অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী

সম্পাদনা
ধীমান দাশগুপ্ত

অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

অন্নদাশঙ্কর রায়

BCSC Public Library
[illegible] 2317
[illegible] M.R. No. 10034

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট, ১৯৪৭

প্রকাশক
অবনীন্দ্রনাথ বেরা
বাণীশিল্প
১৪এ টেমার লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর
ক্রিয়েশন
২৪বি/১বি ডা. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৪

সহ সম্পাদক
অজয় সরকার

প্রচ্ছদ
প্রণবেশ মাইতি

২০০.০০

লেখকের ভূমিকা

আমি কবি হতেই চেয়েছিলুম, ঔপন্যাসিক হতে চাইনি। তার জন্যে কোনো প্রস্তুতিই ছিল না। ইউরোপ প্রবাসের সময় পাশ্চাত্য তথা আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল থেকে বিশ্বব্যাপার নিরীক্ষণ করে আমার মনে যে আলোড়ন ঘটে তারই একটা রেকর্ড রাখার কথা মাথায় আসে। কবিতা তার মাধ্যম হতে পারে না, যদি না মহাকাব্যে হাত দিই। এ যুগে মহাকাব্যের স্থান নিয়েছে বৃহৎ উপন্যাস। আমার চোখের সামনে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত ছিল। যেমন রম্যাঁ রলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ' বা টমাস মানের 'ম্যাজিক মাউন্টেন'। 'জাঁ ক্রিস্তফে'র ইংরেজী অনুবাদ আমি কলেজ জীবনে পুরস্কার রূপে পাই। অবচেতন মনে তারই প্রভাব সম্ভবত সক্রিয় ছিল। তা বলে তত বড়ো উপন্যাস লেখার খেয়াল আমার ইউরোপ প্রবাস কালেও ছিল না। দেশে ফিরে আসার পরই উপলব্ধি করি যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই সভ্যতার বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ যদি আমার উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয় তবে আমাকে পাঁচ বছর ধরে লিখতে হবে পাঁচ পর্বের উপন্যাস।

কিন্তু আরম্ভ করার জন্যে ত্বরা ছিল না। যে ব্যক্তি কখনো ছোট একখানা উপন্যাসও লেখেনি সে যদি প্রস্তুত না হয়ে পাঁচ খণ্ডের উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করে তবে তার অনেক আগেই থেমে যাবে। কিন্তু 'বিচিত্রা' সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে চিন্তা করারও অবকাশ দিলেন না। চেয়ে বসলেন 'পথে প্রবাসে'র সমাপ্তির পিঠ পিঠ একটি উপন্যাস। শিখিয়েও দিলেন কেমন করে লিখতে হয়। না ভেবে না চিন্তে সাঁতার না শিখেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আজকাল আমি সহসা কিছু শুরু করিনে। বছরের পর বছর ধরে ভাবি ও নোট করি। কিন্তু পঁচিশ বছর বয়সে আমার স্বভাবটা ছিল কবির। লীরিক কবির। লীরিক যারা লেখে তারা স্বতঃস্ফূর্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। উপেন্দ্রনাথ আমাকে ধাক্কা মেরে জলে নামিয়ে দেন। আমাকে প্রাণের ভয়ে সাঁতার কাটতে হয়। লিখতে লিখতে আমার আত্মবিশ্বাস জাগে। কিন্তু মাসে মাসে লেখা জোগানো একজন কর্মব্যস্ত ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে সম্ভব হয় না। ধারাবাহিকভাবে 'বিচিত্রা'য় প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতির খেলাপ হয়।

ইতিমধ্যে ডি. এম. লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী গোপালদাস মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। তাঁর অনুরোধে 'আগুন নিয়ে খেলা' লিখে তাঁর হাতে দিই। তিনি যখন আরো উপন্যাস চান তখন তাঁকে বলি, "পাঁচ খণ্ডের উপন্যাস কি আপনি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করতে রাজী আছেন? অত্যন্ত সীরিয়াস বিষয়ে লেখা উপন্যাস কি কেউ কিনবে? আপনার লোকসান হবে না?" তিনি আমাকে আশ্বাস দেন যে লাভ না হলেও তিনি আমার পাঁচ খণ্ডের উপন্যাস প্রকাশ করবেন। বই যখন শেষ হয় তখন বারো বছর কেটে গেছে, পাঁচের জায়গায় ছয় খণ্ড লিখতে হয়েছে। গোপালবাবুর আগ্রহের কমতি নেই। আরো এক খণ্ড লিখলে সেটাও তিনি নিতেন। পাঠকদের দিক থেকেও ঔৎসুক্য ছিল। বাংলার পাঠক সমাজ ইউরোপের পাঠক সমাজের চেয়ে কম ম্যাচিয়োর নয়। তবে আকারে ছোটো।

ইচ্ছা করলে কি ও বই সাত খণ্ডে সমাপ্ত করা যেত না? না, প্রত্যেক কাহিনীরই

এক জায়গায় না এক জায়গায় দাঁড়ি টানতে হয়। তাকে আরো বাড়াতে গেলে রসভঙ্গ হয়। উপন্যাসও মূলত কাহিনী। অসংখ্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলেও আমি কাহিনীর খেই হারিয়ে ফেলিনি। আর কাহিনী আমাকে যতদূর টেনে নিয়ে গেছে ততদূরই আমি গেছি। কাহিনীটা গৌণ নয়, সেটাই মুখ্য। আমি নিজেই জানতুম না যে কাহিনীটা আপনি আপনাকে লেখাবে। আমি নিমিত্তমাত্র। পাঠকের হয়তো মনে হবে সমস্তটাই আগে থেকে ছকা ছিল। না, 'সত্যাসত্যে'র বেলা সেকথা খাটে না। আমি আমার সৃষ্ট চরিত্রদের খুশিমতো চলতে ফিরতে দিয়েছি। তারাই বরঞ্চ আমাকে চালিয়েছে ফিরিয়েছে। উপন্যাস লেখার আনন্দ তো সেইখানেই। ওটা লেখকের পক্ষে একটা অ্যাডভেঞ্চার।

রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে 'সত্যাসত্যে'র প্রথম অংশ 'যার যেথা দেশ' ও দ্বিতীয় অংশ 'অজ্ঞাতবাস' যাচ্ছে। ঘটনাস্থল প্রধানত ইউরোপ। লিখতে গিয়ে অনেক সময় আমার সহধর্মিণী লীলা রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়েছে। নইলে ইউরোপীয় আচার ব্যবহার রীতিনীতি সম্বন্ধে নানা ভুলভ্রান্তি থেকে যেত। লেখবার সময় তো আমি ইউরোপে ছিলুম না, ছিলুম বাংলার মফঃস্বলের বিভিন্ন জেলায় বা মহকুমায়। বই যখন আরম্ভ করি তখন আমি মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সে সময় আমার জানা ছিল না যে আমি এমন একজনকে বিয়ে করব যিনি আমাকে আমার উপন্যাস রচনায় সাহায্য করবেন। দৈবাৎ তিনি বহরমপুর বেড়াতে আসেন, দৈবাৎ তাঁর সঙ্গে আমার চেনাশোনা হয়, দৈবাৎ সেই চেনাশোনা প্রণয়ে ও পরিণয়ে পর্যবসিত হয়। সমস্তটাই দুই মাসের মধ্যে। যেন তিনি আমার ভাগ্যবিধাতার দ্বারা প্রেরিত হয়েই এসেছিলেন আমাকে আমার উপন্যাসদায় থেকে উদ্ধার করতে। যে গ্রন্থ লণ্ডনে বা প্যারিসে বসে লিখলে মানাত সে গ্রন্থের প্রথম দুই অংশ বহরমপুরে, বাঁকুড়ায় ও রাজশাহী জেলার নওগাঁয় বসে লেখা বিড়ম্বনা। কেন যে আমি অমন দায় নিজের কাঁধে টেনে নিয়েছিলুম তা আমিও কি জানি ? আমার কি সাধ্য ছিল দায়মুক্ত হবার, যদি না আরেকজন কোন্ সুদূর থেকে এসে আমার জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করতেন। বিয়ের বয়স হয়েছিল, নির্বন্ধেরও বিরাম ছিল না। করেও বসতুম হয়তো অপর একজনকে বিয়ে। কিন্তু সেই অপর একজন আমার উপন্যাস রচনায় সহযোগিতা করতে পারতেন না। 'সত্যাসত্য' লিখতুম আমি ঠিকই, কিন্তু তার পাশ্চাত্য দিকটা খুবই দুর্বল হতো। সত্য ও অসত্য যদিও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নয় তবু একটি না থাকলে অন্যটিও অপরিপূর্ণ। সমন্বয়ই আমার আদর্শ। 'সবুজপত্র' আমার বাল্যকালে এ আদর্শ শেখায়।

এই খণ্ডে সংগৃহীত কবিতাগুলি ইউরোপে থাকতেই লেখা কিংবা তার অল্পকাল পূর্বে বা পরে। আরো লিখতে চেয়েছিলুম, কিন্তু রাজধর্ম কবিধর্মের বিরোধী। কবিতাকেই পথ ছেড়ে দিতে হলো। ট্র্যাজেডী।

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রাসঙ্গিক ৯

উপন্যাস

সত্যাসত্য : ১ম খণ্ড : যার যেথা দেশ (১৯৩২) ১৭
সত্যাসত্য : ২য় খণ্ড : অজ্ঞাতবাস (১৯৩৩) ২২৫

কবিতা

প্রথম স্বাক্ষর (অগ্রন্থিত) ৪১৫
রাখী (১৯২৯) ৪৩৬
একটি বসন্ত (১৯৩২) ৪৫৯
কালের শাসন (১৯৩৩) ৪৭১
লিপি (অগ্রন্থিত) ৪৮৯
নীড় (অগ্রন্থিত) ৪৯৯
জার্নাল (অগ্রন্থিত) ৫০৯
পরিশিষ্ট ৫২১

প্রাসঙ্গিক

রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ছয় খণ্ডে সমাপ্ত উপন্যাসমালা 'সত্যাসত্য'-এর (১ম খণ্ড : যার যেথা দেশ, ২য় : অজ্ঞাতবাস, ৩য় : কলঙ্কবতী, ৪র্থ : দুঃখমোচন, ৫ম : মর্ত্যের স্বর্গ, ৬ষ্ঠ : অপসরণ) প্রথম দুই খণ্ড এবং ১৯৩৩ পর্যন্ত রচিত ও প্রকাশিত প্রায় সমস্ত কবিতা। সূচিপত্রের এই বিন্যাস প্রাসঙ্গিক হয়েছে কেননা সত্যাসত্য শুধু সত্য ও অসত্যের হিসাবনিকাশ নয়, একদিক থেকে দেখলে জীবন ও শিল্পের আর বাস্তব ও আদর্শেরও হিসাবনিকাশ এবং অন্নদাশঙ্করের কবিতা হল এমন এক শিল্পরূপ যা থেকে শুধু জীবনের নয়, আত্মজীবনেরও, কথা অব্যাহতভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

আধুনিক মনের স্বাভাবিক ভাষা গদ্য। আধুনিক কথাসাহিত্য তাই পদ্যে লিখিত হয়ে মহাকাব্য নাম ধারণ না করে, গদ্যে লিখিত হয়ে উপন্যাস নাম ধারণ করে। উপন্যাসই হল আধুনিক কালের মহাকাব্য—গদ্যকাব্য। আধুনিক কালের সবসেরা বাঙালি লেখকদের মধ্যে প্রস্তুতিপর্বের প্রতিন্যাসের ক্ষেত্রে উপন্যাস বনাম ছোটগল্প এই দোটানা দেখা গেছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ভাষায়, 'আমার অনেক গল্প বেরিয়ে গেল। তবু তখনও আমি উপন্যাসে হাত দিইনি। তবে আমি উপন্যাসের দিকে আস্তে আস্তে এগোচ্ছিলাম। আমি মনে করতাম গল্পগুলি হল এক এক খণ্ড ইট। আর উপন্যাস হল একটা প্রকাণ্ড ইমারত। সুতরাং ইটের পর ইট গাঁথার মতন আমি আমার গল্পের চরিত্রগুলি সাজিয়ে দেব। সেইসঙ্গে সিচুয়েশনের দরজা জানালা জুড়ে দেব, ঘটনার সিঁড়ি থাকবে বারান্দা থাকবে। তার ওপর স্টাইলের পলেস্তারা পড়বে এবং তারপর ভাষার রং।' আবার অন্নদাশঙ্করের ভাষায়, 'এক একটা উপন্যাস লেখা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার, তার জন্য কঠিন পরিশ্রমের দরকার। তবু আমি উপন্যাস নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম। ছোটগল্প লিখতে আমার সাহসে কুলোয় নি। ছোটগল্পের যে ওস্তাদি তা আমার আয়ত্তে ছিল না। ছোটগল্পের আর্ট উপন্যাসের চেয়ে কম কঠিন নয়। তার প্রস্তুতিও ভিন্ন। পক্ষান্তরে উপন্যাসও এক রাশ ছোটগল্পের একত্রীকরণ নয়। ছোটগল্পের দাবী এমন যে চেখভের মতো অত বড় শিল্পী একখানিও উপন্যাস লেখেননি। তেমনি উপন্যাসের দাবী এমন যে ডস্টইয়েভ্‌স্কির মতো মহাশিল্পীকে দিয়ে ছোটগল্প বড় একটা হলো না।'

দুই লেখকের মধ্যে মতের পার্থক্য তাঁদের রচনার মেজাজেও প্রভেদ এনে দিয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রের একাধিক উপন্যাস হয়ে উঠেছে যেন প্রসারিত ছোটগল্প বা একসারি গল্পের মালা। আবার অন্নদাশঙ্করের একাধিক ছোটগল্প আসলে বীজাকার উপন্যাস, কনসেপ্টধর্মী বড় মাপের থিমকে ছোটগল্পের পরিসরে ঢোকাতে গিয়ে সেখানে সংলাপে

অনেক খোরাক দিতেই হয়েছে। অন্নদাশঙ্করের শিল্পমেজাজ মুখ্যত ঔপন্যাসিকের, বড় মাপের উপন্যাসের, মনোলিথিক স্ট্রাকচারের। এটা স্বাভাবিক যে তিনি ছয় খণ্ডে উপন্যাস লিখবেন, তারপর তিন খণ্ডে, তারও পরে চার খণ্ডে। প্রথম খণ্ডের প্রাসঙ্গিকে আমরা বলেছিলাম অন্নদাশঙ্করের তিনটে অন্বেষণ আছে—সত্যের অন্বেষণ, প্রেমের অন্বেষণ, সৌন্দর্যের অন্বেষণ। সত্যাসত্য সেই সত্যের অন্বেষণের কাহিনী। একটা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে লেখক আমাকে বলেছিলেন, সত্য কী ? তা এক কথায় বলা যায় না, সেই 'এক্সপিরিয়েন্স অব ট্রুথ' নিয়ে সত্যাসত্য উপন্যাস লেখা। লেখক প্রথমে চেয়েছিলেন সত্যাসত্য হবে এপিক তথা রূপক। কিন্তু দেখা গেল বিভিন্ন চরিত্র, বিবিধ সম্বন্ধ সবাইকে রূপকের অঙ্গীভূত করা যায় না, তখন রূপক গেল কিন্তু এপিক রইলো। এপিকের বিষয়বস্তু সত্যাভিজ্ঞতা, পটভূমিকা তৃণখণ্ড থেকে মানবসংসার হয়ে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড। এরও প্রায় কুড়ি বছর পর লেখক জানান, সত্যাসত্য এপিক নয়, বৃহৎ উপন্যাস।

সুতরাং তাঁর ছ-খণ্ডের সত্যাসত্য ষট্‌মাত্রার এপিক হয়ে উঠতে পারলো না—এ-কথা সমালোচকের বলার অপেক্ষা রাখে না, লেখক নিজেই বলে দেন, আয়তন বৃহৎ হলেই যে মহাকাব্য বা এপিক উপন্যাস হয় তা নয়। আরো দীর্ঘ উপন্যাসও লেখা হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে এপিকের জীবনদৃষ্টি নেই। ক্যানভাস বড়ো না হলে সত্যিকার ভালো উপন্যাস হয় না, এটা ঠিক। তা বলে ক্যানভাসটাকে যত খুশি বড়ো করলেই যে এপিক উপন্যাস হবে তাও নয়। ক্যানভাসের চেয়ে আরো বড়ো জিনিস জীবনদৃষ্টি। সেই জীবনদৃষ্টি সবাইকে দেওয়া হয় না।

আগেই বলেছি সত্যাসত্যে লেখকের জীবনদৃষ্টি হল সত্যদৃষ্টি : সত্যের উপর জোর বরাবর দিয়েছি, আরো জোর দিতে হবে এবার। কিন্তু আমি স্টোরি লিখতে বসেছি। হিস্টরি লিখতে বসিনি। জীবনী বা ইতিহাস লিখলেই তা উপন্যাস হয় না। জীবনের সত্যকে আর্টের সত্য করতে হবে। আরো গভীরে যেতে হবে। তার জন্যে চাই আরেক রকম দৃষ্টি। অন্তর্দৃষ্টি।

এই উপন্যাসের তিন নায়ক-নায়িকা তিন স্বতন্ত্র পথ দিয়ে একই সত্যের অভিসারী। বাদল নিয়েছে মননের মার্গ, সুধী নিয়েছে শ্রদ্ধার মার্গ আর উজ্জয়িনী নিবেদনের। তিনজনেরই লক্ষ্য এই সত্যান্বেষণে তারা শেষপর্যন্ত রইবে অনভিভূত অনুত্তেজিত ও মোহমুক্ত। তিনজনেই জানে তারা একটা যুগসন্ধিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। অথচ তর্কপ্রবণ এই চরিত্রগুলি বাদবিতণ্ডার ত্রুটিতে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে ফেলে। বীতশোক ভট্টাচার্যের মতে, 'যে তলস্তয় অন্নদাশঙ্করের আদর্শ তিনি তাঁর বিগ্রহ আর শান্তি প্রসঙ্গে বলেছিলেন : ঐতিহাসিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার ব্যাপারটি অবান্তর। অসচেতন ক্রিয়াই একমাত্র ফলদায়ক। ঐতিহাসিক ঘটনায় যার সক্রিয় ভূমিকা

আছে সে কখনো তার তাৎপর্য বুঝতে পারে না। বুঝবার চেষ্টা করলেই তার প্রয়াস ব্যর্থ হয়। এই প্রয়াস আর তার ব্যর্থতা অন্নদাশঙ্করের সত্যাসত্য-এ খুবই স্পষ্ট।’

বাদলের সত্যান্বেষণ যে ব্যর্থ হবে তার ইঙ্গিত রয়েছে প্রথম খণ্ড থেকেই। মননশীল বাদল হল সেই রকম মানুষ যে নিজের মন নিয়ে ব্যাপৃত, পরেরও যে মন বলে কিছু আছে সে-খবর সে রাখে না, তার যুক্তি হল তার নিজের দিক থেকে যখন ভালোবাসা নেই তখন অপরের দিক থেকে থাকবে কেন, তাই স্বেচ্ছায় বিয়ে করেও স্ত্রীকে ভালোবাসবার বা তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ থাকবার দায়িত্ব তার নেই, স্ত্রী তার কাছে সহযাত্রিণী নয়, অতিক্রমণীয়া, তার ধারণা বিশুদ্ধ মননক্রিয়া হল সেই জিনিশ যাতে সাহিত্য-সমালোচনার মধ্যে সমাজের স্বার্থ ঢোকে না, সৌন্দর্য-বিচারের ভিতর আসে না মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা—এই প্রেমহীন, বিশ্বাসহীন (কোন কিছুতেই তার বিশ্বাস নেই আবার খুব প্রবলভাবে কোন কিছুকে অবিশ্বাস করতেও সে অক্ষম) মনন কীভাবে সত্য আবিষ্কার ও আত্ম আবিষ্কারের হাতিয়ার হতে পারবে ? তাই স্বাভাবিকভাবেই অন্তিমে তার সত্যান্বেষণ ব্যর্থ হয়ে যায় ও অনিবার্যভাবেই সে অনুভব করে সে একা ও তাকে ঘিরে এক অব্যক্ত রহস্য। জীবনকে শ্রদ্ধা না করলে জীবনের কাছ থেকে শ্রদ্ধা পাওয়া যায় না। বাদল জীবনের সঙ্গে ফ্লার্ট করেছিল, তাই জীবনের কাছ থেকে প্রত্যয় সে পেল না।

বরং সুধী অনেক বেশি সুস্থির ও স্থিতধী। বাদল যদি হয় আত্মকেন্দ্রিক সুধী তবে আত্মমনস্ক। তার বচনে, হস্তাক্ষরে ও আচরণে আত্মসমাহিত প্রসন্ন অন্তঃকরণের ছাপ। সে তার স্বজ্ঞার সঙ্গে মিলিয়েছে মনন ও দায়িত্ববোধকেও। পাসকালের উক্তিকে প্রসারিত করে বলা যায় একই আধারে এই তিন বৈশিষ্ট্য বা গুণের সহাবস্থান নিতান্ত বিরল। এই সহাবস্থান ঘটে জীবনে, কখনো কখনো শিল্পেও, জীবন ও শিল্পের সেই সম্পর্ক ও বিনিময়ের কথা বলার আগে সুধী সম্পর্কে এটুকু বলা দরকার যে তাকেই আমরা অপেক্ষাকৃত ভিন্ন রূপে ফের ফিরে পাব ক্রান্তদর্শী উপন্যাসমালায়। সে অবশ্য পরের কথা।

সত্যাসত্যের ভূমিকায় যখন লেখক বলেন, আর্ট না থাকলে জীবন রিক্ত ও জীবন না থাকলে আর্ট আকাশকুসুম। জীবন এবং আর্ট মিলে একটি অবিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণতা, যেন ওরা দুই নয়, এক। যেন জীবন হচ্ছে আর্ট, আর্ট হচ্ছে জীবন। তবু ওদের প্রকৃতি ভিন্ন—তখন বেশ বোঝা যায় লেখক যে-সাধনায় মগ্ন তা হচ্ছে জীবনশিল্পের সাধনা। আর তাহলে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তার শৈলীর প্রসঙ্গ, ‘যে শৈলী অভিব্যক্তিগত হয়েও নৈর্ব্যক্তিক। এ গদ্য ভাবুক বুদ্ধিজীবীর সত্যসন্ধানের গদ্য। যে সত্য (গরিষ্ঠ সংখ্যকের) জীবনে নেই তার আত্মিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এ গদ্যের

উদ্ভব' (—বীতশোক ভট্টাচার্য)। ফলে শৈলীবিজ্ঞানের দিক থেকেও এই উপন্যাসমালা মূল্যবান হয়ে ওঠে। প্রসন্নতা ও উজ্জ্বলতা, মনীষা ও সহৃদয়তায় আক্রান্ত তাঁর লেখা, শাণিত সংহত অথচ স্বচ্ছ একটি গদ্যভঙ্গিমা তাই শিক্ষিত পাঠক চায়। শিক্ষিত মনস্ক পাঠক। সকলের সহিতত্ব তাঁর কথাসাহিত্যের লক্ষ্য নয়, সে লক্ষ্য হলে হতে পারে তাঁর ছড়ায়।

সত্যাসত্যের নায়ক নায়িকাদের বাকপটুতা ও তর্কপ্রবণতারও কারণ মেলে শৈলী বিজ্ঞানের সূত্র ধরেই। যেমন লেখকের অনেক গল্পে কনসেপ্টধর্মী বড় মাপের থিমকে ছোট গল্পের পরিসরে ঢোকাতে গিয়ে সংলাপে অনেক খোরাক দিতেই হয়, তেমনি বড় মাপের হলেও এপিক নয়—এমন থিমকে কয়েক খণ্ডের উপন্যাসে ছড়াতে গিয়ে সংলাপ দিয়েই কিছু ফাঁক ভরাতে হয়। সেই দীর্ঘ, সংলগ্ন, কখনো ঈষৎ শিথিল সংলাপ-রীতি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো পরবর্তী খণ্ডে যখন সত্যাসত্যের কাহিনী পূর্ণ গতি পেয়েছে। যেমন আধুনিকতা ও আন্তর্জাতিকতার সমর্থক হিশেবে ও মানবতার উত্তরণের নির্ধারক হিশেবে সত্যাসত্যের ভূমিকার কথা আলোচিত হবে রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে—সত্যাসত্য শেষ হবে যেখানে। তখন আমাদের সত্য সংক্রান্ত কয়েকটি নান্দনিক সূত্রও পরীক্ষা করে দেখতে হবে, যেমন—

১. চরম ও পরম সত্য বলে কিছু নেই, সমস্ত সত্যই আপেক্ষিক
২. নেতিনেতি করেও সত্যকে জানা যায়
৩. 'সত্য যে কঠিন, / কঠিনেরে ভালোবাসিলাম—/ সে কখনো করে না বঞ্চনা।'
ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তিকে লেখক নিজেই উদ্ধৃত করেছেন : পাঠকের কাছে লেখক একটা সনদ আদায় করে নিয়েছে। সে সত্য কথা বলবে, কিন্তু সত্য কথা বানিয়ে বলবে।

জীবন ও শিল্পের যে সম্পর্কের কথা আমরা আগে তুলেছিলাম সেই প্রসঙ্গে এও বলতে হয় যে, রসজ্ঞ জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে সাহিত্যের ও বর্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে অতীতের বিচার করে থাকেন, যারা কেবলমাত্র পণ্ডিত তাদের সঙ্গে এদের সেই কারণে বনে না। মনন ও রসানুভূতির এই দ্বন্দ্বও সত্যাসত্যের অন্যতম প্রাসঙ্গিক বিষয়। লেখক এর নাম দিয়েছেন একই আত্মার অন্তর্বিগ্রহ—বুদ্ধি বনাম অন্তর্দীপ্তি, আরো তলিয়ে দেখলে দেশকালপাত্রাতীতের সঙ্গে দেশকালপাত্রোচিতের অসামঞ্জস্য। কল্পনা বনাম বাস্তব ও বাস্তব বনাম আদর্শ এই দুই দ্বন্দ্ব এসে পূর্বোক্ত দ্বন্দ্বকে আরো জটিল করে দিয়ে যায়। এখানে বোধহয় আরো একটা মিথক্রিয়ার কথা বলা দরকার—জীবন ও বিজ্ঞান। সরাইওয়ালার ডাগর মেয়ে করে গোদোহন। বাঁটের পিচকারি থেকে বালতিতে সফেন দুধ ছুটে এসে পড়ছে, ফুলে ফুলে উঠছে। টুলের উপর বসেছে সেই ডাগর মেয়েটি। তার

গালের রঙ টকটকে লাল। তার হৃষ্ট মুখ ও পুষ্ট দেহ : জীবনের এই সপ্রাণ চিত্র (যা জসীমউদ্‌দীনের হলুদ-বরণী মেয়ের হলুদ বাটার দৃশ্যের সঙ্গে তুলনীয়) বাদলকে উদ্‌বুদ্ধ করে না, কেননা জীবনের ওপর বিজ্ঞানের যে সদর্থক প্রভাব, জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞানের যে প্রাণবন্ত সম্পর্ক তা বাদলের ক্ষেত্রে কার্যকর নয়. সে যে অপরিপাচিত্ত বিজ্ঞানের অজীর্ণে রুগ্ন। তার আকাশকুসুম কল্পনা তার ভূমিস্থ অস্তিত্বকে পদে পদে বিপন্ন করে, অচল স্বর্ণমুদ্রার মতো তার বিদ্যা জীবনে রূপান্তরিত হতে পারে না, যদি সুধী থাকে বিশ্ব-শতদলের কেন্দ্রে তাহলে সে যেন রয়েছে একেবারে একপ্রান্তে—স্বাভাবিক যে কমিউনিজম তার চোখের বিষ হবে।

অন্নদাশঙ্করের জীবনবেধ যদি তাঁকে উপন্যাসাভিমুখী করে থাকে, করে থাকে বহিঃস্থ ও কেন্দ্রাতিগ, তাঁর জীবনবোধ তাহলে তাঁকে কাব্যাভিমুখী করেছে, অন্তঃস্থ ও কেন্দ্রাভিগ। 'আমার আসল কাজ কবিতায়। কবিতা—সে কবির কাছে মননের চাইতে বেশি কিছু দাবি করে, বিশুদ্ধ আবেগ ও গভীর আনুগত্যও দাবি করে। কবিতা একটা সাধনা, খুব কম কথার মধ্যে বেশি কথা বলতে পারাটা সাধনা। কবিতা না লিখলে আমার মুক্তি পরিপূর্ণ হবে না। কিন্তু তার আগে আমাকে উপন্যাসের কাজ কমিয়ে আনতে হবে। নইলে আমার কবিতা হবে না।' তাঁর উপন্যাসে জীবনের প্রতিভাস, কবিতায় আত্মজীবনের উদ্ভাস। তাই তাঁর কবিতায় স্বাভাবিকভাবেই থাকে তাৎক্ষণিকতার মোহ, ত্বরিতানুভূতির স্পর্শ। তাঁর উপন্যাস ও কবিতার মেজাজে সুস্পষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে, বস্তুত তারা পরস্পর বিপ্রতীপতার সূত্রে নিবদ্ধ। তাঁর উপন্যাস দৃঢ় পুরুষালি মননশীল, কবিতা নমনীয় কমনীয় আবেগপ্রবণ।

খুব রাশভারী মানুষটিও যেমন বনভোজন বা অন্য কোন প্রমোদ অনুষ্ঠানে আচার-আচরণ ও হাবভাবে স্বভাববিরুদ্ধ এমন অনেক কিছু করে থাকেন যা অন্য সময়ে করলে ভীষণ খেলো ও ছেলেমানুষি মনে হত, গুরুগম্ভীর আর গুরুত্বপূর্ণ মানুষটিও যেমন ঘরে ফিরে এসে মনের মানুষের কাছে হয়ে যান খোলামেলা আর অন্তরঙ্গ, ছুটির দিনে দৈনিক রুটিনে যেমন স্বেচ্ছায় এমন অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটে যায় যা অন্য দিনে ঘটলে হয়ে উঠতো স্বেচ্ছাচার ও বিশৃঙ্খলা, অন্নদাশঙ্করের কবিতাও আসলে তেমনি ভিতর ঘরের জিনিশ, ছুটির দিনের জিনিশ, প্রমোদনের জিনিশ। 'কবিতার মুড না এলে আমি কবিতা লিখিনে। স্বতঃস্ফূর্তি তার প্রথম শর্ত।'

সেইজন্য কবিতা নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর চাঞ্চল্য, অস্থিরতা ও অতৃপ্তি রয়েছে। একটা ব্যক্তিগত উদাহরণ দেওয়া যাক। রচনাবলীর এই খণ্ডে লেখকের সাতটি কবিতা-সঙ্কলন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে : প্রথম স্বাক্ষর, রাখী, একটি বসন্ত, কালের শাসন, লিপি, নীড়, আর্শাল, তার মধ্যে প্রথম স্বাক্ষর, লিপি, নীড় ও আর্নাল কখনো স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশিত

হয়নি, শুধু তাদের প্রত্যেকের অংশবিশেষ নূতনা রাধা সঙ্কলন-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এখন রচনাবলীতে অন্তর্ভুক্তির সময় লেখক শুধু এই চারটি সঙ্কলনের ক্ষেত্রে নয়, প্রকাশিত গ্রন্থ তিনটির ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিমার্জন সাধন করলেন। কখনো কখনো নূতনা রাধা-য় প্রকাশিত অংশটুকুকেই মনোনীত করলেন, কখনো কখনো সেই অংশটুকুর সঙ্গে আরো কিছু নির্বাচিত কবিতা যুক্ত করলেন, কখনো সমগ্র অগ্রন্থিত পাণ্ডুলিপিকেই নির্বাচন করলেন, কখনো প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে অনেক কবিতা বর্জন করলেন, এ-ছাড়া কবিতার নাম পালটালেন বা কবিতার স্বতন্ত্র নামকরণ বাতিল করলেন। আপাতত এই। ভবিষ্যতে যদি তাঁর আর কিছুসংখ্যক কবিতা সংযোজনের বাসনা হয় তবে নূতনা রাধা-র রচনাবলী সংস্করণ হিশেবে রচনাবলীর নির্দিষ্ট খণ্ডে তারা স্থান পাবে : এই আশাও প্রকাশ করলেন। তাঁর কবিতা তাঁর কাছে তাঁর বনিতার মতোই, তাই কবিতাকে নিয়ে তিনি একই সঙ্গে আকর্ষণ ও দোটানায় ভুগছেন।

তাঁর জীবনের সঙ্গে তাঁর কবিতার প্রত্যক্ষ সম্পর্কের কথা বলেছি। বস্তুত তাঁর জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা, জীবন জিজ্ঞাসা ও জীবন দর্শনের অপূর্ব পরিচয় মেলে তাঁর কবিতা থেকে—

জন্ম : এ জীবন কত নন্দিত ! কত নন্দিত !
জন্মেছি বলে ধন্য রে আমি ধন্য।
জীবন : এ জীবন কী যে নন্দিত ! কী যে নন্দিত !
বেঁচে আছি বলে ধন্য রে আমি ধন্য !
মা : দুঃখিনী মায়ের কথা পড়ে আজ মনে।
বিদেশযাত্রা : দেশ ছেড়ে চলি বিরাট রথে
মহাজগতে।
প্রবাস : বিলেতবাসী আমরা সবাই
শীতে এবার হলেম জবাই—
তোমরা কি এর খবর রাখো কোনো ?
দেশে ফেরা : এবার চলেছি নিজ দেশে
ভারতের ছায়াতরুতলে
পরিচয় : প্রিয়ার সাথে প্রিয়ের পরিচয় প্রথম স্থলগন
গগনে কোন বর্ণলীলা, কোন লাবণ্যযোজন ?
পরিণয় : আমাদের যুক্ত প্রেমে অবনী কি হয়েছে নবীন
মানবের দেশে দেশে অকল্যাণ কিছু হলো ক্ষীণ ?

সত্যান্বেষণ : সত্যের গোধনগুলি আসে নাই ঘর ;
রজনী গভীরা হলো।

সৌন্দর্যের অন্বেষণ : আদিকাল হতে শুধু রূপে রূপে আঁখি অভিসারী
প্রাণ তবু রূপের ভিখারী।

প্রেমের অন্বেষণ : একখানি সম্পূর্ণ জীবন
প্রেম তার কেন্দ্র আর পরিধি যে অনন্ত ভুবন।

সত্য, প্রেম, সৌন্দর্য—সমস্ত মিলিয়ে তাঁর সামগ্রিক অন্বেষণের কথাও লেখক বলেছেন কবিতায় : যে তাঁর কামনা অন্য ফুল নয়, নিজ ফুল ; অন্য সুর নয়, নিজ সুর ; অন্য মাণিক নয়, সাঁচা মাণিক ; অন্য তারা নয়, ধ্রুব তারা ; যে-কোন দেখা নয়, অসামান্য দেখা। তাঁর জীবনদর্শনের কথাও এসেছে কবিতায় (বস্তুত তাঁর একটি অত্যন্ত মূল্যবান কবিতার নামই জীবনদর্শন) : তবে তাই হোক, আমার ধর্ম/সব ছেড়ে দিয়ে শিল্পকর্ম, সৃষ্টির সার দিয়ে সৃষ্টি করি/এই তো আমার কাজ, কবি যদি হয়ে থাকো আছে তো লেখনী/ব্রহ্মাস্ত্র তোমারি তূণে তবে কেন ভয় ? / অন্তিমে অববারিত তোমারি তো জয়…।

তবু কবিতা-রচনার চেয়েও মূল্যবান কাজ আছে তাঁর : জীবনে সব নয় কবিতা লেখা/সত্য করে চাই বাঁচতে শেখা, জানি নাকো আমি কতদিন আছি/বাঁচতে শিখব যত দিন বাঁচি। এবং এইভাবে দেখলেও তিনি হলেন জীবনশিল্পী, নিজের জীবনকেই শিল্প করে তুলছেন। কবিতার মধ্য দিয়ে আরো ভালোভাবে বাঁচতে শিখছেন ও আরো ভালোভাবে বাঁচার প্রতিফলন পড়ছে নিজের নতুন কবিতায়। ‘অমৃত হয়েছি আমি মর্ত্যলোকে এসে।’

বলা বাহুল্য, এইসব কবিতা সূক্ষ্ম রসানুভূতি ও গভীর হৃদয়ানুভূতিতে আপ্লুত। তাঁর উপন্যাসের যে সুবিস্তৃত কক্ষপথ ও আন্তর্জাতিক মানসিকতা তাঁর কবিতা সেই তুলনায় অনেক ব্যক্তিগত ও মূলত নিজস্ব অক্ষ বরাবরই তার ঘূর্ণন কিন্তু তাঁর সমগ্র শিল্পকর্মের ভারকেন্দ্রটিকেই ধারণ করে আছে তাঁর কবিতা। তিনি তাঁর প্রিয়ার হাত ধরে যেমন তেমনি তাঁর কবিতার হাত ধরেও একটু গভীরে যান, আর একটু গভীরে যান, আরো একটু গভীরে যান, একটু ওপরে ওঠেন, আর একটু ওপরে ওঠেন, আরো একটু ওপরে ওঠেন—সেটাই জীবনের আদর্শ। ‘আমি নিজে সম্পূর্ণ হই আর না হই, আমার প্রিয়া সম্পূর্ণ হন কি না হন, আমার কবিতা সম্পূর্ণ হোক কি না হোক, আমি বিশ্বাস করি ‘eternal’ বলে একটা কিছু আছে। তা কী সেটাই আমার প্রশ্ন, সেটাই আমার ধ্যান।’ তাঁর সেই ধ্যান ও সাধনার, তাঁর অন্তরাত্মার পরম প্রকাশ কবিতায়।

তাই তাঁর এই প্রগাঢ় ও সানুরাগ উচ্চারণ—

একদিন খুলে যাবে মায়াময় মন্দিরের দ্বার
নিহিত প্রকৃত সত্য রূপ নেবে সম্মুখে আমার ;
প্রতীক্ষায় আছি তারই, জরাজীর্ণ মরণের নয়
বুক হবে রসে ভরা, ত্রিনয়ন হবে আলোময়।—আমাদের যে মুক্ত জগতের দিকে নিয়ে যায়, সেই জগতের সততা, আন্তরিকতা ও প্রজ্ঞাকে আমি, সমস্ত রাজনৈতিক মতভেদ সত্ত্বেও, শ্রদ্ধা না করে পারি না।

ধীমান দাশগুপ্ত

প্রত্যাহৃত ভূমিকা

বিশ্বব্যাপারের সর্বত্র যে দুই বিরুদ্ধ মহাশক্তি সর্বদা সক্রিয় রয়েছে প্রাচীনরা তাদের দেবাসুর আখ্যা দিয়েছিলেন । দেশান্তরে তারাই God এবং Satan ; তাদের নিয়ে প্যারাডাইস্ লস্ট্ রচিত হয়েছে । আধুনিক মন ওসব নাম পছন্দ করে না, তাই তাদের বলে সত্যাসত্য ।

গোড়াতে আমার সংকল্প ছিল তাদের নিয়ে আমিও একখানি এপিক রচনা করব, কিন্তু পদ্যে নয় গদ্যে, যেহেতু আধুনিক মনের স্বাভাবিক ভাষা গদ্য । গ্রন্থের যুগ্মনায়কের নাম রাখতুম সত্য এবং অসত্য । কিন্তু অমন নাম কোনো পিতামাতা রাখেন না। অতএব সুধী ও বাদল। নারীবর্জিত হলেই ভালো হত । কিন্তু নায়িকাহীন কাব্য হয় না। অতএব উজ্জয়িনীর অবতারণা। সত্য এবং অসত্য উভয়ের আকর্ষণ তাকে দ্বিধায় দোলাবে। সে যেন সংকটারূঢ় মানবাত্মা। "সত্যাসত্য" এপিক তথা রূপক হবে।

আইডিয়াটিকে মগজ থেকে কাগজে নামিয়ে দেখা গেল, বাদল সুধী উজ্জয়িনী আমার হুকুম মানে না। অবাধ্য সন্তানের মতো যা খুশি বলে, যা খুশি করে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যায়। দেখতে দেখতে তাদের চরিত্র বদলে গেল, সম্বন্ধ বদলে গেল। মানসসরোবর থেকে নির্গত হয়ে সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র দুই বিপরীত দিকে প্রবাহিত হল, গঙ্গা ধাবিত হল তৃতীয় দিকে। কোথায় রইল তাদের বিরোধ, সুধী হল বাদলের দাদা। কোথায় রইল তাদের প্রেম, বাদল উজ্জয়িনীকে টানল না, সুধীও তার প্রতি নিরনুরাগ। এই তিন নদনদীর সঙ্গ নিল ও ছাড়ল বহু উপনদ উপনদী, শাখানদ শাখানদী। তাদের সবাইকে রূপকের অঙ্গীভূত করা যায় না, তারা এক একটি শক্তি নয়—ব্যক্তি।

রূপক গেল, কিন্তু এপিক রইল। এপিকের বিষয়বস্তু সত্যাসত্যের হিসাবনিকাশ। পটভূমিকা কেবলমাত্র মানবসংসার নয়, নক্ষত্রনীহারিকার সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়পারম্পর্য, অণু-পরমাণুর চিরন্তন অস্তিত্ব। নায়কনায়িকা তিন জনের তিন পন্থা। সুধী গ্রহণ করেছে ইন্‌টুইশনের মার্গ, বাদল ইন্‌টেলেক্‌টের, উজ্জয়িনী আত্মনিবেদনের। তিন জনেরই আকাঙ্ক্ষা বিশুদ্ধ ও বিপুল, অধ্যবসায় একাগ্র ও একান্ত, নিষ্ঠা নিবিড় ও নিগূঢ়। ওদের স্বভাবে কৃত্রিমতা নেই। এপিকের নায়কনায়িকা হবার যোগ্যতা ওদের আছে, ওরা পুরা মাপের মানুষের চাইতে মাথায় উঁচু।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই যদি হয় এপিক, উপন্যাসের সঙ্গে এপিকের প্রভেদ কোথায় ? উত্তর, এপিকমাত্রেই উপন্যাস, হয় পদ্যে নয় গদ্যে। কিন্তু উপন্যাসমাত্রেই এপিক নয়। অর্থাৎ উপন্যাস বহু প্রকার। তার এক প্রকার হচ্ছে এপিক। এপিকের লক্ষণ নায়কনায়িকার লক্ষ্যের উচ্চতা ও প্রয়াসের মহত্ব ; তাদের জগতের বিস্তার ও জীবনের অতিমর্ত্যতা। এর উদাহরণ রলাঁর জাঁ ক্রিস্তফ্। আর এক প্রকার হচ্ছে চরিত্র-চিত্রশালা। বিচিত্র চরিত্রের ভিড়, জনতার কলকোলাহল। এর উদাহরণ ডস্টইয়েভ্‌স্কির যে-কোনো

উপন্যাস। আর এক প্রকার হচ্ছে ঘটনাচক্র। নায়কনায়িকার ভাগ্য ঘটনার সঙ্গে ঘুরতে থাকে, কী হবে কী হবে করে পাঠকের মনটা ব্যাকুল। পাঠিকা হলে বইয়ের শেষ পাতাটা উলটে ধাঁধার জবাব দেখে রাখেন, নায়কনায়িকা বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে মিলিত হয়েছেন, বিবাহের বিলম্ব নেই। এর উদাহরণ রেলওয়ে বুকস্টলে অগুনতি। বড় বড় লেখকেরও এই প্রকার উপন্যাস আছে। উদাহরণ "Three Musketeers"। আর এক প্রকার হচ্ছে বিশ্বকোষ। তার পাত্রপাত্রী অবান্তর। সেটি যাবতীয় জাগতিক বিষয়ে গ্রন্থকর্তার চিন্তার পরিশীলন। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ওয়েল্‌সের উইলিয়াম ক্লিসোল্ড্‌। আর এক প্রকার হচ্ছে প্রচারপত্রী। তারও পাত্রপাত্রী অবান্তর, তাদের উপলক্ষ করে গ্রন্থকার ধর্মপ্রচার করেন, সমস্যার সমাধান বলে দেন, আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করেন। আধুনিক উদাহরণ Upton Sinclair-এর যাবতীয় উপন্যাস। আরও অনেক প্রকার আছে, তাদের মধ্যে একটি প্রকার সম্প্রতি বহুল আলোচিত হচ্ছে। তাকে বলতে পারা যায় সন্দর্ভ অথবা থীসিস্। লেখকের উদ্দেশ্য প্রচার নয়, প্রতিপাদন। তাঁর মনের ছাঁদ বৈজ্ঞানিকের, পদ্ধতি objective. উদাহরণ জেমস্ জয়্‌সের "Ulysses", মার্সেল প্রুস্তের *"A la recherche du temps perdu"*.

উপরে বলেছি, আধুনিক মনের স্বাভাবিক ভাষা গদ্য। নতুবা ওই সমস্ত উপন্যাস পদ্যে লিখিত হয়ে কাব্য নাম ধারণ করত। প্রাচীন সাহিত্যে তার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি। তবে উপন্যাস বলে সাহিত্যের কোনো সুনির্দিষ্ট বিভাগ সেকালে ছিল না। এখনও উপন্যাসের সীমানা নিয়ে দাঙ্গা বাধে। সমালোচক হানা দিয়ে বলেন ওটা উপন্যাস নয়, প্রকাশক পাঠক পাকড়াবার ফন্দীতে মলাটের উপর ছেপে দেন উপন্যাস। লেখক বলেন আমি লিখেই খালাস, শ্রেণী-বিভাগ অপরে করুক; পাঠক প্রকাশকের চাতুরীর জন্যে লেখককে দায়ী করেন। পাছে আমার এই উপন্যাসের বেলা তাই হয় সেজন্যে একটা অযাচিত জবাবদিহি করে রাখলুম।

উপন্যাসের সংজ্ঞা কিংবা সীমানা নির্দেশ করা আমার সাধ্যাতীত, স্বয়ং বেদব্যাস তা করেননি। তবে তাঁর মহাভারত থেকে আমার "সত্যাসত্য" পর্যন্ত উপন্যাসরূপে গণ্য হবার দাবি রাখে এমন যত গ্রন্থ গ্রথিত হয়েছে তাদের প্রাণবস্তু হচ্ছে গল্প। প্রক্ষিপ্ত কিংবা বিক্ষিপ্ত গল্প নয়, আদ্যোপান্ত একটি গল্পপ্রবাহ। পক্ষান্তরে এক রাশ ছোটগল্পের একত্রীকরণও নয়, সব উপগল্পকে জড়িয়ে একটিমাত্র গল্প। যে উপন্যাসে একটি সর্বময় গল্প নেই সে উপন্যাস প্রাণবিহীন পিণ্ডবিশেষ। গল্পের গুণ আগ্রহকে জাগিয়ে দিয়ে জাগিয়ে রাখা এবং আগ্রহের সঙ্গে জেগে থাকা। রাত ভোর হয়, রাজা তৃপ্তি পান, শেহেরজাদী মুক্তি পান। অতএব শুধু গল্প থাকলে চলবে না, গল্পের গুণ থাকা চাই। গল্প যেন শ্রোতাকে গুণ করতে পারে। যে উপন্যাস পাঠকের আহারনিদ্রা হরণ করতে পারল না, যে নারী পুরুষের মনোহরণ করতে পারল না, তাকে শত ধিক্।

উপন্যাসের প্রাণ গল্প এবং গল্পের গুণ চমৎকারিতা। কিন্তু তাই সব নয়। তাই যদি শেষ কথা হত তবে ছোটগল্পের সঙ্গে উপন্যাসের প্রভেদ থাকত না। উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের প্রভেদ শুধু পরিমাণগত নয়, প্রকৃতিগত। উভয়ের প্রাণ একই জায়গায়, যেন তরুর প্রাণ ও তৃণের প্রাণ। উপন্যাসের ডালপালা ছাঁটলে সে ছোটগল্প হয় না ছোটগল্পকে পল্লবিত প্রসারিত করলে সে উপন্যাস হয় না। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সে পাঠককে একটি বিশিষ্ট জগতের প্রবেশ-দ্বার খুলে দিয়ে বলে, "বিচরণ কর, আলাপ কর, প্রেমে পড়।" ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সে একটি বিশিষ্ট জগতের ঘোমটা খুলে একটুখানি দেখায় আর বলে, "পাঠক, যথেষ্ট দেখলে, আর দেখতে চেয়ো না।"

উপন্যাসকার ক্রমাগত সুতা ছাড়তে থাকেন, মাছকে অনেকক্ষণ ধরে খেলিয়ে তারপরে ডাঙায় তোলেন। ছোটগল্পকার জাল ফেলে তখুনি তুলে নেন। ছোটগল্প হাউইয়ের মতো বোঁ করে ছুটে গিয়ে দপ্ করে নিবে যায়। উপন্যাসের পক্ষে বেগ সংবরণ করা সময়সাপেক্ষ, তার অস্তগমনের পরেও গোধূলি থাকে।

উপরে যে বিশিষ্ট জগতের কথা বলা হল সে শুধু উপন্যাসের কিংবা ছোটগল্পের নিজস্ব নয়। প্রত্যেক সৃষ্টির একটি বিশিষ্ট জগৎ আছে। প্রকৃতপক্ষে ঐ জগৎটাই সৃষ্টি। ভাষার কারিকুরি, ভাবের ঐশ্বর্য, ঘটনার ঘূর্ণী চরিত্রের বৈচিত্র্য—কিছুতেই কিছু হবে না, যদি একটি বিশিষ্ট জগতের আভাসটুকু অন্তত না থাকে। সে জগতের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারিক জগতের মিল থাকবে কি থাকবে না, যদি থাকে কতখানি থাকবে, এ নিয়ে তর্কের অন্ত নেই। "সত্যাসত্য" সম্বন্ধেও ঐ তর্ক বাধতে পারে। কেউ কেউ মাসিকপত্রে প্রকাশিত অংশ পড়ে ইতিমধ্যেই মন্তব্য করেছেন, "কই, বাদলের মতো কাউকে তো দেখিনি?" বাদল ছাড়া বাদলের মতো কাউকে আমিও দেখিনি সেটা ঠিক। কিন্তু বাদলকে আমি দেখেছি, হয়তো একমাত্র আমিই দেখেছি। তবে দেখারও প্রকারভেদ আছে। বাদলকে দেখেছি ও ট্র্যাফলগার স্কোয়ার দেখেছি, দু-ই যথার্থ হলেও দুই সমার্থক নয়। বাদলকে নিজের মধ্যে দেখেছি, পরের মধ্যে দেখেছি, বহু স্থানে বহু অবস্থায় দেখেছি। ট্র্যাফলগার স্কোয়ারকে দেখেছি, ট্র্যাফলগার স্কোয়ারে। দু-রকম দেখাকেই পাঠককে দেখিয়েছি। যথাস্থানে ও যথানুপাতে দেখালে এমন জিনিস নেই যা দর্শনীয় হয় না। সকলের চোখে দেখা এই জগৎটার যাবতীয় বস্তুকে আমি যে perspective থেকে যে proportion-এ দেখি তাই আমার দেখা ও সেই দেখার থেকে আমার উপন্যাসের জগৎ। আমার উপন্যাসের জগতে বিচরণ করতে করতে অনেক কিছু পাঠকের মনে ধরবে না অনেককিছু ধরবে, যেমন ভগবানের জগতেও। কিন্তু সৃষ্টি যদি করে থাকি, ফাঁকি যদি না দিয়ে থাকি, তবে ও-জগৎকে এ-জগতের মতো স্বীকার করে নিতেই হবে।

শেষ প্রশ্ন, আর একটা জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী? ভগবান তাঁর জগৎ কী জন্যে সৃষ্টি

কমলের প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া যায় না, কিন্তু ঔপন্যাসিকের কাছে উত্তরের আশা রাখি।

ঔপন্যাসিকের বক্তব্য, উপন্যাস আর্টের শাখা। বিচার করতে হয়, আর্টের উদ্দেশ্য কী। অনেকের মতে আর্টের উদ্দেশ্য জীবনকে প্রতিবিম্বিত করা (bolding the mirror up to Life)। তাই যদি হয় তবে কাজটা ছেলেখেলা। আয়নায় যাকে ধরা যায় সে প্রতিচ্ছায়া, আয়না হচ্ছে ছায়াধরা ফাঁদ। সোজাসুজি জীবনের মুখের দিকে না তাকিয়ে আয়নায় তার আদল দেখব কেন ? আসল থাকতে নকল কী হবে ? কেউ কেউ বলেন, তা নয়, আর্টের উদ্দেশ্য জীবনের ব্যাখ্যা করা, আর্ট হচ্ছে জীবনের ভাষ্য। অর্থাৎ জীবন অতি দুর্বোধ্য পুঁথি, আর্টিস্ট ব্যতীত অপরে তার অর্থ করতে অপারগ। আর্টিস্ট হলেন জীবনশাস্ত্রের শঙ্করাচার্য। কিন্তু আর্টিস্টের ঐ দাবি দার্শনিকের দাবির সঙ্গে সমান। মামলা বাধলে বিচারকের রায় দার্শনিকের পক্ষে যাবে।

তৃতীয় এক দলের ধারণা, আর্টের অনুপ্রেরণায় রূপান্তরিত হয়ে মানবের জীবন হবে দেবতার জীবন। আর্টিস্ট হবেন apostle ; তিনি উপনিষদের ঋষির মতো উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করতে থাকবেন, "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"—যতক্ষণ শ্রোতার কর্ণপটহ অবিভক্ত থাকে। রক্ষা এই যে, কোনো সত্যকার আর্টিস্ট কোনো দিনই এ ব্রত স্বীকার করেননি ; যাঁরা করেছেন তাঁদেরকে আর্টিস্ট বলে গণ্য করা হয়নি।

আমি বলি, জীবন যেমন ভগবানের সৃষ্টি, আর্ট তেমনি মানবের সৃষ্টি। জীবনের উদ্দেশ্য যা, আর্টের উদ্দেশ্যও তাই। সে উদ্দেশ্য স্রষ্টার আত্মপ্রকাশেচ্ছা পূরণ, স্রষ্টার মহিমার সাক্ষ্যদান। জীবন বড়, না আর্ট বড়, এমন প্রশ্নও উঠেছে। শুনে হাসি পায়। রাধা বড়, না কৃষ্ণ বড় এ সম্বন্ধে শুকশারীর কলহ সুপরিচিত। আমি বলি আর্ট না থাকলে জীবনমহীরুহ পুষ্পপল্লবহীন, রিক্ত। জীবন না থাকলে আর্ট আকাশকুসুম। জীবন এবং আর্ট মিলে একটি অবিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণতা, যেন ওরা দুই নয়, এক। যেন জীবন হচ্ছে আর্ট, আর্ট হচ্ছে জীবন। তবু ওদের প্রকৃতি ভিন্ন, যেমন স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতি। পরস্পরের অনুকৃতি ওদের সম্বন্ধের মাধুর্য হ্রাস করে, পরস্পরকে উন্নত করা ওদের চোখের অগোচরে ঘটে, পরস্পরের কাছে ওরা অর্থসমন্বিত।

"সত্যাসত্য" লেখবার অভিপ্রায় আমার বহুদিন থেকে ছিল, কিন্তু বিশ্বাস ছিল না যে লিখে উঠতে পারব। ধারাবাহিকভাবে 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রে প্রকাশিত "পথে প্রবাসে" বন্ধ হলে সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আমার কাছে একখানি উপন্যাস দাবি করেন ও এইটুকু মাফ দেন যে, দাবির পরিমাণ কিস্তিবন্দীভাবে দিলে চলবে। তাঁর আগ্রহের আনুকূল্য না পেলে বোধ করি এতদিন এ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হত না, মনোরথ মনের অতলে উত্থিত হয়ে বিলীন হত। এখনো যে সমস্তটা লিখিত হয়েছে তা নয়। যেটুকু হয়েছে সেটুকু পাঠকের হাতে স্থায়ীভাবে দিতে প্রস্তুত ছিলুম না, কিন্তু প্রকাশক শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদার প্রস্তুত করিয়ে নিলেন, কালক্ষেপ করতে দিলেন না। "যার যেথা দেশ" নামে "সত্যাসত্যে"র প্রথম সর্গ প্রকাশিত হল। পাঠক যদি পড়তে পাবার সুযোগ লাভ করেছেন বলে অন্তরে কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন তবে সেই কৃতজ্ঞতা উপেন্দ্রবাবুর ও গোপালবাবুর প্রাপ্য।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

পরিচ্ছেদসূচী

যাই যাই ২৫
ভাসমান পুরী ৩৭
চিঠির জবাব ৫৭
প্রথম শীত ৭২
বিরহিণী ৮৭
দুই মার্গ ১১৮
উপেক্ষিতা ১৪৬
পলায়ন ১৬৮
পলায়নের পরে ১৯১

চরিত্রপরিচিতি

বাদলচন্দ্র সেন	এই উপন্যাসের নায়ক
সুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	বাদলের বন্ধু
উজ্জয়িনী	বাদলের স্ত্রী
মহিমচন্দ্র সেন	বাদলের পিতা
যোগানন্দ গুপ্ত	উজ্জয়িনীর পিতা
সুজাতা গুপ্ত	উজ্জয়িনীর মাতা
কুবেরভাই	বাদলের সহযাত্রী
মিথিলেশকুমারী	বাদলের সহযাত্রিণী
কুমারকৃষ্ণ দে সরকার	সুধী ও বাদলের আলাপী
বিভূতিভূষণ নাগ	সুধীর আলাপী
কলিন্স্	বাদলের আলাপী
মিসেস উইল্স্	বাদলের ল্যাণ্ডলেডী
মাদাম দ্যপোঁ	সুধীর ল্যাণ্ডলেডী
সুজেৎ	মাদামের কন্যা
মার্সেল	মাদামের পালিতা কন্যা
এলেনর মেলবোর্ন-হোয়াইট	সুধীর আণ্ট এলেনর
আর্থার মেলবোর্ন-হোয়াইট	সুধীর আঙ্কল আর্থার
ওয়েলী	বাদলের আলাপী
বীণা	উজ্জয়িনীর আলাপী
মিসেস স্যামুয়েল্স্	উজ্জয়িনীর শিক্ষা-সহচরী

—আরো অনেকে—

যার যেথা দেশ

যাই যাই

১

বাদল তার পড়ার ঘরে বসে এক মনে কী লিখে যাচ্ছিল। চোখ না তুলে বলল, "এই যে সুধীদা, তোমার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে এই আমার প্রথম ও শেষ চিঠি লেখা।"

সুধী একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। কৌতূহল প্রকাশ করল না।

বাদল লেখা বন্ধ না করে বলে যেতে লাগল, "শুনলে তো বাবার যুক্তিটা? বৌ না রেখে বিলেত গেলে পাছে বৌ নিয়ে দেশে ফিরি সেই জন্যে করতে হবে বিয়ে। বাবাকে বললুম, বিয়ে করতে হয় তো দুই বন্ধুকে এক সঙ্গে করতে হবে, নয় তো কারুকেই না। এক বন্ধুর বিয়ে হলে অপর বন্ধু পর হয়ে যায় সে কি আমি জানিনে।"

সুধী শুধু বলল, "সে হয় না।" বাদলের মনে আঘাত দিতে তার মুখ মূক হয়ে যাচ্ছিল।

বাধা পেয়ে বাদল মাথা তুলল। কলম ফেলে দিয়ে অধৈর্যের সহিত প্রশ্ন করল, "হাউ ডু ইউ মীন্?"

সুধী উত্তর করল, "মাদ্রাজ থেকে ফরাসী জাহাজে আমি রওনা হচ্ছি। বিয়ের পরে পি এণ্ড ও'তে তুই যাবি। তোকে আমি লণ্ডনে রিসিভ করব।"

বাদল কিছুক্ষণ থ হয়ে রইল। কী ভেবে বলল, "তোমার কথার প্রতিধ্বনি করছি। ফরাসী জাহাজে আমিই চললুম। বিয়ের পরে পি এণ্ড ও' তে তুমিই যেয়ো। তোমাকেই আমি লণ্ডনে রিসিভ করব।"

সুধীর পক্ষে গাম্ভীর্য রাখা দায় হল। করুণ হেসে বলল, "বিয়ে না করলে তোর বাবা তোকে যেতেই দেবেন না যে। আর বিয়ে করলে যদি বন্ধুত্বে ফাট ধরে তবে তেমন ঠুন্‌কো বন্ধুত্বকে কতকাল আমরা আগলে থাকব?"

বাদল বলল, "তবু যাঁকে ভালোবাসিনি তাঁকে বিয়ে করতে আমার প্রিন্সিপ্লে বাধবে। হয়তো তাঁরও।"

সুধী স্বল্পভাষী মানুষ। কিন্তু বাদলের সঙ্গে তর্ক করা তার সয়ে গেছে। বলল, "বিয়ের আগেই যে ভালোবাসতে হবে এই পাশ্চাত্য কুসংস্কারটা তোর মতো ভাবুকেরও আছে! বিয়ের এক আধ দিন পরে ভালোবাসলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?"

"বিয়ের পরে যদি না ভালোবাসি তবে অশুদ্ধ হয় বৈ কি।"

"তা যদি বলিস, ভালোবেসে বিয়ে করেও অনেকে দেখে ভালোবাসা উবে গেছে। তখন?"

"তখন বিবাহের করোলারী বিবাহচ্ছেদ।"

"তা যতদিন চলিত হয় নি ততদিন সকলে যেমন বিয়ে করে ও পস্তায় তুইও তাই

করিস।"

"সকলে তাই করলে ডিভোর্স কোনো দিন চলিত হবার সুযোগ পাবে না। আগে ডিভোর্সের পথঘাট খোলা রেখে তারপরে বিয়ে করতে হয় করব। করতেই যে হবে এটা একটা কুসংস্কার।"

সুধী চুপ করে থাকল দেখে বাদল তার বক্তব্যটাকে আর একটু বাড়িয়ে দিল।— "অবশ্য আমি প্লেটোর দলে নই, সুধীদা। আমি—এই ধর—গ্যয়টের দলে।"

সুধী হেসে বলল, "তা হলে উজ্জয়িনীর মতো মেয়েকে কোনোকালে পাবিনে।"

বাদল তার স্বভাবসিদ্ধ ঐকান্তিকতার সহিত বলল, "নাই বা পেলুম। কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী। যে আমার তাকে আমি কোনো দিন কোনো দেশে পাবই। পরের কাছে থাকলে ছিনিয়ে আনব। কারুর বিবাহকেই আমি বৈধ মনে করিনে, অন্তত অচ্ছেদ্য মনে করিনে, সুধীদা।"

বাদলকে দিয়ে কোনো কাজ করিয়ে নেবার সংকেত সুধী জানত। কোনো একটা প্রিন্সিপ্লের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দিলে বাদলকে দিয়ে যা খুশি করানো যায়। সুধী মৃদু হেসে বলল, "চ্যারিটি বিগিন্‌স্ য়াট্ হোম্। নিজে বিয়ে করে প্রমাণ করে দে যে বিয়ে বলতে কিছুই বোঝায় না। কা তব কান্তা, এই প্রাচীন বাক্যটা নিয়ে নবতন মায়াবাদ প্রচার করতে নেমে পড়।"

বাদল সোৎসাহে বলল, "তথাস্তু। উজ্জয়িনী হবেন আমার প্রথম শিষ্যা, আমার যশোধরা। তাঁকে বিবাহের বিরুদ্ধে দীক্ষিত করবার একমাত্র উপায় তাঁকে বিবাহ করা। তাই বলে তাঁকে ভালোবাসবার বা তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ থাকবার দায়িত্ব আমার নেই। উই ম্যারি টু ডাইভোর্স।"

সুধী তার পিঠ চাপ্‌ড়ে দিয়ে বলল, "আচ্ছা, দেখা যাবে।"

তখন বাদল তার চিঠিখানাতে মন দিল। ইওর্স সিন্‌সিয়ার্লি বি সি সেন পর্যন্ত লিখে থামল।

২

বাদলের ভাবী শ্বশুর ক্যাপ্‌টেন ওয়াই গুপ্ত বহুবিজ্ঞ লোক। নামে ডাক্তার, আসলে এন্‌সাইক্লোপীডিয়া। যৌবনকালে স্বাধীনচেতা ছিলেন, কিন্তু স্বাধীনভাবে পসার জমাতে পারলেন না। সরকারী চাকরি নিতে বাধ্য হলেন। তখন তাঁর সান্ত্বনা রইল, আমি না হই আমার পুত্র কন্যা স্বাধীন হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে পুত্র হল না, পুত্রকামনা থেকে গেল।

ডাক্তারসাহেব এত অল্পবয়স্ক পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করতে চাইতেন না, যদি না তাঁর পুত্র-আদর্শ বাদলের মধ্যে মূর্তি খুঁজত। তাঁর অন্য জামাতারা অধিকবয়স্ক।

কৌশাম্বীর স্বামী সিমলায় বড় চাকুরে। কাঞ্চীর স্বামী কলকাতায় ব্যারিস্টার। তাঁরা আর একটু হলেই শ্বশুরের সমসাময়িক হতেন, আপাতত শাশুড়ীর সমবয়সী। তাঁদের দেখলে যোগানন্দের পুত্রভাব সঞ্চার হয় না। অথচ মিসেস গুপ্ত বেছে বেছে তাঁদেরকেই জামাতারূপে নির্বাচন করেছেন, যেহেতু তাঁরা ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড-প্রত্যাগত এবং অত্যন্ত উপার্জনক্ষম।

বাদলের প্রতি মিসেস গুপ্ত কিছুমাত্র প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু যোগানন্দ ধরে বসলেন, কনিষ্ঠা কন্যাটির বিবাহ আমিই স্থির করব। উজ্জয়িনীর সঙ্গে তার মায়ের তেমন বনে না। সে তার দিদিদের মতো নয়। তাকে নিয়ে তার বাবা একটা এক্সপেরিমেন্ট করে আসছিলেন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে। সেইজন্যে তার মায়ের কিংবা দিদিদের সঙ্গে তাকে বেশী মিশতে দেন নি, নিজের কাছে কাছে রেখেছেন। কৌশাম্বী ও কাঞ্চী লোরেটোতে লালিত। নিত্য নূতন পোশাক ও নিত্য নূতন পার্টি এই নিয়ে তাদের জীবন। তাদের বাল্যকাল কেটেছে কলকাতায় মায়ের সঙ্গে ও দিদিমায়ের বাড়িতে। উজ্জয়িনীর বাল্যকাল কেটেছে বাপের সঙ্গে ও বাংলার নানা শহরে। মাতে বাবাতে ছাড়াছাড়ি অবশ্য হয় নি। তবু মা ভালোবাসতেন কলকাতা এবং বাবা যখন সরকারী চাকুরে তখন তাঁকে ক্রমাগত বদলি হতে হয়। উজ্জয়িনীর জন্মের কয়েক বছর পরে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে বাংলায় অন্তরিত হন।

মিসেস গুপ্ত নিজে বিলেত না গিয়ে থাকুন, বিলেতফের্তার মেয়ে, স্ত্রী ও শাশুড়ী। চাকর বেয়ারার মুখে মেমসাহেব ডাক শুনতে শুনতে তাঁর ধারণা দাঁড়িয়ে গেছল যে তিনি অন্তত দশজন বাঙালীর মেয়ের থেকে নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র, সুতরাং শ্রেষ্ঠ। তাঁর স্বামীর সাহেবিয়ানার শৈথিল্য দেখে তাঁর লজ্জা করত। স্বামীর ত্রুটি ঢাকবার জন্যে তিনি অতিরিক্ত রকম মেমসাহেবিয়ানা ফলাতেন। তাঁর বসবার ঘরে ইংরেজী ধরনে কয়লার আগুন জ্বলত। অগ্নিস্থলীর উপরিতন ম্যান্টেল্‌পীসে একরাশ পুরাতন ক্রিস্‌মাস কার্ড ও নিউ-ইয়ার ক্যালেণ্ডার শোভা পেত এবং দেয়ালে আঁটা একখানি প্রতিকৃতির চতুষ্পার্শে ফুল-পাতার wreath জড়ানো থাকত। প্রতিকৃতিটি পঞ্চম জর্জের স্বর্গত কনিষ্ঠ পুত্রের।

এমন যে মিসেস গুপ্ত তাঁরই কন্যা উজ্জয়িনী হল তার বাপের মতো কালো, যাকে সাধুভাষায় বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। এই এক অপরাধে মেয়েটি মায়ের মমতা হারিয়ে বাপের হাতে গিয়ে পড়ল। বাপের যৌবনকালের মানসী নারী ছিল নার্স, আতুরকে ক্লান্তকে মুমূর্ষুকে যে নারী সেবা ও সঙ্গ দেয়, শুশ্রূষা ও শান্তি দেয়। মেয়েকে তিনি চাইলেন সেই আদর্শে দীক্ষিতা করতে। বিবাহ না করে উজ্জয়িনী সেবা-সদন করবে এই রকম কথা ছিল। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভয় বাড়ে। উৎসাহ ও রক্ত একই সঙ্গে শীতল হয়। যোগানন্দ ভাবলেন বিবাহটা করে রাখা মেয়েমানুষের পক্ষে ইন্‌সিওরান্সের মতো।

ওটাতে জীবনের ব্রতভঙ্গ হবেই এমন কোনো কথা নেই। স্বামীটি যদি উদার হয় তবে উজ্জয়িনী বিবাহ করে যত কাজ করতে পারবে বিবাহ না করে তত পারত না। মিশনারী ওল্ড মেড্‌দের শুষ্ক নীরস চেহারা ও ধারা তাঁর বিভীষিকা হয়েছিল। অতএব এমন একটি জামাতা চাই, যে উজ্জয়িনীর সমমনস্ক। "ইংলিশম্যান" কাগজে "A Youngman Looks at the World" নামক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ তাঁকে অবাক করেছিল। কে এই পাটনার বি সি সেন? স্বনামধন্য গাডু সেনের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল। পত্রের উত্তরে গাডু সেন মশাই জানালেন, ছোকরা খুবই গিফ্‌টেড্‌, এবারকার বি এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে, কিন্তু ওর বাবা রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের সভ্য নন।

যোগানন্দ নিজে নাস্তিক মানুষ, সমাজে কোনদিন যান না। উপরন্তু বৈদ্য জাতটার প্রতি তাঁর অবৈজ্ঞানিক পক্ষপাতও ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, মহিম সেন তাঁর কলেজের সহপাঠী। বছর কয়েক আগে মহিমের স্ত্রী কী এক ব্যাধিতে ভুগে কলকাতায় মারা যান। তখন যোগানন্দ মেডিক্যাল কলেজে একটিনি করছিলেন, মহিম কোথা থেকে উপস্থিত হয়ে বললেন, ভাই, বাঁচাও। যোগানন্দের মনে পড়ে গেল এই সেই মহিম যার টিকি কেটে তিনি ফাইন গুনেছিলেন। সেই মহিমে ও এই মহিমে অনেক তফাৎ। সে ছিল ভয়ানক গরিব, চটি পায়ে ও চাদর গায়ে দিয়ে কলেজে আসত, ভালো ইংরেজী উচ্চারণ করতে পারত না, কিন্তু বই মুখস্থ করে নম্বর আদায় করতে পারত অসাধারণ। এ নাকি বেহারের কোন মহকুমা-হাকিম, রায়সাহেব উপাধি পেয়েছে, উপাধি সাহেব বলে সাহেব সেজেছে।

যোগানন্দ মহিমচন্দ্রকে চিঠি লিখলেন। রায়বাহাদুর তো হাতে স্বর্গ পেলেন। এক্স্ গুপ্তের নাৎনী ও আই এম এস্ অফিসারের মেয়ে, এই যথেষ্ট। সেটি কালো না সুন্দর, ভালো না মন্দ, ষোড়শী না ষষ্ঠী—এ সবের দিক দিয়েই গেলেন না। প্রথম চিঠিতেই পাকা কথা দিলেন। একখানা ফোটো পর্যন্ত চেয়ে পাঠালেন না। মেয়েটিকে অবশ্য একদা তিনি দেখেছিলেন, কিন্তু তখন তার বয়স দুই কি আড়াই বছর। তখন বাদলের বয়স ছয় কি সাত। এরা যে একদিন বিবাহের উপযুক্ত হবে এমন উদ্ভট কল্পনা কোনো কর্মক্লান্ত পুরুষের মনে স্থান পায় না। কোলের ছেলের সঙ্গে সম্ভবপর মেয়ের সম্বন্ধ করা স্ত্রীলোকদেরই মধ্যাহ্ন বিনোদনের বিষয়। এমনি একটি সম্বন্ধ বাদলের মা হয়তো করেছিলেন, কেবল উজ্জয়িনীর মায়ের সঙ্গে কেন, কত মেয়ের মায়ের সঙ্গে। তাঁর সেইসব পাতানো বেয়ানদের স্মরণশক্তি এখনো সজাগ হয়নি এই জন্যে যে, এখনো বাদল যথেষ্ট বড় এবং উপার্জনক্ষম হয়নি। বিলেতটা ঘুরে এসে মস্ত একটা চাকরি জুটিয়ে জাঁকিয়ে বসলে আর কয়েক বছর পরে মিসেস গুপ্তেরও কি হঠাৎ মনে পড়ে যেত না যে, তাই তো, বাদলের মাকে যে কথা দিয়েছিলুম, পরলোকগত আত্মার শান্তির জন্যে এই

বিবাহ প্রয়োজন।

মিসেস গুপ্ত আপত্তিও করলেন, সম্মতিও দিলেন। জানতেন উজ্জয়িনীর রং ও ঢং বাঙালী সাহেবদের পছন্দ হবে না। ও মেয়ের বিয়ের আশা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। এক রায়বাহাদুরের বাড়িতে মেয়ে দিতে তাঁর মেমসাহেবী প্রেস্টিজে বাধছিল। তবু ছেলেটি ভবিষ্যতে বাপকে ছেড়ে শাশুড়ীকে গুরু করবে, যদিও বিলেত ঘুরে আসবে বাপেরই টাকায়, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস ও আশ্বাস।

৩

কৌশাম্বী ও কাঞ্চী এই পিতৃদত্ত নাম দুটোকে তাদের মা লোকমুখে খারিজ করিয়ে নিয়েছেন। তাদের নাম রটে গেছে লিলি গুপ্ত ও ডলি গুপ্ত। অধুনা লিলি চ্যাটার্জী ও ডলি মিটার। তারা এখন সিমলায় ও কলকাতায় নিজের নিজের বাড়িতে থাকে, মিসেস গুপ্ত মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে কিছুকাল যাপন করে আসেন, বাকী সময়টা কাটান বহরমপুরে, স্বামীর কর্মস্থলীতে। যখন বহরমপুরে থাকেন তখন ব্রেকফাস্টের টেবিলে চা ও চিঠি দুই-ই পরিবেশন করেন।

একদিন চাপরাশীর হাত থেকে সেদিনকার ডাক নিয়ে দেখেন উজ্জয়িনীর নামে একখানি খাম, ঠিকানাটা অপরিচিত হাতে লেখা। গুপ্তসাহেব তখন খবরের কাগজে ডুবেছিলেন, উজ্জয়িনী ছিল দেখতে উঠে গেছে। চাপরাশী চলে গেলে মিসেস গুপ্ত চিঠিখানাকে বুকের কাছ দিয়ে ব্লাউসের ভিতর ঝুপ করে ফেলে দিলেন এবং শাড়িটাকে আর একটু উপরের দিকে টেনে দিলেন। স্বামীর চিঠিগুলো স্বামীর একপাশে রেখে দিয়ে বললেন, "আমাকে এবার অনুমতি দাও তো উঠি।"

গুপ্তসাহেব কাগজের ওপার থেকে উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়।"

"তোমাকে আর কিছু দিতে হবে ?"

"না, থাক।"

"আর একটু চা ?"

গুপ্তসাহেব কাগজের ওপাশ থেকে মাথা নাড়লেন। মিসেস গুপ্ত ওটা না দেখতে পেয়ে ঠাওরালেন মৌনং সম্মতিলক্ষণম্। স্বামীর পেয়ালা থেকে তলানিটুকু পৃথক করলেন ও তাতে নূতন চা ঢেলে স্বামীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। অন্যমনস্ক গুপ্তসাহেব পেয়ালাটি তুলে নিলেন।

সিঁড়ি ভেঙে মিসেস গুপ্ত সোজা গিয়ে তাঁর শোবার ঘরে উঠলেন। শুয়ে পড়ে খামখানা বের করলেন। ছিঁড়ে দেখলেন আগাগোড়া ইংরেজী। ইংরেজী তিনি বলতে পারতেন ভালো। সামাজিক ক্রিয়াকর্মের ইংরেজী তাঁর দুরস্ত ছিল। কিন্তু সাহিত্যিক

ইংরেজী বুঝবেন কেমন করে ? তবু অদম্য কৌতূহলবশত চিঠিখানাকে উল্টে পাল্টে দেখলেন। কোথাও দন্তস্ফুট না করতে পেরে ক্ষুব্ধ হলেন এবং ভবিষ্যতে আর একবার চেষ্টা করবার অভিপ্রায়ে ওখানাকে বালিশের নীচে চাপা দিলেন। যখন ঘর থেকে বেরলেন তখন দূর থেকে শুনলেন উজ্জয়িনীর সঙ্গে তার বাবার কথা হচ্ছে।

উজ্জয়িনী বলছে, "আচ্ছা বাবা, চিলের মতো ডানা মেলে দিয়ে ওড়া কি খুব শক্ত ?"

তার বাবা হাসছেন।—"তুই একবার চিলের সঙ্গে উড়ে গিয়ে দেখে আয় না, বেবী !"

উজ্জয়িনী আপন মনে দুই বাহু তুলে চিলের মতো এলিয়ে দিচ্ছে ও ঝট্‌পট্‌ করছে। তার অধ্যবসায় দেখে তার বাবা হাসি চেপে বলছেন, "মন্দ এক্সারসাইজ নয়, বেবী। রোজ করলে সাইজও বাড়তে পায় না তোর মার মতো।"

তাঁদের বাড়ির কুতব মিনারী সিঁড়ি বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মিসেস গুপ্ত প্রবেশ করলেন। শ' খানেক বছরের পুরোনো বাড়ি। এক একখানা ঘরের বহর এমন যে পাশাপাশি পাঁচটা হাতীর পিঠে পাঁচটা জিরাফ দাঁড়ালে তাদের মাথা সিলিং-এ ঠেকবে না।

মিসেস গুপ্ত কোথা থেকে এক জোড়া শতচ্ছিদ্র মোজা পেড়ে এনে গম্ভীরভাবে রিফু করতে বসলেন। এটাও মেমসাহেবিয়ানার অঙ্গ। অবশ্য মোজা জোড়া কারুর কোনো কাজে লাগবে না, খুব সম্ভব বেয়ারা কিংবা চাপরাশীকে দান করা হবে। ধৈর্যের সঙ্গে মোজা রিফু করা চলতে লাগল বটে, কিন্তু কান দুটি খাড়া রইল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শব্দের জন্যে ওৎ পেতে।

যোগানন্দ একখানা চিঠিকে লক্ষ্য করে বললেন, "মহিম লিখেছেন।"

যোগানন্দজায়া একবার চোখ তুলে স্বামীর চোখের সঙ্গে মিলালেন। তখনি নামিয়ে সূচিকর্মে মনোনিবেশ করলেন। কে কী লিখেছে শোনবার জন্যে কৌতূহল দেখালে তাঁর মর্যাদাহানি হয়।

অগত্যা যোগানন্দই একতরফা বলে গেলেন, "লিখেছেন ছেলে অক্টোবরের আগে বিলেত পৌঁছতে চায়, জাহাজে জায়গা রিজার্ভ করা হয়ে গেছে, ভারি তাড়াহুড়ো বাধিয়েছে—"

যোগানন্দজায়া আর একবার চোখ তুলে চোখাচোখি করলেন। ভাবটা এই যে, তাতে আমার কী।

কৈফিয়তের সুরে যোগানন্দ বললেন, "তা আমাদের দিক থেকেও তো আপত্তি নেই। বেবীর আপত্তি না থাকলেই হল। কী বলিস রে বেবী ?"

বেবীর মা বেবীর দিকে কটমট করে তাকালেন। বেবী তার বাবার দিকে শুধু

বিস্ময়সূচক দৃষ্টি ফিরিয়ে রইল।

যোগানন্দ এতদিন কথাটা উজ্জয়িনীর কাছে পাড়েন নি। পাড়তে তাঁর সংকোচ বোধ হচ্ছিল। এত সকাল সকাল বিয়ে করতে উজ্জয়িনীর আপত্তি হবেই তো। তার বাবাই তো তাকে কবে থেকে শিক্ষা দিয়ে আসছেন যে, দেশের সোশ্যাল সার্ভিস বিদেশিনীদের হাতে। এ ক্ষেত্রে কি আমরা কোনো দিন স্বরাজ পাব না?

একে বিবাহ, তায় অল্পবয়সে বিবাহ—যোগানন্দ নিজেই ইতস্তত করছিলেন। সাহস করে বললেন, "আচ্ছা বেবী, একটি সুন্দর ছেলে যদি তোকে এসে বলে, তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই, তাহলে তোর কি আপত্তি থাকতে পারে?"

উজ্জয়িনীর গালে কে রং মাখিয়ে দিল। সে মায়ের দিকে একবার আড়চোখে চাইল, মা যেন দুর্জয় ক্রোধ জোর করে চাপছিলেন। তারপরে খবরের কাগজ গুছাতে বসল। মেয়েকে চুপ করে থাকতে দেখে মিসেস গুপ্ত বুঝলেন কী একটা বলতে চাইছে, তাঁরই ভয়ে বলছে না। তাই তিনি যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন তেমনি সশব্দে মোজা-সেলাইয়ের পুঁজিপাটা সমেত প্রস্থান করলেন। অবশ্য বেশী দূর গেলেন না। আড়ালেই কোথায় কান পাতলেন।

উজ্জয়িনী বলল, "বাবা, তুমি আজকাল কী সব ভাব, আমাকে বল না তো।"

যোগানন্দ বললেন, "সেই সুন্দর ছেলেটির কথাই ভাবি। সে বিলেত চলে যাচ্ছে। তার যাবার আগে তাকে আমার বুকে নিতে চাই। তা সে রাজি হবে কেন, যদি না তুই রাজি হস্?"—এই বলে সস্নেহে কন্যার মুখের দিকে তাকালেন।

উজ্জয়িনী কাঁপছিল। এমন কথা সে কোনোদিন কল্পনায় আনে নি। মনে মনে একটা ব্রত বেছে নিয়েছিল, আদর্শও। বহুদিন থেকে সে স্থির করে রেখেছিল সিস্টার নিবেদিতার মতো সিস্টার উজ্জয়িনী হয়ে গরিবদের খুকীদের নিয়ে একটা ইস্কুল চালাবে। ইস্কুলের সঙ্গে ক্রমে জুড়ে দেবে একটি হাসপাতাল। অনাথাশ্রম কথাটা তার বিশ্রী লাগে। তাতে দীনতার উৎকট গন্ধ, সে দীনতা দয়ার পীড়নে বাড়ে। সিস্টার উজ্জয়িনীর সঙ্গে যারা থাকবে তারা তার বোন, হলই বা তারা পিতৃমাতৃহীন, হলই বা তারা নিঃস্ব। "ভিক্ষুণীর অধমা সুপ্রিয়া" একা তাদের অভাব মেটাবে।

উজ্জয়িনী বলল, "বাবা, তুমি কি আমার বিয়ে দিতে চাও?"

যোগানন্দ একটু দমে গেলেন।—"হাঁ, না, বিয়ে ঠিক নয় মা, বাগ্‌দান। লোকে ওইটেকেই বিয়ে বলে বটে। বলুক না, তুই যেমন আছিস তেমনি থাকবি, লাভের মধ্যে একটি সহকর্মী পাবি। হ্যাট-কোট-পরা বাঁদর নয়, নিজের মতো করে বাঁচবার স্পর্ধা রাখে।"

মিসেস গুপ্ত আর সইতে পারছিলেন না। পাশের ঘর থেকে উঁচু গলায় বলে উঠলেন,

"আমার জামাইদের যে বাঁদর বলে সে নিজে বাঁদর।"

কঠিন বাধা পেয়ে গুপ্তসাহেব থামলেন। উজ্জয়িনীও লজ্জায় নীরব রইল।

৪

সেদিনকার কথাবার্তার ওই শেষ। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে পিতাপুত্রীতে ও বিষয়ে শেষ কথা হয়ে গেল। উজ্জয়িনী অনেক ভেবে রাজি হল। বাদলকে সহকর্মীরূপে পাবার আশায় সে তার ব্রতের খানিকটা ভাঙল ও বাকীটাকে বাদলের উপযুক্ত করে গড়ল। এই তার জীবনের প্রথম আদর্শচ্যুতি। বাস্তবের সঙ্গে এই প্রথম সে রফা করল। এতে তার মর্মান্তিক কষ্ট হতে লাগল। কিন্তু কাকে বোঝায়। তাব কৌমার্য রইল না। সকল মেয়ের মতো তারও পতন ঘটল। সিস্টার উজ্জয়িনী হবার স্বপ্ন অকালে টুটল। ভারত-বর্ষের একটি মেয়েও বিদেশিনীদের সমকক্ষ হল না। সকলের মতো তারও জীবনে ওই খাড়া বড়ি থোড় স্বামী শাশুড়ী শ্বশুর।

যাক্, স্বামীটি তবু বড়দি ছোড়দির স্বামীদের মতো হবে না, ভাবুক ও কর্মী হবে। দুজনে মিলে ইস্কুল খুলবে, খোকা ও খুকী দুই নেবে। একলা মানুষ বড় অসহায় বোধ করত, দুটি মানুষ পরস্পরের কাছে বল পাবে।

উজ্জয়িনীর বন্ধুতালিকা ছোট। তাতে একটিমাত্র নাম—তার বাবা। এইবার আর একটি নাম—তার স্বামী। নতুন বন্ধুটি বিলেত যাচ্ছে, অতএব বিলেতে তার একটি বন্ধু থাকল। ভাবতে বেশ লাগে যে দেশে দেশে তার বন্ধু আছে। শিশুকাল থেকে বিলেত সম্বন্ধে তার কৌতূহল। একদিন সে বিলেতে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসবে কোথায় Little Nell-এর দোকান ছিল, কোথায় কেনিলওয়ার্থ দুর্গ, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল কোথায় কাজ করতেন, ইংরেজদের পার্লামেণ্ট কেমন। অনেকের কাছে অনেক গল্প শুনেছে, তাতে তার কৌতূহল কমেনি, বেড়েছে। এইবার তার বন্ধু যদি বিলেতে থাকে তো সে বিলেতে গিয়ে পথ ভুলে যাবে না, অসাধু গাড়োয়ানকে বেশী ভাড়া দিয়ে ফেলবে না। তার বন্ধু তাকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে।

উজ্জয়িনী যদি বাদলের চিঠি পেত তবে নিশ্চয় চিঠির জবাব দিত। সম্ভবতঃ সব কথার অর্থ বুঝত না, বাবার কাছে বুঝে নিত। বিবাহভঙ্গের কথায় চমকে উঠত—মা গো, তা নাকি হয়। কিন্তু খুশি হয়ে আলাপ করত। জিজ্ঞাসা করত, আপনি ওদেশে গিয়ে কী পড়বেন, দেশে ফিরলে কী করবার স্বপ্ন দেখবেন, সোশ্যাল সার্ভিসে জীবন ব্যয় করতে আপনার মন যায় কি না। হয়তো আপনি স্বাধীনতার উপাসক, সুভাষবাবুর মতো আই সি এস পাস করে ছেড়ে দেবেন। এমনি কত কথা। বাবার বন্ধুত্বে তার অতৃপ্তি ছিল, কারণ বাবার জীবনে নব নব সম্ভাবনা আশা করা যায় না, বাবাকে নিয়ে তার

কল্পনা আকাশে আকাশে উড়তে পারে না, বন্দরে বন্দরে ভিড়তে পারে না। বাদলের সমস্ত জীবনটাই সামনে পড়ে। বাদলের বন্ধুত্ব তাকে কত নদীর কত সমুদ্রের সংবাদ দেবে, কত বিদ্যার কত অভিজ্ঞতার দিকে নিয়ে যাবে। হয়তো ভারতবর্ষের ভাবী নেতা হবে তার বন্ধু, অথবা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার।

এইসব আকাশচুম্বী কল্পনার দ্বারা তার ভূমিসাৎ কল্পনার ক্ষতিপূরণ হল। ক্রমে ক্রমে ওতেই সে রস পেতে আরম্ভ করল। অন্যান্য মেয়েদের মতো সে পুতুল নিয়ে খেলা করেনি, লুকিয়ে প্রেমের গল্প পড়েনি, যেখানে ছেলেমেয়েরা মিলিত হয়ে খুশি হয়েছে—যেমন পার্টি বা অভিনয়—সেখান থেকে সরে গিয়ে সে মুক্ত আকাশের তলে তারা চিনতে বসেছে। সে যে কোনোদিন সামাজিক জীব হবে এ আশা তার আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করেছিলেন। পাগলী বলে তার দিদিরা তাকে ক্ষেপাত এবং নিজেদের দলবল থেকে বাদ দিত। ইস্কুলে যায়নি বলে মেয়ে-বন্ধু তার হয়নি। তার বাবা যেখানেই বদলি হন সেখানেই পাশের বাড়ির বাসিন্দেরা ইংরেজ, তাদের মেয়েরা বিলেতে কিংবা পাহাড়ে পড়াশুনা করে, কাজেই বিদেশী কোনো মেয়ের সঙ্গে উজ্জয়িনীর সচরাচর আলাপ হয় না এবং যদি বা কোনো সুযোগে কারুর সঙ্গে ভাব হয়ে যায় তেমন দুর্লভ বান্ধবীর পিতা কোথায় বদলি হয়ে যান।

বিবাহের সম্ভাবনা উজ্জয়িনীকে অকস্মাৎ মনে করিয়ে দিল যে তার জীবন অদ্যাবধি অর্ধাশনে কেটেছে, জীবনের বড় একটা রস তার পাতে পড়েনি। বাদলের সঙ্গে সম্বন্ধ তাকে কত অপূর্ব স্বাদ দিতে পারে এ কথা কল্পনা করতে গিয়ে সে প্রমথ চৌধুরীর "চার ইয়ারী কথা" খুলে বসল। এবার তার বাবাকে তার পড়ার সাথী করতে তার লজ্জায় বাধল। মনের কথার ভাগ দিতে না পারলে মনের অসুখ করে। তার মধ্যে একটা সদা-সচকিত ভাব এসে পড়ল। রয়ে রয়ে অকারণে চমকে ওঠে, যেন কেউ তার মনের ভাবনা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে, যেন তার মনের ভাবনাগুলি চোরাই মাল।

৫

মিসেস গুপ্ত বিবাহের আয়োজনে গা করলেন না। তাঁর দলের লোক যোগানন্দকে খেয়ালী ও বিষয়বুদ্ধিহীন বলে গাল পাড়লেন। লিলি-ডলিরা গালে হাত রেখে বা হাতে গাল দেখে থ হয়ে রইল। বলল, "ও ডিয়ার! বেবীর যে এখনো পুতুলখেলার বয়স যায়নি। একটা ইস্কুলের ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে!" মিসেস গুপ্তের বোন মিসেস দাশ দুটি প্রাপ্তবয়স্ক কন্যা সমেত প্রত্যেক নিমন্ত্রণে গিয়ে থাকেন, ঐ তাঁর নিত্যকর্ম। উজ্জয়িনীর বিবাহের বার্তা পেয়ে তাঁর মনে হল ওটা যেন তাঁর কন্যাদের অবমাননা। কেবল দু'চারজন উদারচরিত আত্মীয় সুখী হয়ে বললেন, কালো মেয়ের পক্ষে এই যথেষ্ট ভালো। এক্ষেত্রে

সবুরে মেওয়া ফলে না।

অর্ধ হিন্দু ও অর্ধ ব্রাহ্ম মতে এক দিন উজ্জয়িনীর বিবাহ হয়ে গেল। বাদলকে প্রথম দৃষ্টিতেই তার ভালো লাগল। বিবাহের পূর্বে একবার বাদলের কিংবা তার প্রতিকৃতিকে দেখতে চায় কি না জিজ্ঞাসা করায় সে লজ্জায় মাথা নেড়েছিল। তার মা গোড়া থেকেই গাম্ভীর্য অবলম্বন করেছিলেন। একটা রায়বাহাদুরের ছেলে যে গোরু ছাড়া আর কিছু হতে পারে এ কথা তিনি বিশ্বাস করেননি। তাকে দেখলেই কি তার জন্মদুর্ভাগ্য খণ্ডে যাবে? তার বাবা জোর করে বলেছিলেন, আমি জানি সে সুন্দর। সুন্দরকে যাচাই না করলেও সে সুন্দরই থাকে।

উজ্জয়িনী বাদলকে দেখে পিতার মতে মত মিলাল। প্রত্যেক কুমারীই নিজের বলে যে মানুষটিকে পায় তাকে প্রথম দেখাতেই রূপবান ভেবে থাকে। উজ্জয়িনী বাদলকে বাদল বলে কি স্বামী বলে—কী বলে রূপবান ভাবল সেই জানে। বাদলের কিশোরতুল্য লাবণ্যময় মুখচ্ছবি মনের উপর দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করে নিল। যেন বহুবর্ষের ব্যবধানে মুছে না যায়। এ কথা ভাবতে তার কষ্ট হচ্ছিল যে বাদল সপ্তাহকাল পরে সমুদ্রপারে চলে যাবে। তার চক্ষুর বিরহ কতকাল ঘুচবে না।

কে আগে কথা বলবে—বাদল, না, উজ্জয়িনী? বহুকাল নীরবে কাটবার পর বাদল ভাবল, ওটা পুরুষ মানুষেরই কর্তব্য। পুরুষেই তো প্রপোস করে। বলল, "এক্‌স্‌কিউস্‌ মি। আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে কি?"

উজ্জয়িনী বিষম ব্যগ্রতার সহিত উত্তর দিল, "না, না, কিছুমাত্র না।"

"তবে আপনি বসে আছেন যে?"

"ঘুম পায় নি।"

কথা জমল না। বলবার মতো কিছু কোনো পক্ষই খুঁজে পেল না। ইতিমধ্যেই কখন এক সময় বাদল ঢুলতে শুরু করেছে। একবার সালনের দিকে ঝুঁকে পড়তেই সে লজ্জিত হয়ে বলে উঠল, "আই বেগ্‌ ইওর পার্ডন্‌।"

উজ্জয়িনী নীচু গলায় বলল, "হয় তো আমিই ব্যাঘাত করছি।"

বাদল সংকোচের হাসি হেসে বলল, "[illegible] রুগীর আপনি ব্যাঘাত করবেন কী করে?"

উজ্জয়িনী এর উত্তরে বলল, "অভয় দেন তো বলি অনিদ্রার লক্ষণ দেখছিনে।"

উজ্জয়িনী তার চিঠির জবাব দেয়নি বলে তার উপর বাদলের রাগ ছিল। এই সুযোগে বলল, "আমাকেও অনুমতি দেন তো জিজ্ঞাসা করি আমার চিঠির জবাব দিলেন না কেন?"

উজ্জয়িনী আকাশ থেকে পড়ল।—"কোন্‌ চিঠি?"

"জবাবের জন্যে দেড় মাস অপেক্ষা করছি। পান্‌নি সে চিঠি ?"

"সত্যি পাইনি আমি"—উজ্জয়িনী মিনতির সুরে বলল।

বাদল সান্ত্বনার সুরে বলল, "থাক্। খানকয়েক বই দিয়ে যাব, চিঠির কাজ করবে।"

বাদল তার জন্যে বুক কোম্পানীর দোকান ঘেঁটে ইবসেন, অলিভ শ্রাইনার ও ডি এইচ লরেন্সের একরাশ বই কিনে আনল। তার সবগুলিতে স্বহস্তে উজ্জয়িনীর নাম লিখে দিল—কিন্তু উজ্জয়িনী সেন নয় উজ্জয়িনী গুপ্ত।

আলাপ করতে করতে কখন তাদের জড়তা কেটে গেছে। মেলামেশা সহজ হয়ে এসেছে। উজ্জয়িনী অনুযোগ করল, "ভুল লিখেছেন, মিস্টার সেন। দেশ ছাড়বার আগে শুধরে দিয়ে যান।"

বাদল বেশ সপ্রতিভভাবে বলল, "ভুল লিখিনি, মিস্ গুপ্ত। বইয়ের ভিতরটা পড়লেই উপরটার সঙ্গতি হৃদয়ঙ্গম করবেন।"

উজ্জয়িনী কখনো এতগুলি নাটক উপন্যাস চোখে দেখেনি। আলাদিন সেই পাতাল-পুরীতে আনন্দে ও বিস্ময়ে পথ হারিয়েছিল। উজ্জয়িনীর মনে হল এইবার বুঝি কল্প-রাজ্যে পথ হারাবে। ছেলেমানুষীর স্বরে আব্দার জানিয়ে বলল, "বিলেত গিয়ে আমাকে আরো—আরো—বই পাঠাবেন ?"

বাদল যেন তার দাদা। দাদা-সুলভ বীরত্বের ভঙ্গীতে বলল, "অল্‌রাইট্। বই পড়ে পরীক্ষা দিতে হবে কিন্তু। পাস হলে পুরস্কার।"

৬

বাদলকে হাওড়া স্টেশনে তুলে দিতে সপরিবারে গুপ্তসাহেব এলেন।

বাদলের সঙ্গে যোগানন্দের বড় বড় বিষয়ে তর্ক হয়ে গেছে। বাদল প্রমাণ করতে চায় যে, সে সব বিষয়ে অথরিটী। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ সম্বন্ধেও তার নিজস্ব থিওরী আছে। কিন্তু যোগানন্দ তাকে সংস্কৃতে হার মানালেন। বাদলের মুখ দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিলেন যে সে সংস্কৃত "উত্তররামচরিত" পড়েনি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বাংলা সমালোচনা পড়ে তর্কে নেমেছে। এতে বাদলের মনটা যোগানন্দের প্রতি বিরূপ হয়ে গেল।

বিলেত সম্বন্ধে তাই তাঁর অযাচিত পরামর্শগুলো বাদল গণনায় আনল না। বলল, "পোস্টওয়ার ইংলণ্ড সম্পূর্ণ আলাদা জায়গা। আপনার সেকালের গুরু ও বন্ধুরা কোথায় তলিয়ে গেছে, আপনার সেকালের রুটিওয়ালা বা নাপিতের ঠিকানা জানেন তো বলুন, হয়তো তারা এখন পার্লামেন্টের মেম্বার।"

বাপের সামনে যার মুখ খোলে না শ্বশুরের সামনে যে সে বিপিন পাল হয়ে উঠল এর

কারণ যোগানন্দের ব্যবহারের জাদু। তিনি শিশুর সঙ্গে শিশু হতে জানেন, ছাত্রের সহিত সহপাঠী। তাঁকে সমবয়স্ক বলে ভ্রম করা সকলের পক্ষে সহজ ছিল।

যোগানন্দ বললেন, "কী বল, বাদল, বম্বে অবধি তোমার সঙ্গে গেলে কেমন হয়? তর্ক করবার লোভটা দুর্দমনীয় হয়ে উঠছে যে।"

বাদলের হৃদয় অজানার প্রতীক্ষায় আনন্দে উদ্বেগে দোলায়িত হচ্ছিল। যাত্রার প্রাক্কালে কারুর কথায় মন দেবার মতো মন তার ছিল না, কারুর প্রতি আসক্তি তার চোখে জল এনে দিচ্ছিল না। সে টাইমটেবলের পাতা উল্টানো নিয়ে ব্যস্ত ছিল। গাড়ী কখন রায়পুরে পৌঁছবে, কখন নাগপুরে, কখন ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে, তাই যেন সে মুখস্থ করছিল। উজ্জয়িনী তার জিনিসপত্র বার বার গুনছিল, একটা জিনিস ভুলবশত অপরের বার্থের নীচে রয়েছিল, সেটাকে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিল না, অকারণে কুলিগুলোকে বার বার দৌড় করাচ্ছিল।

মিসেস গুপ্ত তাঁর বিলিতী মুরুব্বি ও কুটুম্বগণের কাছে বাদলের পরিচয়পত্র লিখে এনেছিলেন। চেল্‌টেনহ্যামের এক অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান দম্পতি, এবারডিনের এক মিশনারী বুড়ী মিস, এক পিসতুতো বোনের জামাই, এক ননদের দেওরের ছেলে ইত্যাদি জনকয়েকের কাছে লেখা বাদলের পরিচয়পত্র আসলে তার শ্বশুরকুলের পরিচয়পত্র। পত্রের মধ্যে ঢের বাজে কথাও ছিল। যথা, "দেশে গিয়ে আর আমাদের মনে পড়ে না বুঝি।" "শত যুগ হলো চিঠি পাইনি।" "দুষ্টু পিটারটাকে তার ভারতীয় খুড়িমার অনেক অনেক চুমু।" "আমরা হতভাগারা এই গরম দেশে পড়ে রইলুম।"

বাদলকে বললেন, "পৌঁছেই এঁদের সঙ্গে দেখা কোরো, বাছা। এঁরা হলেন কিনা আমাদের আপনার লোক।"

বাদল মনে মনে বলল, "চেল্‌টেনহ্যাম আর এবারডিন লণ্ডন থেকে আধ ঘণ্টার রাস্তা কিনা, পৌঁছেই ধন্না দেব!"—ভাবল, মাদার-ইন-ল'কে ইংরেজরা শতহস্ত দূর থেকে পরিহার করে, আমি তো এঁকে পরিত্যাগই করব। কা তব কান্তা, কা তব শাশুড়ী। এই হল আমাদের নব নীতিশাস্ত্রের বচন।

দয়া করে চিঠিগুলোকে জানালার কাছে স্তূপাকার করল, ট্রেন ছাড়লেই ইংলণ্ডের উদ্দেশে বাতাসে উড়িয়ে দেবে।

ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে এলে উজ্জয়িনী বাদলের পায়ের ধুলো নিতে গেল। কার কাছে সে এমন অবৈজ্ঞানিক ও অন্-ইঙ্গবঙ্গ কুসংস্কারটা পেল সেই জানে বাদল বলল, "এ কী!"

উজ্জয়িনীর হৃদয়ে সঞ্চিত বাষ্প মেঘরূপে বর্ষণের ছল খুঁজছিল, মুষলধারে ঝরে পড়ল। বাদল তো অবাক! উজ্জয়িনী যে তাকে এই ক'দিনে ভালোবেসে ফেলে থাকতে

পারে এমন সম্ভাবনা সে কল্পনায়ও আনেনি। তার নিজের দিক থেকে যখন ভালোবাসা নেই তখন অপরের দিক থেকে থাকবে কেন? অতি অকাট্য যুক্তি।

তবু তার মনটা ঈষৎ ভিজল। সে বলল, "আপনাকে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী দিয়ে যাই —Go farther, always go farther."

উজ্জয়িনী প্রণাম করে নেমে গেল। যোগানন্দ বাদলের হাতে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, "আমারও মন উড়ু উড়ু করছে, বাদল। ছুটি পেলে তোমার সঙ্গেই দৌড় দিতুম ও দেশে। যাক্. তোমার মনের সঙ্গে আমারও মন ইউরোপ বেড়াতে চলল। যত পার চিঠি লিখো।"

ভাসমান পুরী

১

জাহাজের সিঁড়িতে এক পা রেখে ভারতবর্ষের মাটি থেকে আর-এক পা তুলে নেবার সময় বাদল স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। রেলপথ নর্মদা-তাপ্তির বন্যায় ভেসে যায়নি, ট্রেন বিলম্বে বম্বে পৌঁছায়নি, জাহাজ ইতিমধ্যে ছেড়ে দেয়নি। এবার জাহাজডুবি না হলে সে নির্ঘাত ইউরোপে পৌঁছে যাবে। আপাতত ইংলণ্ডের জাহাজ তো ইংলণ্ড।

জাহাজে উঠে বাদলের বাবার প্রথম উক্তি হল, "এরই নাম জাহাজ। বেশ বানিয়েছে তো? ইংরেজের মাথা আছে।"

জীবনে কখনো জাহাজে চড়েননি। কলকাতায় প্রথম এসে ট্রামে চড়বার সময় পল্লীগ্রামের লোকের মনের ভাব যেমন হয় তাঁরও হল তেমনি। তিনি উচ্ছ্বসিত বাক্যে সেই বিরাট জলদুর্গের বন্দনা করতে থাকলেন। প্রায় একুশ হাজার টন বইতে পারে সেই জাহাজ। তাতে ডাক্তার আছে, নাপিত আছে. ধোপা আছে। তার প্রকাণ্ড ভাণ্ডারে চর্ব্য এবং পেয় প্রচুর পরিমাণে মজুত। তার নিজস্ব সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রত্যহ বেতার বার্তা প্রকাশিত হয়। তার নিজস্ব প্রেস আছে! ধন্য ইংরেজ! বলিহারি যাই! হতভাগা দেশী লোকগুলো বলে কিনা স্বরাজ চাই।

নিজের ক্যাবিনটা একবার দেখে নেবার জন্যে বাদল ছটফট করছিল। কিন্তু সেই গোলোকধাঁধার মধ্যে কোনটা যে ৩৭১ নম্বর বার্থ কে তাকে বলে দেবে? সে ইতস্ততঃ করছে। তার বাবা জাহাজের এক স্টুয়ার্ডকে মস্ত একজন কেষ্টবিষ্টু ঠাওরে এক সেলাম ঠুকে বললেন, "সার, আমি পাটনার রায়বাহাদুর এম সি সেন, য়্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। এটি আমার পুত্র মিস্টার বি সি সেন। ক্যাপ্টেন ওয়াই গুপ্ত আই-এম-এস, যিনি প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক এক্স গুপ্তের পুত্র, এটি তাঁরই জামাতা। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে বিলেত যাচ্ছে।"

স্টুয়ার্ডটা কী বুঝল কে জানে। তার কাজের তাড়া ছিল। সে পিতাপুত্রকে জাহাজের এন্‌কোয়ারী অফিসে পৌঁছে দিয়ে "গুড্‌ মর্নিং, সার" বলে টুপিতে আঙুল ছুঁইয়ে বিদায় নিল। রায়বাহাদুর এন্‌কোয়ারী অফিসে উপরোক্ত উক্তির পুনরুক্তি করলেন। অফিসের লোক বলল, "আপনার জন্তে কী করতে পারি ?" রায়বাহাদুর একগাল হেসে বললেন, "হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। আপনি কী না করতে পারেন। আমার একমাত্র সন্তান কত দূর দেশে চলে যাচ্ছে…(আবেগে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে এল)…একটু দেখবেন শুনবেন জাহাজে যে ক'দিন থাকে। গোমাংসটা যেন না খেতে হয়, হিন্দুর ছেলে।"

বাদলকে ঘোর লজ্জা থেকে বাঁচাল একটি অপরিচিত যুবক। বাদলকে ইশারায় ডেকে বলল, "ক্যাবিন খুঁজে পেয়েছেন ? পান্‌নি ? ৩৭১ নম্বর তো ? আপনাকে ও আমাকে একই ক্যাবিনে দিয়েছে। আর একটি ভদ্রলোককেও দিয়েছে। মিস্টার রামমূর্তি।"

বাদলের খুব স্ফূর্তি বোধ হচ্ছিল। স্ফূর্তি গোপন করে বলল, "কোন্‌ রামমূর্তি ? সেই প্রসিদ্ধ পালোয়ান নয় তো ?"

যুবকটি হেসে বলল, "না বোধহয় ! কিন্তু না দেখলে বিশ্বাস নেই। রামমূর্তিকে দিয়েছে ঠিক আপনার বার্থের উপরের বার্থটা। ভেঙে পড়লে আপনার ঘাড়ে পড়বে কিন্তু।"

বাদলদের ক্যাবিন E ডেকে। পাঁচতলা বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে যেমন উপরে উঠতে হয় জাহাজের তেমনি নিচে নামতে হয়। লিফ্‌ট ছিল। রায়বাহাদুর লিফ্‌ট দিয়ে নেমে যাবার সময় আর একবার ইংরেজ-স্মরণ করলেন।

"এই তোদের ক্যাবিন। বেশ তো। খুব বুদ্ধি খাটিয়েছে কিন্তু। হাত মুখ ধোবার ঠাণ্ডা ও গরম দু'রকম জল অনবরত হাজির। ওটা কী ?" (চাকরকে ডাকবার বেল-এ হাত দিলেন। বহুদূরে কোথায় ক্রিং ক্রিং আওয়াজ হল। অমনি একটা স্টুয়ার্ড ছুটে এল। গোয়ানিস।)

রায়বাহাদুর প্রশংসমান দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলেন। ভাগ্যবান ! ক্রমাগত বিলেত যাওয়া আসা করছে। ওর বংশপরিচয় নিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ও তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, "এখনি জাহাজ ছেড়ে দেবে। আর দেরি করবেন না।"

রায়বাহাদুর কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, "য়্যাঁ ?"

বাদলের দিকে অনিমেষচোখে চেয়ে রইলেন। চোখ দিয়ে হু হু করে জল উথলে পড়তে লাগল। তাঁর একমাত্র সন্তান বিদেশ যাচ্ছে ! কবে আবার তার সঙ্গে দেখা হবে শ্রীভগবানই জানেন। তার কুশলের জন্তে ভারতবর্ষের যেখানে যত দেবতা আছেন সকলের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করলেন। কালীঘাটের কালী, কাশীর বিশ্বেশ্বর, পুরীর জগন্নাথ।

এদিকে ভয়ও হচ্ছিল পাছে তখনি জাহাজ ছেড়ে দেয়, তিনি জাহাজে থেকে যান। চাকরিটি খোয়াতে হবে। বাদলকে টেনে নিয়ে তিনি উপরের ডেক-এ চললেন। লিফ্ট-ওয়ালাকে মোটা বখশিশ দিলেন। তখনো অনেক সময় ছিল। তাঁর মতো অনেকে তাঁদের প্রিয়জনের সঙ্গে গল্প করছে, বিদায়ের ব্যথাকে পিছিয়ে রাখছে। রায়বাহাদুর রুমাল দিয়ে ভালো করে চোখ মুছলেন। জোর করে একটু হাসলেনও।

"তারপর, বাদ্লা। এডেন থেকে চিঠি দিস। সুয়েজ থেকে চিঠি দিস। পৌঁছে টেলিগ্রাম করিস। সুধী এতদিনে পৌঁছে গেছে নিশ্চয়। ওর সঙ্গে, ওর হেফাজতে থাকিস। সাবধান হয়ে রাস্তা পারাপার করিস, মোটর গাড়ীর সামনে বাহাদুরি দেখাসনে। বুঝলি? আর ঐ যে মাংসটা ওটা কখনো মুখে দিসনে। আর খবরদার কখনো বোলশেভিকদের ছায়া মাড়াসনে।"

সময় আছে শুনে আশ্বস্ত হয়ে রায়বাহাদুর বাদলের জন্যে এক ইংরেজ মুরুব্বি পাকড়াও করলেন। কিন্তু বাদল কখন সেখান থেকে সরে পড়ে ডেকের উপর ছুটোছুটি করে বেড়াল। তার উত্তেজনার অবধি ছিল না। এতকাল পরে তার জীবনের স্বপ্ন সফল হতে চলল! ইউরোপ! সে কি পৃথিবীর অংশ! কত মহামনীষীর তপস্যা তাকে সূর্যের মত দ্যুতিমান করেছে, তার দিকে চাইলে চোখ ঝলসে যায়। কত কীর্তি কত কাহিনী কত ঘটনা কত আন্দোলন কত তত্ত্ব কত সন্ধান কত সালোঁ। কত ক্লাব—ভাবতে বাদলের মাথা ঘোরে। বাদল যেন মঙ্গলগ্রহে চলেছে। এইবার সকলকেই সে স্বচক্ষে দেখবে। পথের ভিড়ে একদিন গায়ে গা ঠেকে যাবে। কে? না, অলডুস্ হাক্সলি। ট্রেনে যেতে যেতে কী সূত্রে আলাপ হয়ে যাবে। কে? না, মিড্লটন মারি। দুর্যোগে কার দিকে ছাতা বাড়িয়ে দেবে। কে? না, ভার্জিনিয়া উলফ্।

আর-একটি অপরিচিত যুবকের সঙ্গে মুখোমুখি।—"চিনতে পারেন, বাদলবাবু?"

"বড় দুঃখিত হলুম।"

"আমি নওলকিশোর প্রসাদ। পাটনার ছেলে।"

"কলেজ কী? লণ্ডন না কেম্ব্রিজ না অক্সফোর্ড—কোথায় পড়বেন?"

যুবকটি সলজ্জভাবে বলল, "আমি শুধু একজনকে তুলে দিতে এসেছি। আপনি যদি দয়া করে এঁকে দেখেন শোনেন। মিস্টার বাদলচন্দ্র সেন—মিসেস মিথিলেশকুমারী দেবী।"

বাদল bow পূর্বক 'হাউ ডু ইউ ডু' করল। মহিলাটি বেশ সপ্রতিভভাবে সু-উচ্চারিত ইংরেজীতে প্রতিধ্বনি করলেন।

বাদল যেন নিজের লোক পেয়ে গেল।—"আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি খুশি হলুম।"

"আমিও ।"

"জাহাজে আর-কারুর সঙ্গে ভাব আছে কি ?"

"না । একমাত্র আপনার সঙ্গেই ।"

বাদলের ভারি আহ্লাদ হচ্ছিল । একে ইউরোপ চলেছে । তার ইতিমধ্যে একটি মেয়ে-বন্ধুর মুরুব্বি । কিছু উপদেশ দিয়ে ফেলল ।—"দেখুন, আপনার সী-সিক্‌নেস্‌ হতে পারে । এইবেলা কিছু কলা খেয়ে নিন । আমার সঙ্গে অনেক আছে ।"

"কই, কোথাও তো এ কথা শুনিনি যে কলা খেলে সী-সিক্‌নেস্‌ ছাড়ে ।"

"শুনবেন কি করে ? ও যে আমাদের পেটেন্ট মেডিসিন । আমার এক প্রোফেসারের প্রেস্ক্রিপশন ।"

জাহাজ ছাড়বার আগে বাইরে লোকদের নেমে যাবার সংকেত জানাবার ঘণ্টা বাজল । নওলকিশোরকে নামিয়ে দেবার জন্যে বাদলের সঙ্গে মিথিলেশকুমারী সিঁড়ি অবধি গেলেন । নওলকিশোর দুজনের সঙ্গে করমর্দন করে শুভেচ্ছা জানিয়ে নেমে যাবার পর যতক্ষণ জাহাজ দাঁড়িয়ে ছিল ততক্ষণ নিচে থেকে মিথিলেশকুমারীর দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল । একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার ফলেই হোক কি বিদায়-বেদনাতেই হোক নওলকিশোরের চক্ষু ঝাপসা হয়ে এল । চোখে রুমাল দিলে পাছে বন্ধুকে শেষ দেখা দেখবার মেয়াদটুকু সংকীর্ণ হয়ে যায় এই মনে করে নওলকিশোর রুমাল বের করল না । তার গণ্ড বেয়ে জলের স্রোত বয়ে গেল ।

কে কার দিকে তাকায় ! সকলেরই অনুরূপ অবস্থা । যেমন জাহাজের উপরে তেমনি জাহাজ-ঘাটে । বাদলের পিতা যুগপৎ কাঁদছেন ও হাসছেন । হাসিটাও করুণরসাত্মক । বোধ করি মনকে প্রবোধ দেবার জন্যে ওটুকুর ভান করছেন । ইংরেজরা প্রস্থানোন্মুখ বন্ধুদের উদ্দেশে বলছে, চীয়ারিও জ্যাক্‌, চীয়ারিও ওল্ড বোয় । রায়বাহাদুর তাদের অনুকরণে বলছেন, "চীয়ারিও বাদল, চীয়ারিও Sonny Boy." রায়বাহাদুরের বঙ্গ-প্রবাসী বন্ধু ডাক্তার মিত্র পর্যন্ত ছোঁয়াচ এড়াতে না পেরে ছলছল চোখে বাদলের উদ্দেশে রুমাল নাড়ছেন ।

সিঁড়ি সরিয়ে নিল । ঘাটের উপর যে দু'একটা চিঠির বস্তা তখনো অবশিষ্ট ছিল সেগুলিকেও ক্রেন-এর সাহায্যে ওঠানো হল । জাহাজ খানিকটা চলে আবার থামল । তখন রায়বাহাদুর নওলকিশোর প্রভৃতি যারা জাহাজের সঙ্গ ধরে হাঁটছিলেন তাঁরা বিদায় কালের এই অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধিতে পুলকিত হলেন । এবার তাঁরা সত্যিই হাসলেন ।

কিন্তু বাদল অধৈর্য হয়ে উঠেছিল । সুধীদা চলে গেছে কবে ! বাদল যেতে পারছে না আজও । সুধীদা এতদিনে পৌঁছে জমিয়ে বসেছে ও দেশে । বাদল যাবার বেলায়

বাধা পাচ্ছে।

অবশেষে জাহাজ পুরো দমে চলল। ইতিমধ্যে কেউ কেউ জাহাজ-ঘাট ছেড়ে বাড়ী ফিরে গেছেন। যাঁরা বাকী ছিলেন তাঁরা জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলেন না। জাহাজ হঠাৎ মোড় ফিরল এবং কূল ধরে না ছুটে অকূলের দিকে ছুটল। জাহাজ ক্রমশ অদৃশ্য হচ্ছে দেখে অনেকেই হাল ছেড়ে দিয়ে ঘাট ছাড়লেন। দু চারজন নাছোড়বান্দা শেষ চিহ্নটি যতক্ষণ না মিলিয়ে গেছে ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে রুমাল নাড়তে থাকল। তারা বোধ করি নবপরিণীত স্বামী কিংবা পরম উদ্যোগী প্রণয়ী। নওলকিশোর তাদের সবাইকে লজ্জা দিল। সে পলক ফেলল না, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল, পাছে তার বন্ধুকে সে কম দেখতে পায়। বেচারা জানত না যে ইতিমধ্যে কখন মিথিলেশকুমারী ডেক থেকে খাবার ঘরে নেমে গেছেন।

বাদল নিজের চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া দেখা যাচ্ছিল তখনো। ওটা কেবল আসবার দ্বার নয় যাবারও। ভারতবর্ষের সিংহদ্বারকে বাদল মনে মনে প্রণাম জানাল। হয়তো ফিরে আসবে, হয়তো বিদেশে মরবে। বিদায়। যে দেশ তাকে বিশ বছর কোল দিয়েছে বিদায় তার কাছে, বিদায়।

৩

"মিস্টার সেন, লাঞ্চের ঘণ্টা পড়ে গেছে। খেতে আসবেন না?"—এই বলে কুবেরভাই বাদলের পিঠের দিকে দাঁড়াল। বাদল ঘাড় না ঘুরিয়ে বলল, "না, ধন্যবাদ। গা বমি বমি করছে।"

বাদল জাহাজে ওঠবার প্রাক্কালে পেট ভরে শুধু কলা-ই খেয়েছিল।

"তবে উঠুন, আমার হাত ধরুন, ক্যাবিনে নিয়ে যাই। শুয়ে থাকাই এ রোগের একমাত্র ওষুধ।"—কুবেরভাই বাদলকে উত্তর দেবার অবকাশ দিল না, টেনে নিয়ে গেল। ক্যাবিনে শুইয়ে দিয়ে ফ্যান খুলে দিল। বলল, "ক্ষিদে পেলেই বেল্ টিপে স্টুয়ার্ডকে হুকুম করবেন। আমি চললুম খেয়ে খানিকটে ছুটোছুটি করতে।"

"তাতে আপনার অসুখ করবে না?"

"হাঃ হাঃ হাঃ। আমার সী-সিক্‌নেস্? শুয়ে থাকলেই আমার অসুখ করে। ঘুরে বেড়ালে করে না। কতবার জাহাজে চড়েছেন আপনি?"

"আমার এই প্রথম।"

"আপনি বাঙালী। না?"

"কায়ায় বাঙালী—মনোবাক্যে ইউরোপীয়।"

"বলেন কী। যাদের আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি আপনি তাদের দলে? ধিক্ ধিক্।"

"কেন ঘৃণা করেন ?"

"একশ' কারণ। ওরা মাংস খায়।—"

"আপনি বুঝি নিরামিষাশী ?"

"নিশ্চয়। নিরামিষ খাওয়াটা একটা সিম্বলিস্‌ম্ ছাড়া কী ? আমরা ভারতবর্ষের লোক কারুর মাংস খাইনে, কারুর রক্ত চুষিনে।"

বাদলের মাথা ঘুরছিল। সে তর্ক করল না। কুবেরভাই বুঝতে পেরে বলল, "আমি কী নির্বোধ। আপনি শোন্। আমি আসছি।"

অসহ্য কষ্টের ভিতর দিয়ে তিনদিন তিনরাত কেটে গেল। বাদল সারাক্ষণ বিছানায় পড়ে। কুবেরভাই তাকে দু তিন ঘণ্টা অন্তর একবার দেখা দিয়ে ডেকের গল্প বলে গেছে ও রাতের বেলা তার খাতিরে অধিক রাত্রি করে ফিরেছে।

রাত্রি একটার সময় বাদল দেখে ঘরে আলো জ্বলছে।—"কে ? কুবেরভাই ?"

"এই যে, সেন। এখনো জেগে ?"

"ঘুম আসছে না যত চেষ্টা করছি।"

"একপাল মেষ একটির পর একটি যাচ্ছে—চোখ বুঁজে এই ধ্যান কর দেখি।"

বাদল অনেক কষ্টে হেসে বলে, "কতবার ভেড়া গুনেছি। গোলোক ধাঁধার কেন্দ্র খুঁজেছি। মানসাঙ্ক কষেছি। আরো কত কী করেছি। মাঝখান থেকে আমার স্মরণশক্তি বেড়ে গেল, যা পড়ি তাই মনে থাকে, কিন্তু ঘুম আর হল না।"

কুবেরভাই এমন মানুষ দেখেনি। বিস্ময়ের সহিত রসিকতা মিশিয়ে বলল, "আচ্ছা, শুয়ে শুয়ে আমার উপর নজর রাখ। দ্যাখ কেমন করে আমি পাঁচ মিনিটে ঘুমিয়ে পড়ি। দেখলে শিক্ষা হবে।"

কুবেরভাই সত্যসত্যই কথা রাখল। এক ঘরে অন্যের সঙ্গে শুতে বাদলের বিশ্রী লাগে। ঘুম তো আসেই না, তিলপরিমাণ নাসিকাধ্বনি তালপরিমাণ শোনায়। তবু তার সৌভাগ্য রামমূর্তি অন্যত্র একটা খালি ক্যাবিন পেয়ে সরে গেছে।

পরদিন কুবেরভাই রাত্রি দুটোর পর এল। বেশ বুঝল বাদলের ঘুম আসেনি। তবু তাকে জাগাবার ভয়ে আলো না জালিয়ে নিঃশব্দে কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ল। বাদল ভাবছিল কী ভাগ্যবান এই কুবেরভাই, নিদ্রা দেবী এর ইচ্ছাদাসী।

তিনদিন তিনরাত্রির পর কুবেরভাই বলল, "তোমার অসুখ অমন করলে সারবে না, সেন। এস আমার সঙ্গে খেতে ও খেলতে। জাহাজের সঙ্গে তাল রেখে একবার এদিকে ও একবার ওদিকে হেলতে পার যদি, তবে কিছুতেই গা বমি বমি করবে না। সাইকেল চড়তে জান তো ?"

"খুব জানি।"

"তবে আর কী ! ব্যালান্সের ঐ একই প্রিন্সিপ্ল ।"

প্রিন্সিপ্লের নাম শুনে বাদল লাফ দিয়ে উঠল । আয়নার সামনে দাঁড়াতেই তার চোখে পড়লে—চোখ বসে গেছে, গাল ধ্বসে গেছে, নোনা হাওয়া লেগে মুখমণ্ডল চটচট করছে, স্নান না করায় চুলের চেহারা পুরোনো কম্বলের মতো । কুবেরভাই তাকে ধরাধরি করে স্নানের ঘরে পৌঁছে দিল ।

জাহাজে এই প্রথম বাদল খাবার ঘরে বসে ব্রেকফাস্ট খেল । কোথায় মিথিলেশ-কুমারী ? বাদলের চোখ একে একে সব ক'টা টেবিল খানাতল্লাসী করল । দলে দলে স্ত্রী পুরুষ ছুরি কাঁটা চামচ সমান বেগে চালাচ্ছে । তাদের পেয়ালা ও প্লেট থেকে টুং টাং ধ্বনি উঠছে । ওয়েটারদের চাঞ্চল্যে সমস্ত ঘরটা তোলপাড় । একজন এসে বাদলের হাতে সেইদিনকার একখানা ছাপানো মেন্যু বাড়িয়ে দিল ।

কুবেরভাই বলল, "মেন্যুতে নেই এমন অনেক জিনিস চাইলে পাওয়া যায় । চাও তো ডাল ভাত ও নিরামিষ তরকারি দিয়ে যাবে । বলব ?"—কুবেরভাই নিজের জন্যে তাই আনতে দিল ।

বাদল বলল, "যে দেশে যাচ্ছি সে দেশে যা খায় তাই আমার খাদ্য ।" এই বলে 'পরিজ' ইত্যাদির ফরমাস দিল ।

ব্রেকফাস্টের পর কুবেরভাই তাকে বসবার ঘরে নিয়ে যেতে চায় । বাদল বলে, "একজনের সঙ্গে দেখা করা আমার কর্তব্য ।"—অনিচ্ছাসত্বে কুবেরভাইকে সঙ্গে নিল ।

মিথিলেশকুমারীর ঘরে টোকা মারতেই ভিতর থেকে অনুমতি এল । বাদল বলল, "গুড্ মর্নিং, মিসেস্—"

মিথিলেশকুমারী বললেন, "গুড্ মর্নিং । ইনি ?"

যথারীতি পরিচয়ের পর মিথিলেশকুমারী বাদলকে বললেন, "মরেছি কি বেঁচে আছি একবার খবরও নিলেন না । কোথায় ছিলেন এতদিন ? এ যে একটা যুগ !"

বাদল অপরাধ স্বীকার পূর্বক মার্জনা ভিক্ষা করে বলল, "আমি নিজেই শয্যাগত ছিলুম ।"

"তারপর, আপনি কেমন ছিলেন ?"

কুবেরভাই বলল, "আনন্দে ছিলুম । ধন্যবাদ ।"

মিথিলেশকুমারী কৃত্রিম হাস্যভরে বললেন, "ভাগ্যবান ।"—তিনি সেদিন বেশ সুস্থই ছিলেন । কেবল ভয়ে ভয়ে উপরে উঠছিলেন না । তাঁর ক্যাবিনের সঙ্গিনীটি তাঁকে টানাহেঁচড়া করে নড়াতে পারেন নি । ছোটখাট হস্তিনী বিশেষ । কিন্তু দুটি যুবকের অনুরোধ তাঁকে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডেকের্ উপর ঠেলে নিয়ে চলল ।

জাহাজের ভিতরে কেমন একরকম গন্ধ । ডেকে ও-গন্ধ নেই । প্রচুর বাতাস অনবরত

হু হু করছে। বাদল বুঝল গা-বমিবমির প্রধান কারণ ঐ জাহাজী গন্ধটা। এবং তার প্রধান প্রতিষেধক সমস্ত আকাশের রাশীকৃত নিঃশ্বাসের মতো ঐ বাতাস। মরি মরি কী আকাশ! যেন একটা বিশাল গোলাকার বৃন্তহীন ছত্র সমুদ্রকে আবরণ করেছে। "দশ দিক" বলে একটা কথা আছে বটে। তার থেকে একটা দিকে তো সমুদ্র। বাকী নয়টা যে কোথায় বাদল খুঁজে পেল না।

ডেকের উপর ইতিমধ্যে বেশ জনসমাগম হয়েছে। কারা ডেক্-টেনিস খেলছে। কারা দড়ির চাকতি ছুঁড়ে একটা বিশেষ বৃত্তের ভিতর ফেলবার চেষ্টা করছে। নিজ নিজ চেয়ারে বসে অনেকেই কিছু পড়ছে বা সেলাই করছে। বেশীর ভাগ লোক পায়চারি করতে করতে এখানে ওখানে ভিড়ে যাচ্ছে, রেলিং-এর উপর ভর দিয়ে সমুদ্রের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভারি ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে, যেন কী একটা জরুরি কাজে যাচ্ছে—হয়তো উড়ুক্কু মাছ দেখতে।

বাদলের ইচ্ছা করছিল তাদের দু'একটির পথরোধ করে বাহু মেলে দাঁড়ায়। বলে, থাম থাম থাম, আমাকে তোমাদের সঙ্গী করবে না? কুবেরভাইকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করল, "একটিকে আটকাব?"

কুবেরভাই সাতঙ্কে বলল, "ককখনো ও-কর্ম কোরো না। ওদের বাপ মা-রা খ্যাঁক করে তেড়ে আসবে। কিংবা ভাববে আমাদের বাচ্চাদের একটি পুরুষ-আয়া জুটেছে। শাদাতে কালাতে এত মাখামাখি কিসের?"

বাদল ভাবল কুবেরভাইয়ের বড় ছোট মন। কিন্তু ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ পিছিয়ে দিল।

মিথিলেশকুমারী রেলিং-এর উপর ঝুঁকে ফেনলীলা নিরীক্ষণ করছিলেন। তাঁর কাছে তাঁর ক্যাবিনের সঙ্গিনীর সঙ্গে একটি যুবক। সকলে মিলে আলাপ পরিচয় হল। মিস্ জাকারিয়া (দেশী খ্রীস্টান)। মিস্টার আচারিয়া (মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ)। নাম শুনে কুবেরভাই রসিকতা করে বলল, "Rhyming Couplet"—সকলে হেসে উঠল।

মিস্ জাকারিয়া বললেন, "বা মিসেস্ দেবী, ডেক্-এ আসতে এত সাধলুম, তখন এলেন না।"

মিসেস্ দেবী মিষ্টি হেসে বাদলের প্রতি কটাক্ষপাত করলেন। কিন্তু বাদলটা এমন নির্বোধ যে রস গ্রহণ করল না। আপন মনে পায়চারি করতে করতে কখন গিয়ে সেইখানে উপনীত হল যেখানে টাইপ-করা সংবাদপত্র দেয়ালের গায়ে আঁটা থাকে।

৪

জাহাজ লোহিত সাগরে পড়তেই ভয়ঙ্কর গরম পড়ল। হঠাৎ একদিন সকালবেলা কুবের-ভাই দেশী পোশাক পরে ডেক্-এর উপর জুটল। সে ভেবেছিল ইংরেজরা তার এই বেশ দেখে মূর্চ্ছা যাবে, কিন্তু ইংরেজরা অনেকেই তাকে লক্ষ্য করল না, যারা লক্ষ্য করল তারা চুপ করে থাকল। এদিকে ভারতীয় মহলে সোরগোল পড়ে গেল। লক্ষ্য তো তাকে সকলেই করল, জনকয়েক গায়ে পড়ে তার সৎসাহসের প্রশংসা ও বাড়াবাড়ির নিন্দা করে গেল। ফলে তার আলাপীর সংখ্যা বাড়ল এবং তার দেখাদেখি কেউ কেউ দেশী পোশাক বার করে পরল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ডিনার টেবিলে বাদল দেখে কুবেরভাই অনুপস্থিত। কী হল তার। বাদল তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে কুবেরভাইকে খুঁজতে বেরল। দেখল সে ডেক্-এর এক প্রান্তে মুখ ভার করে বসে আছে।

"কী হয়েছে কুবেরভাই ? অসুখ করেছে ?"

কুবেরভাই বলল, "বস।"

পীড়াপীড়ির পর সে যা বলল তার মর্ম এই। সে ডিনার খাবার জন্যে খাবার ঘরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে এমন সময় প্রধান স্টুয়ার্ড তাকে আটকিয়ে বলল, একটা কোট গায়ে দিয়ে আসতে পারেন না ? সে বলল, এই বা মন্দ কী ? স্টুয়ার্ড বলল, না, না। ওটা একটা উত্তম প্রাচীন প্রথা। ওর ব্যতিক্রম কেন হবে তার কারণ দেখছি নে। কুবেরভাই বলল, বেশ। তবে আমি ডিনার খাব না আজ।

এই বলে ডেকে এসে বসে আছে। এই তার সত্যাগ্রহ।

বাদল বলল, "ছাখ, ইংরেজের জাহাজে যখন যাচ্ছ ইংরেজী কায়দা মানতে হয়। লোকটা তোমাকে হিংসা বশত বাধা দেয়নি, কর্তব্যবোধে বাধা দিয়েছে।"

কুবেরভাই তর্ক করল। "ভারতীয়দের দেশে ওরা ভারতীয় কায়দা ভারি মানে কিনা।"

"পরে ও-কথা হবে। এখন নিশ্চয়ই তোমার জঠর জলে যাচ্ছে। তারই আঁচ লেগে মনও।"

বাদল তাকে ক্যাবিনে নিয়ে গিয়ে নিজের ফলের ঝুড়িটি উপহার দিল। বলল, "আমার বাবা সঙ্গে দিয়েছিলেন। এতদিন মনে ছিল না। য়্যা, পচে গেছে ?"

"সবটা পচে যায়নি। চমৎকার কমলালেবু তো ? টাকায় ক'টা করে ?"

কুবেরভাই আহার করে ঠাণ্ডা হল। তখন ডেক্-এ গিয়ে তর্কটা নতুন করে শুরু করল। "তুমি লক্ষ্য করেছ কি না জানিনে, এ জাহাজে ইংরেজ ও ভারতীয়ের মাঝখানে জাতিভেদ আছে। খাবার টেবিল ওদের আলাদা, আমাদের আলাদা।"

"সেটা কি খুব দোষের কথা, কুবেরভাই ? গোরুখোরদের কাছে বসে তুমি খেতে রাজি হতে ?"

"তা যদি বল, আমার পাশের লোকটি মুসলমান। সে রোজ গোমাংস চেয়ে নেয়। কই, তাকে তো শাদা গোরুখোরদের সঙ্গে বসতে বলে না ?"

"তার কারণ সে শুধু গোরু খায় না, ভারতীয় খাবার ভালোবাসে, ডাল ভাত কারি।"

"তা বুঝি শাদা মহাপ্রভুরা খান না ? একবার খবর নাও না ? ওঁরা সর্বভুক। হিন্দুর গোরু, মুসলমানদের শূওর, সমগ্র পৃথিবীর যত কিছু অখাদ্য কুখাদ্য সুখাদ্য কোনোটাতেই ওঁদের অরুচি নেই।"

"যাক, মিস্ জাকারিয়াকে আমি তাদের টেবিলে খেতে দেখেছি।"

"ঐ সব উচ্ছিষ্টভুক্ বিশ্বাসঘাতকের জন্মেই তো ভারতবর্ষের এই দশা। উনি ভাবেন ওঁর নামটা ও ধর্মটা বিদেশী বলে উনিও বিদেশিনী।"

এই সময় পূর্বোক্ত মুসলমান যুবকটি এসে বললেন, "আমি মিসেস্ দেবী ও মিস জাকারিয়ার কাছ থেকে আসছি। আপনারা কি দয়া করে আমার সঙ্গে আসবেন ?"

বাদল ও কুবেরভাই গিয়ে দেখল মিসেস্ ও মিস্ তাঁদের পারিষদগণকে নিয়ে সভা করছেন। মিসেস্ অনুযোগ করে বললেন, "আপনারা দু'জনে কোথায় হারিয়ে গেছলেন ? আমরা সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি।"

"অনেক ধন্যবাদ। আজও কি গান চলছে নাকি ?"

"না, আজ অভিনয় ও আবৃত্তি। মিস্টার আলী নিয়েছেন শাইলকের ভূমিকা। মিস্টার আচারিয়া তাঁর স্বরচিত সনেট শোনাবেন। আপনারাও যোগ দেবেন কি ?"

বাদল লাজুক মানুষ। চুপ করে রইল। কুবেরভাই বলল, "উপায়ান্তর না দেখে ইংরেজীতে বাক্যালাপ করতে হয় এই যথেষ্ট লজ্জা। এর উপর আমি পরের ভাষায় অভিনয় ও আবৃত্তি করে পরকে হাসাব না। মাফ করবেন।"

সকলে অপ্রস্তুত ও আহত হল। আনন্দের সভায় নিরানন্দ। মিসেস্ দেবী বললেন, "তবে আপনি নীরব শ্রোতাই হবেন—কেমন ? আর আপনি ?"

"আমিও।" বাদল বলল।

আচারিয়ার কবিসুলভ চেহারা। ঝাঁকড়া চুল, রিবন-এর মতো করে বাঁধা টাই, সোনার শিকল-বাঁধা রিমলেস চশমা, চশমার নিচে থেকে তার চোখের মিটি মিটি চাউনি দেখা যায়। কবি হতে হলে যত কিছু তোড়জোড় আবশ্যক আচারিয়ার সমস্ত আছে। হাত উঠিয়ে নামিয়ে বুকে রেখে মাথা হেলিয়ে গদগদ ভাবে আচারিয়া সনেটগুলি পড়েন আর বিমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী বারংবার বাহবা দেয়।

আলীর শাইলক হল আর এক কাটি সরেশ। সে কখনো খেঁকী কুকুরের মতো গর্ গর্ করে, কখনো মাথায় চোট লাগা মানুষের মতো নির্বাক বেদনায় টলে পড়ে, পর মুহূর্তে দাঁত খিঁচিয়ে তাড়া করে আসে। "এন্‌কোর" "এন্‌কোর" বলে শ্রোতৃমণ্ডলী ঘন ঘন করতালি দিলে আলী সবিনয়ে bow করে ও আবার শুরু করে। শাইলকের ভূমিকা নেহাৎ শেষ হয়ে গেলে সকলের পীড়াপীড়িতে সে মার্ক অ্যাণ্টনীর ভূমিকা নিল।

৫

জাহাজের জীবন এমন যে, পায়ের তলায় সমুদ্র আছে না মাটি আছে তাও কারুর মনে থাকে না। এবং জাহাজটা যে চলছে এ কথা মনে হয় জাহাজ যখন একটা না একটা বন্দরে দাঁড়ায়। বাদলের মন থেকে ভারতবর্ষ তো মুছে গেলই, তার বদলে ইউরোপও জাজ্বল্যমান হল না।

বাদল জাহাজী সুখ দুঃখ, দলাদলি ও পরচর্চাতে মেতে গেল। আলী, আচারিয়া, কিষণলাল, নবাব সিং ইত্যাদি তাকে লুফে নিল। এদিকে কুবেরভাই হঠাৎ ভোল বদলে ফেলে ইংরেজদেব সঙ্গে দু'বেলা খেলছে ফিরছে সাঁতার কাটছে ও—অসাধারণ তার দুঃসাহস—নাচছে! তা নিয়ে ভারতীয়রা নিজেদের মধ্যে হাস্য পরিহাস করতে লেগেছে বটে, কিন্তু ভাগ্যবান বলে ঈর্ষাও করছে। কেউ কেউ বলছে, "ও কি যে সে লোক নাকি? গবর্ণমেণ্টের স্পাই। ওর মুখে ইংরেজবিদ্বেষ শুনে ভাগ্যিস্ মন খুলিনি।"

একদিন আলী বলল, "মিস্টার সেন, কেম্ব্রিজে যদি আপনি পড়েন তবে আমার একটু উপকার করতে হবে। আমি ইণ্ডিয়ান মজ্‌লিশের সেক্রেটারী পদের জন্যে দাঁড়াব। আপনার ভোট আজ থেকে আমার। রাজি?"

বাদল হেসে বলল, "কেম্ব্রিজে এ বছর জায়গা পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই আমার। নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"আমারো নেই। তবু দৈব বলে তো একটা কথা আছে? দৈবাৎ যদি আমরা দু'জনেই কেম্ব্রিজে জায়গা পাই তবে আপনার ভোট আমার। কেমন?"

"বেশ।" দৈব কথাটা শুনে বাদলের গা জ্বালা করছিল। যেমন হিন্দু তেমনি মুসলমান ভারতবর্ষের লোকগুলো দৈবের মুখ চেয়ে অসম্ভব কল্পনার পথে অধঃপাতে গেল। আল্‌নস্করের মতো উদ্ভট স্বপ্ন দেখা তাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিষণলাল সম্প্রতি টিকি কেটেছে। তার চুল দেখলে টিকির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। হিন্দী বলে, তাই মিথিলেশকুমারীর সঙ্গে তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মে গেছে। প্রায়ই স্বয়মাস খেটে বেড়ায়। মুখের ভাবটা যেন সর্বদা বিরক্ত হয়ে আছে। বাদলকে ক্ষ্যাপাবার জন্য বলে, "বাঙ্গালী বাবু, চিংড়ি মাছের সের কত?"

বাদল জবাব দেয়, "বলেন কেন! মাছের দর দেখে ছাতু ধরেছি। ছাতু খাই আর ভজন গাই আর হনুমানজীর আখড়ায় মুগুর ভাঁজি।"

"সেই জন্যেই তো অমন ফড়িংএর মতো চেহারা।" এই বলে সে বাদলকে ধরে কাঁধে তুলতে যায়। বলে, "গায়ে জোর নেই, বাঙ্গালী বাবু! চালাবেন কী করে?"

"গায়ের জোরওয়ালা দারোয়ান রাখব, বেয়ারা রাখব। তা বলে একটা ভাবরাজ্যের ঝাঁকামুটে হব কী করতে?"

"ইস! বাঙ্গালী বাবুর intellectual arrogance কত! হবেন তো কেরানী কিংবা ইস্কুলমাস্টার।"

"যেমন জগদীশ কিংবা রবীন্দ্রনাথ। যাঁদের দেশের লোক বলে বিদেশে আপনি নাম পাবেন, মিস্টার কুলি।"

কুবেরভাইকে আসতে দেখে কিষণলাল পালায়। কুবেরভাই হল কিনা স্পাই আর কিষণলাল স্টেট্ স্কলার! কুবেরভাই বাদলকে সঙ্গে নিয়ে পায়চারি করতে করতে বলে, "ঐ যে য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটি দেখছ ওর ব্যাপার জান?"

"য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান নাকি?"

"খুব বেশী নয়। ওর সবাই ইংরেজ, কেবল ঠাকুমা না দিদিমা মাদ্রাজী।"

"তারপর?"

"তারপর ও তো মাদ্রাজ থেকে পাস হয়ে বিলেতে পড়তে যাচ্ছে মাস্টারি। কিন্তু শিকারী স্বভাব যায় কোথা? একজনকে তাক করে পুষ্পবাণ ছেড়েছে—"

"থামাও অমন কথা!"

"শোনই না। তারপর সেই যে ইংরেজ পুরুষটি সে তোমাদের কলকাতার না কোথাকার বেনে। ঐ যে বেঁটে মতন মোটাসোটা মানুষটি হে। মাথায় খুব কম চুল। প্লাস্‌ফোর্স পরে।"

"হুঁ।"

"এখন সে পড়েছে কিনা আর এক জনের পাল্লায়। সেটি হচ্ছে খাঁটি ইংরেজ মেয়ে। দুঃখের বিষয় তার একটি স্বামী আছে—তোমাদেরি চা বাগানে না কোথায়। স্বামীকে রেখে দেশে যাচ্ছে। তা একলাটি যাচ্ছে, পথে একটি সাথীর দরকার। পাকড়েছে আমাদের প্লাস-ফোর্সওয়ালাকে।"

কুবেরভাই ছাড়বার পাত্র নয়। শ্রোতা পেয়েছে, বলবেই। "তারপর মহাযুদ্ধ বেধে গেছে।"

বাদল চমকে শুধাল, "কী রকম?"

"একদিকে য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান মিস্, অন্যদিকে ইংরেজ মিসেস্। চোখে চোখে ঝগড়া

চলছে।"

"তুমি এত কথা জানলে কী করে ?"

"আমি কী না জানি ? জানতে চাও তো তোমাদের মিসেস্ দেবীর ইতিহাস বলতে পারি।"

বাদল আঁৎকে উঠল। বলল, "আমি শুনতে চাইনে।"

"কিন্তু আমি শোনাতে চাই। সেই যে ছেলেটি ওঁকে জাহাজে তুলে দিতে এসেছিল সেটি একটি বিবাহিত যুবক এবং উনি একটি বালবিধবা।"

"শুনে আমি খুশিই হলুম, কুবেরভাই। আমি ফ্রি-লভ্‌কে শ্রদ্ধা করি।"

"তা তুমি যখন ছদ্মবেশী ইউরোপীয়ান তুমি করবেই তো। আমি কিন্তু ঘৃণা করি।"

"গোয়েন্দাগিরি আর পরচর্চা করতে তোমার ঘেন্না করে না ?"

"গোয়েন্দাগিরি আর পরচর্চা কী ? মানুষ আমরা, সামাজিক জীব। আমরা দশ-জনের খবর রাখব না ? আমি কারুর রাস্তায় কাঁটা দিচ্ছিনে। আমি পুরাদস্তুর অহিংস। আমি জৈন।"

৬

বাদলের ঘুম ভাঙবার আগেই জাহাজ ভিড়েছে। সে পোর্টহোলের ভিতর দিয়ে দেখল জাহাজ ঘাট। জল ছলছলের বদলে জনকলরব কানে এল। অশ্রুতপূর্ব ফরাসীভাষা। অদৃষ্টপূর্ব জনসঙ্ঘ। কুলি, দোভাষী, গাইড্, "money changer", যাত্রীদের ঘরের লোক বা বন্ধু।

অদৃষ্টপূর্ব মাটি।

বাদলের জাহাজের টিকিট সমুদ্রপথে লণ্ডন পর্যন্ত। কিন্তু বাদলের মন ধৈর্য ধরছিল না। চোদ্দ পনের দিন জাহাজে থেকে তার ইচ্ছা করছিল মাটিতে নেমে খুব খানিকটা ছুটাছুটি করে। তার পা যেন শৃঙ্খলের ভারে অবশ হয়েছিল, মুক্তির সম্ভাবনায় অধীর হল।

বাদল তৎক্ষণাৎ ঠিক করে ফেলল জিনিসপত্র সেই জাহাজে লণ্ডনে পাঠিয়ে দিয়ে মার্সেলসে নেমে যাবে। গোটাকয়েক দরকারী জিনিস স্যুটকেসে পুরতে তার পনের মিনিটও লাগল না। স্টুয়ার্ডকে ডেকে একটা পাউণ্ড ধরে দিল—বখ্‌শিষ। পার্সারের কাছে গিয়ে ক্যাবিন ট্রাঙ্কের চাবি বুঝিয়ে দিল, লণ্ডনের ঠিকানা লিখে দিল। তার বদলে পেল একখানা চিঠি—সুধীদার লেখা।

সুধীদা জানতে চায় বাদল জলপথে না স্থলপথে বাকীটা পথ কোন পথে যাচ্ছে। লিখেছে, "লণ্ডনের বাইরে হেণ্ডনে আছি। ফাঁকা জায়গা, সেইজন্যে আমার পছন্দ।

দোষের মধ্যে সময়ে অসময়ে এরোপ্লেনের উচ্চ গুঞ্জন। তোর জন্তে এই বাড়ীর একটা ঘর রাখতে বলেছি। তোর যদি না পোষায় ছেড়ে দিস। আমি কিন্তু এইখানেই থেকে যাব, আমার তো কিছুতেই ঘুমের ব্যাঘাত হয় না।”

বাদলের মন এক লম্ফে লণ্ডনের মাটিতে গিয়ে পড়ল। জাহাজ তার অসহ্য বোধ হল। পথ তার দুস্তর বোধ হল। সুধীদা ভাগ্যবান, সে লণ্ডনে পৌঁছে গেছে, বাদলের এখনো অনেক বাধা।

বাদল পাসপোর্ট দেখিয়ে তরতর করে নেমে যাচ্ছে, তার এক হাতে সুটকেস অন্ত হাতে কম্বল, এমন সময় পিছন থেকে ডাক এল, “সেন।”

বাদলের মনের নিচের তলায় নিতান্ত বাঙালীসুলভ কতকগুলো কুসংস্কার চাপা পড়েছিল। বাদল চটে গিয়ে মনে মনে বলল, “পিছু ডাকে কোন উল্লুক?”

কুবেরভাই তার কাঁধে হাত রেখে বলল, “অত তাড়াতাড়ি কিসের? ট্রেন তো সেই সন্ধ্যা ছ'টায়।”

জাহাজে যে দুটি মানুষ এক ক্যাবিনে থেকেও প্রায় পর হয়ে পড়েছিল মাটিতে তাদের ছাড়াছাড়ি আসন্ন বলে বুক দুলে উঠলো। নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো তাদের মুখে বন্ধুত্বের হাসি।

“এস তোমাকে কাস্টম্‌সের পরীক্ষা পাস করিয়ে দিই। মাশুল দেবার মতো কিছু আছে? সিগার সিগ্‌রেট মদ সুগন্ধি দ্রব্য—”

“ওসব নেই। পায়াজামা, অন্তর্বাস, ক্ষুর—”

“ক্ষুর! বা রে ছেলে! দাড়ি নেই, তার ক্ষুর। দাড়ি কাটবার, না, গলা কাটবার?”

ফরাসী ফাক্তর (facteur) এসে ছোঁ মেরে হাতব্যাগ নিয়ে যেতে চায়, ভাঙা ইংরেজীতে কী যে বলে। কুবেরভাই ও বাদল অতিকষ্টে তার হাত ছাড়িয়ে কাষ্টম্‌স্ ঘরে পৌঁছায়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল, তবু মহাপ্রভুদের দৃষ্টি তাদের উপর পড়ল না। এদিকে ফাক্তরদের সাহায্য যারা নিয়েছিল তারা পরে এসে আগে বেরিয়ে গেল। মিথিলেশকুমারী ও কিষণলাল বাদলের দিকে ফিরেও তাকাল না। আর সেই যে ইংরেজ মিসেস্ তার দুটি হাত দুটি পুরুষের কাঁধে। দেশের নিকটস্থ হবার আনন্দে সে লাফ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তার টান সামলাতে না পেরে পুরুষ দুটি দৌড়িয়ে পাল্লা দিতে বাধ্য হচ্ছে।

অবশেষে কাস্টম্‌সের কর্মচারী বাদলের কাছে এসে দুই একটা প্রশ্ন করল ও জিনিসের উপর চকখড়ির দাগ দিল। বাদলরা বের হয়ে আসতেই সম্মুখে ট্যাক্সি। কুবেরভাই বাদলের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল। বাদল চেপে বসল। অগত্যা কুবেরভাইও।

বাদল বলল, “কুকের দোকানে গিয়ে চেক্ ভাঙাতে হবে, টিকিট কাটতে হবে, তার

করতে হবে।"

এখনো কুকের দোকান খোলেনি। ব্রেকফাস্ট খায়নি বলে বাদলের ক্ষুধাও লেগেছে। বাদল বলল, "চল না একটা কাফেতে কিংবা রেস্তোরাঁয়।" কিন্তু সেখানে গিয়েও তার মন টেঁকে না। কখন কুকের দোকান খুলবে, টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসা যাবে, লণ্ডনে পৌঁছে সুধীদার সঙ্গে দেখা হবে।

কুকের দোকান খুলল। কুকের লোক বলল, "এখুনি একটা ট্রেন আছে বটে, কিন্তু সেটাতে গেলে চেঞ্জ করতে করতে কাল যে সময় লণ্ডনে পৌঁছবেন সন্ধ্যা ছ'টার ট্রেনে গেলেও সেই সময়।"

বাদল হতাশ হয়ে কুবেরভাইয়ের দিকে তাকায়। কুবেরভাইয়ের ভাব থেকে বোধ হয় সে বলছে, কেমন ? বলেছিলুম কি না ?

কুকের প্ররোচনায় বাদলরা কুকের বাস-এ করে সমুদ্রতটবর্তী Baudol গ্রামে গেল। সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজন করে সেই বাস-এই ফিরল। সমস্তক্ষণ বাদল ছটফট করতে থাকল, চেয়ে দেখল না কেমন দুর্গম পার্বত্য পথ দিয়ে সে গেল ও এল, যেখানে বসে খেল সে ঘরের জানালা থেকে তালী বনের ভিতর দিয়ে সূর্যভাস্বর আকাশ ও মন্ত্রশান্ত সাগর পরস্পরের মুকুরের মতো প্রতিভাত হচ্ছিল।

রাত্রে একটা পুরা বার্থ পেয়ে ঘুমতে পারবে ভেবে বাদল ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনেছিল। তার খেয়াল ছিল না যে ইউরোপের ট্রেনে সাধারণ ফার্স্ট ক্লাস শুধু বসবার জন্যে। শোবার জন্যে অতিরিক্ত দিয়ে sleeping car-এর টিকিট কিনতে হয়। হাত পা ছড়িয়ে শোবার জায়গা নেই দেখে তার কান্না পাচ্ছিল। অনিদ্রারোগীর অনিদ্রাকে বড় ভয়।

যাক্, বেশ আরাম করে বসা যাবে। বাদল পায়ের উপর পা রেখে ঠেস দিয়ে বসে Daily Mail-এর Paris Edition পড়ছে। জাহাজে দেখা এক আধা পাগলা বুড়ো এসে হা হা করে হেসে উঠল। কী ব্যাপাব ? বুড়ো বলল, "এই সীট্ আমার রিজার্ভ করা।" বাদল কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল, "য়্যাঁ ?"

কুবেরভাই ছিল সেকেণ্ড ক্লাসে। বাদল তাকে খুঁজে বের করে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে ডাকল, "কুবেরভাই !"

"কী হয়েছে, সেন ? কী ব্যাপার ?"

"ও-হো-হো ! ফার্স্ট ক্লাসে মোটে একটি সীট্ খালি ছিল, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ের মাথা-পাগ্‌লা বুড়ো বন্ধু বলছে ওটা তার রিজার্ভ করা।"

"ও: সেই বুড়ো ? প্লাস্-ফোর্স্‌ওয়ালাকে হস্তান্তরিত হতে দেখে মেয়েটি যাকে শিকার করেছিল ? সে আবার ফার্স্ট ক্লাসে চড়তে যায় কোন সাহসে ?"

কুবেরভাই গিয়ে বুড়োর টিকিট দেখতে চাইল। বুড়ো বলল, "নিগার।" কুবেরভাই তাকে ঠেলা দিয়ে বলল, "এটা ইণ্ডিয়া নয় যে সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনে ফার্স্ট ক্লাসে উঠবে, দাদু! তোমাকে আমি কুকের দোকানে টিকিট কিনতে দেখিনি?"

ধরা পড়ে গিয়ে বুড়ো ফিক করে হেসে উঠল। বলল, "একটু তামাশা করছিলুম।" এই বলে কুবেরভাইয়ের সঙ্গে নেমে গেল।

গাড়ী চলবার পর দেখা গেল বাদলের পাশের সীটের মালিক গাড়ীতে ওঠেননি। বাদল বিনা বাক্যব্যয়ে পা ছড়িয়ে দিয়ে জায়গাটুকু দখল করল। সবটা শরীর আঁটে না, তবু যথালাভ।

অন্ধকার রাত্রি। দিব্য শীত। বাদলের সীট্ ও তার পার্শ্ববর্তিনীর সীটের মাঝখানে একটি ছোট বেড়া ছিল। বাদল তার উপর মাথা রাখল। শীতের ভয়ে জানালা দরজা বন্ধ। অন্ধকার রাত্রিতে দেখাও যায় না দু'ধারের দৃশ্য। হয়তো ঘুম এসেছিল। হয়তো তন্দ্রা। হঠাৎ এক সময় তার মনে হল কে যেন তার মাথার কাছে মাথা রেখেছে। কার মাথার চুল যেন তার কপাল ছুঁচ্ছে। সে উঠে দেখল কামরা অন্ধকার। বারান্দার আলোয় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একজন বুকের উপর দুই বাহু বেঁধে দেয়াল ঠেস দিয়ে বসে ঘুমচ্ছে। আর একজন পায়ের উপর পা রেখে ঘুমচ্ছে। আর একটি পুরুষ; সেও ঘুমন্ত। বাদলের পাশের মহিলাটি বাদল যেখানে মাথা রেখেছিল সেইখানে ঘেঁষে একটি বালিশ পেতে কম্বল মুড়ি দিয়ে নিদ্রা যাচ্ছে।

ফ্রান্সের মধ্যভাগ দিয়ে ট্রেন ছুটেছে। জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নেই। ঘুমন্ত পুরীতে সেই একা প্রহরী জেগে। তার একান্ত নিকটে নিদ্রিতা নারী। সে কিছুক্ষণ ইতস্তত করল। তারপর বালিশের একাংশ বেদখল করে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন প্রভাতে উঠে দেখে তার আগে অন্যেরা উঠেছে। মহিলাটি তাকে বালিশটা ছেড়ে দিয়েছেন।

৭

প্যারিসে কুবেরভাই নেমে গেল। বাদলকে বলল, "কখনো যদি এদিকে আস আমাকে খবর দিয়ো, সেন। আমার কাকার এখানে মণিমুক্তার কারবার। ঠিকানা লিখে রাখ।"

কুবেরভাইয়ের অন্তর্ধানে বাদলের একটু দুঃখ হল। কিন্তু সে যাকে পিছনে রাখে তাকে মনে রাখে না। ট্রেন Gare de Lyon ছাড়ল। বাদলও কুবেরভাইকে ভুলল।

গাড়ী বায়ুবেগে ছুটেছে। ফ্রান্সের ট্রেন হালকা ও ভূমি মোটের উপর সমতল। প্রধানত চাষের জমি। উজ্জ্বল সবুজ ঘাস। ঝর্ণা। ঝোপ। নামমাত্র পাহাড়। মাঝে মাঝে নতুন গড়া বাড়ী। বিজ্ঞাপনের ফলক।

ক্যালে। সমুদ্রকে বাদল ইতিমধ্যেই ভুলেছিল। আবার সমুদ্র দেখা দিচ্ছে। ট্রেন থামল, যাত্রীরা নামল। ফাকৃতর! ফাকৃতর! বাদল এবার ফাকৃতরের কবল থেকে বাঁচল না। জিনিসগুলি নিয়ে ফাকৃতর যে ভিড়ের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল বাদল চিন্তিত হয়ে জাহাজে উঠল।

জাহাজে উঠে দেখে ডেক-চেয়ার ভাড়া করে খোলা ডেকের উপর অনেক লোক বসে গেছে। বন্ধ ডেকের বেঞ্চিতে বাদল জায়গা করে নিল। কিন্তু কোথায় ফাকৃতর? জাহাজ ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময় ফাকৃতর মশাই একগাল হেসে মাল সমেত উপস্থিত। "আপনাকে কোথায় না খুঁজেছি। সেকেণ্ড ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাস, নিচের ডেক, উপরের ডেক।"—বলে হাত পাতল। তার ইংরেজী শুনে বাদলের যা হাসি পাচ্ছিল! মজুরি পেলেও ছাড়বার পাত্র নয়। বখ্‌শিষ চায়। রসিক লোক। আশাতিরিক্ত পেয়ে কপালে হাত ঠেকাল।—"বঁজুর মঁসিয়ে।"

নাঃ। ফরাসী ভাষাটা না শিখলে নয়। লণ্ডনে পৌঁছেই আরম্ভ করে দেওয়া যাবে। ফরাসী না জানা থাকায় ট্রেনে ভালো করে খাওয়া হয়নি, খাবার জল চেয়ে খনিজ জল (সোডা ওয়াটার) পেয়েছে। ফরাসী না জানায় কুলির অনুসন্ধান করতে পারেনি, সুটকেসটার মমতা ত্যাগ করেছিল।

ইতিমধ্যে জাহাজ চলতে শুরু করেছে। মেঘলা দিন। ঠাণ্ডা হাওয়া। বর্ষাও টিপ টিপ পড়ছে। সুটকেস ফেরৎ না পেলেও বাদলের চলত। কম্বলখানা ফিরে পেয়েছে বলে ফাকৃতরকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল।

ইংলিশ চ্যানেলটুকু এক ঘণ্টার পথ। গারট্রুড ইডার্ল সাঁতরে পার হয়েছে। কিন্তু জাহাজে করে পার হতে গিয়ে বাদল যত কষ্ট পেল নিশ্চয়ই তত কষ্ট পায়নি। সকলের সামনে তার বার বার বমি হয়ে গেল। লজ্জায় মাথা কাটা যায়। তার টুপি উড়ে গেল, চুল সজারুর মতো হল, মুখ অপরিষ্কার, পোশাক নোংরা। মাথা ভারি, চোখ লাল, গা ঘিন্ ঘিন্।

ঐ যে দেখা যাচ্ছে—দূর দিগ্বলয়ে অস্পষ্ট তটরেখা। ইংলণ্ড এসেছে—white chalk cliffs of Dover! না, না, পাহাড় তো নয়! একরাশ বাড়ী। যাই হোক, ইংলণ্ড তো?

বাদল মনে মনে জানুপাত করল। ব্রিটানিয়ার দক্ষিণ করপৃষ্ঠে একটি চুম্বন অর্পণ করে মনে মনে বলল, বন্দে প্রিয়াম্।

৮

ফরাসী ফাক্তয়ের মতো গুঁফো খ্যাঁকশিয়ালী নয়। ইংরেজ পোর্টার যণ্ডা, গোঁফ-দাড়ি কামানো, নীরব স্বভাব। ডোভারে এত মানুষ নামল, এত পোর্টার ছুটল, কিন্তু মার্সেল্‌স ও ক্যালের সিকি পরিমাণ গোলমাল নেই।

"আপনার জিনিস নামিয়ে নেব, স্যর ?"

"নাও।"

পাসপোর্ট ও কাস্টম্‌সের ঝুঁকি পুইয়ে বাদল বোট-ট্রেনে চড়ে বসল। ফার্স্ট ক্লাসে কেউ নেই বললেও চলে, তার কামরায় সে একা। পোর্টারকে একটা শিলিং ফেলে দিতেই সে টুপিটাকে বেশীরকম উঠিয়ে ধন্যবাদ ও শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে গেল।

বাদলের মন উড়ু উড়ু। কখন লণ্ডনে পৌঁছবে ? সুধী নিতে আসবে কি না। ভিক্টোরিয়া থেকে হেণ্ডন কত দূর ?

ট্রেন ছাড়লে দেখা গেল আকাশ পরিষ্কার, সূর্যাস্তের আভা সমতল মাঠের উপরকার দূর্বাদল ঘাসের উপর পড়েছে। পর পর অনেকগুলো সুড়ঙ্গ। চকখড়ির পাহাড় শাদা নয়, দিব্য সবুজ।

কত ছোট ছোট শহরের ছোট ছোট স্টেশন ছাড়িয়ে ট্রেন এক দৌড়ে ভিক্টোরিয়ায় পৌঁছল। তখনো গোধূলির আমেজ আছে। ইংলণ্ডের গোধূলি দীর্ঘস্থায়ী।

বাদল জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দু'দিকে চাইল। অমনি দেখল সুধী সেকেণ্ড ক্লাসে তার খোঁজ করছে।

বাদলের মন উল্লাসে অধৈর্য হল। সে ভব্যতার মাথা খেয়ে চিৎকার করে উঠল, "সুধীদা—।"

সুধী ও তার সঙ্গে কে একটি ভারতীয় যুবক পিছু ফিরে দেখল—বাঁদরটা ফার্স্ট ক্লাসে। দু'জনে হাসাহাসি করতে করতে বাদলের কামরার কাছে যখন উপস্থিত হল বাদল তখন সুটকেস হাতে করে নামছে। সুটকেস মাটিতে রেখে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিতেই সুধী তাকে একরকম বুকের উপর নিয়ে ফেলল। কিছুক্ষণ দু'জনেরই বাগ্‌রোধ। ইতিমধ্যে নূতন ভারতীয়টি বাদলের সুটকেস হাতে করে শুধাচ্ছে, "এই ? না, আর আছে ?"

বাদলকে সুধী তার সঙ্গে পরিচিত করে দিল। "ইনিই বাঁদর. আর ইনি কুমারকৃষ্ণ দে সরকার।"

প্ল্যাটফর্ম দিয়ে চলতে চলতে দে সরকার বলল, "দেখুন, মিস্টার সেন, আমার এখানে দু'রকম পরিচয় আছে। ইণ্ডিয়ানরা জানে আমি কুমার কে ডি সরকার, নিশ্চয় জমিদারের ছেলে। আর নেটিবরা জানে আমি মঁসিয়ে ড সারকার।"—এই বলে হাসতে লাগল।

বাদল হেসে বলল, "ছুটো পরিচয়ই সমান ম্যারিস্টক্র্যাটিক।"

সুধী বলল, "এখন সমস্যা হচ্ছে ট্যাক্সি করা যাবে, না, ম্যারিস্টক্র্যাটরা টিউবে করে যাবেন ? হেণ্ডন অবধি ট্যাক্সি করে গেলে প্রায় পাউণ্ডখানেক লাগে। আর বাদল যে রকম চেহারা নিয়ে এসেছে টিউবে চড়লে মূর্চ্ছা যাবে।"

ট্যাক্সিই করা গেল। তখন দে সরকার বলল, "আজকের মতো বিদায় হই ভাই চক্রবর্তী আর সেন।"

বাদলের এই প্রিয়দর্শন যুবকটিকে বিশেষ ভালো লেগেছিল। শুধাল, "কেন, আপনি আমাদের সঙ্গে আসবেন না ?"

"আমি ? কুমার বাহাদুর থাকবেন Suburbiaয় ? কেন ? Mayfair কি নেই ? Belgraviaয় স্থানাভাব ?"—সুরটা নামিয়ে কারুণ্যের সঙ্গে বলল, "আমি ব্লুমস্‌বেরীতে থাকি, ভাই।"

৯

লণ্ডন ! গোধূলির শেষে অন্ধকার নামছে। অসংখ্য আলোকের টুকরা আকাশে ও মাটিতে। রাস্তার পর রাস্তা ডাইনে ও বামে সম্মুখে ও পশ্চাতে রেখে ট্যাক্সি ছুটেছে। বাদলের সাধ্য কী যে চিনে রাখে। সত্য সত্যই সে লণ্ডনে পৌঁছেছে। তার আবাল্যের অলকা অমরাবতী লণ্ডন ! কোন শহরকেই বা সে এত ভালো করে চেনে ? সেই রোমান যুগ, স্যাক্‌সন যুগ, নর্মান যুগ, ডিক হুইটিংটন, টাওয়ার অফ লণ্ডন, মারমেড ট্যাভার্ন, নেল্ গুইন্, ডকটর জনসন, ক্রাইস্টস্ হসপিট্যাল, সোহো…ক্রমান্বয়ে কত স্মৃতি যে তার মনের পর্দার উপর বায়োস্কোপের ছবির মতো উদয় হবামাত্র অস্ত গেল। বাদল ভাবল, পূর্ব জন্ম হয়তো মিথ্যা নয়।

সুধী একটি কথাও বলছিল না। তার হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ। পূর্ণ কলসের শব্দ নেই। কেবল ড্রাইভার যখন হেণ্ডনের কোন রাস্তায় যাবে জিজ্ঞাসা করল সুধী বলল, "টেণ্টাবর্টন ড্রাইভ্।"

ট্যাক্সি থামতেই বাড়ীর দরজা খুলে গেল। দেখা গেল একটি পাঁচ ছয় বছরের মেয়ে একটি ষোল সতের বছর বয়সের মেয়ের হাত ধরে ও গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সিকে বিদায় করে সুধী ও বাদল বাগানের গেট বন্ধ করল। সুধী বলল, "কি রে মার্সেল, তুই এখনো ঘুমতে যাসনি ?"

সুজেৎ (Suzette) সলজ্জভাবে বলল: "আপনার বন্ধুকে দেখবে বলে বায়না ধরল। বিছানায় কিছুতেই থাকতে চাইল না।"

সুধী ও বাদল পা-পোষে জুতো মুছে হ্যাট-ওভারকোট রাখবার স্ট্যাণ্ডে হ্যাট রাখল।

তখন সুধী বলল, "পরিচয় করিয়ে দিই। মিস্টার সেন, ম্যাড্‌মোয়াজেল সুজেৎ—।" যথারীতি অভিবাদন ইত্যাদি।

"আর ইটি হল আমাদের ছোট্ট মার্সেল, লক্ষ্মী মার্সেল, Jolie petite Marcelle."

মার্সেল ঘাড় নেড়ে প্রবল আপত্তি জানাল। "না, petite না।"

তখন সুধী হেসে বলল, "তবে আমার ভুল হয়েছে। Jolie grande Marcelle" এই বলে মার্সেলকে দুই হাতে তুলে উঁচু করে ধরল। "ইস, আমার চেয়েও বড়! সুজেতের চেয়ে, বাদলের চেয়ে, সকলের চেয়ে মার্সেল বড়। plus grande Marcelle!"

বাদলকে নিয়ে উপর তলায় যাবার সময় সুধী সুজেৎকে বলল, "তোমার মাকে বোলো আমরা হাত মুখ ধুয়ে আসছি। আর মার্সেলকে ঘুম পাড়াতে দেরি কোরো না।"

বাদলের ঘর। একখানা লোহার খাটে বিছানা তৈরি। একটা পড়ার টেবিলের উপর ফুলদানী ও ফুল। একটা হাত মুখ ধোবার টেবিলের উপর চীনামাটির কুঁজো ও বেসিন, একটা আয়না-লাগানো আলমারি। অগ্নিস্থলীতে বাদল আসবে বলে কয়লার আগুন জ্বালানো হয়েছে।

সুধী বলল, "লণ্ডনে শীত এখনো পড়েনি। গরম দেশ থেকে আস্‌ছিস্, তোর একটু বেশীরকম শীত বোধ হতে পারে ভেবে তোর ঘরে আগুনের ব্যবস্থা হয়েছে। গরম জল দরকার হবে? দাঁড়া, আমিই নিয়ে আসছি।"

বাদলের মুখ হাত ধোয়া হয়ে গেলে সুধী তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। একই আকারের একই রকম ঘর—কেবল ওয়ালপেপারের নক্সা আলাদা। এবং পড়ার টেবিলের উপর পরিপাটী করে সাজানো বই ও পত্রিকা।

"দেখি দেখি কী বই কিনেছ?—ও:, Spenglerএর সেই বইখানা? 'Decline of the West'—বাজে কথা, ইউরোপের কখনো বার্ধক্য আসতে পারে? ইউরোপ চিরযৌবন।"

"পাছে বাইরেটা দেখে মোহাবিষ্ট হই, সেই ভয়েই তো এই মোহমুদ্গর আনানো। কিন্তু কিনিনি বাদল, Mudieর লাইব্রেরীতে চাঁদা দিয়ে ধার করেছি।"

"ও:! হাউ ক্লেভার! আমাকে মেম্বার করিয়ে দেবে সুধীদা?"

"তুই চল। খেয়ে দেয়ে সুস্থ হ'। বিশ্রাম কর। Mudie তো পালিয়ে যাচ্ছে না, তুইও কয়েক বছর থাকছিস।"

জাহাজে মনের মতো খোরাক না পেয়ে গ্রন্থকীট উপবাসী ছিল। স্পেংলারখানাকে বগলদাবা করে খাবার ঘরে চলল।

চিঠির জবাব

১

দুই বন্ধুর মাঝখানে দুই মাসের ব্যবধান। মনের কথা জমে গেছে দুই শত বছরের। কোনখান থেকে কে আরম্ভ করবে স্থির করতে পারল না। অগত্যা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখল।

পরদিন রবিবার। সেদিন মধ্যাহ্নে দে সরকারকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। ভোজনের পর তাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাওয়া যাবে।

"এই দে সরকার ভদ্রলোকটি কে, সুধীদা? ব্লুম্‌স্‌বেরীতে থাকেন—বোহিমিয়ান নাকি?"

"স্কুল অফ ইকনমিক্‌সে পড়েন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আলাপ।"

"বাই জোভ্‌। এরি মধ্যে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ভর্তি হয়েছ? আমি কবে হব, সুধীদা?"

"অনেক নিয়ম কানুন। একটু বেগ পেতে হবে।"

ব্রেকফাস্টের পর বসবার ঘরে এসে দু'জনে বসল। রবিবারে সুধীর জন্যে "অব্‌সার্ভার" ও বাড়ীর লোকের জন্যে "নিউস্ অব্‌ দি ওয়ার্লড" নেওয়া হয়। বাদল সমান আগ্রহের সঙ্গে উভয় কাগজ আগলে বসল। কোনোখানা হাতছাড়া করতে চায় না।

মার্সেলের সঙ্গে খেলা ও পড়া সুধীর নিত্যকর্ম হয়ে গেছে। মার্সেল এসে নীরবে তার এক পাশে দাঁড়াল। সুধী বলল, "আয়। তোর ছবির বই কোথায়?"

মার্সেল তার শতচ্ছিন্ন ছবির বই ও ছবিওয়ালা ছোটদের কাগজগুলি হাতে করে এনেছিল। ঐ কয়টিই তার সম্বল। প্রথম প্রথম সুধী অনুযোগ করে বলত, "মার্সেলকে নতুন বই কাগজ দাও না কেন?" সুজেৎ উত্তর দিত, "দু'দিনেই ছিঁড়ে ফেলে। দস্যি মেয়ে।" ক্রমশ সুধী বুঝতে পারল এদের অবস্থা ভালো নয় এবং মার্সেল অতি শান্ত মেয়ে, এত শান্ত ও এত গম্ভীর যে তার বয়সের মেয়েদের পক্ষে ওটা অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছনীয়। তারপর একটু একটু করে সুধী জানল, মার্সেল সুজেতের আপন বোন নয়। এমন কি দূর সম্পর্কের কেউ নয়।

মার্সেলরা ফরাসী, সুজেৎরা বেলজিয়ান। যুদ্ধের সময় সুজেতের মা-বাবা তাকে নিয়ে ইংলণ্ডে পালিয়ে আসে, তখন থেকেই ইংলণ্ডে তারা আছে। সুজেৎরা শ্রমিক শ্রেণীর লোক, যুদ্ধের পরে যখন নামমাত্র মূল্যে বাড়ী পাওয়া যায় তখন এই বাড়ীখানা কেনে। বাপ মিস্ত্রী, মা ঘর সংসার বোঝে। সুজেৎ সবে স্কুলের পড়া শেষ করে কোন একটা দোকানে কাজ পেয়েছে। পেয়িং গেস্ট না নিলে তাদের চলে না, ট্যাক্স যে অনেক।

কয়েক বছর আগে তাদের পরিচিত একটি ফরাসী কুমারী লণ্ডনের কোন এক সাধারণ সূতিকাগার থেকে বেরিয়ে নবজাত কন্যাটিকে তাদের জিম্মা দেয় এবং মাসে মাসে

কন্যাটির জন্যে নিজের রোজগারের অংশ পাঠাতে থাকে। কন্যাটির পিতাও খবর পেয়ে কন্যাটিকে দেখে যায় ও মাসে মাসে নিজের রোজগারের অংশ পাঠায়। অবশ্য মা-বাবা যা পাঠায় তা সামান্যই এবং মাঝে মাঝে বেকার হয়ে পড়লে সেটুকুও পাঠাতে অক্ষম হয়।

মার্সেল জানে না ওরা তার কে। সে জানে মাদাম তার মা, মঁসিয়ে তার বাবা, স্যুজেৎ তার দিদি। এরা তাকে যথার্থ ভালোবাসে, কিন্তু তার প্রয়োজনমতো ছবির বই ও খেলার পুতুল কিনে দেওয়া এদের অবস্থায় কুলয় না। বুড়ীর বয়স বাড়ছে, বুড়োর চাকরি কোন দিন যায়, স্যুজেতের বিয়ের যৌতুক সঞ্চয় করতে হয়।

সুধী বলে, "মার্সেলকে আমার হাতে দিন। আমি তাকে নিজের খরচে মানুষ করব। তার বিয়ের যৌতুক আমি দেব।"

মাদাম বলে, "তা হলে ওর বাবাটি মারা যাবে। বুড়োমানুষ—মার্সেলকে ছেড়ে থাকতে পারে না বলে রোজ সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফেরে।"

স্যুজেৎ বলে, "কিরে মার্সেল, এঁর সঙ্গে এঁর দেশে যাবি?"

মার্সেল যেমন নিঃশব্দ তেমনি নিস্পন্দ। পাথরের মতো অচঞ্চল। পাথরে গড়া মূর্তির মতো ওজনে ভারি। মেয়েটি অতি প্রিয়দর্শন। তাকে না ভালোবেসে থাকা যায় না। তার প্রতি করুণা তো হয়ই।

সুধী তাকে আরও টেনে নিয়ে বলল, "তোর জন্যে নতুন বই কিনে আনব রোজই ভেবে যাই, রোজই মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে দেখি দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। আচ্ছা, এইবার তোর নতুন দাদা কিনে আনবেন।"

তারপর সুধী ও মার্সেল একই বই সুর করে পড়ে অভিনয়ের ভঙ্গীতে।

"Jack and Jill
Went up a hill"

তারা কেমন করে পাহাড়ে উঠল, পাহাড় কত উঁচু—এসব মার্সেল হাতেকলমে শিখতে ভালোবাসে। সুধী যেমন করে যা করে সেও তেমনি করে তাই করে। জ্যাক ও জিল সেজে দু'জনে সোফার উপর আছাড় খায়। ওর নাম পাহাড় থেকে পড়া।

টাইমপিস ঘড়ির আড়ালে মুখ রেখে সুধী বলে,

"Hickory Dickory dock
It is bath-time, says the clock."

মার্সেল ভাবে সত্যিই যেন ঘড়িটা তার সঙ্গে কথা কইছে। সেও বলে "হিকরি ডিকরি ডক্‌..." কিন্তু বাকীটা বলতে না পেরে থেমে যায়। তারপর স্যুজেৎ এসে তাকে পাকড়াও করে। এবার সত্যি সত্যি স্নান করতে হবে—It is bath-time, says the clock! মার্সেলের মুখ শুকিয়ে যায়। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি চলে। মার্সেল যে খুব লক্ষ্মী মেয়ে নয়

সেটা তার স্নানের সময় ধরা পড়ে।

২

বেল বাজছে শুনে সুধী দরজা খুলে দিতে উঠে গেল। রান্নাঘর থেকে মাদামও ছুটে এসেছে।

দে সরকার টুপি উঠিয়ে অভিবাদন করল।

“আরে আসুন আসুন। বাড়ী খুঁজে পেলেন কী করে?”

“কোন মুলুকে বাড়ী করেছেন, মশাই। দেড় ঘণ্টা ধরে খুঁজছি। গাইড বুকে খুঁজে পাইনে, যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে এদিক দিয়ে ওদিকে যাও, তারপরে তিনটে রাস্তা ছাড়িয়ে ডাইনে যাও, তারপরে চারটে ল্যাম্প পোস্ট পেরিয়ে বাঁয়ে তাকাও—ওঃ! মাফ করবেন। আপনাকে দেখতে পাইনি।”

“তাতে কী? আপনি কি মঁসিয়ে দ্য সারকার?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কি মাদাম— ?”

দে সরকারকে দেখে বাদল বই ফেলে উঠল। করমর্দনের পর দে সরকার বলল, “তারপর কী খবর! বাড়ী পছন্দ হয়েছে?”

বাদল বলল, “বেশ। তবে ইংলণ্ডে এসে কন্টিনেন্টালদের সঙ্গে থাকতে উৎসাহ বোধ করছিনে।”

“তা যদি বলেন, নেটিব পরিবারে বড্ড খরচ, মিস্টার সেন।”

নেটিব কথাটার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে বাদল বলল, “বিজ্ঞাপন দিলে ভালো ইংরেজ পরিবারে জায়গা পাইনে?”

“কেমন করে পাবেন? যাদের পয়সা আছে তারা পেয়ীং গেস্ট নেবে কেন? ওতে তাদের প্রাইভেসী নষ্ট হয়। পরের মন জোগানোর হাঙ্গামাও আছে?”

“ধরুন যদি কোনো পরিবারে বন্ধুতা হয়ে যায়?”

“হলেও সুবিধে নেই। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ফ্ল্যাটে কিংবা আধখানা বাড়ীতে বাস করেন। সাময়িক অতিথির জন্যে অতিরিক্ত ঘর রাখতে এত খরচ যে কদাচিৎ কেউ রাখেন।”

বাদল ভেবেছিল রোম্যান্টিক ভাবে কত পরিবারে প্রবেশ পাবে, কত ঘরে ঘরের একজন হবে। তার কল্পনায় ঘা লাগল। সে বলল, “তবু এমনো হতে পারে যে আমারি জন্যে তাঁরা ফ্ল্যাট বদলাবেন। ছোট ফ্ল্যাট থেকে বড় ফ্ল্যাটে যাবেন।”

দে সরকার খুব একচোট হেসে নিল। বলল, “আপনি মশাই বিদেশে এসেছেন না শ্বশুরবাড়ী এসেছেন? ভুল ভাঙতে বেশী দেরি হবে না কিন্তু।”

সুধী মৃদু মৃদু হাসছিল। বাদলের জন্যে তার দুঃখ হচ্ছিল। কল্পনায় ও বাস্তবে অনেক গরমিল।

সুজেৎ এসে সলজ্জভাবে দাঁড়াল। বলতে চায় খাবার দেওয়া হয়েছে। সুধী বুঝতে পারল। বলল, "আসুন খেতে যাই। মিস্টার দে সরকার, মাদ্‌মোয়াজেল সুজেৎ।"

খেতে বসে দে সরকার বাদলের কানে কানে বলল, "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। এই-খানেই থেকে যাও না, সেন?"

বাদল বলল, "কোথাও তিন মাসের বেশী থাকব না ভাই দে সরকার। লণ্ডনের সব ক'টা পাড়া দেখতে চাই।"

"তা হলে সব রকম লোকের সঙ্গে থাকতে প্রস্তুত হও। সব পাড়াতেই ভদ্র নেটিব শ্বশুরবাড়ী অতি বড় ভাগ্যবানও আশা করতে পারে না। এমন কি নেটিবরাও আশা করে না।" এই বলে দে সরকার অতি কষ্টে হাসি চাপল। ইংরেজদের দেশে তার দু'বছর কেটেছে। সে ভারতবর্ষে বসে বসে বিলিতী নভেল পড়েনি।

আহার শেষ হলে লাউঞ্জে বসে দে সরকার কফি ও সিগ্‌রেট প্রচুর ধ্বংস করল। লোকটি আলাপ জমাতে অসাধারণ পটু। মঁসিয়ে এবং মাদাম তাকে ছাড়তেই চায় না। তার কাছে যত রাজ্যের খোশ গল্প শুনে মুগ্ধ। চালও তার রাজারাজড়ার মতো। তাকে সিগ্‌রেট দিতে আসবার আগেই সে তার হাতীর দাঁতের সিগ্‌রেট কেস্ খুলে মঁসিয়েকে সিগ্‌রেট দিতে উঠে গেছে। মাদাম সিগ্‌রেট খায় না বলে মাদামের সঙ্গে করেছে মধুর রসিকতা। সুজেৎ তাকে gallantryর সুযোগ না দিয়ে রান্নাঘরে বাসন ধুচ্ছে বলে তার যে আক্ষেপ। এমন কি ছোট্ট মার্সেলকে সে উপেক্ষা করেনি। পকেট থেকে এক গাদা টফি বের করে তার হাতে গুঁজে দিয়েছে।

পরনে তার ছাইরঙের সুট, নিখুঁত কাট। তার লম্বা গড়ন ও সুন্দর গায়ের-রং-এর সঙ্গে এত ভালো মানায় যে একমাত্র ঐ পোশাকই যেন তার জন্মগত গাত্রাবরণ। ময়ূরের যেমন পেখম কিংবা মেষের যেমন পশম। চার্লি চ্যাপলিনের যেমন গোঁফ এবং প্যাণ্টলুন, হ্যারল্ড লয়েডের যেমন চশমা, দে সরকারের তেমনি ছাই রং-এর সুট।

কফির পেয়ালায় সিগ্‌রেটের ছাই ফেলতে ফেলতে দে সরকার বলছিল, "হ্যাঁ, কী বলছিলুম মঁসিয়ে। আমি যখন Marble Arch-এর কাছে সার্ভিস ফ্ল্যাট নিয়ে একা থাকতুম তখন একদিন এক বেলজিয়ান যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে যায়। দেশে ফেরবার সময় সে আমাকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতেই যা বাকী রেখেছিল। এতদূর বন্ধুতা! নিমন্ত্রণপত্র যে কতবার লিখেছে, এই সেদিনও একখানা পেয়েছি। যাই বলুন, বেলজিয়ানদের মতো মিশুক জাত আমি আজো দেখলুম না।"

এই বলে দে সরকার সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল। অতঃপর

অবশ্য মাদাম চা-এ থাকতে আব্দার ধরল এবং মঁশিয়ে চলল আর এক বাক্স সিগ্‌রেট আনতে। দে সরকার কিন্তু কিছুতেই থাকতে পারে না, অন্যত্র তার চায়ের নিমন্ত্রণ আছে। আগামী সপ্তাহে আসতে পারবে কি ? না, মনে করে দেখে আগামী সপ্তাহটার সবটাই তার আগে থেকে বিলিব্যবস্থা করা। আচ্ছা, সে টেলিফোন করে জানাবে দু'একদিন পরে—অকস্মাৎ যদি এনগেজমেন্ট পিছিয়ে যায়।

সুধী ও বাদলকে নিয়ে দে সরকার রাস্তায় নেমে পড়ল।

৩

দে সরকার লণ্ডনের ঘুঘু। কোথায় পাঁচ গিনি দামে চলনসই স্যুট পাওয়া যায় এবং কোথায় সাত গিনি দামে, কোন দোকানের ওভারকোট কিনতে হয় এবং কোন দোকানের ড্রেসিং গাউন—লণ্ডনের চাঁদনি ও চৌরঙ্গী দুই তার নখদর্পণে। বাদলকে একদিন টিউব-এ চড়িয়ে, বাস-এ বসিয়ে, পায়ে হাঁটিয়ে ক্যালিডোনিয়ান রোডের ওধারে কোন এক অজ্ঞাতকুলশীল হাটে নিয়ে গেল। সেখানে সস্তার চূড়ান্ত। কুৎসিত পোশাক পরা কুৎসিত চেহারার যৌবনে স্থবির কতকগুলো স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জিনিসের নাম ও দাম হাঁকছে। বাদল ত্রাহি ত্রাহি করছে দেখে দে সরকার বলল, "এই বুঝি তোমার লণ্ডন দেখার সংকল্প! এস এস, ক' নম্বরের মোজা চাই, এঁকে বল।"

এক সপ্তাহের মধ্যে দে সরকারের তৎপরতায় বাদল শীতের জন্যে যা কিছু দরকার সবই কিনে ফেলল। তার নতুন স্যুট, নতুন জুতো, নতুন হ্যাট। দে সরকার পই পই করে বলে দিয়েছে কোন টাইয়ের সঙ্গে কোন মোজা ও কোন রুমাল মানায়। ওভারকোট কিনে দিয়েছে স্যুটের সঙ্গে ও হ্যাটের সঙ্গে মিলিয়ে। পকেটে এক সেট আয়না-চিরুণী সব সময় রাখতে শিখিয়েছে। দে সরকার না থাকলে বাদল কেমন করে জেন্টলম্যান হত ? সুধীদা এ বিষয়ে অকর্মণ্য। বড় জোর জানে কোথায় নিরামিষ রেস্তোরাঁ ও Mudieর লাইব্রেরী। তার পোশাক বলতে দেশে তৈরি মোটা খদ্দরের গলা বন্ধ কোট ও প্যান্টলুন, মোটা খদ্দরের টুপী। ফরমাস দিয়ে একটা দেশী পশমের গলা-বন্ধ ওভারকোট করিয়ে এনেছে। টাই মাফলার ইত্যাদির বালাই নেই তার। সুধীদা লণ্ডনের ফ্যাশানের ধার ধারে না। সুধীদা পুরাদস্তুর বিদেশী। বাদল সুধীদার সঙ্গে ঘর করল বটে, কিন্তু দে সরকারের সঙ্গে বাইরে ঘুরল।

দে সরকার বলে, "চাল দেওয়া জিনিসটাকে নেটিবরা একটা আর্ট করে তুলেছে, সেন। পোরো পাঁচ গিনির স্যুট, কিন্তু কেউ জিজ্ঞাসা করলে অম্লানবদনে বোলো আট গিনির। থেকো সপ্তাহে দু'গিনি খরচ করে, কিন্তু চাল থেকে যেন সকলে ঠাওরায় সাউথ কেনসিংটন কিংবা সেন্ট জন্‌স্ উডের বাসিন্দে। না, না, মিথ্যা কথা বলতে বলছিনে।

কিন্তু snobকে যে সমাজে উঁচু আসন দিয়েছে সে সমাজে একটু আধটু অত্যুক্তি করলে বিবেকে বাধে না।"

বাদল বলে, "তুমিও খুব অত্যুক্তি কর বুঝি ?"

"সকলের কাছে নয়। আমি এ বিষয়ে একান্ত সায়েন্টিফিক। যে রকম লোকের কাছে যে রকম advertise করলে ম্যাকসিমাম ফল পাওয়া যায় সে রকম লোকের কাছে সে রকম চাল দিই। বেঁচে থাকলে একদিন লর্ড নর্থক্লিফ কিংবা গর্ডন সেল্ফ্রিজ হব।"

দে সরকার আরো বলে, "আর দ্যাখ কাউকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ কোরো না। যখন কারুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে তখন তাকে চা খাওয়াতে চাও তো Tea Roomsএ নিয়ে যেয়ো, লাঞ্চ খাওয়াতে চাও তো রেস্তোরাঁতে দেখা করতে বোলো। কিন্তু বাড়ীতে ডেকে দারিদ্র্য দেখিয়ো না।"

দে সরকার এও বলে, "কেম্ব্রিজে তো এ বছর জায়গা পেলে না। এ বছরটা অপেক্ষা করবে, না এখানকার কোনো কলেজে ভর্তি হবে ? আমি বলি, ব্যবসা শেখ।"

বাদল বলে, "ব্যবসা আমার মাথায় ঢোকে না ভাই দে সরকার, যদিও খুব কৌতূহল জাগায়। এক একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোর কেমন করে চালায় জানতে এত ইচ্ছা করে। সেদিন যখন সেল্ফ্রিজের দোকানে নিয়ে গেলে আমি ভাবছিলুম আমাদের পাটনা সেক্রেটারিয়াট তার তুলনায় কী। এককালে আমার খেয়াল ছিল লর্ড সিংহের শূন্য সিংহাসনটা পূর্ণ করব। এখন মনে হচ্ছে কী ক্ষুদ্র অভিলাষ।"

"লাটগিরিও চোখে লাগে না, সেল্ফ্রিজগিরিও ধাতে সয় না, অথচ সেনগিরি যে কী তাও আমাদের বলনি।"

"আমি নিজেই জানিনে ভাই। আমার মনে হয় আমি যেন একটা নেবুলা। হতে হতে কী যে হয়ে উঠব আমাকে ভাবতে সময় দাও।"

বাস্তবিক বাদল ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছিল না। লণ্ডনের বি-এ ডিগ্রির জন্যে আবার সেই সমস্ত পুরোনো বইয়ের পাতা ওল্টাতে ও পরীক্ষা দিয়ে মরতে তার বিশ্রী লাগছিল। পি-এইচ-ডি'র থিসিস লেখবার অনুমতি পাবে কিনা সন্দেহ। পেলেও মিউজিয়ামের লাইব্রেরীতে গ্রন্থকীট হয়ে নতুন দেশের দৃশ্যরাশিকে উপেক্ষা করা তার বিবেচনায় অপরাধ। অথচ সুধীদা দিনের পর দিন তাই করে যাচ্ছে। সুধীদা যদি ডিগ্রীর জন্যে পড়ত তা হলে বাদলও পড়বার উৎসাহ পেত, কিন্তু সুধীদা বিদেশী ডিগ্রীর মর্যাদা মানে না। সে যদি চাকরি করে তো দেশী ডিগ্রীর জোরেই করবে। তার অভাব অল্প; আয় অধিক না হলেও চলে।

বাদল বলে, "আমার মন চায় মনে প্রাণে ইংরেজ হতে, ইংরেজের সুখ দুঃখকে নিজের সুখ দুঃখ করতে, ইংরেজ যে যে সমস্যার সমাধান খুঁজছে সেই সেই সমস্যার

সমাধান খুঁজতে। কলেজে পড়ে আমি কতটুকু ইংরেজ হতে পারি বল? ইংলণ্ডের সব অঞ্চল দেখব, সব রকম মানুষের সঙ্গে মিশব, সব প্রচেষ্টাতে যুক্ত থাকব এই আমার মনস্কামনা।"

দে সরকার এমন পাগল দেখেনি। বিলেতে এত ছেলে আসে, কেউ ব্যারিস্টার কেউ আই-সি-এস কেউ চার্টার্ড য়্যাকাউণ্ট্যাণ্ট কেউ এঞ্জিনীয়ার হয়ে ফেরে। সকলেরই একটা না একটা লক্ষ্য আছে। এমন কি যারা ফুর্তি করতে আসে তাদেরও একটা উপলক্ষ থাকে, তারা পড়ুক না পড়ুক পড়ার ফীটা দেয় এবং পরীক্ষায় অলিখিত খাতা দাখিল করে। অবশ্য বাড়ীর লোক জানে ছেলের হঠাৎ অসুখ করেছে কিংবা ইংরেজ পরীক্ষক ইণ্ডিয়ান ছাত্রকে পাস হতে দিচ্ছে না কিংবা ফল আরো ভালো হবে বলে ছেলে এ বছরটা হাতে রেখেছে। এই সব নিষ্কর্মা ধনী সন্তানদের সকলেই রেপাব্লিকান ন্যাশনালিস্ট, কেউ কেউ দুর্ধর্ষ কমিউনিস্ট। সকলেই নিখুঁত ইংরেজী বলতে চেষ্টা করে, নিখুঁত ইংরেজী পোশাক পরে, ইংরেজ বন্ধু পেলে ধন্য হয়ে যায়। কিন্তু কেউ কি এই পাগলাটার মতো মনে প্রাণে ইংরেজ হতে চায়?

দে সরকার বলে, "আমি স্বদেশী নই, আমি সব-দেশী। ভারতবর্ষই আমার দেশ নয়, ভারতবর্ষও আমার দেশ। ও দেশের মধ্যে তুমি এমন কী দেখলে যার দরুন ওকে একেবারে অস্বীকার করলে?"

বাদল বিরক্ত হয়ে বলে, "দশটা পথের থেকে একটা পথ বেছে নিলে অন্য নয়টা আপনিই উপেক্ষিত হয়। পথিকের মনে উপেক্ষা ভাব কেন জন্মাল সে প্রশ্ন কেউ করে না। প্রকৃত প্রশ্ন হচ্ছে, পথিক তার লক্ষ্যের পক্ষে যে পথ অনুকূল সেই পথ বেছে নিয়েছে কিনা।"

দে সরকার তর্কে পরাস্ত হয়ে বলল, "জানি মশাই জানি। বাড়ী থেকে যতদিন টাকা আসতে থাকবে ততদিন ওদের যেমন কমিউনিজম তোমার তেমনি anglicism। বাপের ব্যাঙ্ক ফেল করলে কিংবা হঠাৎ স্বর্গপ্রাপ্তি হলে বড় বড় মিঞারা দেশে ফিরে মাথা মুড়িয়ে কালো মেয়ে বিয়ে করে নগদ কয়েক হাজার টাকার মূলধন হস্তগত করে যা করে থাকেন তুমিও তাই করবে। লম্বা চওড়া কথা কেন আওড়াও, যাদু? চোস্ত ইংরেজী বলতে চাও, শেখ। Correct পোশাক পরতে চাও, পর। রোস্ট বীফ খেতে চাও, খাও। কিন্তু 'মনে প্রাণে ইংরেজ হতে চাই' (দে সরকার বাদলের সুরের নকল করল)— অতখানি মৌলিকতা আমি বরদাস্ত করতে পারব না, কারণ পৃথিবীতে কেউ কোন দিন অতখানি মৌলিক হয়নি।"

বাদলের মুখ কান লাল হয়ে গেল। সে তোৎলাতে তোৎলাতে অনেক কষ্টে যা বলল তার মর্ম—পৃথিবীতে সে এর আগে জন্মায়নি; কাজেই সে অভূতপূর্ব; ভূতপূর্বদের

তার মেলে না। দে সরকার যেন নিজের সংকীর্ণ মাপকাটি দিয়ে তাকে মাপ করবার ধৃষ্টতা ত্যাগ করে। ছাতা চেনা জুতো চেনার মতো মানুষ চেনা অত সোজা নয়, ক্যালিডোনিয়ান মার্কেট পর্যন্ত যার দৌড় সে যেন সেইখানেই দাঁড়ি টানে।

এরপর দে সরকার দে চম্পট। বাদলের সঙ্গে আর তার দেখা হয় না। বাদলও লায়েক হয়ে গেছে। একলা লণ্ডনের এক মাথা থেকে আর এক মাথা অবধি যেতে পারে। পথ হারালে নিকটস্থ আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেল স্টেশন কোথায়, তার খোঁজ করে। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে বারকয়েক ট্রেন বদল করে হেণ্ডনে উপস্থিত হয়। ভারি ফুর্তি! পথ ভোলাই তো পথ চেনা। বাদল অতি সহজে এই তত্ত্বটা আবিষ্কার করে ফেলল।

৪

বাদল পৌঁছে অবধি বাড়ীতে কিংবা শ্বশুরবাড়ীতে চিঠি লেখেনি, কেবল দুটো cable করেছিল। সে যে কোনোদিন ভারতবর্ষে ছিল এ ধারণাকে তার ইংলণ্ডগত মন একদণ্ড স্বীকার করছিল না। বর্তমানকে ভোগ করতে হলে অতীতকে ভুলে থাকা দরকার। অতীতের স্মৃতির একটি কণাও যদি বর্তমানের চেতনায় লেগে থাকে তবে সেইটুকু উচ্ছিষ্ট সমস্তটা ভোজ্যকে অপবিত্র করে দিতে পারে।

জাগ্রত অবস্থায় না হয় ভারতবর্ষকে ভুলে থাকা যায়, কিন্তু স্বপ্নে তো মনে হয় ভারতবর্ষেই আছি—সেই কতকাল পূর্বের দিদিকে দেখছি তিনি হঠাৎ উজ্জয়িনী হয়ে কলকাতার বাড়ীর ছাদে বড়ি দিচ্ছেন।

এরূপ স্বপ্ন বাদলকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। এত কষ্ট করে এত সহস্র ক্রোশ দূরে এলুম, তবু এদেশের স্বপ্ন না দেখে সেই কোন পূর্বজন্মের স্বপ্ন দেখছি। বাদল স্থির করল দিনের বেলা কোন ভারতীয়ের সংস্রবে আসবে না, কোন ভারতীয় বই বা চিঠি পড়বে না, বাসা বদলিয়ে সুধীদাকে এড়াবে এবং প্রতি সপ্তাহে দেশের চিঠি এলে সুধীদাকে দিয়ে পড়াবে ও উত্তর লেখাবে।

শনিবার রাত্রে দেশের ডাক এলে অন্যান্য বার সে পড়ে তুলে রাখত, উত্তর দেবে দেবে করে দেবার সময় পেত না। সেবার যখন ডাক এল বাদল সুধীকে বলল, "সুধীদা, কাল তো রবিবার। আমার চিঠিগুলো পড়ে জবাব লিখে দিতে পারো?"

সুধী বলল, "সে কী রে! আমার জবাব ওঁরা চাইবেন কেন? উজ্জয়িনীরা তো আমার নামও শোনেননি বোধ করি।"

"শুনেছেন হে শুনেছেন। পোর্ট সৈয়দ থেকে তুমি কী একটা বিয়ের উপহার পাঠিয়েছিলে। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, কে এ কথা না জানে!"

"তা বলে আমি তোর প্রাইভেট চিঠির জবাব দেব? ছি! ছি!"

"প্রাইভেট চিঠি কাকে বলছ? মিস গুপ্তর সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তোমারও ধরতে গেলে তাই। Mere acquaintance। সাত দিনে সাত ঘণ্টাও আলাপ হয়নি।"

সুধী সস্নেহভাবে বলল, "পাগলা।"

কিন্তু সত্য সত্যই বাদল চিঠি খুলল না, তুলে রাখল না, সুধীর ঘরে ফেলে রেখে ভুলে গেল। বৃহস্পতিবার ভারতবর্ষের ডাক যাবার সময় অতিক্রান্ত হলেও যখন জবাব দিল না তখন সুধী ভীত হয়ে বলল, "বাদল, কাকামশাই অত্যন্ত ভাববেন। কাজটা ভালো করিসনি।"

বাদল বলল, "চিঠির জবাবের কথা বলছ? তুমি দাওনি? বা রে! এই নিয়ে চার সপ্তাহের চিঠি জমল।"

"চা-র স-প্তা-হে-র! করেছিস কী? আমার আজকাল দেখাশুনা করবার সময় হয় না বলে তুই অমানুষ হয়ে গেছিস? কাল সকালেই একটা cable করে দিতে হবে। কাকামশাই বড্ড ভাবেন।"

"ভালো কথা সুধীদা, তোমার মাদামকে সাত দিনের নোটিশ দিলে চলবে, না আরো বেশী দিনের? আমি Putneyতে উঠে যাচ্ছি।"

সুধী কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি ও হতবাক হয়ে রইল। বলল, "হেণ্ডন থেকে পাটনী লণ্ডনের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত তা জানিস?"

"ম্যাপে দেখেছি।"

"তবে তোর সঙ্গে রবিবারেও দেখা হবে না—শুধু যেতে আসতেই চারটি ঘণ্টা লাগে।"

"ধরে নিয়ো আমি কেম্ব্রিজে আছি।"

"হুঁ। এদিকে যে কলেজগুলো খুলে গেল। ভর্তি হবিনে?"

"নাঃ। ভেবে দেখলুম আইন পড়ব। তার মানে বার-ডিনার খাব এবং টো টো করে বেড়াব। Called যদি হই তো English Bar-এই প্র্যাকটিস করব। ইণ্ডিয়ায় আমি ফিরছিনে, ভাই সুধীদা।"

সুধীর প্রাণটা কেমন করে উঠল। যেন বাদল চিরকালের মতো পর হয়ে যাচ্ছে। এতদিন তাকে পক্ষীমাতার মতো পক্ষপুটে রেখেছিল; এখন সে বড় হয়েছে, উড়তে চাইছে।

সুধী বলল, "সম্ভব হলে আমিও Putneyতে উঠে যেতুম। কিন্তু মার্সেলকে নিয়ে একটা নতুন শিক্ষাপদ্ধতির এক্সপেরিমেণ্ট করছি। সেও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না।"

বাদল বলল, "সেই বেশ। আমি যে পরিবারে থাকব তাতে একজনের বেশী বাইরের

লোক নেবে না। তাদের জায়গা নেই, এর আগে বাইরের লোক নেয়ও নি। কেমন করে তাদের আবিষ্কার করলুম জানো, সুধীদা ?"

৫

বাদল চলে গেলে পরে বাদলের বাবাকে চিঠি লেখবার ভার সুধী বিনা দ্বিধায় নিল। কাকামশাই তারই হাতে বাদলকে সঁপে দিয়েছেন। তার চিঠির উপর তাঁর যতটা আস্থা বাদলের চিঠির উপর ততটা নেই। তিনি ভালোই জানতেন যে বাদল সাংসারিক বিষয়ে অমনোযোগী ও অজ্ঞ। দরকারী টেলিগ্রামকেও সে ছেঁড়া কাগজের ঝুলিতে ফেলে দিয়ে থাকে, রেজিস্ট্রী করে রসিদ নিতে ভুলে যায়, বাজার করতে পাঠালে দোকানদার যে দর হাঁকে সেই দর দিয়ে আসে—ওসব কথা দূরে থাক, স্টেশনে গিয়ে টিকিট কাটতে জানে না। কোনোবার বাদল যদি বা ট্রেনে ওঠে তার জিনিস ওঠে না। কোনোবার তার জিনিসপত্র যদি বা ট্রেনে ওঠে সে নিজে ওঠে না। প্রায়ই তার চশমা খুঁজে পাওয়া যায় না। বলে, "সুধীদা, তুমি দেখেছ ?" সুধী তার কান দুটো মলে কান থেকে চশমাটাকে টেনে বের করে। তখন বাদল বলে, "How funny ! চশমাটা সারাক্ষণ চোখেই ছিল, তা নইলে সেটাকে খুঁজে বেড়াবার মতো দৃষ্টিশক্তি যে থাকত না।"

এই অসহায় ছেলে বিরাট লণ্ডন শহরে অপরিচিতদের সহিত একাকী বাস করবে। সে সরকারকে যতক্ষণ সঙ্গে নিয়ে ঘুরত ততক্ষণ মোটর চাপা পড়বার সম্ভাবনা ছিল না। এখন নিষ্কর্মার মতো টো-টো করে বেড়াবে—আইন পড়া তো তিন মাসে ছয় দিন ডিনার খেয়ে আসা ?

সৌভাগ্যক্রমে সুধী ও বাদল উভয়েরই বাড়িতে টেলিফোন ছিল। সুধী প্রত্যহ একবার করে রাত্রে ফোন করে খবর নেয়। "দিনটা কেমন কাটল ?"—"বেশ চমৎকার। আজ গেছলুম Gray's Innএ ভর্তি হতে। কিছুতেই নিতে চায় না। ইণ্ডিয়ান কম নিয়ে থাকে। বললুম, আপনিও যেমন ব্রিটিশ আমিও তেমনই ব্রিটিশ। এই দেখুন পাসপোর্ট। এই Innএর উপর আমার জন্মগত অধিকার। পাসপোর্ট নাড়াচাড়া করে বলল, আপনার বাবা ম্যাজিস্ট্রেট ? তবে তো আইনের চর্চা আপনার বংশগত। তারপর ভর্তি হবার অনুমতি পেলুম। চেক লিখে দিয়েছি।"

"দিনটা কেমন কাটল ?"—"খুব ভালো, ধন্যবাদ। মিসেস উইল্‌সের সঙ্গে সারাদিন গল্প করে কাটিয়েছি। Devon, glorious Devon—সেইখানে তাঁর ও তাঁর স্বামীর জন্ম ও বিবাহ। সে আজ কতকালের কথা। তারপর এঁরা লণ্ডনে এসে স্থায়ী হন। কতরকম অবস্থা পর্যায়! ওঃ সে অনেক কথা। আজ আমাকে এক্সকিউস্ কর। গুড নাইট।"

ইতিমধ্যেই কথায় কথায় 'ধন্যবাদ' ও 'এক্সকিউস্ কর!' এই তার আত্মীয়তম বাদল।

সুধী নিজের কানকে বিশ্বাস করতে কুণ্ঠিত হচ্ছিল। তার নিজের দিক থেকে বাদলের প্রতি স্নেহ কমেনি তো? বাদল যে বড় অভিমানী ভাইটি। একবার সুধী তাকে না দেখিয়ে মাসিকপত্রে লেখা ছাপিয়েছিল বলে বাদল একরকম প্রায়োপবেশন করেছিল বললে চলে।

সুধী একদিন জিজ্ঞাসা করল, "কিরে, আমার উপর রাগ করিসনি তো?"—"না, রাগ করব কেন? এতদিন তোমার সঙ্গে দেখা করিনি বলে বলছ? রোসো, আগে মিউজিয়ামে ভর্তি হই, সেইখানেই মাঝে মাঝে দেখা হবে। রবিবারে আসতে চাইছ? অনেক দূর—অনেকগুলো চেঞ্জ। কাজ কী এত কষ্ট করে?"

এর পর সুধী বাদলকে ফোন করা কমিয়ে দিল। কাকামশাইকে চিঠি লেখবার সময় এলে জিজ্ঞাসা করে, "তোর কিছু বলবার আছে?"—"কিছুই বলবার নেই, ধন্যবাদ।"

উজ্জয়িনীর চিঠি নিয়ে সুধী মুশকিলে পড়ল। বাদল চলে যাবার পরেও সুধী উজ্জয়িনীর চিঠি খুলতে সংকোচ বোধ করল। কিন্তু দেখতে দেখতে যখন কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল তখন সুধী ভাবল উজ্জয়িনীর ধৈর্যের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। সুধী দ্বিধার সহিত চিঠিখানা খুলল।

বেশি নয়, ছোট্ট এক টুকরা কাগজ। তাতে আছে, মিস্টার সেন, বিলেতে গিয়ে আমাদের ভুলে গেছেন বোধ করি। কেমন লাগছে? কার কার সঙ্গে আলাপ হল? শুনেছি ওখানে একটা ভালো চিড়িয়াখানা আছে। আমি আপনার দেওয়া বইগুলি পড়ে ভালো বুঝতে পারিনে। অলিভ শ্রাইনারের Lyndalকে আমার বড় হৃদয়হীন মনে হয়। ইবসেন থেকে কি উপদেশ পাওয়া যায়? আমরা ভালো আছি। আজ আসি। ইতি। বিনীতা শ্রীউজ্জয়িনী।

পুনশ্চ:—ওখানে কি বড় শীত? বরফ পড়ছে বুঝি? বেশী বাইরে বেরবেন না। ঠাণ্ডা লাগলে সময়মতো প্রতিকার না করলে নিমোনিয়ায় দাঁড়াতে পারে। কিছু ফরাসী ডাকটিকিট পাঠাবেন? বাবার আশীর্বাদ জানবেন।

৬

বিবাহ সম্বন্ধে বাদল কিছু বলেনি। সুধীও জিজ্ঞাসা করেনি। সুধী জানত ব্যাপারটা যদি সুখের হত তবে বাদল আপনা থেকেই বলত। উজ্জয়িনীর বয়স কত, সে কতদূর পড়েছে, তাকে দেখতে কেমন—সুধীকে বাদল আভাসটুকুও দেয়নি। মনে মনে তার একটি প্রতিমা গড়বার পক্ষে মালমসলা তার চিঠি। সুধী কল্পনা করল উজ্জয়িনী ছোট একটি মেয়ে, বয়স তের চোদ্দ, দেখতে কিছু গম্ভীর। বেশ লক্ষ্মী মেয়েটি, সরল, শিষ্ট। লজ্জাবতীর মতো মাটিতে মিশিয়ে যাচ্ছে না, সপ্রতিভ। অল্পবয়সীর মতো চিড়িয়াখানায় কৌতূহলী অথচ

বয়সের অনুপাতে চিন্তাশীল।

কিন্তু কী লিখবে ? উজ্জয়িনীকে চিঠি লেখা Sigrid Undsetকে চিঠি লেখার থেকে কঠিন। দু'জনেই অপরিচিতা, কিন্তু একজন খ্যাতিসম্পন্না। খ্যাতিতে দূরত্ব হ্রাস করে।

সুধী লিখল :—

কল্যাণীয়াসু,

আমি বাদলের জ্যেষ্ঠ—অতএব আপনারও। বাদল নানা কাজে ব্যস্ত। তার চিঠিপত্র আমাকেই পড়তে হয়। আমি তার কেবল অগ্রজ নই, সচিব ও সখা। উপরন্ত সেক্রেটারী। সেই অধিকারে এ পত্র লিখছি। এটি আপনার পত্রের উত্তর।

বাদলের শারীরিক কুশল। সে থাকে দক্ষিণ পশ্চিমে, আমি উত্তর পশ্চিমে। সম্প্রতি কিছুকাল দেখা হয়নি, কিন্তু প্রায়ই ফোনযোগে কথাবার্তা হয়। উদ্বেগের কারণ নেই। সে ভালো জায়গাতেই আছে।

চিড়িয়াখানা এখনো দেখতে যাইনি। আমার বোন মার্সেল টিউবে কিংবা বাসে চড়লে অসুস্থ হয়ে পড়ে, জানিনে তার কী অসুখ আছে। তাকে না নিয়ে একা গেলে সে মনে কষ্ট পাবে। ভেবেছি একদিন তাকে ঘোড়ার গাড়ীতে করে নিয়ে যাব। কিন্তু লণ্ডনে ঘোড়ার গাড়ী বড় একটা দেখতে পাইনে।

ফরাসী ডাকটিকিট কাছে নেই, আনিয়ে দেব। উপস্থিত বেলজিয়ান ডাকটিকিট পাঠাচ্ছি।

আমার পত্র যদি আপনার পছন্দ হয় তো ভবিষ্যতে যে পত্র লিখব তাতে সাহিত্যের কথা থাকবে। আপনার বাবাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে আপনি আমার প্রীতি নমস্কার জানবেন। ইতি। নিবেদক

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

চিঠিখানা ডাকে দিয়ে সুধী ভাবল কনিষ্ঠাকে আপনি বলাটা ঠিক হল না। কিন্তু প্রথম চিঠিতেই বা 'তুমি' লিখি কী করে ? একে তো সে বাদলের চিঠির বদলে আমার চিঠি পেয়ে বিষম অভিমান করবে। বাদ্‌লাটা এমন পাগলা। নিজের মন নিয়ে ব্যাপৃত, পরেরও যে মন বলে কিছু আছে সে খবর রাখে না। বিয়ে করলে বদলাবে ভেবেছিলুম। কই, কোনো পরিবর্তন তো দেখলুম না। যে কে সেই। কিন্তু চিরদিন সে এমন থাকবে না, থাকতে পারে না। ইংলণ্ডের মোহ টুটলে দেশের টান দুর্বার হবেই। তখন তার স্মৃতিকে ও স্বপ্নকে আচ্ছন্ন করবে দেশরূপিণী একটি নারীমূর্তি। তখন উজ্জয়িনীর আর কোনো ক্ষোভ থাকবে না। দীর্ঘসঞ্চিত অভিমান আনন্দাশ্রুপ্রবাহে ধৌত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সুধী তার নিজের পড়া ও পড়ানোতে মন দিল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ থেকে শীতপ্রধান

দেশে গেলে গরম পোশাক পরতে হয়, গরম ঘরে থাকতে হয়, যে খাদ্য থেকে প্রচুর তাপ পাওয়া যায় তেমন খাদ্য খেতে হয়। এক কথায় নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে দেহের একটা বনিবনা ঘটাতে হয়। সুধী ভাবল, শুধু তাই? এক দেশ ছেড়ে আরেক দেশে এলুম। এ দেশের জল-স্থল-অন্তরীক্ষ পশু-পক্ষী-ওষধি-বনস্পতির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে না? শকুন্তলা আশ্রমতরু ও আশ্রমমৃগদের কাছে বিদায় নিয়েছিল, আমি আগমন সংবাদ জানাব। তোমরা ছিলে, আমি এলুম। তোমরা আমাকে স্বীকার কর, আমি তোমাদেরকে স্বীকার করি।

সুধীর পড়ার ঘরের জানালা খুললে দৃষ্টিপথে পড়ে বহুদূরবিস্তৃত মাঠ। ওর উপর উজ্জ্বল সবুজ ঘাস। ইংলণ্ডের সকল মাঠের মতো এটিও অসমতল। কিছুদূরে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উপত্যকা। একটি সেতু। Asphalt লিপ্ত রাজপথের দ্বারা যেন মাঠের কোমল গাত্র ছড়ে গেছে।

সুধী মনে মনে বলল, "তোমরা প্রতিদিন একটু একটু করে আমার অঙ্গ হবে, আমি প্রতিদিন একটু একটু করে তোমাদের অঙ্গ হব। আমি যখন ইংলণ্ড ছেড়ে চলে যাব তখন যাব অথচ যাব না। যেখানেই যাই তোমরা আমার সঙ্গে চলবে।"

৭

কয়েক দিন থেকে অনবরত টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। রবিবার। বের হবার তাড়া নেই, বের হয়ে সুখ নেই। সুধীর ঘরে কয়লার আগুন জ্বলছিল, সুধী চেয়ারটাকে আর একটু টেনে নিয়ে আগুনের উপর হাত রাখল। কনকনে ঠাণ্ডা। হাত জমে গেছে। কলম ধরে লিখতে বসলে কলম চলে না।

কাল রাত্রে উজ্জয়িনীর আর একখানি চিঠি এসেছে। উজ্জয়িনী উত্তরের জন্য দেড় মাস অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নয়। উত্তর তো যথাকালে পাবেই, এই ভরসায় সে যখন তার লিখতে ভালো লাগে তখন লেখবার অনুমতি চায়। অবশ্য বাদলের কাছে।

আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা সুধীকে আকুল করেছিল। তন্ন বিদ্যা যন্ন দীয়তে। সুধী প্রতিদিন যা আহরণ করছে তাকে মনের রসায়নে স্বকীয় করে কারুর কাছে ধরে দেবার তাড়না অনুভব করছিল। আগে ছিল বাদল। বাদলের সঙ্গে মৌখিক আলোচনায় তার চিন্তা তার কাছে স্পষ্ট হত। মুখ কী বলে কান তা শোনবার জন্য লালায়িত। হাত কী লেখে চোখ তা দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব। নিজের ভিতরে কেমন মৌচাক বাঁধা হচ্ছে মন সে বিষয়ে কৌতূহলী।

উজ্জয়িনীকে লেখার দ্বারা ডায়েরী লেখবার অপ্রীতিকর দায় এড়ানো যায়। ডায়েরীতে মাত্র একটি মন আপনাকে মন্থন করে অবসন্ন হয়। চিঠিপত্র দুটি মনের ঘাত-

প্রতিঘাত। তোমার ভাবের করাঘাতে আমার ভাবের ঘুম ভাঙবে। আমার ভাবনার ঢিল লেগে তোমার ভাবনার মৌচাক থেকে মধু ক্ষরবে।

সুধী কিছুক্ষণের জন্যে নিচে নেমে গেল। বলল, "মাদাম, মার্সেলকে সুজেৎ পিয়ানো বাজাতে শেখাচ্ছে, ভালোই। যেন উপরে উঠতে দেয় না। আমার এখন অন্য কাজ।"

উজ্জয়িনীর চিঠিখানা আর একবার পড়ল। শাদা কাগজের উপর পেনসিল দিয়ে রুল টানা। হাতের লেখাটি ঝরঝরে। অক্ষরগুলি কাঁচা। উত্তরের অপেক্ষা না করে মাঝে মাঝে চিঠি লেখবার সংকল্প জানিয়ে উজ্জয়িনী লিখছে :—

শরৎচন্দ্রের বইগুলো গোড়া থেকেই বেহাত হয়েছে। দিদিরা পড়তে নিয়ে ফেরত দেয়নি। মেজদি নাকি মাকে লিখেছে, শরৎচন্দ্রের বই খুকীর হাতে দেওয়া যায় না। তার বদলে ওকে আমি Fairy tales কিনে দেব। ইস্! তবু যদি আমার বয়স সতের না হত। আচ্ছা বলুন দেখি কেন ওরা আমাকে খুকী বলে ক্যাপায়। কেউ কেউ বলে পাগলী। আমি বাবাকে বলে দিই। বাবা বলেন, যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিসনে কিছু। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় আমি পাগলী?

এতগুলো নভেল নাটক দেখে বাবার চক্ষু স্থির। বললুম, বাবা বুঝিয়ে দাও। বাবা বললেন সময়ের অপব্যয়=আয়ুক্ষয়। এবং নাটক-নভেল পড়া=সময়ের অপব্যয়। তখন তিনি স্লেট পেন্‌সিল নিয়ে অঙ্ক কষছিলেন, তাঁর অন্যমনস্ক গাম্ভীর্য আমাকে ভয় পাইয়ে দিল। ভাবলুম এখুনি বলবেন, খুকী, বোস। সেদিন যে বলছিলুম একটা শাদা মোরগের সঙ্গে একটা কাল মুরগীর যদি বিয়ে হয় আর তাদের যদি আটটা ছানা হয় তবে ছানাগুলোর রং কী কী হবে, সেই ধাঁধার জবাব দে।

কাজ নেই বাবা মুরগীর ছানার রংএর আঁক কসে। পড়ছিলুম ইবসেনের "A Doll's House." পালিয়ে এসে বাগানে বসে শেষ করা গেল। কিন্তু অর্থ?—

উজ্জয়িনী আরো কিছু লিখে চিঠিখানার যথাবিধি ইতি করেছিল।

সুধী লিখল :—

কল্যাণীয়াসু,

মিউজিয়ামের পাঠাগারে সে দিন বাদলের সঙ্গে দেখা। কখন এসে আমার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়েছে। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে বললুম, কথা আছে, মিউজিয়ামের বাইরে চল। তার সঙ্গে একটি ভারতীয় যুবক ছিল। বাদল বলল, এঁর নাম আলী। ইনি খবর এনেছেন এঁর ও আমার বন্ধু মিথিলেশকুমারীর অসুখ। দেখতে যাচ্ছি। তুমি আমাকে টিউব অবধি এগিয়ে দিতে পারো?

পথে চলতে চলতে বললুম, বাদল, উজ্জয়িনী তোরই চিঠি চান, আমার চিঠি না। তোর কি সত্যিই সময় নেই? বাদল বলল, সত্যিই সময় নেই। মিসেস উইল্‌সের সঙ্গে

তর্ক করা, বাজার করা, নিমন্ত্রণ রক্ষা করা। মাঝে মাঝে ট্রেনে ও বাসে করে শহরে আসতে কয়েক ঘণ্টা অপব্যয় করা। এর পরে যেটুকু সময় থাকে সেটুকুতে বই কাগজ ঘাঁটা। আমি বললুম, সাতদিনে একখানা চিঠি লেখা। সত্যিই সময় নেই ? বাদল বলল, বা রে। আজ Poppy Day ; তোমার গায়ে Poppy কই ? একটি মেয়ের বাক্সে ছ'পেনী ফেলে বাদল বলল, এঁর কোটের বাটন্‌হোল্‌-এ একটি পপি পরিয়ে দিন। মেয়েটি সেই শ্রেণীর মেয়ে যারা বিদেশী পথিক দেখলে তার ইংরেজীজ্ঞান পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করতে এগিয়ে আসে, বলতে পারেন ক'টা বেজেছে ? বাদলের মুখে ইংরেজী শুনে তাকে পরীক্ষার পাস নম্বর দিল। আমার রবিঠাকুরী টুপীটি দেখে আমার ইংরেজীজ্ঞান সম্বন্ধে তার সন্দেহ দৃঢ় হল। বলল, এঁর কোটে বাটন্‌হোলই নেই। এইখানে বলে রাখি আমার ওভারকোট খাস বিলিতী নয়।—আমি বললুম, তবে পপিটি আমি আপনাকেই উপহার দিলুম।

টটনহ্যাম কোর্ট রোড। টিউব স্টেশনে বাদলকে পৌঁছে দিয়ে আমি মিউজিয়ামে ফিরলুম। তারপরে আর বাদলের সঙ্গে দেখা হয়নি। কাল আপনার দ্বিতীয় পত্র এল। দেশ ছাড়বার আগে যদি আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে আসতুম তবে আপনার পত্রের যেখানে যেখানে পারিবারিক প্রসঙ্গ আছে সেখানে সেখানে চোখ পড়বামাত্র মনের পর্দার উপর ছবি জ্বলে উঠত। দেখতে পেতুম ইনি আপনার মেজদি, ইনি আপনার মা, ইনি আপনার বাবা। পত্রের উত্তর লেখবার সময় আঁধারে ঢিল ছোঁড়ার মতো হত না।

তবে আপনাকে আমি চিনি। পত্রের বাতায়নপথে দেখেছি, কল্পনায় বাকীটুকু বানিয়ে নিয়েছি। প্রতি পত্রে আপনি স্পষ্টতর হচ্ছেন। যেন একটি চেনা মানুষ দূর থেকে নিকটে আসছেন।

ইবসেনের ডল্‌স্‌ হাউসের অর্থ কী ? আমি যতদূর বুঝি, ঘর ছিল স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই ঘর, বাহির ছিল স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই বাহির। তাঁতী তার বাড়ীতে বসে কাপড় বুনত, তাঁতিনীর সাহায্য নিত। এখন তাঁতী যায় কারখানার মজুর হয়ে, তাঁতিনী কুটীরে পড়ে থাকে। সমাজ ছিল গৃহের সমবায়। গৃহের দুটি চরণ—গৃহস্থ ও গৃহিণী। এক সময় দেখা গেল যে গৃহস্থ গৃহের ত্রিসীমানায় নেই, গৃহিণী গৃহ আগলে পড়ে আছে পুরুষ আপিসে আদালতে পার্লামেন্টে মিউনিসিপালিটীতে স্ত্রীকে অর্ধাসন দেয় না। এতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তভঙ্গ হয়। স্ত্রী দাবি করছে নূতন সামঞ্জস্য, নূতন সহধর্মিতার আদর্শ। নতুবা সে যেন একটি পুতুল। যে ঘরে তাকে রাখা হয়েছে সেটা যেন একটা খেলাঘর। সেখানে পুরুষ একটু আমোদ করবার জন্যে ক্লান্তি দূর করবার জন্যে সেবা লাভ করবার জন্যে আসে। স্ত্রীকে নিজের ভাবনায় ভাগ নিতে দেয় না ; স্ত্রীর ভাবনায় ভাগ নিতে বললে ক্লাবে বেরিয়ে যায়।

নারীর বিদ্রোহ মূলতঃ এই নিয়ে। নারী সর্বত্র পুরুষের সঙ্গিনী হবে। পুরুষশূন্য গৃহে গৃহিণী হয়ে তার সার্থকতা নেই। আমার বিশ্বাস এই হচ্ছে ইবসেন প্রমুখ মনীষীর মনের কথা।

দরজায় দুটি টুক্ টুক্ করে টোকা মারার শব্দ শুনে সুধীর ধ্যানভঙ্গ হল। সে বলল, "আয়।" কিন্তু মার্সেল দরজা খুলবামাত্র যে ঘরে ঢুকল সে মার্সেলের কুকুর "জ্যাকী"। দুই পায়ে দাঁড়িয়ে জ্যাকী সুধীর কাঁধে দুটি পা রাখল। তার জিব লক লক করছে, চোখ দুটি একবার সুধীর মুখে একবার টেবিলের উপর রাখা চিঠিতে কী যেন অন্বেষণ করছে। মার্সেল ছুটে এসে তাকে নামাবার ব্যর্থ প্রয়াসে লিপ্ত হল। বলল, "যা, যা-আ, যা।" বিরক্তিতে তার কান্না পেতে লাগল। কুকুরটা তার হুকুমে নিচে থেকে তার সঙ্গে উঠে এসেছে, তার বিনা হুকুমে ঘরে ঢুকে মিস্টার চক্রবর্তীর কোল জুড়ে বসেছে। "ওঃ। ওঃ। যায় না কেন ? যা, যা—।" রীতিমতো নরে বানরে যুদ্ধ।

নিচে থেকে সুজেৎ দৌড়িয়ে এল। খোলা দরজায় টোকা মারতেই সুধী তার দিকে তাকাল। সুজেৎ তার স্বভাবসিদ্ধ সলজ্জ হাসি হেসে বলল, "মার্সেল আপনাকে খবর দিতে এসেছিল—খাবার দেওয়া হয়েছে।"

সুধী বলল, "ওঃ তাই ? আমি ভেবেছিলুম সার্কাস দেখাতে এসেছে। আয় রে মার্সেল।"

জ্যাকী পথ দেখাতে দেখাতে চলল, সুধীরা তার অনুগমন করল।

প্রথম শীত

১

বাদলের সঙ্গে কতকাল গল্প করা হয়নি। এতদিনে তো লণ্ডনের ধারা ওর অভ্যাস হয়ে গেছে, নূতনত্বের আকর্ষণে ছুটে বেড়াবার তাগিদ তেমন প্রবল নয়, রয়ে সয়ে দেখলে শুনলে কোনো কিছু পালিয়ে যায় না। সুধী একদিন ফোন করে বলল, "বাদল, সামনের উইকেণ্ডে এ বাড়ীতে থাকবি ? জায়গা আছে"। বাদল বলল, "মিসেস উইলসের কাছে কথাটা পেড়ে দেখি।"

মিসেস উইল্‌স্‌ রাজি হলেন। অতএব বাদলও। শনিবার সন্ধ্যায় মাদামের সদর দরজায় বেল বাজল। "আমি খুলব," "আমি খুলব," বলতে বলতে মার্সেল ও সুজেৎ ছুটে এল।

বাদল পুরাতন কুটুম্বের মতো নিঃসংকোচে পাপোষে জুতো ঝাড়ল, স্ট্যাণ্ডে টুপি ওভারকোট লটকাল, লাউঞ্জে প্রবেশ করে একটা গদীওয়ালা চেয়ারে ধুপ করে বসে পড়ে আগুনের দিকে দুই হাত বাড়িয়ে দিল। তার সুটকেসটা নিয়ে মার্সেল ও সুজেৎ

কাড়াকাড়ি করছে, কেউ কাউকে সিঁড়িতে উঠতে দিচ্ছে না, দুজনেই স্বল্পভাষী বলে শুধু উভয়ের "উঃ" "আঃ" "না" ইত্যাদি অনুযোগসূচক অব্যয় শব্দ কানে আসছিল।

সুধী সেই ঘরেই বসেছিল। বলল, "ভেবেছিলুম তুই এখানে চা খাবি।"

বাদল বলল, "খাবই তো। খাওয়াও না এক পেয়ালা? অবশ্য শুধু চা, আর কিছু না। কী ভয়ানক ঠাণ্ডা।"

সুধী চায়ের কথা খাদামকে বলে এল।

বাদল বলল, "জ্বালাতন করেছে সারাদিন। তর্ক আমি করতে ভালোবাসি শুনতেও ভালোবাসি। কিন্তু কেবল বুলি, কেবল ধুয়ো, কেবল কুড়িয়ে পাওয়া ঘসা পয়সার মতো বিশেষত্ববিহীন সর্বজনব্যবহৃত বচন।"

সুধী জানত জিজ্ঞাসা না করলেও ব্যাপারটা কী তা বাদল আপনা থেকেই বলবে। বাদল বলল, "কে বলে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা সাক্‌সেস্‌ফুল হয়েছে। বি-এ এম্‌-এ পাশ করার নাম শিক্ষিত হওয়া নয়। নেতি নেতি করে ভাবতে শেখা চাই। লোকে যেটাকে সত্য মনে করছে সেটা নাও হতে পারে সত্য।"

সুধী দেখল আসল ঘটনাটা বাদলের মনের তলায় চাপা পড়ে গেছে। অনেকখানি মাটি খুঁড়লে তবে ঘটনারত্নটি উদ্ধার হবে। সুধী ভাবল, এক কোপ মেরে দেখি যদি উদ্ধার হয়।

সুধী বলল, "মিথিলেশকুমারীর সঙ্গে জোর তর্ক হয়ে গেল বুঝি?"

বাদল যেন ধরা পড়ে গেল। হঠাৎ ঘেমে বলল, "আগুনের এত কাছে বসা ঠিক হয়নি।" একটু দূরে সরে বসে বলল, "কী বলছিলে? না, মিথিলেশকুমারীর সঙ্গে না। তাঁর একটি নতুন বাহনের সঙ্গে। হা-হা-হা। দেবীদের বাহনরা তো সাধারণত চতুষ্পদ হয়েই থাকে। ভুলে যাচ্ছি কী তাঁর নাম—বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ কিংবা সেই রকম কিছু। লোকটির বহিরঙ্গ ঠিক আছে, খুব স্মার্ট পোশাক পরিচ্ছদ; চোখে প্যাঁস্‌নে। কী পড়েন জানিনে।"

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বাদল বলল, "ভালো কথা, একটা হাসির কথা তোমাকে জানাই। মিথিলেশকুমারী বধ্‌ করেছেন। শুধু তাই নয়। ছিলেন মিসেস দেবী, হয়েছেন মিস দেবী। হা হা হা।"

মিথিলেশকুমারী কে তাই সুধী জানত না। শুধু নাম শুনেছিল। জানবার আগ্রহ তার ছিল না।

বাদল বলল, "বিন্ধ্যেশ্বরীজীর ধারণা স্ত্রীস্বাধীনতা এদেশের মেয়েদেরকে মাতৃত্বের অযোগ্য করে তুলেছে। বলেন, How can a typist make a good mother? বেচারি টাইপিস্টের অপরাধ সে হাঁড়ি ঠেলে সময় কাটায় না, টাইপরাইটার খট্‌খট্‌ করে

সময় কাটায় ! কিছুদিন আগে বাবুদের বুলি ছিল—সতীত্ব গেল গেল। এখনকার বুলি মাতৃত্ব গেল গেল।"

মঁসিয়ে রান্নাঘরে মাদামের সঙ্গে কথা বলছিল। বাদলের গলা শুনে বসবার ঘরে এল। যথারীতি অভিবাদনের পর বলল, "মিস্‌তার সেনের শীতটা কেমন লাগছে ?"

বাদল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "চমৎকার !"

"চমৎকার ! এই দারুণ শীত বৃষ্টি কুয়াশা ! কয়েকদিনের মধ্যে বরফ পড়বে—"

মঁসিয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বাদল বলল, "তবে তো আরো চমৎকার হয়। ইংলণ্ডে থেকে সুইটজারলণ্ডে থাকা যাবে। স্কেট করা যাবে, শী করা যাবে।" বাদলের কল্পনা সর্বত্র বরফ দেখতে লাগল।

বাদল অন্যমনস্কভাবে বলতে লাগল, "হাঁ, ইংলণ্ডের শীতকালটা চমৎকার। খুব শীত করে বটে, কিন্তু কয়লার আগুন পোহাতে কেমন মিষ্টি লাগে ! গায়ে যথেষ্ট গরম কাপড় থাকলে বাইরে ভিজেও আরাম আছে। কুয়াশায় সামনের মানুষ দেখা যায় না, তবু আমি মাইল চারেক হেঁটে বেড়িয়েছি, কারুর গায়ে ধাক্কা লাগাইনি।"

খাবার ডাক পড়ল।

খেতে খেতে বাদল বলল, "শুনবে মাদাম, আমার কতটা উন্নতি হয়েছে ? ভারতবর্ষের মানুষ হাজার সাহেব সাজুক তার সাহেবিয়ানার অগ্নিপরীক্ষা হচ্ছে গোমাংস খাওয়া। সে পরীক্ষায় ফেল করাটাই নিয়ম, না করাটা নিপাতন। যার একে একে সব সংস্কার গেছে তার ঐ একটি সংস্কার যায় না। এই নিয়ে নিজের সঙ্গে প্রতিদিন দুবেলা লড়াই করেছি, তোমাদের এখানেও। কিন্তু জয়লাভ করলুম এই সেদিন, সেও অপরের ষড়যন্ত্রে। শুনবে ঘটনাটা ?"

সুধীর মুখে খাবার রুচছিল না। বাদল, তার বাদ্‌লা, গোমাংস খেতে শিখেছে ! কখনো বিশ্বাস হয়। না খাওয়াটা হতে পারে কুসংস্কার, হতে পারে অযৌক্তিক। তবু ভারতবর্ষের অতি দীর্ঘ ইতিহাস ও অতি ব্যাপক লোকমত কি কিছুই নয়।

২

পরদিন উপরের ঘরে বাদল ও সুধী আগুন পোহাচ্ছে। অগ্নিস্থলীর পার্শ্বে বাদলের পিতার চিঠি। কাল রাত্রের ডাকে এসেছে।

তিনি লিখেছেন, সুধী ও বাদল যেন পাশ্চাত্যের জীর্ণ কঙ্কাল বহন করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করে না। যেন পাশ্চাত্যের বাহ্য চাকচিক্যে সম্মোহিত হয় না। যাহা ভালো তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা মন্দ তাহা সর্বদা বর্জনীয়।

বাদল বলল, "জগতের ইতিহাসে কি চিরকাল এই চলতে থাকবে ?"

সুধী বলল, "কী চলতে থাকবে ?"

বাদল নিজের চিন্তায় বিভোর থেকে ভাবে, সকলেই বুঝি সেই একই চিন্তায় বিভোর। সুধীদার পাল্টা প্রশ্ন শুনে তার কাণ্ডজ্ঞান ফিরল। সে বলল, "আমি ভাবছিলুম প্রবীণের সঙ্গে নবীনের এই যে ভাবনা-বৈষম্য, এই যে দুরকম ইডিয়ম ব্যবহার করা, এর কি প্রতিকার নেই ?"

বাদল কী উপলক্ষে অমন কথা পাড়ল সুধী ধরতে পারল না। বলল, "হঠাৎ একথা তোর মনে উঠল কেন ?"

"দেখলে না, বাবা লিখেছেন, যাহা ভালো তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা মন্দ তাহা সর্বথা বর্জনীয় ? তুমি লিখলে লিখতে ও কথা ?"

বাদল অস্ফুট স্বরে আবৃত্তি করতে লাগল, "যাহা ভালো তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে।" হঠাৎ খাড়া হয়ে আলস্য ভেঙে বলল, "বাবা একটু কষ্ট করে একটা বাংলা অভিধান পাঠালে পারতেন। 'ভালো' 'মন্দ' এ দুটো কথার অর্থ কী, সংজ্ঞা কী, সীমানা কতদূর—কে আমাকে বুঝিয়ে বলবে ? বাংলা ভাষার উপর আমার তেমন দখল নেই।"

বাদল পায়চারি করতে করতে চিন্তা ও তর্ক করতে ভালোবাসে। কিছুক্ষণ বাদে বলল, "কোনো দুজন মানুষের পক্ষে একই জিনিস ভালো নাও হতে পারে একথা আমরা তরুণরা দেখে ও ঠেকে শিখেছি। এই ধর বৃষ্টি। চাষারা দুহাত তুলে আনন্দ জানাচ্ছে। বাবুরা গজ্ গজ্ করছেন। মঁসিয়ে খক্ খক্ করে কাশছে আর আমি তো খুব খুশিই হয়েছি। কিংবা ধর বরফ। অনেকে পা পিছলে পড়ে হাড়-গোড় ভাঙবে। অনেকে পিছলাতে পিছলাতে নক্সা কাটতে কাটতে স্কেট করবে। মিসেস উইলসের সঙ্গে যুদ্ধের গল্প হচ্ছিল। তিনি বললেন, কারুর পৌষ মাস কারুর সর্বনাশ।"

সুধী বলল, "তথাপি স্বীকার করতেই হবে যে 'ভালো' ও 'মন্দ' এক নয়। এবং 'মন্দ'কে ছেড়ে 'ভালো'কে নিতে হবে।"

বাদল অসহিষ্ণুভাবে বলল, "আমি বলি 'ভালো' ও 'মন্দ' একই বস্তুর দুই বিশেষণ। এবং বস্তুটির অর্ধেক নিয়ে অর্ধেক ফেলা সম্ভব নয়। হয় পুরো নিতে হবে, নয় পুরো ফেলতে হবে। এই ধর বীফ। বাবা বলবেন মন্দ, আমি বলব ভালো। তিনি পুরো বর্জন করবেন, আমি পুরো গ্রহণ করব।"

সুধী মনে গ্লানি বোধ করছিল। বলল, "তর্ক থাক্, বাদলা। অন্তত দুহাজার বছর ধরে 'ভালো' ও 'মন্দ' নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়ে এসেছে। আরো দুলাখ বছর হবে। সেইজন্যে তর্কের উপর আমার আস্থা নেই।"

বাদল তর্কের পক্ষ নিয়ে তর্ক করতে উদ্যত হয়। সুধী নিজের দুই কানে দুই হাত দিয়ে বলে, 'নন্‌ভায়োলেন্ট নন্‌কোঅপারেশন।" দুজনেই হেসে ওঠে।

বাদল আবার এসে সুধীর কাছে বসল। সুধী বলল, "কাকামশাই লিখেছেন, উজ্জয়িনী এখন থেকে তাঁর কাছে থাকবেন, এই রকম কথা চলছে।"

"বটে? আমার লাইব্রেরীটা তা হলে তাঁকে উৎসর্গ করে দেব, আমার তো ফিরে যাবার সংকল্প নেই।"

"পাগল।"

"সত্যি সুধীদা। তোমার কাছে এলে স্বপ্নের মতো মনে পড়ে ভারতবর্ষে এককালে আমি ছিলুম বটে। নতুবা ইংলণ্ডই আমার পক্ষে একমাত্র সত্য।"

"পাট্‌নীতে কেমন ঘর পেয়েছিস্? খাওয়াদাওয়া কেমন?"

"এই রকমই।"

"ঘুম কেমন হয়?"

"হয় না।"

সুধী দুঃখিত হল। বাদলের যে কোনো দিন ঘুমহানি দূর হবে সে আশা সুধীর ছিল না। সুধী বলল, "বাদল, ঘুম তোর যথেষ্টই হয়। তবু তোর কেমন একটা সংস্কার হয়ে গেছে যে ঐ ঘুম যথেষ্ট নয়। তোর রোগ আসলে ঘুমহানি নয়, ঘুমহানি বিষয়ক সংস্কার।"

বাদল বলল, "রোগটা যাই হোক আমাকে অর্ধজীবী করে রেখেছে। ইংরেজ ছেলেদের সঙ্গে যখন মিশি তখন নিজেকে মনে হয় অভিশপ্ত।"

"খুব মিশছিস নাকি?"

"খুব নয়। টট্‌নহ্যাম কোর্ট রোডের Y. M. C. A.-তে গিয়ে থাকি। ওখানকার ছেলেরা বেশীর ভাগ ব্যবসা বাণিজ্য করে। কিন্তু খেলাধুলায় প্রত্যেকের মন পড়ে আছে। ছুটি পেলেই ড্রিল, জিমন্যাষ্টিক, সাঁতার, ওয়াটারপোলো, বেস্ বল, বাস্কেট বল, ফুটবল। পড়াশুনার দিকটা কাঁচা। তা বলে দেশবিদেশের খবর কেউ কম রাখে না, সব বিষয়ে দুচারটে কথা সকলেই বলতে কইতে পারে।"

এর পর উঠল মিসেস উইল্‌সনের প্রসঙ্গ। কিন্তু উঠতে না উঠতেই নীচের তলা থেকে সোরগোল শোনা গেল।

৩

এতদিন পরে মঁসিয়ে দ্য সারকার এসেছেন, তাই নিয়ে আনন্দকলরোল। জনপ্রিয় দ্য সারকার একে bow করছেন, ওর করমর্দন করছেন, সুজেতের করপৃষ্ঠে চুম্বন রাখছেন, মার্সেলকে কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

সিঁড়ির উপর দুটি স্তম্ভীভূত নরমূর্তি দেখে দে সরকার বলল, "নেমে আসুন, নেমে আসুন, মশাইরা। গ্যালারীতে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখছেন নাকি?"

মাদাম বলল, "আজ কিন্তু আপনাকে যেতে দিচ্ছিনে, মঁসিয়ে। এইখানে খেতে হবে, গল্প করতে হবে।"

মঁসিয়ে (মাদামের স্বামী) বলল, "হাঁ মঁসিয়ে, আজ আপনাকে আমরা ছাড়ছিনে। কাল মিস্তার সেন এসেছেন, আজ আপনি।"

বাদল যে এ বাড়ীতে ছিল না দে সরকার সে কথা জানত না। কিন্তু নিজের অজ্ঞতা ফাঁস করে দেওয়া দে সরকারের স্বভাব নয়। তার ওভারকোট খুলে দিতে মঁসিয়ে এগিয়ে এল, সুজেৎ তার টুপি চেয়ে নিল, দে সরকারের আপত্তি কেউ গ্রাহ্য করল না।

মঁসিয়ের সঙ্গে সিগ্রেট বিনিময় হয়ে গেলে দে সরকার সুধীকে বলল, "এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিষায়। আমার কিছু বলবার আছে।"

সুধী বলল, "বলতে আজ্ঞা হোক।"

"এমন দুর্যোগে দিশী খিচুড়ি খেতে নিশ্চয়ই আপনাদের—না অন্তত আপনার—মন চায়। মিস্টার সেন অবশ্য ইংরেজ।"

বাদল বলল, "মাঝে মাঝে মুখ বদলাতে ইংরেজেরও আপত্তি নেই।"

সুধী বলল, "কিন্তু খিচুড়ি পাই কোথা?"

"সেই কথাই তো নিবেদন করতে যাচ্ছি। মশাইরা যদি দয়া করে গরীবের গ্যারেটে পদার্পণ করেন তবে আমি স্বহস্তে খিচুড়ি রেঁধে খাওয়াই। তবে আমার হাতে খেলে যদি জাত যায়—"

দে সরকারের দুষ্টুমি বাদলকে হাসাল। সে বলল, "তবে আমরা কিছু গোবরের জন্যে ভারতবর্ষে চিঠি লিখব।"

"তা যদি বলেন গোরু এদেশেও দেখা যায়। কিন্তু মিস মেয়ো আমাদের বদনাম রটিয়েছে যে অপরে খায় গোরু আর আমরা খাই গোবর। সেই থেকে রক্ত টগবগ করছে। যাক ও কথা। খিচুড়ি খাবেন গরীবের গ্যারেটে? এ বেলা নয় ও বেলা।"

বাদল বলল, "রাজি। আমার জীবনে এমন সুযোগ তো আসে না।"

সুধী বলল, "মাদামকে খবরটা দিয়ে রাখতে হবে।"

দে সরকার বলল, "ফোন নম্বর জানা থাকলে ফোন দ্বারা নিমন্ত্রণ করতুম। অবশ্য ত্রুটি মার্জনা করবেন। এতখানি আসা কি কম হাঙ্গাম? টিউব, বাস, শ্রীচরণ। কবে এরোপ্লেনের দাম কমবে, আমাদের দুঃখ দূর হবে!"

বাদল দরদের সহিত বলল, "বাস্তবিক।" যদিও এরোপ্লেনের কর্কশ গুঞ্জন বাদলের হেণ্ডন ত্যাগ করার অন্যতম কারণ ছিল।

বাদল জানত না দে সরকার তার উপর রাগ করে তাকে এতকাল বর্জন করেছিল, সুধীও জানত না। দে সরকারের সঙ্গে যে আর দেখা হয় না এটা অত্যন্ত স্বাভা

লণ্ডনে কে কার খবর রাখে ? বিরাট শহর—কলকাতার আটগুণ বড় । যার সঙ্গে একবার কোনো সূত্রে আলাপ হয়ে যায় তার সঙ্গে দ্বিতীয় বার দেখা হয় না ।

বাদল বলল, “আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটা একটা মিরাক্ল, মিস্টার দে সরকার !”

দে সরকারের রাগ পড়ে গেল ! সে বানিয়ে বলল, “আপনার সঙ্গে সন্ধি করবার জন্যেই এতদিনে এ বাড়ীতে আসা । আগে আসিনি বলে মাফ করবেন ।”

খোকা বাদল বুঝতে পারল না যে দে সরকারের সম্প্রতি বান্ধবীবিচ্ছেদ ঘটেছে, তাই সে স্বজেতের সন্ধানে এসেছে । বাদল বলল, “আগে এলে আমাকে পেতেন না । আমি পাটনীতে উঠে গেছি ।”

দে সরকার বিস্মিত হল । কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করা দে সরকারের স্বভাব নয় । সে বলল, “ওঃ পাট্‌নী ! চমৎকার জায়গা ! পাট্‌নী হীথ—খোলা ময়দান । সুখে আছেন । সেবার পাট্‌নী হীথে বেড়াতে বেড়াতে—”

৪

দে সরকার বিনয়বশত গ্যারেট বলেছিল বটে, কিন্তু ঘরখানি তার সুধীর ঘরেরই মতো উপরতলার একটি ঘর ।

দে সরকার বলল, “বসুন । অমন করে কী দেখছেন ? এই ঘরখানার প্রত্যেক ইঞ্চির একটি করে ইতিহাস আছে । ঐ চেয়ারখানিতে একজন বসত, ঐ ওয়ালপেপার একজনের পছন্দ মতো বসানো, ঐ টাইমপীস একজনের উপহার ।”

বাদল ফস করে জিজ্ঞাসা করে পরে জিভ কাটল, “ঐ একজনটি কে ?”

“সে কি একটি ? তিনজনের উল্লেখ করলুম, মিস্টার সেন । কিন্তু মিস্টার সেন কেন বলছি ? আপনাকে তো আগে ‘সেন’ ও ‘তুমি’ বলতুম ।”

বাদল সতর্ক হয়ে নিয়েছিল, কৌতূহল জ্ঞাপন করল না । ‘Sunday Times’ ওল্টাতে লাগল । সুধী ও দে সরকার খিচুড়ির উদ্যোগ করতে বসল ।

দে সরকারের কাবার্ডে ডাল, চাল, নুন, ঘী (মাখন) ইত্যাদি মজুত ছিল । ‘Barber's Bellatee Bungalow’ থেকে খরিদ করা । কিছু বড়ি বেরিয়ে পড়ল দেশ থেকে প্রেরিত । দে সরকারের ভাণ্ডারে আদা, লঙ্কা, গোলমরিচ, হলুদ ইত্যাদি এত রকম রসদ ছিল যে বহুতর ভারতীয় আহার্য প্রস্তুত করা যায় ।

সুধী সুধাল, “আপনি কি প্রায়ই এই সব করেন নাকি ?”

“প্রায়ই । ঐ একটা বিষয়ে আমি এখনো খাঁটি বাঙালী আছি । দেশের ধর্ম বদলাক, সমাজ বদলাক, স্বরাজ হোক, সোভিয়েট হোক, কিন্তু আমাদের সনাতন রন্ধনকলাটি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে ।”—সকলে হাসল ।

দে সরকার পাকা রাঁধুনি। সুধীও মন্দ রাঁধে না। দুজনে মিলে দেখতে দেখতে খিচুড়ি, আলুর দম ও পায়েস বানাল এবং বড়ি ভাজল। পড়ার টেবিলটা খাবার টেবিলে রূপান্তরিত হল, ওর উপর তিন গ্লাস জল রইল, কোথা হতে একটা ফুলদানীতে করে কিছু carnation ফুল উড়ে এসে জুড়ে বসল। কাবার্ড থেকে চাটনী নামল।

দে সরকার বলল, "সেনের খুব অসুবিধা হবে জানি—ছুরি কাঁটা নেই। তবে হাত ধোবার সময় গরম জল জোগাতে পারব।"

বাদলের অসুবিধা হচ্ছিল না বটে, কিন্তু খাবারের গায়ে আঙুল ছোঁয়াতে কেমন-কেমন লাগছিল, যেন আঙুল অশুচি হয়ে যাচ্ছে। খোশগল্প করতে করতে খাওয়া যখন শেষ হল তখন সুধী বলল, "এমন তৃপ্তির সহিত ভোজন বহুদিন থেকে হয়নি।"

দে সরকার বলল, "এবার দক্ষিণা দিতে হবে নাকি, ঠাকুর?"

"দিন। এদেশে দক্ষিণা দিয়ে ভোজন করতে হয়, দক্ষিণা নিয়ে ভোজন করা ইংলণ্ডের মাটিতে আমিই প্রবর্তন করি।"

দে সরকার একটি তিন পেনি মুদ্রা বাক্স থেকে বের করল। আমাদের দুয়ানি আকারের রজতখণ্ড। বলল, "ঠাকুর, গত বড়দিনের নিমন্ত্রণে একজনদের বাড়ী থেকে এইটি অর্জন করে এনেছিলুম—আমার ভাগ্যে উঠেছিল। সৌভাগ্যের নিদর্শন বলে এটিকে। আসল মানুষটিকেই যখন হারালুম তখন এটিকে কাছে রেখে কেন স্মৃতিকে আঁকড়ে থাকব? আমি স্মৃতিভারমুক্ত হতে চাই।"—এই বলে তিন-পেনি-খণ্ডটি সুধীর হাতে গুঁজে দিল।

ঘরের ইলেকট্রিকের আলো হঠাৎ নিবিয়ে দিয়ে সুধী বলল, "বলুন আপনার কাহিনী।" সুধী বুঝতে পেরেছিল দে সরকার নিজের কাহিনী কারুকে বলতে না পেরে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে বাস করছে।

দে সরকার বলল, "ভয়ে বলব, না, নির্ভয়ে বলব?"

"নির্ভয়ে।"

"তবে এই শর্তে বলব যে আপনারাও আপনাদের কাহিনী বলবেন।"

"উত্তম।"

দে সরকার আরম্ভ করল :—

"আমার জীবনে একটার পর একটা প্রেম আসে আর আমাকে ধরাশায়ী করে রেখে যায়। আমার কাজকর্ম যায় চুলোয়, আমার জীবনের ব্রত হয় ভঙ্গ, আমাকে আবার গোড়া থেকে গড়তে হয়।"

"ভাঙা মেরুদণ্ড নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ানো কল্পনা করতে পারেন? কী অসীম সহিষ্ণুতাসাপেক্ষ সেই পুনরুত্থান। ভাঙা হাড় জোড়া লাগে, উঠে দাঁড়াই, চলি। আবার

লণ্ডভাণ্ড। আর পারিনে। তবু পারি। মানুষ যে কত পারে তার ধারণা তার নিজের নেই। এই জন্যেই তো আমার সন্দেহ হয় যে মানুষ আত্মবিস্মৃত সর্বশক্তিমান। আত্মবিস্মৃত ভগবান।"

বাদল বাধা দিয়ে বলল, "ঐখানে আমার আপত্তি। ভগবান একটা fallacy, যেমন আত্মবান একটা myth."

দে সরকার বলে চলল—

"স্কুলজীবনের প্রেমকে আপনারা বলবেন calf-love. আমার ভালো মনেও পড়ে না। এক এক জনের জীবন কী দীর্ঘ! আমি যেন সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আছি। নিজের বাল্যকাল নিজের কাছে সত্য যুগের মতো পুরাতন।

"কলেজে পড়বার সময় যাকে পেলুম তার আসল নাম বলব না, আপনারা বাংলা মাসিকপত্রে প্রায়ই তার নাম দেখতে পান—"

বাদল বাধা দিয়ে বলল, "আমি তো বাংলা মাসিকপত্র ভুলেও পড়িনে, আমার কানে কানে বলুন না?"

"পড়েন না সেটা আপনাদের সেকেলে সাহেবিয়ানা, সেই প্রাঙ্‌মাইকেল যুগের। লর্ড সিংহের মতো লোক যা পড়েন আপনি তা পড়েন না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা—যাতে থাকে আপনি তা পড়েন না। Shame!"

সুধী উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, "বাদলকে ভুল বুঝবেন না, দে সরকার। বাংলা সাহিত্য ওর বেশ ভালো করে পড়া আছে এবং রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ বই ওর লাইব্রেরীতে। কিন্তু বাংলা মাসিকে ও চিন্তার খোরাক পায় না। বলে, 'জল-মেশানো চিন্তা'। বাস্তবিক, আমাদের শ্রেষ্ঠ ভাবুকরা ভালো জিনিস ইংরেজীতে লিখে খেলো জিনিস বাংলাতে লেখেন। তা যাক, আপনি আসল নাম নাই বা বললেন। ধরে নিলুম তাঁর নাম পদ্মিনী দেবী।"

দে সরকার হেসে বলল, "পদ্মিনী নারী বললে অত্যুক্তি হবে হয়তো। পদ্মিনী দেবীই বলব।…

"পদ্মকে পেলুম আমি যখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ি। থার্ড ইয়ারটা ছাত্র সমাজের অলিখিত আইন মেনে scrupulously ফাঁকি দিয়েছি। ফোর্থ ইয়ারে ক্লাসের ধুরন্ধর ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করছি, কি হে, বিশ্ববিদ্যালয় কী কী বই পাঠ্য নির্দেশ করেছে? ভাবছি কেমন করে আরম্ভ করা যায়, সেকেণ্ড ক্লাস অনার্সটা তো পেতেই হবে।…

"ক্লাসের শেষ সারির বেঞ্চির খানিকটে আমার রিজার্ভ করা। সেইখানে বসে আমি গল্প ও কবিতা লিখি। সর্বসম্মতিক্রমে ঐ আমার স্টুডিও। পাশের ছেলেরা আড্ডা দেবার সময় পরস্পরকে বলে, এই, আস্তে। দেখছিসনে উনি লিখছেন? প্রথম প্রথম ওরা

চেষ্টা করেছিল আমার ধ্যান ভাঙাতে। কিন্তু আমি বললুম, আড্ডা আমি দুবেলাই দিয়ে থাকি, প্রমাণ চান তো আসুন আজ সন্ধ্যায় । কিন্তু কাজের সময় কানের কাছে ঢাক বাজালেও আমি টলব না। ওরা হাল ছেড়ে দিল। তারপর থেকে ওরা আমার বন্ধু।…

"আমাদের বেঞ্চিতে আমরা অন্ত কারুকে বসতে দিইনে । কিন্তু একদিন দেখলুম সামনের সারি থেকে একজন আমার পাশের ছেলেটির সঙ্গে জায়গা অদল বদল করেছেন। বললেন, এখন থেকে এইখানেই বসব, আপনার আপত্তি আছে ? বললুম, থাকলে আপনি শুনবেন কেন ? তিনি বললেন, ছি ছি, রাগ করবেন না । আপনি সাহিত্যিক, আপনি তরুণ, আপনি বিদ্রোহী—শ্রদ্ধা করি বলেই তো কাছে এসেছি। ছেলেটিকে দেখতে বড় মধুর। লাজুক নয়, সপ্রতিভ। কিন্তু তার মনের স্বপ্ন তার দেহের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে।…

"আমি জিজ্ঞাসা করলুম আপনার নামটি জানতে পারি ? সে বলল, অবশ্য। আমার নাম মৃত্যু।…বাপ-মায়ের রাখা নাম, না, নিজের দেওয়া নাম ?…দুইই । ওঁরা বলেন মৃত্যুঞ্জয়, আমি বলি মৃত্যু। মৃত্যুকে জয় করতে পারে কেউ ? মৃত্যুই জেতা।…

"একদিন মৃত্যু বলল, একখানা কাগজ বার করছি। বার করছি ঠিক না। আমাদের পারিবারিক কাগজখানাকে জগতের করছি। মাতৃগর্ভে শিশু চিরকাল থাকে না, থাকলে জগতের প্রতি অন্যায় হয়। আমি বললুম, অন্ত সময় খুঁজে পেলেন না ? পরীক্ষার খড়্গ মাথার উপর ঝুলছে।…দুর্ভিক্ষের দিনেও শিশু ভূমিষ্ঠ হয় । প্লাবনের রাত্রে ঘর ভেসে গেছে, গাছের উপর নারী আশ্রয় নিয়েছে, সেখানেও শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে।…

"বাংলা মাসিকপত্রের প্রথম সংখ্যা বারো মাসের যে কোনো মাসে বেরতে পারে। এমন কি চৈত্র মাসেও কোনো কোনো কাগজের বর্ষারম্ভ হয়েছে জানি। মৃত্যুর কাগজের প্রথম সংখ্যা বেরবে আশ্বিন মাসে—প্রথম থেকেই পুজার সংখ্যা। সেজন্যে আমার লেখা চাই। আমি সাহিত্যিক, আমি তরুণ, আমি বিদ্রোহী। জিজ্ঞাসা করলুম, আর কার কার কাছে লেখা চেয়েছেন, মৃত্যুবাবু ? উত্তর হল, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেশ সেনগুপ্ত—আমি বাধা দিয়ে বললুম, নরেশ সেনগুপ্ত তরুণ নাকি ? মৃত্যু বলল, বয়সের ওই মুখোসখানা তো প্রকৃত নয়, প্রাকৃতিক। কুমারবাবু, আপনিও জড়বাদী হলেন ?…"

বাদল চুপ করে শুনছিল। আর থাকতে পারল না। বলল, "আপনি কি জড়বাদী, না, Vitalist, না, অধ্যাত্মবাদী ?"

দে সরকার রসিকতা করে বলল, "আমি বিসম্বাদী । অর্থাৎ আমি বাদী মাত্রেরই সঙ্গে বিবাদ বাধাই । আমি কিছু মানিনে, কিছুতে বিশ্বাস করিনে, আমার কোনো লেবেল নেই।"

বাদল উচ্ছ্বাস গোপন করতে না পেরে বলল, "ঠিক আমার মতো।"

দে সরকার নির্দয়ভাবে বলল, "মোটেই না । আমি জাতীয়তাই মানিনে। আপনি

স্বজাতীয়তা ত্যাগ করে বিজাতীয়তা বরণ করেছেন। আমার বাড়ী Cosmopolis, সে জায়গা কোথাও নেই। আপনার বাড়ী লণ্ডন।"

বাদলের মুখখানা লাল হয়ে গেল কি কালো হয়ে গেল অন্ধকারে দেখা গেল না। কিন্তু সুধী তো বাদলের নাড়ী-নক্ষত্র জানে। সে অনুমানে বুঝে বলল, "গল্পটা আমার বড় ভালো লাগছিল। এইবার পদ্মিনী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে—সর্বগুণান্বিতা অনবদ্য সুন্দরী। নিন, খেই ধরিয়ে দিলুম।"

৫

দে সরকার বলল, "আশ্চর্য্য, তখন অনবদ্য সুন্দরীই মনে হত বটে ; দয়াধর্ম বলে একটা জিনিস তো আছে। মনটা এখনকার মতো বিশ্লেষণশীল হয়নি। কিন্তু কী বলছিলুম? মৃত্যু আমাকে একদিন একরাশ লেখা দিয়ে বলল, 'দেখে দাও না।' মৃত্যুদের বাড়ীর সকলেই লেখক, মায় বেড়াল কুকুর পর্যন্ত। ঠাকুর পরিবারেও এমনটি দেখা যায় না। ইনি কে হে, মৃত্যু? ··ওঃ! উনি? আমার পটল মামা; আমাদের বাড়ীতে থেকে ডাক্তারি পড়েন। · আর ইনি?···রাঙা পিসির কথা জিজ্ঞাসা করছ? ওঁর জোরেই তো কাগজ বার করছি। আমার সমবয়সী ও মন্ত্রী।...মৃত্যুদের বাড়ীর সকলের নাম-পরিচয় একে একে জানলুম। তখন ওঁদের সঙ্গে মেশবার কৌতুহল জাগল। বললুম, মৃত্যু, এ সব মূল্যবান document আমার মেসে থাকলে বেহাত হবে, নাম বদলে অন্যেরা ছাপবে। একটা আপিস কর। মৃত্যুদের বৃহৎ বাড়ীর এক কোণে আমাদের আপিস বসল। সাইনবোর্ড খাটানো গেল—'কনীনিকা। বয়ঃকনিষ্ঠদের মুখপত্র।'"

এবার সুধী বাধা দিয়ে সুধাল, "কই, নাম শুনেছি বলে মনে হয় না তো?"

দে সরকার উত্তর করল, "আমাদের প্রথম সংখ্যাই হল শেষ সংখ্যা আর বর্ষারম্ভ হল বর্ষশেষ। তার কারণ মৃত্যু বেচারা মৃত্যুমুখে পড়ল।"

বাদল বলে উঠল, "আঃ হাহা!"

দে সরকার গলাটা পরিষ্কার করে বলল, "মৃত্যু যে দিন প্রথম তাদের ওখানে আমাকে নিয়ে গেল সেদিন আমাকে আপিস ঘরে বসিয়ে রেখে ভিতরে প্রত্যেককে বলতে বলতে চলল, মা গো, সেই বিখ্যাত লেখক—(চা খেতে বল) রাঙা পিসি, সেই তরুণ লেখক—(সেই যিনি অশ্লীল লেখেন?) শৈলেন, সেই স্টাইলিস্ট্ লেখক—(আচ্ছা, আমি আসছি তাঁর কাছে)।"

বাদল আন্দাজ করে বলল, "সেই রাঙা পিসিটিই পদ্ম, না?"

"তিনিই। তবে তাঁর নাম পদ্ম নয় আসলে।

"ঘনিষ্ঠতার বিলম্ব হল না। দুএকদিন পরে তাঁর সঙ্গে যেই প্রথম দেখা হয়েছে অমনি ফস

করে বলে বসলুম, আপনার কাছে একটা নালিশ আছে। নালিশটা আপনারই নামে। পদ্ম একটু একটু কাঁপছিল। কী নালিশ? আপনি নাকি বলেছেন আমি অশ্লীল লিখি? পদ্ম থতমত খেয়ে বলল, কে বলেছে? মৃত্যুঞ্জয়? তার পরে ক্রমশ তার লজ্জা ভাঙল। আমার কবিতা পড়ে সে প্রথম জানল যে তার মতো সুন্দরী আর নেই, সেই এ যুগের হেলেন, বেয়াত্রিচে, এমিলিয়া ভিভিয়ানী। পদ্মর স্বামী তাকে বিয়ে করেই স্বর্গে চলে যান—সেই থেকে পদ্ম এতদিন তাঁর ফোটো পূজা করে আসছিল। কিন্তু ফোটো তো ফিরে পূজা করে না। পূজার ক্ষুধা পদ্মর আমি মেটালুম। তখন আমার ফোটো পদ্মর বাক্সে উঠল।…

"ইতিমধ্যে বেচারা মৃত্যুর হল অকাল-মৃত্যু। কাগজ গেল সহমরণে। কোন সূত্রে ওদের বাড়ী যাই? তখন একটা ছল আবিষ্কার করলুম। মৃত্যুর যাবতীয় লেখা সংগ্রহ করে বই করে বার করব। বাংলা সাহিত্যে মৃত্যুর স্মৃতি থাকবে। পদ্ম লিখবে মৃত্যুর জীবন কথা। আমি লিখব ভূমিকা।…

"ছ মাসের মধ্যে আমরা পরস্পরের অন্তর্যামী হলুম। যতক্ষণ দেখা হয় না ততক্ষণ মরে থাকি। দেখা হলে এত খুশি হই যে সব সময়টা বাজে বকি। সেও মিষ্টি লাগে। নমো নমো করে বি-এ পরীক্ষা দিলুম, কোনোমতে ডিগ্রীটা পেলে বাঁচি।…

"অবশেষে পদ্মকে লিখলুম, নী—, প্রেমকে স্থায়ী করবার উপায় পরিণয়। তার সময় আসেনি কি? পদ্ম জবাব দিল না। লিখলুম, নী—, আমাদের দুজনের জীবনকে করে তুলব একখানি উপন্যাস। দুজনে মিলে একখানি জীবনোপন্যাস লিখব—নিখিলের কথা, বিমলার কথা, তোমার একটি পরিচ্ছেদ, আমার একটি পরিচ্ছেদ, এমনি করে অসংখ্য পরিচ্ছেদ। পদ্ম জবাব দিল না।…

"যে দিন তার সঙ্গে দেখা হল তার চোখে দেখলুম জল টলমল করছে। তার কাঁচা সোনার মতো রং, চাঁপা ফুলের মতো শাড়ী, ঋজু তরুর মতো গড়ন, শুকতারার মতো চাউনি। সে আমার স্ত্রী; সে আমার ভবিষ্যৎ; সে আমার যশ ও লক্ষ্মী, সন্তান ও সার্থকতা। এক নিমেষে বহু দিবসের সৌধ টলে পড়ল, তার কয় বিন্দু অশ্রুর মতো।…

"পদ্ম বলল, আমার শ্বশুরের মাথা হেঁট হবে, আমার শাশুড়ী অভিসম্পাত দেবেন। তা ছাড়া আমাদের জাত এক নয়।…

"কানের ভিতর দিয়ে গলানো সীসে মরমে প্রবেশ করল। আমার বাবা তার শ্বশুর নন, আমার মা তার শাশুড়ী নন, এঁদের প্রতি তার কর্তব্য নেই। জাত! আপনারা বাংলা নভেল পড়েছেন—মিস্টার সেনও। তাতে নায়ক নায়িকার জাত লেখা থাকে না, তবু বাঙালীর সমাজে জাত প্রবলভাবে আছে। বাংলা খবরের কাগজের ছত্রে ছত্রে লেখে, 'জাতির অপমান', 'জাতির সংকল্প'; তবু জাতি বলে কিছুই নেই। আছে জাত। ধর্ম

বদলাতে পারি, পেশা বদলাতে পারি, মিস্টার সেনের মতো দেশ বদলাতে পারি, কিন্তু জাত বদলানো যায় না।···

"ইংলণ্ডে পালিয়ে এলুম। লিখে কিছু পাই। বন্ধুরা চাঁদা করে কিছু পাঠায়। আর প্রেম নয়, পুরুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে, কাজ। Man of action হতে হবে—Clive-এর মতো, Cecil Rhodes-এর মতো, Henry Ford-এর মতো, Lenin-এর মতো।···

"কিন্তু মানুষ প্ল্যান করে, আর বিধাতা বলে যদি কেউ বা কিছু থাকেন তিনি প্ল্যান ভাঙেন। অন্তত প্রেম সম্বন্ধে আমি destiny মানি গ্রীকদের মতো। প্রেম আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার দাস নয়। সে আমার কথা না শুনে পালায়, আমায় খবর না দিয়ে আসে। কিন্তু আজ কি আপনাদের সময় হবে, ভাই চক্রবর্তী ও সেন? বারোটার আগে না উঠলে টিউব পাবেন না। ট্যাক্সি করে বাড়ী ফিরতে হবে।"

৬

সুধী এতক্ষণ নির্বাক ছিল। হঠাৎ দে সরকারকে জিজ্ঞাসা করল, "পদ্মর খবর পান?"

"মাঝে মাঝে। পদ্ম চিঠি লেখে, পদ্মদের বাড়ীর অনেকেই চিঠি লেখেন। আমি সর্বত্র জনপ্রিয়।"

"টেণ্টারটন ড্রাইভেও। কিন্তু আমাদের সুজেৎটিকে ভোলাবেন না, দোহাই আপনার।"

"পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দিলে আগুন কী করবে?"

"না, না। ওটি বড় নিরীহ, বড় সরল। ওকে একটু প্রশ্রয় দিলেই বিয়ের স্বপ্ন দেখবে, গৃহলক্ষ্মী হবার স্বপ্ন। যে স্বপ্ন ভাঙবেই সে স্বপ্ন জাগাবেন না।"

সুধী একটু থেমে বলল, "মেয়েদের পক্ষে ষোল সতের ও ছেলেদের পক্ষে উনিশ কুড়ি বড় বিপজ্জনক বয়স। ও-বয়সে মানুষ বিনা বিবেচনায় দেহ ও মন বিলিয়ে দিতে পারলে বাঁচে। পদ্মর বয়স যদি তখন ষোল-সতের হত আপনি হাত পেতে আশার অতিরিক্ত পেতেন। জাত কুল শ্বশুর শাশুড়ী তাঁর মনেই উঠত না।"

দে সরকার বলল, "নিয়তি।"

জল পড়ছিল না, কিন্তু আকাশ ঘোলাটে হয়ে রয়েছিল। মেঘ ও কয়লার ধোঁয়া মিশে ঐ অপরূপ রং। রবিবারের রাত্রি—সিনেমা হতে লোকজন বাড়ী ফিরছে।

মাটির নীচে স্টেশন। টিকিট-উইণ্ডো পর্যন্ত গিয়ে দে সরকার টুপী তুলল।—"চীয়ারিও।"

সুধী বলল, "পুনর্দর্শনায় চ। মাঝে মাঝে লাঞ্চের সময় বিরক্ত করব।"

"ওঃ! নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি যদি বাড়ী না থাকি ল্যাণ্ডলেডীকে বললেই আমার ঘরে পৌঁছে দেবে। কাল আসবেন? বুড়ীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। দেড়টার আগে আসবেন দয়া করে।"

বাদল চিন্তায় মগ্ন ছিল। কখন বিদায় নিয়ে কেমন করে ট্রেনে চড়ল তার নজর ছিল না। বাদল ভাবছিল, প্রিয়জনকে পাবার জন্যে মানুষ ধর্ম বদলাতে পারে, পেশা বদলাতে পারে, কিন্তু জাত বদলাতে পারে না। তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা না রেখে জন্মসূত্রে তোমার জাত নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, সে নির্দেশের উপর আপীল চলে না। Determinism! মানুষের এর চেয়ে অসহায়ত্ব আর কী হতে পারে। দে সরকার বলে, নিয়তি! আমি হলে কী বলতুম? বলতুম, কাপুরুষতা।

৭

মিসেস উইলসের বয়স সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে। নিঃসন্তান। চোখে কৌতুকের স্থির বিদ্যুৎ। শরীর দেখে মনে হয় না যে কিছুমাত্র বল আছে। কিন্তু একাকী সকল গৃহকর্ম করেন, দাসী রাখেননি। পোশাক পরিচ্ছদে সৌখীন। অবসর পেলেই নতুন জামা তৈরি করতে বসেন কিংবা পুরোনো জামাকে নতুন চেহারা দিতে।

বাদলের সঙ্গে latch key ছিল। সদর দরজা খুলে মিসেস উইলসের কাছে হাজিরা দিতে গেলে মিসেস উইলস বললেন, "এই যে বার্ট্। কখন এলে?"

"এইমাত্র আসছি, মিসেস উইলস।"

"তারপরে? উইকেণ্ড সুখে কাটল?"

"মন্দ না। ধন্যবাদ। কেবল ঘুমটা—"

"জানি। ভালো হয়নি। কিন্তু তর্ক-বিতর্ক কেমন হল?"—মুচকি হেসে বললেন, "ঐ তো তোমার প্রাণ।"

বাদল উৎসাহ পেয়ে বলল, "শুনবেন, মিসেস উইলস? কাল থেকে ভাবছি কোন উপায়ে ইণ্ডিয়ার থেকে কাস্ট্ উৎপাটন করা যায়। ভেবে দেখলুম ও হচ্ছে সেই শ্রেণীর গাছ যার শিকড়ে কুড়ুল মারলে কুড়ুল ভেঙে যায়। ক্যালিফর্নিয়ার সেই বিরাট বনস্পতি আর কী।"

মিসেস উইলস চোখে হেসে বললেন, "হাল ছেড়ে দিলে?"

"মোটেই না। গাছের গোড়ায় উই পোকার চাষ করব। ভিতর থেকে মাটি আলগা হয়ে গেলে বনস্পতি চিৎপাত। শুনুনই না উপায়টা।"—বাদল আর গোপন করতে পারছিল না। ধীরে ধীরে বুঝিয়ে বলার মতো ধৈর্য ছিল না তার। এক একজন ছাত্র

থাকে মাস্টার মহাশয় ক্লাসের অন্য কোন ছাত্রকে প্রশ্ন করলে অনাহূতভাবে দাঁড়িয়ে বলে, "আমি বলব, মাস্টারমশাই ?" অনুমতির অপেক্ষা না করে প্রশ্নের উত্তরটি বলে দেয়।

বাদল সোল্লাসে বলল, "Electrification।"—উত্তরটা ঠিক হল কি না জানবার জন্য কান পেতে রইল।

মিসেস উইলস তাঁর সেলাই থেকে মুখ না তুলে বললেন, "Electrical engineering পড়তে যাচ্ছ নাকি ?"

"ঠাট্টা করছেন ? কিন্তু সবটা শুনুন আগে। ইণ্ডিয়াতে যথেষ্ট কয়লা নেই বলে যথেষ্ট রেলওয়ে নেই, যথেষ্ট ফ্যাক্টরী নেই। ইংলণ্ড কিংবা জার্মানীর মতো তাড়াতাড়ি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালইজড্ হতে পারছে না। শুধু কয়লার অভাবে একটা দেশ জগতে পারিয়া হয়ে রয়েছে। অথচ জল থেকে তড়িৎ সংগ্রহ করবার সুযোগ ও-দেশে অপরিশেষ।"

"তা হলে ও-দেশে আর অন্ধকার থাকল না দেখছি।"

"কী করে থাকবে ? গ্রামে গ্রামে ফ্যাক্টরী। এখন মাত্র ৩৭ হাজার মাইল রেল লাইন। ভবিষ্যতে ৩৭ লক্ষ মাইল ; যে পারিপার্শ্বিক জাতিপ্রথাকে লালন করেছিল সে মরে যাবে, কাজেই জাতিপ্রথাও।"

এইবার একটু গম্ভীর হয়ে মিসেস উইলস বললেন, "মা মরে গেলেও ছেলে বেঁচে থাকে, বার্ট্। এখনো এদেশে শ্রেণীপ্রথা আছে।"

বাদল বলে ডাকতে অস্বস্তি বোধ হয় বলে বাদলকে এঁরা বার্ট্ বলে ডাকতেন। এই ইংরেজী নামকরণ বাদলের সম্পূর্ণ মনঃপুত হয়েছিল। 'সেন'-টাকে কোনমতে 'স্মিথ' করা যায় না বলে তার আক্ষেপ ছিল।

এক একটা আইডিয়া বাদলকে নেশা পাইয়ে দেয়। লোকে পাগল বলে ক্ষেপাবে, নতুবা সে ট্রেনে আসবার সময় উপনিষদের মতো ঘোষণা করতে করতে আসত, শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ···। মগজের চায়ের কেটলিতে আইডিয়ার বাষ্প গর্জন করছে, সেই আরব্য উপন্যাসের দৈত্যকে ভব্যতার ঢাকনা দিয়ে কতক্ষণ সায়েস্তা রাখা যায় ? স্টেশন হতে বাস, বাস হতে বাসা—বাদল অতি কষ্টে পা দুটোকে সংযত করে মিসেস উইলসের work-room-এ পৌঁছল।

এ বাড়ীর প্রত্যেক ঘরেই তার অবাধ প্রবেশাধিকার। বাদলের বয়সের তুলনায় তাকে ছোট দেখায়, তার মুখে বড় বড় কথা শুনতে এই নিঃসন্তান দম্পতির কৌতুক বোধ হয়। সে চোখ বুজে ঠিক সময়ে বিল মেটায়, অনুরোধ করবামাত্র কৃতার্থ হয়ে ফরমাস খাটে, মিসেস উইলসের সঙ্গে বাজার করতে গিয়ে বাজার বয়ে আনে, মিসেস উইলসের ছুঁচে সূতো পরিয়ে দেয়। এমন মানুষকে ঘরের মানুষের অধিকার দিতে

বিলম্ব হয় না।

আরো আশ্চর্যের কথা, বাদল মিসেস উইলসের প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়ে তাঁর চিঠিপত্র লিখে দিত—সেই বাদল, যে নিজের পিতাকে ও নিজের স্ত্রীকে চিঠি লেখার সময় করে উঠতে পারত না। মিসেস উইলসের কোন ধরতে ধরতে কত লোকের সঙ্গে তার আলাপ হয়ে গেছে। চিঠি লিখতে লিখতেও। একজন হবু ইংরেজের পক্ষে এ কি সামান্য লাভ ?

বাদল দিবা-স্বপ্ন দেখত। দশ বৎসর কেটে গেছে, বাদল প্র্যাকটিস জমিয়ে তুলছে, এতদিন অমুক K. C'র জুনিয়ার ছিল, এবার স্বতন্ত্র হয়েছে। এখন Temple অঞ্চলে তার আফিস, পিকাডিলী কিংবা সেণ্টজেমস অঞ্চলে তার ক্লাব—সেইখানে সে সোমবার থেকে শনিবার অবধি বাস করে। তার বাসার ঠিকানা জানতে চাও তো Who's Who খুলে দেখ। ক্লাবের নাম পাবে। রবিবারটা সে Country-তে কাটায়, Dorsetshire-এ তার কুটির আছে—"far from the madding crowd." সেখানে সে আইন আদালত ভুলে বই লেখে, গল্‌ফ্ খেলে। ততদিনে Moth Aeroplane সস্তা হয়েছে—বাদল তাব নিজের এরোপ্লেনে চড়ে গ্রামে যায় ও শহরে আসে।

বিরহিণী

১

বাদলকে বিদায় দিয়ে এসে উজ্জয়িনী চিন্তা করবার সময় পেল প্রথম।

জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনাগুলো যেন আপনা থেকে ঘটে যায় মানুষকে সাক্ষী করে। পরম মুহূর্তগুলির উপর মানুষের কর্তৃত্ব যেন কথার কথা। কোথায় ছিল উজ্জয়িনী, কোথায় ছিল বাদল। কেমন করে একদিন তাদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে হয়ে গেল ভাবতে বসলে অবাক হয়ে যেতে হয়। সে কি সহজ কথা ! একটি দিনে জীবনের এত বড় পরিবর্তন কি আর আছে ! বাইরের লোক ঢাক ঢোল পিটিয়ে বাজি পুড়িয়ে ভালোমন্দ খেয়ে ও খাইয়ে অন্তরের এই গভীর সত্যটাকে রূপক আকারে ব্যক্ত করতে চায়।

তবু উজ্জয়িনীর কেমন যেন মনে হতে লাগল বিয়ে তার হল না। অতলস্পর্শী পরিবর্তনের ভাব তার অন্তরে কই ? সে তো সেই উজ্জয়িনীই আছে, মোটের উপর। উৎসবের ত্রুটি হয়নি, রাশি রাশি উপহার এসেছে, শাড়ি ও বই এত এসেছে যে পরে ও পড়ে শেষ করতে দুটি বছর লাগবে। গহনা যা এসেছে তা নিয়ে গহনার দোকান খোলা যায়।

যে মুহূর্তে সে তার স্বামীকে দেখল প্রথম, সে মুহূর্ত তার স্মৃতির আকাশে উষারাগের মতো কখন মিলিয়ে গেছে, কেননা তারপরে ফুটেছে দিনের পর দিন বাদলের সঙ্গে

পরিচয়ের দিবাদীপ্তি। উজ্জয়িনী স্বভাবত গম্ভীর, বাদল স্বভাবত লাজুক অথচ বাচাল। বাদলকে একবার যদি কোনো উপায়ে কথা কওয়ানো যায় তবে সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে একটানা ও একতরফা বাক্যালাপ চালায়। কেবল ইংলণ্ড, ইংলণ্ড, ইংলণ্ড। কতদিনে সেখানে পৌঁছবে, আধুনিক যুগের কোন কোন চিন্তানায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, কোন অঞ্চলে চাষাদের ফার্মে থাকবে, কোন কোন ফ্যাক্টরীতে শখের অ্যাপ্রেন্টিস হবে, পায়ে হেঁটে ল্যাণ্ডস এণ্ড থেকে জন্‌-ও-গ্রোট্‌স যাবে—এমনি হাজারো জল্পনা। বাদলের উচ্চাভিলাষ যেমন সংখ্যাতীত তেমনি তুলনাতীত। একদিন বলছিল, "গায়ে যদি আর একটু জোর থাকত তা হলে ইংলিশ চ্যানেলটা পার হবার জন্যে জাহাজের সাহায্য নিতে লজ্জা বোধ করতুম।" উজ্জয়িনী যখন চেপে ধরল, তখন বাদল চট্‌ করে উত্তর করল, "সাঁতার কেটে পার হব এমন কথা আমি বলিনি। খুব সম্ভব এরোপ্লেন চালিয়ে পার হতুম।"

বাদলের সঙ্গে এক ঘরে ও এক বিছানায় রাত কাটাতে উজ্জয়িনীর ভারি আশ্চর্য লেগেছিল। আশ্চর্যের ভাব পুরাতন হবার আগেই বাদল দেশ ছাড়ল। বাদলের দেশ ছাড়াতে উজ্জয়িনীর যে স্বাভাবিক বিষাদ, সেই বিষাদের দ্বারা চাপা পড়লেও মাঝেমাঝে আশ্চর্যের ভাব উজ্জয়িনীকে অভিভূত করে। সে নিজেকে বারম্বার প্রশ্ন করে, "সত্যি? সত্যি? সত্যি? সত্যি? সত্যি?…"

একটুখানি সান্নিধ্য। তবু কী অপরূপ আবেশ এনে দেয়। দিদিদের সঙ্গে এক বিছানায় কতবার শুয়েছে। কিন্তু এমন অদ্ভুত বোধ হয়নি। তার কারণ বুঝি এই যে, বাদল অপরিচিত আর দিদিরা চিরপরিচিত? কিংবা এই যে, বাদল তার স্বামী?

স্বামী কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করতে উজ্জয়িনী সরমে শিহরিত হয়। বন্ধু পাবে, সেই আশায় সে বিয়ে করেছিল। কিন্তু বিয়ের পরে বন্ধুর কথা গেল ভুলে। মনে রইল যার কথা সে তার স্বামী।

উজ্জয়িনীর মনে হ'ল এই ক'দিনে তার বয়স যেন দশ-বছর বেড়ে গেল। যেন তাকে আর বোকা মেয়ে বলা চলে না, খুকী নাম বেমানান হয়। তার স্বামীর সান্নিধ্য তাকে কোন মন্ত্রশক্তির দ্বারা বিজ্ঞ করে দিয়ে গেছে। এখন সে অনেক কিছুর অর্থ বোঝে। এই অতি-পরিচিত অতি-অবজ্ঞাত পৃথিবী যেন এই প্রথম তার চোখে পড়ছে। রাত্রের আকাশের দিকে চেয়ে মনে হয়, কী একটা ভাষায় কী যেন লেখা রয়েছে, নেহাৎ হিজিবিজি নয়। তারাগুলো এক একটা হরফ।

কিন্তু কোনো এক বিষয়ে মন বসে না। তারার কথায় মনে পড়ে বাদলও জাহাজে বসে এই তারাই দেখছে। কিন্তু বাদল কি উজ্জয়িনীর কথা ভুলেও ভাবছে? তার লক্ষ্যের দিকে সে যত দ্রুত গতিতে ছুটেছে উজ্জয়িনীকে পিছনে রাখতে রাখতে যাচ্ছে তত বেশী।

বাদলের জীবনে কি বিয়ে ব্যাপারটা কিছুমাত্র দাগ কেটেছে? উজ্জয়িনী যেমন তাকে স্বামী বলতে রোমাঞ্চিত হয় সেও কি উজ্জয়িনীকে স্ত্রী বলতে পুলক পায়? প্রেম শব্দটা উজ্জয়িনী বইতে পড়েছে, তার যে কী অর্থ কেমন প্রকৃতি সে কথা উজ্জয়িনীর বোধগম্য হত না, এখন যেন কতকটা হয়—অন্তত তার একটা লক্ষণ হচ্ছে সঙ্গকামনা। বাদলের প্রাণে এমন কামনা কখনো জাগে না কি? নিশ্চয়ই জাগে না, জাগলে কি বাদল সারাক্ষণ ইংলণ্ডের ধ্যান করত?

বাদল যে উজ্জয়িনীকে স্ত্রী ভাবে না, ওকথা সে প্রকারান্তরে জানিয়ে গেছে বইয়ের গায়ে উজ্জয়িনী গুপ্তের নামাঙ্কন করে। কোনো দিন মিস গুপ্ত ছাড়া অন্য কোনো নামে ডাকেনি। একদিন তো বাদল খোলাখুলি বলেওছিল, "বিয়ে না করলে বিলেত যেতে পাব না বলেই বিয়ে করছি। আর বিলেত না যেতে পেলে আমার জিনিয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে। এতদিন যে এদেশে আছি এই এক ট্র্যাজেডী।"

অন্য কোনো মেয়ে হলে অভিমান করত অথবা অপমানে কেঁদে ফেলত, কিন্তু উজ্জয়িনীর বাদলের প্রতি অনুকম্পাই হল। আহা, বেচারা বিয়ে না করে করেই বা কি! এত বড় প্রতিভাশালী যুবকের প্রতিভা যে বিলেত না গেলে খুলবে না। রবি ঠাকুর, জগদীশ বসু, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু—ভারতবর্ষের প্রত্যেক মহাপুরুষের যৌবন বিলেতের বাতাস লেগে মঞ্জরিত হয়েছে।

বিয়েটা যেন উজ্জয়িনী একা করল, বাদল নামমাত্র বর হল। উজ্জয়িনীর সিঁথেয় সিঁদুর উঠল ও হাতে নোয়া। তবু অন্তরে সে কুমারীই থেকে গেল। কেবল অন্তরে কেন, দেহেও।

২

বাদল চিঠি লিখবে মাঝে মাঝে, এমন প্রত্যাশা উজ্জয়িনীর ছিল। তাদের সম্বন্ধটা দাম্পত্যের না হোক, বন্ধুত্বের না হোক, ভদ্রতার তো বটে।

উজ্জয়িনী বম্বে থেকে চিঠি না পেয়ে বিচলিত হল না। মনকে বোঝাল, সময়ের অভাব। বিদেশ যাত্রার উত্তেজনা। ট্রেন থেকে নেমে জাহাজ ধরা তো হেসে দুলে কোঁচা সামলে ধীরে সুস্থে হবার নয়। বাদলের সঙ্গে উজ্জয়িনীরও বম্বে অবধি যাওয়া উচিত ছিল, অন্তত উজ্জয়িনীর বাবার কিংবা শ্বশুরের। তাঁরা যে যেতে চাননি তা নয়, বাদলই তাঁদেরকে নিরস্ত করেছে, বলেছে ইংরেজের ছেলেরা যখন ঐ বয়সে সিবিলিয়ানী করতে কিংবা ওর থেকে কম বয়সে ব্যবসা করতে ভারতবর্ষে আসে তখন ওদেরকে এগিয়ে দেবার জন্যে কেউ মার্সেলস অবধি আসে না। কলকাতা থেকে বম্বে এক দৌড়ের মামলা, সঙ্গে একটা চাকর যাচ্ছে সেই যথেষ্ট বাড়াবাড়ি, অন্য কেউ যদি যান তবে

বাদলের পৌরুষ লজ্জা পায়।

বাদল বম্বে পৌঁছে দুই গুরুজনকে দুখানা টেলিগ্রাম করল, কিন্তু উজ্জয়িনীকে না। অভিমান করা উজ্জয়িনীর স্বভাবের অঙ্গ নয়। উজ্জয়িনী হাসতেও জানে না, কাঁদতেও জানে না, মনের দুঃখ নীরবে পরিপাক করে। তার মুখ দেখে বোঝা যায় না সে কী ভাবছে, কিসে ভুগছে। সেইজন্যে তো তার সমবয়সিনীরা তাকে সন্দেহ করে। তারা সাধারণ মানুষ—হাসে, হাসায়, কাঁদে, কাঁদায়, গল্প করে, দুষ্টুমি করে, ঝগড়া যেমন করেও তেমনি ভোলেও। উজ্জয়িনীর মনের নাগাল পায় না বলে তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, উজ্জয়িনীটা কেবল যে বোকা তাই নয়, তার পেটে পেটে অনেক বিদ্যে।

উজ্জয়িনীর মনের গড়ন জানতেন একমাত্র তার বাবা। তাঁরই কাছে উজ্জয়িনীর গভীরতম ভাবনা-বেদনা-আবেগ-অভিলাষ স্টেথোস্কোপের মুখে বুকের স্পন্দনের মতো ধরা পড়ে যেত। উজ্জয়িনীর মনের য্যানাটমি তাঁরই একার আয়ত্ত ছিল। কিন্তু বিয়ের পর থেকে উজ্জয়িনীর মনের আড়ালে যে-সব কামনা ও যে-সব খেদ জমতে লাগল সে সকলের ডায়গ্নসিস যোগানন্দের সাধ্যাতীত। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি নিতান্তই হাতুড়ে।

তা ছাড়া উজ্জয়িনীও তাঁর কাছে তেমন প্রাণ খুলে কথা কয় না, লজ্জা বোধ করে। অথচ লজ্জা না ঢাকা দিয়েও পারে না, সে যে আরো লজ্জার কথা। বাবার কাছে তার কিছুই গোপন ছিল না, এখন থেকে একটি বিষয়ে মিথ্যাচরণ হল। বাদল সম্বন্ধে তার উৎকণ্ঠা নেই অনুমান করে যোগানন্দ ভাবলেন, আহা, নেহাৎ ছেলেমানুষ। স্বামী কি জিনিস বোঝে না বলেই কাঁদে না।

বলেন, "বাদল বোধ হয় এতদিনে এডেন পৌঁছে গেছে রে, বেবী।"

উজ্জয়িনী অসংকোচে বলে, "সে কী করে সম্ভব? এই তো সেদিন গেলেন।"

যোগানন্দ ভাবেন, তাই তো। আমাদের বয়সে আমরা একটা দিনকে একটা যুগ মনে করতুম। শনিবার চিঠি আসার বার, বৃহস্পতিবার থেকে পোস্টম্যানের পায়ের শব্দ শুনতুম। রবিবারটা ছিল আমাদের সত্যিকারের Sabbath; সেদিন মেঘদূত ছাড়া অন্য পিছু পড়তুম না, খবরের কাগজ পর্যন্ত না। বিলেত যখন যাই তখন তো কতবার কত ছলে cable করতুম ও করাতুম। হায় রে! কত দুঃখই না পেয়েছি!

যোগানন্দের স্মৃতি বিশ বছর পেছিয়ে গেল। উজ্জয়িনীর স্মৃতি গেল মাত্র সাতদিন পেছিয়ে। আজ বৃহস্পতিবার। গত বৃহস্পতিবার বাদল ছিল। এখন যে সে কত দূরে, দশ হাজার মাইল দূরে কি দশ মাইল দূরে—তার হিসাব হয় না।

কাছে থাকা ও কাছে না থাকা, এই দুয়ের মাঝখানে যে ব্যবধান সে ব্যবধান এতই অসীম যে পরিমাপের দ্বারা তাকে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রমাণ করলে তজ্জনিত দুঃখ কমেও না বাড়েও না।

উজ্জয়িনী দেয়ালের দিকে চেয়ে টিকটিকির শিকারপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করছে, না ক্যালেণ্ডারের প্রতি চোরা চাউনি ক্ষেপণ করছে যোগানন্দ টের পাচ্ছেন না। তিনি ভাবছেন অল্প বয়সে বিয়ে করা দেহের পক্ষে অহিতকর হলেও মনের পক্ষে তপস্যার কাজ করে। সেইজন্যে বিবাহের অব্যবহিত পরেই বিরহের ব্যবস্থা দিতে হয়। আমাদের সমাজে এই ব্যবস্থাই এককালে প্রচলিত ছিল, তখন এক বাড়ীতে থেকেও স্ত্রী-পুরুষের কতখানি দূরত্ব ছিল আজকালকার স্বামী-স্ত্রীরা শুনলে বিশ্বাস করবে না। সেই দূরত্বকে যদি ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর হত তবে তো বাল্যবিবাহনিরোধের প্রয়োজন থাকত না।

৩

বিয়ের পূর্বাহ্ন থেকে উজ্জয়িনীর জানা ছিল যে, বাদল বিদেশ-যাত্রী, উজ্জয়িনী তার যাত্রাপথের একটা মাইলস্টোন মাত্র। সহযাত্রিণী নয়, অতিক্রমণীয়া। সেইজন্যে বিদায়কে সে যথাসম্ভব সহজ করে এনেছিল।

তবু তার বিশ্বাস ছিল না যে, বাদলকে বিদায় দিয়ে সে বিবাহপূর্বের যুগে ফিরে যেতে পারবে। কলকাতা থেকে বহরমপুরে ফিরে যাওয়া তো বর্তমান থেকে অতীতে ফিরে যাওয়া নয়। উজ্জয়িনী দশ দিনে দশ বছর বেড়েছে, স্মৃতির থেকে মুছে গেলেও এই দশটি দিন বনাম বছর মনের অন্তরালে অক্ষয়।

বাদল চলে যাবার পর উজ্জয়িনী নিজের অনুভূতির খবর নিয়ে অবাক হয়ে গেল। সে মূর্ছাও যায়নি, মরেও যায়নি, প্রিয়বিরহকে প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ করে নিয়েছে। তার জীবনে বাদলের থাকাটার স্থান পূরণ করেছে বাদলের না থাকাটা। সে এক হিসাবে ফিরেই গেছে বইয়ের রাজ্যে, তারার দেশে, পশুপাখীর সংসারে।

থেকে থেকে যখনি বাদলের সান্নিধ্যের স্মৃতি জাগে তখনি উজ্জয়িনী উতলা হয়। তারপরে যথাপূর্বং। শুধু চিঠির বার এলে মিথ্যা আশায় ভোরের আগে ওঠে। ছল ছল চোখে সপ্তর্ষির দিকে চেয়ে থাকে। হয়তো চিঠি আসবে না। পুনরায় আশাভঙ্গ। দিনের আলোয় সকলের সামনে যে কান্না কাঁদতে পারবে না শেষরাত্রের আকাশতলে বসে সেই কান্না সাঙ্গ করে রাখে।

কত সপ্তাহ কেটে গেল, চিঠি এল না। যোগানন্দের নামে cable এল দুই তিনবার, কিন্তু উজ্জয়িনীর নামে কিছুই না। কেবল শ্বশুরের চিঠিতে এল বাদল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা। মহিম লিখলেন, “মা গো, বাদলের সবিশেষ জানিয়ে আমাকে সুখী কোরো। তারের খবরে প্রাণ ভরে না।”

যোগানন্দও বিস্মিত হন। বাদল কি তাঁর কন্যাকে ভালোবাসে না? ভালোবাসলে তো এত মোটা চিঠি লিখত যে চিঠিখানা নির্ঘাত বেয়ারিং হত। এবং বেয়ারিং চিঠি

কখনো পথে হারায় না।

যোগানন্দ বাদলকে চিঠি লিখলেন ভালোবাসা জানিয়ে। মেয়েকে সান্ত্বনা দেবার ছল খুঁজলেন, কিন্তু উজ্জয়িনী তাঁকে সে অবসর দিল না। বলল, "তোমার এত উৎকণ্ঠা কেন বল তো বাবা? ভালো আছেন সে খবর তো পেলে। মামুলি চিঠি তাঁর কাছে তোমার আশা করাই অন্যায়। যখন প্রেরণা পাবেন তখন তিনি চিঠি লিখবেন দেখো।"

বাদলের প্রেরণার অপেক্ষায় যোগানন্দ অধৈর্য হয়ে উঠলেন, মহিম প্রমাদ গণলেন, পরস্পরের মধ্যে যে পত্রবিনিময় চলল তার ধুয়া এই যে, ছেলেটা হয়তো বকেই গেল। এমন সময় তাঁরা পেলেন সুধীর চিঠি। আশ্বস্ত হলেন। যোগানন্দ ভাবলেন, হাঁ, সাইলেণ্ট ওয়ার্কার বটে, চিঠিপত্র লিখে নিজেকে বিক্ষিপ্ত করতে চায় না। মহিম ভাবলেন, কার ছেলে সেটা মনে রাখতে হবে তো। বিয়ে করেছে বটে, কিন্তু কর্তব্য অবহেলা করে বৌকে প্রেমপত্র লেখে না।

সুধীর লেখার মধ্যে সুধীর পরিচয় পেয়ে যোগানন্দের তাকে সহজেই মনে ধরল। মহিম তো সুধীর কতকালের কাকামশাই—সুধী তাঁর ছেলের অভিন্নহৃদয় বন্ধু, কাজেই তাঁর কাছে ছেলের দোসর। সুধী যে পরামর্শ দেয় তাই সুপরামর্শ, সুধী যে কথা বলে তাই সত্য কথা।

যোগানন্দ ও মহিম বাদলের চিঠি সুধীকেই লিখলেন, সুধীর চিঠিতে বাদলের চিঠির স্বাদ মেটালেন। বাকী থাকল উজ্জয়িনী। বাদল যে সুধীকে দিয়ে তাকেও চিঠি লেখাবে এমন কথা তার মনে উঠল না। বাদল যদি তাকে ভুলেই গিয়ে থাকে তবু সে বাদলকে দোষ দেবে না, বাদলের যদি কোনো দিন তাকে মনে পড়ে সেই সুদিনের প্রতীক্ষা করবে, তার প্রতি বাদলের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

হঠাৎ একদিন উজ্জয়িনীর নামে চিঠি এল। বাদলের হাতের লেখা উজ্জয়িনী চিনত। বাদলের হাতের লেখা নয়। সুধীর হাতের লেখাও উজ্জয়িনী দেখেছে। সুধীরই হাতের লেখা বটে।

উজ্জয়িনী চিঠিখানি খুলবে কি না চিন্তা করল। সে তো বাদল সংক্রান্ত সংবাদের প্রার্থী নয়। তবে কেন সুধীর চিঠি খুলবে? সুধীর সঙ্গে তার পরিচয়ও নেই। কোন অধিকারেই বা সুধীর চিঠিকে স্বীকার করে নেবে?

কিন্তু জীবনে প্রতিদিন নতুন মানুষের আগমনী বাজে না। সুধীর হাতের লেখাই তো সুধীর পরিচয়-পত্র। গোটা গোটা অক্ষর, একটু ডান দিকে টান, কোনোটাতে কালির পরিমাণ বেশী-কম হয়নি, সমস্তটিতে আত্মসমাহিত প্রসন্ন অন্তঃকরণের ছাপ। উজ্জয়িনী এমনি হস্তাক্ষর আরো দেখবে এই আকাঙ্ক্ষায় চিঠিখানি অবশেষে খুলল।

৪

উজ্জয়িনী যদি স্বভাবত অভিমানিনী হত, তবে বাদলের উপর রাগ করে সুধীর চিঠি ছিঁড়ে ফেলত, ছুঁড়ে ফেলত, মন থেকে ঝেড়ে ফেলত। পৃথিবীর অন্য সবাইকে সেক্রেটারী দিয়ে চিঠি লেখান যায়, কিন্তু—মরি মরি কী রুচি!—স্ত্রীকেও!

কিন্তু উজ্জয়িনীর মান-অপমান-বোধ তেমন তীব্র ছিল না। বাদলের উপর তার কিসেরই বা অধিকার! বিয়েটা বাদলের পক্ষে বিলেত যাওয়ার সামাজিক পাসপোর্ট; না হলে চলে না বলেই সংগ্রহ করতে হয়েছে। বিলেতে নিরাপদে পৌঁছবার পর বাদল কি তার পাসপোর্টখানা কোন বাক্সে তুলে রেখেছে তা মনে করে রেখেছে? বিশেষত বাদলের যে ভোলা মন! অল্প কয়েক দিনের পরিচয়ে বাদলের এ দিকটা উজ্জয়িনীকে মাঝে মাঝে হাসিয়েছে—অবশ্য মনে মনে হাসিয়েছে। একথা মনে পড়ে যাওয়ায় তার আর একবার হাসি পেল। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো যে কত কথা মনে পড়ে গেল।

যতই মনে পড়ে যায় ততই কান্না পায়। বাদলকে সে ভালোবেসেছিল। অন্তত বাদলকে তার ভালো লেগেছিল। ('ভালো বেসেছিল'—একথা মনে মনে স্বীকার করতেও তার কী লজ্জা!) বাদল যখন তার স্বপ্নলোক থেকে বাস্তব লোকে অবতরণ করেছিল, তখনকার সেই দিনগুলি কত ছোট ছোট ঘটনা, কথোপকথন ও ভদ্র ব্যবহার দিয়ে এক একটি বছরের মতো সুদীর্ঘ ও সুপুর্ণ বোধ হয়েছিল। বাদল হয়তো পাথর, কিন্তু উজ্জয়িনী কুমারী মেয়ে। বাদলের সান্নিধ্য তাকে কখনো ভাবাবেশময়ী, কখনো সচকিতা, কখনো স্নেহমমতায় পরিপূর্ণা করে তুলত। সমস্তই বাদলের অজ্ঞাতসারে। বাদলের পক্ষে যা মামুলী কথা উজ্জয়িনীর কানে তাই কেমন সুধাবর্ষণ করত। উজ্জয়িনী মনে মনে সেই সকল এলোমেলো কথাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখত, বিস্মৃতির মরচে ধরে নষ্ট হয়ে যেতে দিত না।

কিন্তু বাদল যেদিন চলে গেল সেদিন থেকে উজ্জয়িনীকে বিরহ-বেদনায় উদাস করল। বাদলের সঙ্গে তার সেই মধুর অতীত তার যতবার মনে পড়ে যায়, ততই মন টন টন করে—তাজা ক্ষতের উপর আঙুল লাগলে যেমন করে। প্রকৃতিগত আত্মরক্ষণেচ্ছা উজ্জয়িনীকে শেখাল বিস্মরণের কৌশল। উজ্জয়িনী অতীতকে চাপা দিতে লাগল ভবিষ্যতের দোতলা তেতলা চারতলার তলায়। বাদল কাল এডেনে পৌঁছবে, পৌঁছেই চিঠিখানা ডাকে দেবে, চিঠিখানা চলে আসবে সেই দিনের বোম্বাই-মুখী জাহাজে। তা হলে একদিন দুদিন তিনদিন চারদিন···সাতদিনের দিন চিঠিখানা উজ্জয়িনীর হাতে এসে পড়বে। আগ্রহাতিশয্যে উজ্জয়িনী দিনগণনায় গোঁজমিল দেয়। শনিবারের পর সোমবার, বুধবারের পর শুক্রবার, এই তার গণনার রীতি।

বার বার আশাভঙ্গের পর সে আশা করতে ছাড়ল না বটে, কিন্তু নিরাশার সঙ্গে

আপোস করে নিতে শিখল। বাদলের চিঠি আসে তো ভালোই, না আসে তো মন্দ কী। এমন তো একদিন ছিল যখন বাদল তার জীবনে ছিল না। এখন বাদল তার জীবন থেকে চলে গেছে ভাবতে তার প্রাণে সয় না বটে, কিন্তু চলে যাবার অধিকার যে বাদলের আছে সে তো অস্বীকার করা যায় না।

বাদল পৃথিবীর কোথাও না কোথাও এই মুহূর্তে আছে এবং বেশ সুস্থই আছে। সুধীর চিঠি থেকে এটুকু জানতে পাওয়া তার যথালাভ। এইজন্যে চিঠিখানা খুলে সে অন্যায় করেনি। নইলে পরপুরুষের চিঠি খুলতে তার সংস্কারে পীড়া লাগত। হোক না কেন বাদলের অদ্বিতীয় বন্ধু।

সুধীকে সে মনে মনে সাধুবাদ দিল। কিন্তু উত্তর দেবে কি না স্থির করতে তার বহু দিন ও বহু রাত্রি, বহু চিন্তা ও বহু অনিদ্রা লাগল। বাদলকে সে একরকম চেনে বলে চিঠি লিখতে সাহস পেয়েছিল, কিন্তু সুধীন্দ্রবাবু না জানি কত বড় বিদ্বান ও কত বেশী বয়স্ক। তাঁকে তাঁর উপযুক্ত সম্ভ্রম দেখানো কি সহজ কথা। উজ্জয়িনীর চিঠিগুলি যে তিনি পড়েছেন এই ভাবতে উজ্জয়িনী ঘেমে ওঠে। পড়ে নিশ্চয়ই দুষ্টু হাসি হেসেছেন, ভেবেছেন কী ছেলেমানুষ! কী নির্বোধ। তাঁর অপরাধ কী। উজ্জয়িনী নিজেও তো তার একমাস আগের আমি'র সঙ্গে আজকের আমি'র তুলনা করতে কুণ্ঠিত হয়। এই দু'এক মাসে সে কি কম বদলেছে, কম বেড়েছে। চেহারায় তার তেমন পরিবর্তন হয়নি ; তবে সিঁথিতে সিঁদুর ওঠা মেয়েদের জীবনে একটা মস্ত ঘটনা। তাতে কেবল কপালকে রাঙায় না, কপোলকেও রাঙায়। মুখাবয়বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে একটি অনির্দেশ্য শ্রী গড়িয়ে পড়তে থাকে, পারদের মতো চঞ্চল। এই চোখে তো এইমাত্র চিবুকে, এইমাত্র ভুরুতে তো এইমাত্র অধরে।

সুধীর প্রথম পত্রের উত্তর দেবার আগে তার দ্বিতীয় পত্র এসে পড়ল। তাই নিয়ে উজ্জয়িনী হল আরো বিব্রত। বাদল যেন পণ করেছে উজ্জয়িনীকে চিঠি লিখবে না। না লেখে নাই লিখুক, কিন্তু সুধীকে দিয়ে লেখানোর আবশ্যকটা কী ছিল। উজ্জয়িনী চেয়েছিল চিঠির ভিতর দিয়ে বাদলের সঙ্গ। বড় বড় সমস্যার মীমাংসা তো চায়নি, যদি বা চেয়ে থাকে তবে সে চাওয়াটা কেবল বাদলকে চিঠি লেখার একটা অবলম্বন জোগাতে ; পাছে বিষয়ের অভাবে বাদল চিঠি লিখতে গা না করে। বড় বড় সমস্যার সমাধান তো এল, কিন্তু কই তার মধ্যে বাদলের গলার স্বর, বলার ভঙ্গী, ডান হাতের মধ্যম আঙুলটি দিয়ে মাথার চুলগুলোকে টেনে চোখের উপর নামানো ইত্যাদি মুদ্রাদোষ ? সুধীর পাকা হাতের পরিষ্কার লেখা, শান্ত সমাহিত মনের পরশ, বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর প্রতি প্রচ্ছন্ন গভীর স্নেহ উজ্জয়িনীর স্মৃতিকে সক্রিয় করল না। কে যে সুধী আর কী যে তার বক্তব্য—যেন চিঠি পড়ছে না, একখানা ভালো লেখকের লেখা বই পড়ছে

ও বোঝবার চেষ্টা করছে। যেন এ চিঠি লাইব্রেরীতে বসে বাবার সাহায্যে পড়বার, শোবার ঘরে খিল দিয়ে বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দকে বালিশের উপর পিষতে পিষতে কখনো হাসতে হাসতে ও কখনো চোখের জলে ভাসতে ভাসতে পড়বার নয়। এ চিঠির ক দেখে কৃষ্ণকে মনে পড়ে না, হৃদয়াবেগকে নাড়া দিয়ে মন-কেমন করায় না এ চিঠি।

তবু কর্তব্যের খাতিরে এর জবাব লিখতে হবে। না লিখলে যেটুকু বাদলের খবর পাওয়া যাচ্ছে সেটুকুও পাওয়া যাবে না।

উজ্জয়িনী সুধীকে চিঠি লিখতে বসল।

লিখল :—

ভক্তিভাজনেষু,

আপনার দুখানি পত্রই পেয়েছি। আপনার মূল্যবান সময়ের বিনিময়ে আমার এ বহুমূল্য প্রাপ্তি। এই সৌভাগ্যের জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি কি ?

আপনার বন্ধু কেমন আছেন ? অবশ্য সেকথা আপনি প্রতি সপ্তাহে বাবাকে লিখছেন। সেই একই কথা প্রত্যেক সপ্তাহে আমাকেও লিখুন এমন অনুরোধ করলে ছেলেমানুষী হবে। একে তো আমার ছেলেমানুষী আপনাকে নিশ্চয়ই কৌতুক দিয়েছে। আমার সম্বন্ধে আপনি কী যে ভেবেছেন, ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়। ছি ছি ! ডাকটিকিট সংগ্রহ করার কথা কেন যে লিখেছিলুম ! সত্যি আমার ওসব ‘হবি’ আজকাল নেই।

পশ্চিমের মেয়েদের সম্বন্ধে উল্টো পাল্টা কত কথাই না শুনি। কোনোটাই বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। আমার জানাশুনার মধ্যে যাঁরা আছেন তাঁরা এত বেশী আমাদের মতো যে তাঁরা কী পরেন ও কী খান সেই প্রমাণের উপর তাঁদের উপর সরাসরি রায় দেওয়া যায় না। বিচার করবই বা কেন ? পারি তো ভালোবাসব। না পারি তো ছায়া মাড়াব না। আমার বাবারও এই মত। মিস্টার সেন কী বলেন জানতে ইচ্ছা করে। একটা মজার কথা দেখুন, জানি বলেই জানতে ইচ্ছা করে। মিস্টার সেন গোঁড়া ইংরেজ বলে জানি। তাই জানতে ইচ্ছা করে তিনি কি তাঁর স্বজাতীয়দের প্রতি পক্ষপাতিত্ববশত আমাদের মতো বিজাতীয়দের প্রতি বিমুখ ? তাঁর বান্ধবীদেরকে আমার প্রণাম জানাবেন কি ?

আচ্ছা, বিলেত গিয়ে আপনারা ফোটো তোলেননি ? আমার ফোটো দেখবার মতো হলে নিশ্চয়ই পাঠাতুম। কিন্তু আপনার বন্ধুকেই জিজ্ঞাসা করুন না ? আমি নিতান্তই কালা আদমী। এবং বিদ্যা বুদ্ধিতে ইস্কুলের সিকস্‌থ্‌ ক্লাস। আমার বাবার পাঠাগারে আমার বয়সের মেয়ের পড়বার মতো বই অল্প কিছু আছে, তাই পড়েছি। কিন্তু সেই যৌতুক নিয়ে কি আপনার বন্ধুর যোগ্য হওয়া যায় ?

আচ্ছা, আপনি কি করেন ? কী পড়েন ? আপনি মাসিক পত্রে লেখেন না কেন ?

লিখলে আপনার মূল্যবান চিন্তা দেশের কত পিপাসুর পিপাসা মেটায়। না, আপনার বন্ধুর মতো আপনিও এদেশের নন? যে কেউ বড় হলেন তিনিই যদি বিদেশী হলেন তবে এ দুর্ভাগা দেশ কাকে নিয়ে বড় হবে? সত্যি বলছি, ইংরেজের প্রতি আমার বিদ্বেষ নেই, তবু ইংরেজ আমি কিছুতেই হব না। আমার দেশের মহান অতীত ও মহত্তর ভবিষ্যৎ তার বর্তমানকালের গ্লানি ও লজ্জার থেকে বড়। সেই বড়ত্বের লোভে আমি ভারতীয়া। আমার বাবাও এই কথা বলেন।

আমার প্রীতি ও ভক্তিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি।

বিনীতা

শ্রীউজ্জয়িনী দেবী

চিঠিখানা অনেক কাটাকুটি করে অনেক রয়ে বসে লেখা। তবু যতবার পড়ে দেখে ততবার নিজের নির্বুদ্ধিতার নতুন নমুনা আবিষ্কার করে। ভালো কাগজে নকল করতে করতে বিলিতী ডাকের বার অতিক্রান্ত হল বলে। তখন উজ্জয়িনী মরীয়া হয়ে ডাকঘরে চিঠি পাঠায়। এবং যতক্ষণ না ডাক চলে যায় ততক্ষণ পোস্ট মাস্টারকে লিখে চিঠিখানা ফিরিয়ে আনবে কি না ভাবে।

চিঠি পায় না সে এক দুঃখ। চিঠি লিখতে জানে না সে আরেক। সুধীন্দ্রবাবু ও চিঠি একা পড়বেন না, বাদলকে পড়াবেন নিশ্চয়। দুজন বয়োজ্যেষ্ঠ বিদ্বান লোক তার অন্তঃকরণকে হাতের মুঠার ভিতর পেয়ে হাস্য পরিহাসের হাতল করবেন। উজ্জয়িনী কল্পচক্ষুতে দুই বন্ধুর লণ্ডনস্থ বৈঠকখানার দৃশ্য দেখতে পারছে। বাদল সেই গৌরবর্ণ কৃশকায় চির-চিন্তিত অস্থির-অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাক্‌পটু বালকটি। তার বয়স ষোল পেরিয়েছে বলে বিশ্বাস হয় না। আর সুধীন্দ্রবাবুর বোধ করি চুলে পাক ধরেছে। বয়সের গাছ পাথর নেই। তাঁর সংযম ও গাম্ভীর্য সেকালের মুনিদের মতো। তাঁর প্রতি অনায়াসে শ্রদ্ধা জন্মায়। আহা, পিতৃকল্প মানুষ যে।

উজ্জয়িনী মনে মনে হাসে। হাসি পেলে মনে মনে হাসাটাই নিরাপদ। ধর সুধীন্দ্রবাবুর সামনে যদি হাসি পায় তবে কি তার হাসতে সাহস হবে? অথচ অদৃষ্ট তাকে এইসব মানুষের দলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একদিন হয়তো বিলেত যাবে তার শ্বশুরের সঙ্গে, ও এঁদের সঙ্গে পরিচিত হবে। বিষম সমস্যা মানুষের সঙ্গে মেশা। বই পত্রের সঙ্গে মেশা কেমন নির্ঝঞ্ঝাট। ঐ করতে করতে তো সে বুড়ো হয়ে গেল। বুড়ো নয় তো কী। সামনের ফাল্গুনে সে সতেরয় পড়বে। এরি মধ্যে সে তার শৈশবকে ভুলেছে। অতীতের কথা বসে বসে স্মরণ করতে ভালোও লাগে না। সেই সময়টা বাদলের চিন্তায় বিভোর থাকতে প্রাণ চায়।

উজ্জয়িনীর দেহে এই প্রথম রং ধরছে। এত দিন সে নিজের দেহ সম্বন্ধে সচেতন ছিল

না। দেহ আছে কি না সে কথা লোকের মনে পড়ে প্রথমত যখন অন্নাভাব ঘটে, দ্বিতীয়ত যখন প্রেম জাগে। উজ্জয়িনীরা পুরুষানুক্রমে বড়লোক। এন্ন গুপ্ত তাঁর তিন পুত্রকে নগদ তিন লাখ টাকার উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন। তাঁদের কেউ মুর্শিদাবাদের সিবিল সার্জন, কেউ রেলের ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, কেউ বা রেঙ্গুনের ব্যারিস্টার। সুতরাং উজ্জয়িনীরা অন্নাভাবের কথা খবরের কাগজের থেকে যেটুকু জানে সেইটুকু জানে। সেকথা শুনে মোটারকম চাঁদাও পাঠায়; দেশের অন্নকষ্টের সুযোগ নিয়ে গীতাভিনয় কিংবা নৃত্যাভিনয়ও করে। কিন্তু কিছুতেই দেহসচেতন হয় না, যতদিন না প্রেম জাগে।

প্রেম জাগে অর্থাৎ বিয়ে হয়ে যাবার পরে স্বামীর প্রতি আকর্ষণ জন্মায়। এদিক দিয়ে উজ্জয়িনীরা গোঁড়া স্বদেশী। তাদের সেট-এর কেউ যে প্রেমে পড়ে বিয়ে করেছে এমন সংবাদ কদাচ শোনা যায়। তারা বিয়ে না করে, অন্তত বাগদত্ত না হয়ে, প্রেমের নাম মুখে আনে না। মেয়ে কার সঙ্গে মিশতে পারে এবং কার সঙ্গে মিশতে পারে না এ সম্বন্ধে মেয়ের মা'রা তাঁদের অলিখিত মনুসংহিতা মেনে চলেন। উক্ত গ্রন্থের বারো আনা অংশ জুড়েছে পদ ও উপার্জন শীর্ষক প্রথম দুই অধ্যায়।

এক কথায় দেহসচেতন হবার সুযোগ উজ্জয়িনীদের জীবনে বিশ একুশ বছর বয়সের আগে আসে না। উজ্জয়িনীর জীবনে তার আগেই এল। উজ্জয়িনী তার মা'র ঘরের বড় আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সৌভাগ্যক্রমে তার মা তখন কলকাতায়। নিজেকে দেখে উজ্জয়িনীর বড় আশ্চর্য লাগে। সে তো সেই উজ্জয়িনী নয়। সে তো কোনোদিন এত সুদর্শনা ছিল না। এমন কি তার রংও যেন কিছু ফরসা হয়েছে। শীতকাল বলে কি? তার গাল দুটিতে মাংস লাগছে ভাবতে তার গাল দুটি রাঙা হে উঠল। তার চোখের পাতায় অকারণে জল চুইয়ে পড়ছে ভাবতে তার খেয়াল হল বা. শ মুখ গুঁজে ঘণ্টাখানেক খুব কাঁদে।

৫

একদিন সকালবেলা ডাক খুলে যোগানন্দ বললেন, "এ তো ভারি মুশকিল হল!"

উজ্জয়িনী মুখে কিছু জিজ্ঞাসা করলে না, কিন্তু চোখের চাউনিতে জিজ্ঞাসা করল, কেন? কী হয়েছে, বাবা?

যোগানন্দ চিঠিখানা আরো একবার পড়লেন, পড়ে উজ্জয়িনীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। উজ্জয়িনী হাতের লেখা দেখে বুঝল তার শ্বশুরের চিঠি। পড়ে দেখল তিনি উজ্জয়িনীকে নিতে আসছেন; যোগানন্দ এবারও যেন আপত্তি না করেন; যোগানন্দের আরো দুই সন্তান এই দেশেই আছে, যোগানন্দ অনায়াসেই তাদের আনাতে পারেন; কিন্তু মহিমচন্দ্রের একমাত্র সন্তান বিদেশে; উজ্জয়িনীকে কাছে না পেলে তাঁর জীবন

দুর্বহ ; বিশেষত তাঁর উপরিওয়ালারা তাঁর প্রতি যেমন দুর্ব্যবহার করছে তাতে তাঁর সময় সময় ইচ্ছা করছে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে কাশীবাস করেন। "আর এ পথে সুখ নেই রে ভাই" (ইংরেজীতে লেখা) ; "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ। আর ক'টা দিন বৈ তো নয়। একদিন ইহকালের কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টায় না করলুম কী ! তবু তো কালকের নিউইয়ার্স উপাধি তালিকায় আমাকে উপেক্ষা করে জুনিয়ার অফিসারকে O. B. E. করা হল। এইরূপ অবিচারের উপর ব্রিটিশ এম্পায়ার টিঁকবে ?"

দীর্ঘকাল একস্থানে থাকতে কারই বা ভালো লাগে ? নতুন জায়গা দেখবার শখ, নতুন মানুষের সঙ্গে মেশবার সাধ, বিশেষ করে যে বাড়ীতে বাদল ছিল সেই বাড়ীতে থাকবার সৌভাগ্য উজ্জয়িনীকে পাটনার দিকে টানল। তবু তার চিরকালের সাথীকে, তার বাবাকে, ছাড়তে পারা যায় না। পিতা ও কন্যার মধ্যে আকর্ষণ সাধারণত নিবিড় হয়েই থাকে। যোগানন্দ ও উজ্জয়িনীর বেলা নিবিড়তর। শুধু নাড়ীর টান নয়, মনের মিল, মতের মিল। ওরা যেন দুটি সতীর্থ, দুটি সহাধ্যায়ী। লেখাপড়ায় যে ওদের মন বসে সেটা লেখাপড়ার খাতিরে ততটা নয় পরস্পরের খাতিরে যতটা। ছেলেরা ইস্কুলে যায় ছেলেদের সঙ্গ পাবার জন্যে।

যোগানন্দ হাসির ভান করে বললেন, "মহিমকে O. B. E. না করে গবর্নমেন্ট আমার প্রতি অত্যাচার করলেন।"

উজ্জয়িনী কিছু বলবার মতো কথা পেল না। চিঠিখানাকে আর একবার পড়তে বলল। যোগানন্দ তাঁর খবরের কাগজে মন দিলেন, অর্থাৎ মন দেবার ভান করলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ পারেন না, মাঝে মাঝে বলে ওঠেন, "মহিমের ওখানে একেবারে অন্য চাল…জবরদস্ত হাকিম…আইনের বই ছাড়া অন্য বই রাখে না…ওর বাড়ীতে তোর সময় কাটবে কী করে ? খরচ করে পার্টি দেয় বিস্তর…এও একটা চাল, বুঝলি ? পার্টি জমবে ভালো যদি তুই থাকিস…হয়তো সম্রাটের জন্মদিনের উপাধিতালিকার উপরে নজর…সেইজন্যে তোকে নেবার জন্যে তাড়াহুড়ো।"

উজ্জয়িনী কোনোদিন পিতার মুখে পরনিন্দা শোনেনি। শুধু পরনিন্দা নয়, বাদলের পিতার নিন্দা। পিতা যে কতখানি বিচলিত হয়েছেন অনুমান করতে পারল। কিন্তু কেমন করে তাঁর সঙ্গে শ্বশুরের পক্ষ নিয়ে কিছু বলে ? বিয়ে করলে মেয়েরা পর হয়ে যায় এ জাতীয় একটা অমূলক জনশ্রুতি তো তার অশ্রুত নয়।

তবু বলল, "বাবা, শোন, ওঁর ছেলের জন্যে ওঁর মন-কেমন-করাটা নেহাৎ অবিশ্বাস্য নয়। ওঁর স্ত্রী নেই বলে ওটা আরো দুঃসহ। তুমি একবার নিজের অমন অবস্থা কল্পনা কর না ?"

যোগানন্দ বিরক্তি চেপে বললেন, "মেয়ে হয়েছিস, মেয়ের বাপ তো হসনি ! কল্পনা

করে দেখিন।" এই বলে তিনি উঠে গেলেন স্ত্রীকে টেলিগ্রাম করতে।

রাত্রের গাড়ীতে উজ্জয়িনীর মা এলেন। ব্যাপার শুনে উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "যাবে বৈ কি। যাবে না? পাটনা isn't a bad place; একটা প্রভিন্সের ক্যাপিটাল। যদিও রায়বাহাদুর, তবু নেহাৎ কেউ কেটা নয়, প্রভিন্সনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। ওঁকে সমাজে তুলতে হবে, ওঁর পুত্রবধূরই কর্তব্য। ওঁর বাড়ী নিশ্চয়ই মিসম্যানেজ্‌ড। ওসব কি আর পুরুষ মানুষের কাজ। তবে বেবীকে যেমন অমানুষ করে তৈরি করেছ আর যা ওর বয়স তাতে একলা ওকে নিয়ে বেয়াই সুবিধা করতে পারবেন না।"

যোগানন্দ বক্তৃতার শেষে টিপ্পনি করলেন, "তার মানে তুমিও যেতে চাও।"

মিসেস বললেন, "ভালো দেখায় না। জামাইএর সংসার হলে কথা ছিল না, কিন্তু—। যাক, বেবীর সঙ্গে একটি হাউস কিপার পাঠাতে হবে, পাই কোথায়? মিসেস স্যামুয়েল্‌সকে পেলে দুই কাজ হয়, মেয়েটাকে কায়দা দুরস্ত রাখতে পারবেন। আহা, বেচারির এখন বড়ই দুর্দিন যাচ্ছে। তবু পরের বাড়ি চাকরি করতে রাজি হলে হয়!"

যোগানন্দ বললেন, "না হয় রাজি হলেন। কিন্তু মহিম ঠিক আমাদের স্টাইলে থাকেন না। শুনতে পাই তাঁর বাড়ী ঠাকুর-দেবতাও আছেন। কলেজে পড়বার সময় মহিমের যে কত বড় এক লম্বা টিকি ছিল গো। ঐ টিকি কেটে আমি কেমন বিপদে পড়েছিলুম তোমাকে বলিনি?"

উজ্জয়িনীর মা'র স্মৃতি পঁচিশ বছর পেছিয়ে গেল যখন তিনি উজ্জয়িনীর বয়সী। কিন্তু দেখতে উজ্জয়িনীর চেয়ে বহুগুণ সুন্দর—সেকালের নাম-করা সুন্দরী। মহিমচন্দ্রের টিকি-কাটার গল্প মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি বয়সোচিত গাম্ভীর্য ত্যাগ করে সেই সেকালের মতো খিল খিল করে হেসে উঠলেন কন্যার সাক্ষাতেই। বললেন, "রোসো, বেয়াই আসুন।"

বেয়াই যেদিন সন্ধ্যার ট্রেনে নামলেন সেদিন টিকি-কাটার গল্প কারুর মনে ছিল না। তাঁর মাথা জোড়া টাক দেখে তাঁর টিকির কথা কারুর মনেই উঠল না। যোগানন্দ ভাবছিলেন তাঁর আসন্ন কন্যাবিরহের কথা; মহিম যতই হাসেন যোগানন্দ ততই কাঁদেন। এক জনের যে কারণে এত উল্লাস অপর জনের সেই একই কারণে এত বিষাদ। যোগানন্দ-জায়া ভাবছিলেন মিসেস স্যামুয়েল্‌সের কথা কোন সুযোগে তোলা যায়। আর উজ্জয়িনী? উজ্জয়িনী অকৃতজ্ঞ কন্যা। সে বাদলের বাবার মুখে বাদলের আদল খুঁজছিল।

৬

কদমকুঁয়ায় রায়বাহাদুরের মস্ত বাড়ী। পুত্র পৌত্রাদি সহ হিন্দু ও মুসলমান ভৃত্যেরা

সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। তাদের গৃহিণীরা উজ্জয়িনীকে দেখবার জন্তে উৎকণ্ঠিত ছিল—বাদল বাবুয়া না জানি কেমন মেমসাব সাদী করে গেছেন। তারা বোধ করি কিছু হতাশ হল উজ্জয়িনীর রং ও পোশাক দেখে। কিছু খুশিও হল। আহা, বড় ছেলেমানুষ। বাদল বাবুয়ার সঙ্গে একটুও বেমানান হয়নি।

ঘরে তারা ভিড় করে রয়েছে, নড়তে চায় না। উজ্জয়িনীর বাঙালী ঝি-টি বহু অঙ্গভঙ্গী সহকারে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করছে, "তোমরা এখন যাও, বাছা। খুকী বাবা একটু বিশ্রাম করবেন।" কিন্তু ঝি-র ভাষা শুনে ওরা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। উজ্জয়িনী গোটা কয়েক হিন্দী শব্দ জানে; কিন্তু ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক; অগত্যা এই ময়লা কাপড় পরা হাস্যমুখরা কৌতূহলী নারীব্যূহ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্তে বিশ্রামের আশা ত্যাগ করে বাড়ীর সমস্তটা পরিদর্শন করতে বের হল।

অনেকগুলো ঘর। দেশী ও বিলাতী আসবাবের গুদামের মতো দেখতে। স্থান অস্থান নেই, যেখানে সিন্দুক সেখানে সোফা। কার্পেটের উপর স্টোভ পড়ে রয়েছে। নববর্ষের ক্যালেণ্ডারগুলো দেয়ালে দেয়ালে লম্বমান, রাধাকৃষ্ণের পট, বিলাতী রূপসীদের ছবি, রায়বাহাদুরকে কারা বিদায় সম্বর্ধনা করেছিল তার ফোটো ও সেই উপলক্ষে রচিত ইংরেজী কবিতা—উজ্জয়িনী যেন একটা আর্ট গ্যালারীতে পদার্পণ করেছে। এই সকলের মাঝখানে কোন এক কোণে বালক বাদল পুরস্কারের বই হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখে উজ্জয়িনীর চক্ষু জলে ভরে উঠল।

আপাতত এই তার কাজ, এই সমস্ত ঘরকে ঝেড়ে পুঁছে নতুন করে সাজানো গোছানো। তারপর দাসদাসীর দলকে যখন তখন যে ঘরে খুশি ঢুকতে না দেওয়া। সম্ভব হলে ওদের সবাইকে 'লিভারি' (livery) কিনে পরানো। ওদের বাচ্চাগুলোকে লেখাপড়া শেখাতে হবে, বিশেষ করে স্বাস্থ্যনীতি।

এই সব চিন্তা করতে করতে উজ্জয়িনী একটি ছোট ঘরে তালা বন্ধ দেখতে পেল।

বেহারা বলল, "এটা বাবুয়াজীকী কামরা আছে।"

উজ্জয়িনী বলল, "খোল, দেখব।"

বাদলের পড়ার ঘর। আলমারিতে রাশি রাশি ইংরেজী-বাংলা বই। টেবিলের উপর এখনো কালি ব্লটিং পেপার পড়ে আছে। তার কোথাও কি উজ্জয়িনীর নাম উল্টো করে ছাপা নেই? টেবিলের উপর একটি মহিলার ফোটোগ্রাফ হেলানো অবস্থায় রয়েছে। ও হরি, ও যে আনা পাভ্লোভা। বাদলকে তিনি স্বাক্ষরিত ফোটো পাঠিয়েছিলেন বুঝি?

বেয়ারাকে বিদায় দিয়ে উজ্জয়িনী বাদলের ড্রয়ার খুলতে বসে গেল। তাড়া তাড়া চিঠি। পৃথিবীর কত দেশের কত প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ নামের স্বাক্ষর। সাধে কি বাদলের

এমন আত্মবিশ্বাস। সে যে বাদলের যোগ্য নয় এজন্যে তার ক্ষোভ নেই। কোন মেয়েই বা যোগ্য ?

বাদলের পড়ার ঘরের চাবি উজ্জয়িনী নিজের হাতব্যাগে পুরল। বাদলের শোবার ঘরে নিজের বিছানা পাতল। ও ঘরে একখানা বড় সাইজের ফোটোগ্রাফে সুধী বসেছে, বাদল দাঁড়িয়েছে। উজ্জয়িনী ওখানাকে এমন স্থানে রাখল যেখানে ঘুমবার আগে ও ঘুম থেকে উঠে আপনি চোখ যায়। ভাবছিল ফোটোগ্রাফকে রোজ মালা গেঁথে পরাবে, কিন্তু তা হলে যে সে মালা সুধীকেও পরানো হয়। উজ্জয়িনী জিভ কাটল। সুধীকে যেমন কল্পনা করেছিল তেমন নয়। বেশ যুবা পুরুষ, মাথার চুল কালোই। বরঞ্চ বাদলেরই কপাল ঘেঁসে টাক পড়বার লক্ষণ। বাদলের তুলনায় সুধী কালো, কিন্তু ঢের বেশী হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান। বাদলের প্রতিভা বাদলের চোখের তারার দীপ্তিতে। সুধীর প্রতিভা সুধীর আভাময় ললাটে। উভয়কেই উজ্জয়িনী নমস্কার করল।

দুদিন পরে শ্বশুর মহাশয় যখন মিসেস শ্যামুয়েল্সের প্রসঙ্গ পাড়লেন উজ্জয়িনী বলল, "কাজ নেই বাবা, তাঁকে এ বাড়িতে বেখাপ হবে। আমাদের অনেক পোষ্য, অনেক অতিথি, এদের নিয়ে আমি বেশ আছি, আমার আর সমাজের জন্যে তৈরী হয়ে কাজ নেই।"

মহিম বললেন, "আঃ হাঃ হাঃ হাঃ, বুঝেছি মা বুঝেছি। এই সরল সত্যটা না জানা থাকলে হাকিমী করতে পারতুম ? মেয়েরা তাদের কর্তৃত্বের ভাগ কখনো কাউকে দিতে রাজি হয় না। কিন্তু মা, তুমি যার স্ত্রী তার জন্যে তৈরি হতে হবে তোমাকে। সে আই-সি-এস হয়ে বছর দুই পরে যখন ফিরবে তখন তার চোখে যেন তোমাকে আসল বিলিতী মেয়ের মতো দেখায়।"

উজ্জয়িনী বলল, "আমি খাঁটি বাঙালী হতে চাই।"

"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, এম্র গুপ্তর নাতনী বলে খাঁটি বাঙালী হতে চাই। ওরে মেয়ে, তোদের তিন পুরুষ বিলেত ফেরৎ। তুইও একদিন হবি।"

"কিন্তু বাবা, এম্র গুপ্ত যে কত বড় স্বদেশপ্রাণ পুরুষ ছিলেন সে কি আপনি জানেন না ? বিলেত গেছলেন সেই চোগা-চাপকান পরে।"

রায়বাহাদুর গম্ভীর হয়ে বললেন, "তবু আই-সি-এস অফিসারের স্ত্রী, আই-এম-এস অফিসারের মেয়ে, সমাজে তোমার অবস্থার মেয়েরা যেমন, তুমিও তেমনি না হলে মানাবে কেন ? গান্ধীর স্ত্রী খদ্দর পরেন গান্ধীর সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার জন্যে।"

উজ্জয়িনীর ইচ্ছা করছিল বলে, সঙ্গতির কথা যদি বলেন তবে এ বাড়ীর খোল ও নল্চে দুই বদলাতে হয়, মায় আপনাকে পর্যন্ত। আপনার সুটের সঙ্গে আপনার টাই বেমানান, আপনার ঐ পাগড়িটি ইংরেজী পোশাকের সঙ্গে যায় না, আপনি স্নানের নাম

করে স্নানের ঘরের লাগাও ঠাকুর ঘরে বসে গুরুর দেওয়া মন্ত্র জপ করেন, বিজাতীয় খাবার নামমাত্র মুখে দিয়ে শোবার ঘরে লুকিয়ে আতপ চালের ভাত ও নিরামিষ তরকারী খান, আপনি এডগার ওয়ালেসও রাখেন যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণও রাখেন, সিগারেটও ফোঁকেন আলবোলাও ভুড় ভুড় করেন। মিসেস স্যামুয়েল্‌স্‌ এ বাড়িতে এসে কেবলি হাসি চাপতে থাকবেন সে আমি হতে দেব না।

উজ্জয়িনী এতদিন পরে নিজের সংসার পেয়েছে, নিজের মনের মতো করে সাজাবে। ও বাড়ীতে মা'র আধিপত্য, জোর করে কিছু চালাতে পারত না ; তার প্রস্তাবগুলো তার বাবার বেনামীতে মা'র দরবারে হাজির করত, তাতেও ফল হত না। এতদিনে সে স্বরাজ পেয়েছে, তার শুভবুদ্ধি যা বলে সে তাই করবে, ফ্যাশান কিংবা প্রথার শাসন মানবে না। এস্র গুপ্তের নাতনী সে এস্র গুপ্তের মতোই সংস্কারক। যোগানন্দের কন্যা সে, যোগানন্দের মতোই বৈজ্ঞানিক। বাদলের স্ত্রী সে, বাদলের মতোই উচ্চমনা।

৭

উজ্জয়িনীদের বাড়ীর একটি বিশেষ ঘর থেকে পাশের বাড়ীর একাংশ চোখে পড়ে। একদিন উজ্জয়িনী দেখল একটি আঠারো উনিশ বয়সের তরুণী বধূ তার আপিস-প্রত্যাগত স্বামীর জুতো খুলে নিয়ে ভিজে গামছায় পা মুছে দিচ্ছে। দৃশ্যটি উজ্জয়িনীর পক্ষে এমন অপূর্ব যে উজ্জয়িনী চুরি করে দেখতে দ্বিধা বোধ করল না।

স্বামীটিরও বয়স বেশী নয়, সে ভারি লজ্জিত ভারি কুণ্ঠিত হয়ে স্ত্রীর সেবা নিচ্ছে, মুখ ফুটে আপত্তি জানাচ্ছে না, জানে যে আপত্তি নিষ্ফল।

স্বামীকে খাবার দিয়ে স্ত্রী পাখা হাতে নিয়ে বসল। পাখার দরকার ছিল না। শীতকাল। তবু স্বামীটি আপত্তি করতে পারে না, পাখার হাওয়া খেতে খেতে মৃদু মৃদু হাসে। সে যে আপিস থেকে অনেক খেটে অনেক কষ্ট পেয়ে ফিরেছে, স্ত্রীর মতো বাড়ীতে বসে বসে আরাম করেনি তো। মুখ ফুটে না বললেও স্ত্রীর মনোভাবটা যেন এই।

উজ্জয়িনীর অন্যত্র কাজ ছিল বলে সে আর অধিকক্ষণ দাঁড়াতে পারল না। আবার যখন এল তখন দেখল স্ত্রীটি স্বামীকে বাবু-বেশে সাজিয়ে বলছে, "বন্ধুদের বাড়ী বেড়াতে না গেলে ওঁরা যে কুণো বলে ঠাট্টা করবেন, বলবেন বৌ-পাগলা, স্ত্রৈণ।"

স্বামী এর উত্তরে কী একটা বলবার জন্যে ঠোঁট নাড়ল। স্ত্রী তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, "চুপ!" কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "মা শুনতে পাবেন যে। ছি!"

একদিন উজ্জয়িনী মা-টিকেও দেখল। স্বামীর মা শাশুড়ী। মেয়েটি তার শাশুড়ীকে পাগল হরনাথের তত্ত্বকথা পড়ে শোনাচ্ছে। উজ্জয়িনী কান পেতে যতটুকু শুনল ততটুকু তার বিশেষ ভালো লাগল ; তাদের বাড়ীর ত্রিসীমানায় আধ্যাত্মিকতা নেই। তার বাবা

ভগবান সম্বন্ধে সংশয়বাদী, তার মা ও দিদিরা বিপদে পড়লে ভগবানের নাম করে বটে, কিন্তু তাদের একটা নির্দিষ্ট ধর্মমত নেই । তাদের সমাজের লোক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ধন মানের উপাসক । যদিও নামে তারা কেউ হিন্দু, কেউ ব্রাহ্ম, কেউ কেউ বা খ্রীস্টান ।

উজ্জয়িনীর মনের খোরাক থেকে যেন একটা উপাদান বাদ পড়ে আসছিল, তাই তার মনের পুষ্টি তার মনের মতো হচ্ছিল না । এইবার যেন সে ভিটামিনের সন্ধান পেল । শ্বশুরের লাইব্রেরী ঘাঁটাঘাঁটি করে হরনাথের বই পেল না, কিন্তু ধর্মগ্রন্থ যা-কিছু পেল সমস্ত চুরি করল । রামায়ণ মহাভারত তার পড়া ছিল, ধর্মগ্রন্থ হিসাবে নয়, প্রাচীন ভারত সভ্যতার বিশ্বকোষ বলে । কিন্তু "চৈতন্যচরিতামৃত", "ভক্তমাল গ্রন্থ", "রামকৃষ্ণ-কথামৃত" ইত্যাদি তাকে অনাস্বাদিত রস দিল।

সেই মেয়েটির জীবন উজ্জয়িনীর লোভনীয় লাগে । আহা, উজ্জয়িনীরও যদি একটি শাশুড়ী থাকত ! আর উজ্জয়িনীর স্বামীটি যদি থাকত কাছে ! কেমন অল্পের মধ্যে সম্পূর্ণ সংসার । তাদের তো ঝি-চাকর অগুনতি নয়, একটি মাত্র ঠিকে-ঝি । মেয়েটি রান্না করে নিজের হাতে । উজ্জয়িনী লুকিয়ে তার কাজ দেখে । উজ্জয়িনী যদি লেখাপড়া এত না শিখে রান্না করতে শিখত ! ক্যান্ডী সেলাইয়ের কাজ না শিখে যদি ফাটা বালিশ রিফু করতে শিখত । পিয়ানো বাজাতে শেখার দুরন্ত দুশ্চেষ্টায় বহু সময় নষ্ট করেছে, সেই সময়টাতে বাজার হিসাবের খাতা লিখলে কাজ দিত ।

মহিম দিনে আপিস করেন, রাত্রে সমপদস্থ দেশীয় চাকুরেদের সঙ্গে আড্ডা দিতে ও তাস খেলতে যান । তাঁর ইচ্ছা আছে পদমর্যাদা আর একটুখানি বাড়লে ইউরোপীয় ক্লাবের মেম্বার হবার জন্যে দেহপাত করবেন ।

উজ্জয়িনী আহারের সময় ছাড়া শ্বশুরের সঙ্গ পায় না । সেজন্যে ওর আফসোস নেই । রবিবারে তিনি তাকে পীড়াপীড়ি করেন অমুক সাহেবের বাড়ী সঙ্গে নিয়ে যেতে । সে বলে, আজ নয়, আর একদিন । কারুর সঙ্গে তার আলাপ করবার সাধ নেই, আছে শুধু ঐ প্রতিবেশিনী মেয়েটির সঙ্গে । কিন্তু ওদের বাড়ী যে নিজের থেকে যাওয়া যায় না । ওরা তো বড়-চাকুরে নয় । কলেজের লেকচারার । একটা পুরো বাড়ীর এক-চতুর্থাংশ ভাড়া নিয়েছে । ওদের বাইরের ঘরে দারোয়ান নেই । স্বামীর কোনো বন্ধু এলে হাঁক দেন, "কমল বাড়ী আছ হে ?" কেরোসিন তেলওয়ালা এলে ডাক দেয়, মাইজী ।"

উজ্জয়িনীর ভারি হিংসা হয় । তাকে কেউ "মাইজী" বলে না ? এত কাল ছিল "খুকী বাবা" । এখন "ছোটা মেম সাব" । তা নইলে স্বামী ও শ্বশুরের সঙ্গে সঙ্গতি হয় না । মহিমকে সাহেব না বলে বাবু বললে তিনি কেবল মনে মনে নয় মুখেও বড় চটেন । একদিন কাকে যেন বলছিলেন, "রায়বাহাদুর উপাধিটা, মশাই, উপাধি তো নয় উপদ্রব বিশেষ । ওর চেয়ে, মশাই, রায়সাহেব উপাধি ভালো । তবু তো সাহেব ।"

ওর বাড়ীর মেয়েটিও এ বাড়ীতে পা দেবার কথা ভুলেই থাকে। ওর কিসের অভাব ? ওর স্বামী যতক্ষণ থাকেন না ততক্ষণ শাশুড়ী থাকেন। কোনো কোনোদিন শাশুড়ীকে নিয়ে সে তাদেরই সমান অবস্থার কোন উকীলবাবু বা ডাক্তারবাবুর বাড়ী গল্প করতে যায়। তাঁরা এলে তাদের বসবার জন্মে মেজেতে সতরঞ্চি পেতে দেয়, পান সেজে আনে। বেশীর ভাগ কথা ওঠে স্বামী সংক্রান্ত—কার স্বামী কত ভালো, কার স্বামীর আপিসের কাজ কত বেশী সময়সাপেক্ষ, উপর-ওয়ালাদের কেন মরণ নেই, কোথায় বদলি হলে দুধ-ঘির সুবিধে। বাজার খরচের কথা ওঠে। ঝি-চাকরগুলোকে বিশ্বাস করবার জো নেই, দোকানদারগুলো ভেজাল দেয়, পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া উচিত। পুলিশ থেকে আসে দেশের প্রসঙ্গ। গান্ধী মহারাজ কী করছেন, সি-আর-দাশ মারা যাবার পর থেকে আন্দোলনটাও মরে রয়েছে, সাহেবরা কি কিছুতেই রাজত্ব ছাড়বে, কেই বা নিজের জমিদারিখানি বিলিয়ে দিতে চায় বল ?

থেকে থেকে বেশ একটু অশ্লীল আলোচনাও হয়। আমুকবাবুর স্ত্রীর ক'মাস চলছে, অমুকবাবুর স্ত্রী আর পারে না, প্রত্যেক বছর একটি। ভগবানের দান। তাঁর উদ্দেশ্য বোঝে, ছার মনুষ্যের এমন সাধ্য নেই। "আচ্ছা, সকলের হয়, আমাদের বীণার কেন হয় না ?"

উজ্জয়িনী সেই থেকে জানল মেয়েটির নাম বীণা। মেয়েটির চোখ ছলছল করে উঠল, মেয়েটি মুখ নিচু করে বলল, "যাও !"

৮

বীণা মেয়েটির নাম। বেশ নামটি তো। উজ্জয়িনী একটা জবড়জং নাম, ও নাম ধরে কেউ কাউকে ডেকে সুখ পাবে না। কেমন আদরের নাম বীণা। বীণা, বীণু, বীণি !

উজ্জয়িনী মনে মনে বীণার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে লাগল। তার বয়সে স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই কিছু স্বজাতিবৎসল হয়ে থাকে। বিয়ে করলেও এর ব্যতিক্রম হওয়া শক্ত। বীণাকে দেখে উজ্জয়িনী প্রথম অনুভব করল যে তার একটি সখী চাই। যেই অনুভব করল অমনি আশ্চর্য হল ভেবে যে এত বড় অভাবটা আগে কেন অনুভব করেনি। ছোট ছেলেরা যেমন থাকে থাকে হঠাৎ ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে অনর্থ বাধায়, উজ্জয়িনীও তেমনি বীণার সঙ্গে সখ্য পাতাবার জন্তে একাগ্র হয়ে উঠল। রোজ তার বীণাকে দর্শন করা চাইই। সেকালের বাদশারা বাতায়নে দাঁড়ালে ভক্তরা দর্শন পেয়ে দিন সার্থক করতেন। আমাদের উজ্জয়িনীর কিন্তু উল্টো ব্যাপার। সে বাতায়নে দাঁড়িয়ে দর্শন দেয় না, দর্শন করে।

চুরি করে দর্শন করতে করতে একদিন উজ্জয়িনী ধরা পড়ে গেল। বীণার সঙ্গে

চোখোচোখি হতেই বীণা মাথার কাপড়টা তুলে দিল। তার সময় ছিল না যে দাঁড়ায়। স্বামীর কলেজের বেলা হল। তিনি প্রাইভেট টিউশনি করতে গেছেন, এখনি এসে আরাম কেদারায় গড়িয়ে পড়বেন। ভাবটা এই যে আজ নাই বা গেলেম কলেজে। একখানা ছুটির দরখাস্ত করে দিয়ে প্রিয়ার সঙ্গে দুটো কথা কই। স্বামীটি জানে প্রিন্সিপাল যদি বা সে দরখাস্ত মঞ্জুর করবে স্ত্রী সে দরখাস্ত লিখতে দেবে না। অতএব অন্যান্য দিনের মতো আজকে রাশি রাশি কথা কইতে হবে, নিত্য খানেক নোট লেখাতে হবে। এই ভাবতে ভাবতে তার আরাম কেদারায় বসার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে।

বীণা রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে বসল। উজ্জয়িনী সম্বন্ধে সে কী মনে করছিল কে জানে। উজ্জয়িনী সটান দৌড় দিল তার পড়ার ঘরে অর্থাৎ বাদলের স্টাডিতে। তার যেমন হাসি পাচ্ছিল তেমনি কান্নাও পাচ্ছিল। হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে। তাও বীণার কাছে। পরে যখন বীণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবে তখন এই নিয়ে বীণা রঙ্গ করবে। এত বড় উচ্চ শ্রেণীর মেয়ে উজ্জয়িনী, সেও গুপ্তচরবৃত্তি করে, বীণা হয়তো এজন্যে তাকে অশ্রদ্ধাও করতে পারে।

বাদলের স্টাডির দেয়ালে কোনোরকম ছবি টাঙানো ছিল না, তাতে বিদ্যার্থীর চিত্ত-বিক্ষেপ ঘটায়। ছিল একটি মটো। "Repentance is a sin". উজ্জয়িনী তার মানে বোঝবার চেষ্টা করল। পৃথিবীতে এত কথা থাকতে বাদলের ঐ একটি কথা মনে ধরল কোন গুণে? সবাই তো ওর উল্টোটাই বলে। অনুতাপ করলে পাপক্ষয় হয় বলেও তার জানা ছিল, বাদলের মতে অনুতাপ করলে পাপ হয়। এ সম্বন্ধে সুধীন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখলে মন্দ হয় না। ভালো কথা সুধীন্দ্রবাবুর একখানা চিঠি এসেছে কাল. একবারের বেশী পড়া হয়নি, অথচ বহুবার না পড়লে ঠিক ঠিক অর্থবোধ হয় না। উজ্জয়িনী সুধীর চিঠি বের করে পড়তে বসল।

সুধী লিখেছে:—

প্রীতিভাজনাসু,

বাদলের সংবাদ জানবার জন্যে আপনার স্বাভাবিক আগ্রহ থাকবে বলেও বটে, আবার প্রসঙ্গতঃ কথা কয়ে আমিও কিঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করব, এই বিবেচনার ফলে এই পত্রক্ষেপ। ভাবছি আমার এ পত্রখানি যখন ক্ষুধার্ত দুর্বাসার মতো প্রোষিতভর্তৃকার পুরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আত্মপরিচয় ঘোষণা করতে করতে ক্ষীণকণ্ঠ হবে তখনো কি তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হবে না, তিনি উত্তর দিতে একান্ত বিলম্ব করবেন?

দেশে থাকতে আমরা থার্ডক্লাস গাড়ীর যুগল পক্ষিরাজ ছিলুম। দেশের গতির ছন্দে মিল দিয়ে আমরা দুই বন্ধুও ধীরে সুস্থে হাঁটতুম ও আত্মাবলের বাহিরে বন্ধু খুঁজতুম না। তবে ঠিক অসামাজিকও ছিলুম না। বিলেত দেশটা মাটির হলেও মাটির গুণে ফসলের

বাড় বেশী বা কম। দেখছি বিলেতে এসে বিলেতের গতিচ্ছন্দ আয়ত্ত না করলে মরণং ধ্রুবম্। বাদল বুদ্ধিমানের মতো গাড়ীটানা ঘোড়ার কাজে ইস্তফা দিয়ে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া বনছে। আমিও মোটর গাড়ীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে খোঁড়া হয়ে মরি কেন, পিঁজরাপোলে আশ্রয় নিয়েছি। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এদেশের অনেকসংখ্যক না-মঞ্জুর ঘোড়ার সঙ্গে আমিও জাবর কাটছি।

ইদানীং খাঁচার পাখীর সঙ্গে বনের পাখীর মোলাকাৎ হয় ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রতি বুধবার। বাদলকে আপনার হয়ে বহু অনুরোধ উপরোধ করি, সে কি কথা শোনে? সমস্তক্ষণ অন্যমনস্ক। গভীর আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ সুপ্তোত্থিতের মতো প্রশ্ন করে, 'হ্যাঁ, কী বলছিলে?" আপনার কথা পাড়লে বলে, "ওঁকে কিছু নতুন প্রকাশিত বই পাঠিয়ে দিতে রোজই ভুলে যাই, ভদ্র মহিলাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম।"

বাদল অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। ইংরেজের ছেলে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করে বিশ বৎসর বয়সে যা হয়ে ওঠে বাদল বিশ সপ্তাহে তা হতে চায়। অথচ বিশ বৎসরেও তা হবার উপায় নেই, কারণ ততদিনে ইংরেজসন্তান চল্লিশ বৎসর বেঁচেছে আর ইংলণ্ডবাসী বাদল বেঁচেছে বিশ বৎসর। অন্য কথায়, ইংলণ্ডে জন্মিয়ে বাদলের সমবয়সীরা বিশ বৎসর স্টার্ট পেয়ে গেছে এবং সে স্টার্ট কোনো মতে হ্রস্ব হবার নয়। তথাচ বাদল উঠে পড়ে দৌড়াচ্ছে। ইংলণ্ডের বিগত বিশ বৎসরের দৈনন্দিন ইতিহাস সে সংবাদপত্র হতে বিপুল অধ্যবসায়ের সহিত স্মৃতিসাৎ করছে। ইংলণ্ডের তৎকালীন ভাবস্রোতে বাদল উজান বেয়ে চলেছে। ইংরেজশিশু জন্মলাভ করে দেখে ওর জন্যে একটি মাতা ও একটি পিতা অপেক্ষা করে আছেন। ভ্রাতা ও ভগিনী, সঙ্গী ও সতীর্থ, প্রতিবেশী ও দৃষ্টিপথারূঢ় বহুবিধ ব্যক্তি ওকে নানা সূত্রে শিক্ষায় সংস্কারে ভাষায় ব্যবহারে স্বভাবে ও স্মৃতিতে ইংরেজ করে তুলছে। কিছুটা সে কানে শুনে শেখে, কিছুটা আবার চোখে দেখে ও অবস্থায় পড়ে। একটি শিশুর মানসিক জীবনের উপর ওর দেশ ও জাতির রূপ গুণ কেমন ধীরে অথচ অমোঘভাবে মুদ্রিত হয়ে থাকে আপনি নিশ্চয়ই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন। টাকাকে গলিয়ে নতুন ছাঁচে ঢালাই করা যায়, কাগজের উপরিস্থিত লেখাকে মুছে আরেক দফা লেখাও সম্ভব, সুদক্ষ স্থপতি একটা বাড়ীকে বেমালুমভাবে আরেকটা বাড়ীতে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু পুনর্জন্মের পূর্বে বাঙালী কখনো ইংরেজ কিংবা ইংরেজ কখনো বাঙালী হতে পারে না। বেশভূষায় আদবকায়দায় সহানুভূতিতে বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতিয়ে বা বহুদিন হতে একত্র থেকে আইন অনুসারে এক দেশের মানুষ আর এক দেশের মানুষ হতে পারে সত্য। কিন্তু বাদল যে স্মৃতিতে ও প্রকৃতিতে ইংরেজ হতে চাইছে। সে যদি ইঙ্গবঙ্গদের মতো আমার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা কইত তবে দুঃখিত হলেও বিস্মিত হতুম না, কিন্তু কোনো দিন সে বলে বসবে, "তুমি আমার

ভারতবর্ষীয় বন্ধু, যখন ভারত-প্রবাসী ছিলুম তখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়।"

থাক্ ও কথা। বাদলের বদলে বরফের বর্ণনা করি, অবধান করুন। শুভ্র আকাশ হতে রাশি রাশি শেফালী অতীব ধীর মন্থর ভাবে ঝরছে। জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলে মুঠার মধ্যে পাই। কিন্তু হাত কন কন করে না। অথচ ইংলণ্ডের বর্ষা বর্শার ফলার মতো বেঁধে। বৃষ্টির ফোঁটা যে কী ভয়ানক ঠাণ্ডা হতে পারে অনুভব করেননি। কিন্তু বরফের থোপা বড় মোলায়েম ও ঈষৎ শীতল-স্পর্শ। যে বরফ খান সে বরফের কুচি জমাট ও কঠিন। এ বরফের পাউডার ফুঁ দিলে উড়ে যায়।

এ বাড়ীতে একটি শিষ্ট বালিকা থাকে, তার নাম মার্সেল। বোধ করি তার পরিচয় দিয়েছি। লক্ষ্মীকে স্বচক্ষে দেখতে চান তো মার্সেলকে দেখে যান। আজ রবিবার, আজ আমাকে বাইরে যেতে দেবে না, আমাকে তার ঘোড়া সাজাবে। থার্ডক্লাস ঘোড়াকে সহজেই চেনা যায়, মেয়েদের স্বাভাবিক ইনট্যুইশন বশত মার্সেল আরো সহজে চিনেছে। চিঠিখানাকে আর একটু দীর্ঘ করে সেই অশ্বারূঢ়া ঝাঁসীর রাণীর মসীচিত্র এঁকে দেখাব ভেবেছিলুম। কিন্তু লাগামে টান লাগছে। অগত্যা উঠতে হল। নমস্কার জানাই। ইতি।

বিনীত

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ

মার্সেলের কাণ্ড পড়ে উজ্জয়িনীর কৌতুক বোধ হচ্ছিল। ইংলণ্ডের মেয়েগুলোও কম বাঁদর নয়। সুধীবাবুর মতো একজন দার্শনিক মানুষকে হামাগুড়ি দেওয়ায়। দেয় সপাং করে এক চাবুক। সুধী না হয়ে বাদল হলে কেমন জব্দ হত। (মার্সেল নয়, বাদল জব্দ হত।)

কিন্তু বাদল থাকে দূরে, বীণা থাকে অদূরে। বীণার টানই প্রবল। উজ্জয়িনী সুধীবাবুকে কী লিখবে ভেবে তাঁর চিঠিখানা খুলেছিল ভুলে গেল। একবার বীণাকে দেখে এলে হয় না? এবার কিন্তু খুব সন্তর্পণে, বীণা যাতে টের না পায়। শুধু বীণা নয়। বীণার স্বামীও এতক্ষণে ফিরেছেন, তিনিও টের পাবেন আর মুচকি হাসবেন। ভারি লাজুক ভদ্রলোকটি। সুন্দর চেহারা, ঋজু ও তন্বু গড়ন, সুকুমার স্বভাব। বীণার স্বামী না হয়ে বীণার স্ত্রী হলেন না কেন? অসাধারণ ফরসা, তবু প্রসাধনের পারিপাট্য নেই, নম্রতার অবতার। মৌনভাবেরও। কলেজে বেশী বকতে হয় বলে বাড়ীতে শক্তি সঞ্চয় করেন।

উজ্জয়িনীকে বীণার আকর্ষণ কি কমলের আকর্ষণ কোনটাতে টানল বলা যায় না। উজ্জয়িনী এবার সযত্নে নিজেকে গোপন করল। দেখল স্বামীটি খাচ্ছে আর স্ত্রীটি এমন

ভাবে তার থালার দিকে হাতের দিকে মুখের দিকে অনবচ্ছিন্ন ভাবে তাকাচ্ছে যেন একটি সূর্যমুখী ফুল ধীরে ধীরে পশ্চিমমুখী হচ্ছে। যেন স্বামীর আহারলীলা নিরীক্ষণ করার মধ্যে স্ত্রীর নিজের আহারক্রিয়া উহ্য রয়েছে। বাদল উজ্জয়িনীকে কোনো দিন এমন সুযোগ দেবে কি? যদি দেশে ফেরে তবে দুর্ধর্ষ জনবুল হয়ে ফিরবে, স্ত্রীর সেন্টিমেন্টের মর্যাদা বুঝবে কি? এমনি করে দিনের তুচ্ছ কাজগুলির ভিতর দিয়ে স্বামীর কাছে স্ত্রী আত্মনিবেদন করবার ছল খুঁজবে, কিন্তু পাবে না। উজ্জয়িনী না হয়ে বীণা হয়ে জন্মালেও বীণার ভাগ্য পেলে বুঝি উজ্জয়িনীর ক্ষোভ থাকত না।

বীণার সঙ্গে বাক্যালাপের জন্যে উজ্জয়িনী উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল, কিন্তু সে কেমন করে সম্ভব? উজ্জয়িনীদের সমাজের রীতি এই যে দুপক্ষেরই কোনো একজন বন্ধু বা আত্মীয় বা পরিচিত লোকে দুজনকে আলাপ করিয়ে দেবেন। গায়ে পড়ে আলাপ করা অসিদ্ধ এবং আকস্মিক আলাপ পরে অস্বীকার্য। উজ্জয়িনী মহিমচন্দ্রকে একদিন জিজ্ঞাসা করল, "বাবা, ওবাড়ীর কেউ আমাদের এখানে আসেন না কেন?"

মহিম বললেন, "কমলবাবুদের কথা বলছ? কই কোনো দিন তো আসেন না। ছোকরা কিসের যেন লেকচারার শুনেছি, কিন্তু স্বভাবটি তাঁর মুখচোরার।"—এই বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে আকুল।

কিন্তু তাতে উজ্জয়িনীর কার্য সিদ্ধ হল না। তার সঙ্গে মহিমচন্দ্র পাড়ার দুর্পাচজন ডেপুটি মুন্সেফ ও উকীলের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং ওঁরাও ওঁদের "ওঁদেরকে" একদিন পাঠিয়ে দেবেন বলে আপনা থেকেই প্রস্তাব করেছেন। সাহেব-কন্যাকে নিমন্ত্রণ করে দুঃসাহসের কাজ করেননি। উজ্জয়িনীর একমাত্র আশা যদি ওঁদের কারুর "ওঁরা" একদিন আসেন ও দৈবাৎ বীণার সঙ্গে পরিচিতা থাকেন।

সেদিনের প্রত্যাশায় উজ্জয়িনী ব্যাকুল হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে বীণার সঙ্গে ঘটতে থাকল বারম্বার দৃষ্টি-বিনিময়। বারম্বার যা ঘটে তার মধ্যে আকস্মিক কতখানি, কতখানিই বা চিন্তিতপূর্ব? দৃষ্টিবিনিময় মাত্রে যে হাস্যবিনিময়টুকু হয় সেটাও কি আকস্মিক?

সংকোচ কেটে যেতে লাগল। উজ্জয়িনী জানালায় থেকে সরে যায় না, বীণা ত্রস্ত কেশের উপর কাপড় তুলে দেয় না। আহা, উভয়ের বয়স যদি আরো কম হত। তখন হয়তো দুজনে একই ইস্কুলে যেত, একই জায়গায় খেলা করত। ইস্কুলের কথা মনে পড়ায় উজ্জয়িনীর আফসোস হতে লাগল, কেন অবুঝের মতো অকালে ইস্কুল ছাড়ল। তখন কি ভয়ানক লাজুক ও অসামাজিক ছিল সে, কোনো মেয়ের সঙ্গে তার বনত না, ওরা তাকে মারত কিংবা ক্ষ্যাপাত অথচ সে কারো গায়ে হাতটি তুলত না কিংবা মুখ ফুটে প্রতিবাদ করত না। একদিন বাবাকে বলল, "আর ইস্কুলে যাব না।" বাবাও বাধ্য

করলেন না, নিজে কন্যার ইস্কুল-মাস্টারি করতে শুরু করে দিলেন। তার ফলে উজ্জয়িনী অল্প বয়সে অনেক শিখেছে। কিন্তু সমবয়সিনীদের সঙ্গ হারিয়ে তাদের জগতে প্রবেশের পথ পাচ্ছে না। তাদের সঙ্গে পড়লে পড়াশুনা হত না, কিন্তু পড়াশুনার চাইতে যা ঢের বেশী লোভনীয় তাই হত—হত সখ্য, হত অন্তরঙ্গতা।

উজ্জয়িনীর মনে হল বাদলকে যে সে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারল না এর প্রধান কারণ তার বিদ্যার স্বল্পতা নয়—একটা বড় কারণ বটে, কিন্তু প্রধান কারণ নয়। বীণা বিদুষী কি না জানে না, কিন্তু উজ্জয়িনী জোর করে বলতে পারে বীণা বাদলকে এমন করে আপনার করে নিত যে বাদল তাকে চিঠি না লিখে পারত না। বীণার সে নিপুণ হাত যাদু জানে। বীণার স্বভাবে যে মাধুর্য আছে উজ্জয়িনীতে তা কই? বীণাকে পেলে বোধ করি বাদল এত একাগ্র ভাবে ইংরেজ হবার তপস্যা করত না। তার তপশ্চর্যায় বীণার মুখখানি হত ইন্দ্রপ্রেরিত বিঘ্ন। হয়তো তার জীবনের ব্রত হত বীণাকে সুখী করা, বীণাই হত তার ধন ও মান, যশ ও কীর্তি।

কিন্তু বেচারা কমলের তা হলে কি দশা হত। সে যে বড় বেচারা মানুষ। খুব সম্ভব বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান, একান্ত স্নেহলালিত পোষা প্রাণীটি, এখন মার হাত থেকে স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত হয়েছেন। নাঃ, বীণা বলেই পারে, উজ্জয়িনী কিছুতেই সইতে পারত না। বাদল যদি কমল হয়ে থাকত তবে উজ্জয়িনীর ক্ষোভ দূর হত না, এক ক্ষোভের স্থান অপর ক্ষোভ নিত। স্বামীর ভালোবাসা পাওয়ার থেকে বড় কথা স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে পারা। উজ্জয়িনী বীণার তুলনায় ভাগ্যবতী।

কিন্তু বীণার সঙ্গে প্রাণ খুলে এ সব কথা না কইলে কাকে কইবে, কেমন করে প্রাণের নিঃসঙ্গতা লাঘব করবে? বাবাকে যখন চিঠি লেখে তখন এসব কথার ধার মাড়ায় না। বাবা তার মনের সাথী, প্রাণের নয়। একটি সাথী তার চাই-ই চাই। এ যে অভাব, এর মতো অভাব বুঝি আর নেই।

উজ্জয়িনীর সংস্কার বিদ্রোহী হলেও সে ঠিক করল বীণার সঙ্গে যেচে আলাপ করবে। বীণা যদি তার বন্ধুত্ব প্রত্যাখ্যান করে তা হলে যে সে কী ভয়ঙ্কর লজ্জা পাবে সে কথা ভাবতে তার মাথা ঘোরে, সে কথাকে সে বলপূর্বক চাপা দিল। না, না, মরে যাবে না, মরার কথাই ওঠে না। কিন্তু আর কখনো এই জানালা খুলবে না এবং আর কখনো কারুর সঙ্গে সখীসম্বন্ধ পাতাবে না। জানবে যে তাকে পৃথিবীতে কেউ ভালোবাসে না, এক তার বাবা ছাড়া। পৃথিবীর কারুর কাছে কোনো প্রত্যাশা না রেখে সে মীরাবাইয়ের মতো ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করবে এবং হিমালয়ের কোনো গুহায় আত্মগোপন করবার জন্যে সংসার ত্যাগ করবে। তার বাবা ছাড়া অন্য সকলে ক্রমশ ভুলে যাবে যে উজ্জয়িনী বলে কেউ ছিল।

১০

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিক থেকে সৌভাগ্য এল। বীণা নয়, মলিনা মেয়েটির নাম। একদিন মা'র সঙ্গে মহিমচন্দ্রের বৌমাকে দেখতে এসে বলে গেল, "আমি আবার তো আসবই, এলে আপনাদের লাইব্রেরী থেকে নভেল না দেখবেন।"

পরিচয়ের ইতিবৃত্ত দেওয়া যাক্।

মহিমচন্দ্রের উকীলবন্ধু সুবল একদিন দুপুরবেলা তাঁর স্ত্রীকে ও কন্যাদ্বয়কে উজ্জয়িনীর সঙ্গে আলাপ করে আসবার অনুমতি দিলেন। গিন্নীটি বড় ভালো মানুষ। এসেই বললেন, "মা, রোজ আসি আসি করে আসা হয়ে ওঠে না, জানোই তো বৃহৎ পরিবারের অসুবিধে। নইলে তোমার এখানে মা নেই, বোন নেই, শাশুড়ী নেই শুনে অবধি প্রাণে যে উন্মাদনা বোধ করছি, মা, সে আর কী বলব? তুমি আমার মেয়ের মতো, তুমি তো সব বোঝ।" এক নিঃশ্বাসে এই পরিমাণ কথা বলে ধুঁকতে লাগলেন। উজ্জয়িনী চট করে একখানা পাখা ও এক গ্লাস জল আনিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিম্ন স্বরে বললেন, "বাবা সিবিল সার্জন?"

উজ্জয়িনী ঘাড় নেড়ে হাঁ জানাল।

"ভাই বোন ক'টি?"

"ভাই নেই, বোন দুটি।"

"আহা, ভাই নেই! একেবারেই নেই!"—ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর থেকে মনে হল তিনি পরম উন্মাদনা বোধ করছেন। উজ্জয়িনীও যেন এই প্রথম একটি ভাইয়ের অভাব বোধ করল। তার চোখ ছল ছল করল।

মলিনা ও মিনতি মার কথাবার্তার সেকেলে ধরনে মনে মনে চটে গেছল। মাকে থামাতেও পারে না। অত্যন্ত অসহায় অথচ অপ্রসন্নভাবে তারা শুনতে লাগল মা বলছেন, "বেশ মেয়ে, খাসা মেয়ে, রাজার মেয়ে। দেখে প্রাণ প্রফুল্লিত হল। আর আমার মেয়ে দুটোর ছিরি ভাখ। এখনো বি-এ পাস করতে পারল না। হাঁ মা, তুমি তো এম-এ পড়া মেয়ে—"

উজ্জয়িনী বাধা দিয়ে বলল, "আজ্ঞে না, আমি ম্যাট্রিকও পড়িনি। সত্যি কথা বলতে কী, আমার বিদ্যার দৌড় সিক্সথ্ ক্লাস পর্যন্ত।"

মলিনাদের মা টিপ্পনি কাটলেন, "ভাখ্ তোরা, দেখে শেখ্, বিনয় কাকে বলে। কত জ্ঞান আহরণ করলে তবে বলতে পারা যায় আমার বিদ্যার দৌড় লাস্ট ক্লাস্ পর্যন্ত। কে যেন ইংরেজ কবি বলে গেছেন, আমি বেলা-ভূমিতে বালুকাখণ্ড সংগ্রহ করেছি?"—

মিনতি মা'র মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "কবি নয় মা, scientist। স্যর আইজাক নিউটন, যিনি Laws of Gravitation আবিষ্কার করেন।"

মলিনা উজ্জয়িনীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ক্ষেপণ করে বলল, "আবিষ্কার করে কী result হল ; আজ তো আইনস্টাইন এসে সব explode করে দিলেন ?"

উজ্জয়িনী সবিনয়ে বলল, "না, ঠিক উল্টে দেননি। দেখুন, এ সম্বন্ধে বড় বড় বৈজ্ঞানিকরাও এত কম বোঝেন যে আমাদের এপক্ষে বা ওপক্ষে কোনো রায় দেওয়া সাজে না।"—বলেই উজ্জয়িনী রেগে উঠল।

মলিনার মা বললেন, "ঠিক বলেছ মা। দুপাতা ইংরেজী পড়ে আমাদের বড্ড বাড় বেড়েছে। ঐ যে বলে, 'হাতী ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল', ওই হয়েছে আমাদের দশা।"

মা কিংবা মেয়ে কারুকেই উজ্জয়িনীর মনে ধরছিল না। সে টের পেয়েছিল যে মাতে মেয়েতে বিদ্যা সংক্রান্ত ঈর্ষা ও অভিমান থেকে তাদের সম্বন্ধে স্বাভাবিক মধুরতাকে পরের পক্ষে অনুপভোগ্য করছে, যেমন চিনির মধ্যে কাঁকর। মেয়েরা উজ্জয়িনীকে মা'র চেয়েও আপন মনে করছে—কিন্তু কেন ? সমবয়সীদের মধ্যে একটা দলগত চক্রান্ত আছে অসমবয়সীদের বিরুদ্ধে—তাই কি ? প্রাচীন ও নবীন, একের গর্ভে অপরের জন্ম, তবু উভয়ে উভয়ের শত্রু। কথাটা সে কোন বইয়ে পড়েছিল স্মরণ করতে চেষ্টা করল।

উজ্জয়িনী তাঁদের কিছু জলযোগ করিয়ে বাড়ীর নানা অংশ দেখিয়ে বিদায় দিল। তাঁরা বাদলকে ভালো করেই চিনতেন, সুধীকেও। সুধী ও বাদল কেমন আছে, কী পড়ছে, কবে ফিরবে ইত্যাদি প্রশ্ন করলেন। উজ্জয়িনীর ইচ্ছা করছিল বীণা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু না, প্রথম দিনে অতটা ভালো দেখায় না।

মলিনা ও মিনতি দুই বোনেরই প্রধান দোষ তারা উজ্জয়িনীর উপর নিজেদের ইংরেজী ভাষাজ্ঞান প্রয়োগ করতে উৎসুক। তারা নিজেরাই নিজেদের শিক্ষার বিবরণী দিল। মলিনা বি-এ দিচ্ছে আগামী বৎসর, মিনতি এইবার আই-এ দেবে। দুজনেই বাড়ীতে মাস্টার রেখে পড়ে। পাটনায় মেয়েদের কলেজ নেই। মলিনার মধ্যে কিছু গভীরতা আছে। সে উজ্জয়িনীর লাইব্রেরী দেখে বলল, "আপনার সঙ্গে আমার রুচি খাপ খাবে। আমিও বিজ্ঞান ভালোবাসি, কিন্তু শেখায় কে ? সস্তায় মাস্টার পাওয়া যায় বলে দুজনেই হিস্ট্রী ও সংস্কৃত পড়ি।"

মিনতি বলল, "আচ্ছা, আপনার কাছে এল্ মুখার্জীর ইংলিশ হিস্ট্রীর নোট আছে ? নেই ? আহা, ভুলে গেছলুম আপনি কলেজে পড়েননি। আমি কিন্তু এইবার কলকাতা গিয়ে ডাইওসিসানে ভর্তি হব।"

এমনি করে প্রবলবাবুর দুই কন্যার সঙ্গে উজ্জয়িনীর আলাপ পরিচয় হল। এবং মলিনা আশা দিয়ে গেল যে সে শীঘ্রই একদিন আসছে। মিনতির ভাব দেখে বোধ হল সে উজ্জয়িনীকে দেখে নিরাশ হয়ে ফিরল। বিলেত-ফেরতের মেয়ে, অন্তত ইংরেজীটা

বলতে পারা তার পক্ষে মাতৃভাষার মতো হওয়া উচিত ছিল কিন্তু মিনতিরা যতবার চার ফেলে মাছটি কোনোবার ধরা দেয় না। উজ্জয়িনী একটিও ইংরেজী কথা ব্যবহার না করে শুদ্ধ বাংলায় বাক্যালাপ করল। মিনতি বোধ হয় ভাবছিল যে বাদলটা যাকে তাকে বিয়ে করে ঠকে গেছে, বিশেষ যখন এক পাড়াতেই মিনতির মতো মেয়ে রয়েছিল। কেন, উজ্জয়িনীর চাইতে সে কিসে কম যায় ? উজ্জয়িনীকে সে বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল যে তার বাবা হাইকোর্টের উকিল ও ইউনিভার্সিটির সিণ্ডিক্। মেয়েকে তিনি বিলেত পাঠাতেও পারেন। তবে মাকে রাজি করানো শক্ত। মিনতি যতক্ষণ বক বক করছিল মলিনা ততক্ষণ তন্ময় হয়ে যোগানন্দ প্রেরিত "Jesting Pilate"-এর পাতা ওল্টাচ্ছিল ও মুখ টিপে টিপে হাসছিল। উজ্জয়িনী যে এ জাতীয় বই পড়ে বুঝতে পারে এ বিষয়ে তার হয়তো সন্দেহ ছিল, তবুও স্থানে স্থানে সমঝদারের মতো লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া ও প্রশ্নসূচক চিহ্ন দেখে সে উজ্জয়িনীর বিদ্যার প্রতি মোটের উপর শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিল। অন্তত তার ভাব থেকে উজ্জয়িনীর তেমন অনুমানের কারণ ছিল।

ওরা চলে গেলে উজ্জয়িনী কতকটা আশ্বস্ত হল। মলিনা বীণা নয়, বীণা বলতে যত কিছু বোঝায় মলিনার মধ্যে তার অল্পই আছে, তবু মন্দের ভালো। বীণা যদি উজ্জয়িনীকে প্রত্যাখ্যান করে তবে মলিনা তার অবলম্বন। আর কিছু না হোক মলিনার সঙ্গে বিদ্যাচর্চা তো করা যেতে পারে। যদিও উজ্জয়িনীর মনটা সম্প্রতি জ্ঞানমার্গ ছেড়ে ভক্তিমার্গের প্রতি ঝুঁকে রয়েছে। উজ্জয়িনীর বাল্যকাল হতে অভিলাষ ছিল সিস্টার নিবেদিতার মতো কোনোরূপ লোকহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করবে। হঠাৎ ভ্রান্তের মতো বিয়ে করে বসল। বিয়ের স্বরূপ তো এই। উজ্জয়িনী তপস্বিনী হবে লোকচক্ষুর অন্তরালে। এত শীঘ্র নয় অবশ্য। বছর তিন চার স্বামীর প্রতীক্ষা করবে। তার পর একদিন অদৃশ্য হয়ে যাবে, যদি স্বামী না ফেরে কিংবা ডাক না দেয়।

যদি ফেরে কিংবা ডাক দেয় তবে ?—ভাবতে উজ্জয়িনী লজ্জায় থর থর করে কাঁপে। না, সে সুখের তুলনা নেই। উজ্জয়িনী ধন্য হয়ে যাবে। বীণার মতো চব্বিশ ঘণ্টা পাগলামি করবে। বাদল যা ভাবে ভাবুক।

কিন্তু দূর হোক্ এ সব বাজে চিন্তা। বাদল হয়তো এতদিনে কোনো 'বিদেশিনীর' প্রেমে পড়েছে।

১১

মেল্-ডের একদিন আগে মহিমচন্দ্র বললেন, "বাদলকে কিছু লিখবে, মা ? অবশ্য জবাব পাবে সুধীর।"

উজ্জয়িনী বলল, "থাক্, বাবা। তাঁর ধ্যানভঙ্গ করব না। সোজা সুধীবাবুকেই কিছু

লেখবার আছে তাঁর পত্রের উত্তরে ।"

মহিম খুশি হলেন । বাদলের এটা ব্রহ্মচর্যের বয়স, গার্হস্থ্যের দেরি আছে । তিনি বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসবান । যদিও নিজে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেননি তবু গৃহিণীর অভাবে তাঁর গার্হস্থ্যও তো অসিদ্ধ । তাঁর চিত্তে ভোগৈশ্বর্যের প্রতি কিছুমাত্র আসক্তি নেই । পুত্রের শিক্ষার কাঞ্চনমূল্য সংগ্রহ করতে হচ্ছে কলির অধ্যাপকরা নিষ্ক্রয় দাবী করছে বলে । নতুবা কামিনী কিংবা কাঞ্চন কোনটাই বা তাঁর প্রেয় ?

উজ্জয়িনী বাদলের চিত্তবিক্ষেপ ঘটাতে চায় না, এজন্যে যোগানন্দের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জাত হল । কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা তো বহু পিতা দিয়ে থাকেন, এমন চরিত্রশিক্ষা এ যুগে বিরল ।

উজ্জয়িনী সুধীকে লিখল :—

"আমি পাটনা এসেছি, খবর রাখেন ? যে সে শহর নয়, পাটলীপুত্র তিনটি হাজার বছর এর বয়স । তার থেকে একটি হাজার বছর এ নগরী বিশাল ভারতের রাজচক্রবর্তীদের রাজধানী ছিল । আপনাদের লণ্ডনের এত দীর্ঘকাল এরূপ সৌভাগ্য হয়নি ।

এর মাটি মাড়িয়ে চিরকালের জন্যে পবিত্র করে দিয়ে গেছেন স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ, আর রাজর্ষি অশোক । বিম্বিসার, অজাতশত্রু, চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, পুষ্যমিত্র, অগ্নিমিত্র, সমুদ্রগুপ্ত ইত্যাদি কত পরাক্রান্ত পুরুষ, কত দার্শনিক, কত কবি, কত জ্যোতির্বিদ এবং হিউয়েন্‌ৎ সাং ফাহিয়েনের মতো কত তীর্থযাত্রী । কল্পনাও পরাস্ত হয়, ইতিহাস তো স্মৃতির কঙ্কাল মাত্র । আমি অবসর সময়ে যতবার এই নগরীর অতীতচিহ্নহীন সিন্দূরকঙ্কণহীন বিধবা মাটির দিকে তাকাই ততবার আমার সমগ্র সত্তা এর পায়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে । এর গায়ে পা ঠেকেছে, সেই কি কম অপরাধ ? অথচ এমন কুৎসিত শহর আমি অল্পই দেখেছি । যারা একে কুৎসিত করে রেখেছে তারাই কুৎসিত । এই সব বালখিল্যের কল্পনা অল্প একটুখানি বর্তমান ও অদূর ভবিষ্যৎ অবধি মোরগের মতো ওড়বার ভান করে । হয়তো এই পুণ্যভূমির কোনো অদৃশ্য স্থানে কোনো শাক্যসিংহ তপস্যা করছেন । কিন্তু বাইরে থেকে আমরা যাঁদের হাঁক ডাক শুনি তাঁরা ক্ষণজন্মা নন, ক্ষণজীবী । আমার শ্বশুরের সঙ্গে যাঁরা গল্প করতে আসেন তাঁদের হয়তো অন্য সমস্ত গুণ আছে, কিন্তু তাঁদের স্মৃতি আশা ও কল্পনা তাঁদের পূর্বপুরুষদের সমতুল নয় ।

এত অল্প দেখে এত বড় বিষয়ে মত জাহির করতে আমার সাহস হয় না, তবু আমার যা সত্য ধারণা তাই আপনাকে জানালুম । ক্ষমা করবেন তো ? দয়া করে দোষ ধরবেন না ।

আপনার বন্ধুর অসাধ্যসাধন তাঁর প্রতি আমাকে সশ্রদ্ধ করেছে । কিন্তু কিসে যেন আমাকে পীড়া দিচ্ছে । প্রত্যেকের জীবন তার নিজের হাত-খরচের টাকা, তার উপর

অন্যের হাত খাটানো অন্যায়। বিবাহসূত্রেও একজনের হাত-খরচের টাকা অন্য জনের হয় না, হওয়া অনুচিত। কাজেই তিনি তাঁর জীবনের যেমন খুশি বিলি ব্যবস্থা করলে আমার একটি কথা বলবার অধিকার নেই।

আমার বিয়ে আমার জীবনের সমস্ত ওলট পালট করে দিয়েছে। আগে আমি ঠিক করে রেখেছিলুম লোকসেবায় আত্মোৎসর্গ করব, যেমন সিস্টার নিবেদিতা করেছিলেন। সে আদর্শ কোথায় উবে গেছে। আমাকে টানছে নামপরিচয়হীন ভগবদ্‌ভক্তের জীবন। কিন্তু আপনার বন্ধুর প্রতি কী একটা কর্তব্য আমার আছে—এ আমার সংস্কার থেকে বলছে। যুক্তি এক্ষেত্রে খাটছে না। একটি প্রতিবেশিনী মেয়েকে রোজ দেখি, আপনি হয়তো তার স্বামীকে চেনেন। থাক্, নাম করব না। তার স্বামীই তার ভগবান। শাস্ত্রে লিখছে শুধু তার কেন, সব মেয়ের পক্ষে তাই। এত বড় একটা কথা কি কখনো মিথ্যা হতে পারে? আমার সাহস হয় না ভাবতে।

পড়েছি দোটানায়। যদি স্বামীর জন্যেই প্রস্তুত হই—যা আমার পিতা মাতা, আমার শ্বশুর, আমাদের সমাজ আশা করেন—তা হলে একদিন নিরাশ হব। স্বামী হয়তো ফিরবেন না এবং তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে দেখব তিনি আমাকে চেনেন না ও চান না। পক্ষান্তরে যদি নিজের আদর্শ অনুসরণ করে পারমার্থিক জীবনে মনোনিবেশ করি তা হলেও একদিন বিপন্ন হব। স্বামী ফিরবেন ও জিজ্ঞাসা করবেন কেন আমি তাঁর জন্যে লৌকিক আদর্শ অনুযায়ী প্রস্তুত থাকিনি।

এই সব ভাবি কিন্তু কাউকে বলতে পারিনে। আপনাকে বলে মনটা হালকা হলও বটে, আবার এই সম্ভাবনাও থাকল যে আপনি প্রসঙ্গটা আপনার বন্ধুর কানে তুলবেন। বাবাকে লিখেছিলুম কেন এতদিন তিনি আমাকে ভগবান ভাগবত উপলব্ধির কথা বলেননি। তিনি তার উত্তরে একখানি চটুল ও চাতুর্যপূর্ণ বই পাঠিয়েছেন—"Jesting Pilate" এবং লিখেছেন, তোর শ্বশুরের বয়সে যা স্বাভাবিক তোর বয়সে তা morbid. ভূত ছাড়ানোর জন্যে যেমন রোজার দরকার হয় ভগবানকে ছাড়াবার জন্যে হয় বৈজ্ঞানিকের। এই লেখকটি বৈজ্ঞানিকের পৌত্র ও নিজেও বৈজ্ঞানিকমনা। ইনি যদি বিফল হন তবে আমাকে stethoscope নিয়ে পাটনা রওনা হতে হবে। তোর শ্বশুর নানা জাতীয় সাত্ত্বিক আহার্যের সঙ্গে তোর মস্তিষ্কটিতেও দন্ত-প্রয়োগ করছেন নাকি? এই তো সেদিন এখান থেকে গেলি। এরি মধ্যে ভগবান পেয়েছে! চলে আয়, চলে আয়।

যা কোনো দিন আশঙ্কা করি নি তাই ঘটতে যাচ্ছে। পিতাপুত্রীর মতভেদ। আমার বাবা যে আমার কী ছিলেন কেমন করে তা বোঝাব? আমি শুধু তাঁর দেহের সৃষ্টি নই মনের সৃষ্টিও। তবু দেখছি তাঁর কাছে আমাকে বিদ্রোহী হতে হবে।"

কুশল প্রার্থনা করে ও মার্সেল সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করে পরিশেষে উজ্জয়িনী লিখল,

"চিঠিখানা বড়ই গুরু গম্ভীর হয়ে উঠল এবং আমার বয়স স্মরণ করে আপনি এতে পাকামির গন্ধ পাবেন। কিন্তু জানেন, অল্প বয়স থেকে আমি সঙ্গীমাত্রহীনভাবে একা থেকেছি, তাই আমোদপ্রমোদে ও হাস্যপরিহাসে সময়ক্ষেপ না করে কেবল পড়েছি ও ভেবেছি। অন্যান্য অবয়বের তুলনায় মস্তিষ্ক যদি কিছু বেশী পরিণতি পেয়ে থাকে তবে সেটা হয়তো আপনার চোখে বিসদৃশ ঠেকতেও পারে। তা বলে ভাববেন না যে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছুমাত্র শীর্ণ শুষ্ক খর্ব ক্ষীণ। মা গো, দিনকের দিন এমন মোটা হতে লেগেছি যে আপনার বন্ধু দেখলে হয়তো এই এক দোষে চিনতে দ্বিধাবোধ করবেন।"

তাড়াতাড়ি ডাকে না দিলে সে সপ্তাহে যেত না। ডাকে দেবার পর একে একে কত ত্রুটি উজ্জয়িনী স্মৃতিসমুদ্রে নেমে ডুবুরির মতো উপরে তুলল। তাই নিয়ে তার অনুশোচনার অবধি রইল না। নিজের লেখায় নিজেই যত কদর্থ করল সবগুলি যে সুধীবাবুও করবেন তার আর সন্দেহ কী।

এই সময় বাদলের মটো তার চোখের ভিতরে দিয়ে মর্মে প্রবেশ করল। "Repentance is a sin." বটে? উজ্জয়িনী তা হলে পাপ করছে? শাস্ত্রেও বলেছে গতস্য শোচনা নাস্তি। তবু এ দোষ উজ্জয়িনীর স্বভাব থেকে যায় না কেন?

বাদলের দেওয়া বীজমন্ত্রটিকে সে এখন থেকে জীবনের মূলধন স্বরূপ খাটাবে। বাদল তার দীক্ষাগুরু। সে পশ্চাতে ভ্রূক্ষেপ না করে দ্বিধাহীনভাবে এগোতে থাকবে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত। কে কী মনে করবে সে কথা মনে করাই তো অনুশোচনার গোড়ার কথা। আচ্ছা, যে যা মনে করে করুক। উজ্জয়িনী যদি ভুলও করে ফেলে তবু অনুশোচনা করবে না, শুধু ভুলটার সংশোধন যদি সম্ভব হয় তবে করবে এবং ভবিষ্যতে যাতে অমন ভুল না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখবে।

১২

উজ্জয়িনী শ্বশুরকে বলল, "বাবা, আমি এখন থেকে নিরামিষ খাব।"

মহিমচন্দ্র কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইলেন। এ মেয়ের মুখে এমন কথা! দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ! এর রক্তমাংস খুঁড়লে কত রকম অখাদ্য বংশানুক্রমিকভাবে স্তরকে স্তর উদ্ধার করা যায়। এ কিনা বলে নিরামিষ খাব।

মহিম বলেন, "হা হা হা হা। কে তোমাকে ও মতি দিল, মা? তোমার বয়সে আমরা কী খেতে বাকী রেখেছি? যে বয়সের যেটা। ওসব পাগলামি আরো তিরিশ বছর তুলে রাখ, মা।"

উজ্জয়িনী তার জেদ ছাড়ল না। সে জীবহিংসা করতে পারবে না, তাতে অশোকের স্মৃতির প্রতি অপমান হয়, বুদ্ধদেবের মহাবোধি-লাভের মর্যাদা থাকে না।

মহিমচন্দ্র প্রমাদ গণলেন। সাহেবসুবোকে বাড়িতে ডাকার সৌভাগ্য ঘটে উঠবে না। স্বয়ং হোস্টেস হলেন ভেজিটেরিয়ান। এ মেয়েকে কেউ খেতেও ডাকবে না। সবাই টিটকারী দেবে। বলবে, আই-সি-এসের এমন বৌ? যোগানন্দই বা কী ভাববেন। ভাববেন, মহিমের কুশিক্ষা। স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে যেতে পারে। বাঘ যদি হঠাৎ নিরামিষাশী হয় তবে কি তার শরীর থাকে?

তবু তিনি মনে মনে খুশিও হলেন। এখন থেকে তাঁকে আর লুকিয়ে সাত্ত্বিক আহার সারতে হবে না।

বললেন, "আচ্ছা খাবে খাও, কিন্তু গোঁড়ামি কোরো না। কাউকে খেতে ডাকলে তার সঙ্গে আমিষ খেতে হবে।"

উজ্জয়িনী কথা দিতে না পেরে চুপ করে থাকল। মহিম ভাবলেন ওটা সম্মতির লক্ষণ।

নিরামিষ আরম্ভ করে উজ্জয়িনীর খাওয়া কমে গেল। মুখরোচক হয় না। মোটা হয়ে যাবার ভয়ে দুধ বা মিষ্টান্নও খায় না। সেই সময়টা ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছিল, উজ্জয়িনীরও হল।

সর্বাঙ্গে বেদনা। মাথা ব্যথা। অকারণ শীতে গা কাঁপা। উজ্জয়িনী বিছানায় পড়ে না পারে কিছু পড়তে না পারে গুছিয়ে ভাবতে। ডাক্তার দেখে যায়। মহিম বলেন, "নিরামিষ খাওয়া তোমার বয়সে নিরাপদ নয়। এখন থেকে আমি একাই খাব।"

উজ্জয়িনী চোখ বুজে যাতনায় ছটফট করছিল। বারম্বার পাশ ফিরছিল, গায়ের লেপ পা দিয়ে ঠেলে ফেলছিল ও হাত দিয়ে টেনে তুলছিল। ঝি-রা পা টিপে দিতে আসে, উজ্জয়িনী তাদের ফিরিয়ে দেয়। পরের সেবা নিতে তার প্রবৃত্তি হয় না। আত্মীয়ের সেবা তবু সহ্য হয়।

কে এসে তার শিয়রে বসল ও তার কপালে হাত রেখে উত্তাপের পরিমাপ করল। উজ্জয়িনী চমকে উঠে বলল, "কে?" কিন্তু মাথার যন্ত্রণায় চোখ মেলতে পারল না।

"কে?"

"আমি।" সলজ্জ কণ্ঠস্বর।

"কে আপনি? মাপ করবেন, চিনতে পারছিনে। মলিনা?"

"বীণা।"

উত্তেজনার আতিশয্যে উজ্জয়িনী এক উদ্যমে উঠে বসল। কিন্তু এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে ছিন্নমূল তরুর মতো ভেঙে পড়ল। সেই সুযোগে বীণা তার মাথাটি নিজের কোলের উপর অতি ধীরে তুলে নিল। উজ্জয়িনী বিনা দ্বিধায় আত্মসমর্পণ করল। এবং আবেশে তার শরীর অসাড় হয়ে এল। তার চুলগুলিকে একত্র করতে করতে বীণা তার

মনের কথা নিজের আঙুলের ডগা দিয়ে শুনতে পাচ্ছিল এবং সেই সূত্রে নিজের মনের কথা শুনিয়ে দিচ্ছিল । কোনোপক্ষে বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন ছিল না । ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে গেল । স্বামীর বাড়ি ফেরার সময় হলে বীণা উজ্জয়িনীর কানের কাছে মুখ নিয়ে তেমনি সলজ্জ স্বরে বলল, "কাল আসব ।"

উজ্জয়িনীর প্রাণ চাইছিল বীণাকে চিরকালের মতো আটকে রাখতে । বীণার জন্যেই তো তার এই দশা । এ কথা এখনো বীণাকে শোনানো হয়নি । কাল ? কাল-এর কত দেরি । সন্ধ্যা হবে, রাত পোহাবে, ভোর হবে, স্বামী শ্বশুরকে খাইয়ে তার পরে বীণা আসবে । অসহ্য । তবু উজ্জয়িনী নির্বিবাদে মাথা সরিয়ে নিল । বলল, "বহু ধন্যবাদ ।"

বীণা এই হৃদয়হীন ভদ্রতাটুকুর জন্যে প্রস্তুত ছিল না । এর উত্তরে যে কী বলতে হয় তাও তার জানা ছিল না । তার শিক্ষা দীক্ষা স্বল্প । কখনো উজ্জয়িনীদের সমাজে মেশেনি । সে ভারি অপ্রস্তুত বোধ করে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল । অবশেষে উজ্জয়িনীর মাথার বালিশটা ও গায়ের লেপটা সাজিয়ে মুদিত-নয়নার কাছে করুণনয়নে বিদায় নিল ।

পরদিন উজ্জয়িনীর অসুখ অনেকটা সেরে যাওয়ায় উজ্জয়িনী বিছানা ছেড়ে শোবার ঘরেই পায়চারি করছিল । হঠাৎ ঘরের কপাট ঠেলে বীণার প্রবেশ । কপাটে টোকা দিয়ে "আসতে পারে কি ?" বলতে হয় এ কথা বীণার জানা ছিল না । উজ্জয়িনীর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি হয়ে যাওয়ায় সে বিষম অপদস্থ হয়ে চোখ নামাল ।

উজ্জয়িনী বলল, "বসুন ।"

বীণা সংকুচিত হয়ে কোথায় বসবে ঠিক বুঝতে না পেরে উজ্জয়িনীর বিছানার উপর ধপ করে বসে পড়ল । বসে একখানা ধর্মগ্রন্থের পাতা ওল্টাতে লাগল । দুএকটা জায়গা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পড়েও ফেলল । কিন্তু একটিও কথা বলতে পারল না । "আপনি আজ কেমন বোধ করছেন ?" পর্যন্ত না ।

উজ্জয়িনীও কী বলবে ভেবে পেল না । অতিথি এসেছেন । কিছু খেতে বলবে কি ? বসবার ঘরে নিয়ে যাবে ? কাল এই অপরিচিতার কাছে একান্ত স্বাভাবিক ভাবে সেবা নিয়েছিল, ভালো করে ধন্যবাদ জানাবে কি ? অভাবনীয় ভাবে পরিচয় । কার কাছে খবর পেলেন যে আমার অসুখ করেছে ?—কিংবা এমনি কিছু প্রশ্ন । কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেল না । উজ্জয়িনী ঘেমে উঠল ।

অবশেষে বীণাই কথা পাড়ল । বলল, "আপনি বাংলা বই পড়েন ?"

উজ্জয়িনী বলল, "কেন ও কথা জিজ্ঞাসা করলেন ?"

বীণা অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত হয়ে মৌন রইল ।

উজ্জয়িনী বলল, "বাংলা আমারও মাতৃভাষা ।"

তবু বীণা কথা বলল না। উজ্জয়িনী দেখল বীণা আঘাত পেয়েছে। লজ্জিত হয়ে বলল, “আপনি বুঝি মনে করেছিলেন আমরা খুব সাহেবীভাবাপন্ন ?”

বীণা বলল, “লোকে তো তাই বলে।”

“এবার যখন বলবে তখন বিশ্বাস করবেন না। কেমন ?”

“বললে, আমি বলব, উনি ‘যোগ ও সাধন রহস্য’ পড়েন।”

“না, না, ছি, ছি। ও কথা ফাঁস করে দেবেন না। আমি বড় লজ্জিত হব।”

“কেন, লজ্জা কিসের ? আমিও তো এই রকম বই পড়তে ভালোবাসি। কতকগুলো বাজে নাটক নভেল পড়ে লাভ কী।”

“তবে সব নাটক নভেল বাজে নয়। আপনি কি ডিকেন্সের কোনো বই পড়েছেন ?”

“আমি ইংরেজী তেমন বুঝতে পারিনে, ভাই। থার্ড ক্লাশ অবধি পড়েছিলুম।”

“তবে তো আমার চেয়ে বেশীই পড়েছেন—আমি সিক্স্‌থ্‌ ক্লাশ অবধি।”—উজ্জয়িনী ভাবল এইবার বীণা তাকে সমান ভেবে আত্মীয়তা করবে।

বীণা বলল, “তা হলেও ইংরাজী আপনাদের পরিবারে কুকুর বেড়ালেও ভালো জানে। উনি জানেন কিনা আপনার বাবাকে।”

“সত্যি ! বাবাকে লিখব আমি এ কথা।”

এর পরে দু’জনাতে অনেকক্ষণ ধরে কত যে কথাবার্তা। একজনের মুখে ‘ভাই’ সম্বোধনটি শুনতে উজ্জয়িনীর কী যে ভালো লাগছিল।

দুই মার্গ

১

এদিকে উজ্জয়িনীর যেমন বীণা ওদিকে বাদলেরও তেমনি এক বন্ধু হয়েছে। ফ্রেড কলিন্স।

ফ্রেড কলিন্স কখন এসে বাদলের পাশে দাঁড়িয়েছে বাদল লক্ষ্য করেনি। বাদল একখানা নতুন বইয়ের ব্যর্থ সন্ধানে গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছিল। পার্শ্ববর্তী যুবকটি বলল, ”কোন বইখানি খুঁজছেন জানতে পারি কি ?”

বাদল বলল, “নিশ্চয়। Molnar’s Plays.”

যুবকটি উচ্চ হাস্য পূর্বক বলল, “লাইব্রেরীর এ মাথা থেকে ও মাথা অবধি চুঁড়লেও ও-বই পাবেন না। অত নতুন বই এরা রাখবে কেন ?” একটু থেমে বলল, “কিন্তু আমি আপনাকে সংগ্রহ করে দিতে পারি। কবে চান ?”

“সম্ভব হলে কাল। অজস্র ধন্যবাদ।”

সেই রাত্রেই যুবকটি বাদলকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে আরো একজন কে

থাকে । দুজনে থাকায় ভাড়া কম লাগে । যে অংশে যুবকটির অধিকার বাদল সেখানে বসে বইপত্র নাড়া চাড়া করল । কিন্তু বই দেখে টের পেল না যুবকটি কিসের ছাত্র । বেশীর ভাগ বই Art সংক্রান্ত, কিছু rare books, কিছু মনোবিজ্ঞানের বই ।

বাদল জিজ্ঞাসা করল, "যদি কিছু মনে না করেন জানতে পারি কি আপনি কিসের ছাত্র ?"

যুবকটি স্বভাবসিদ্ধ উচ্চ হাস্য সহকারে বলল, "আপনিই আন্দাজ করুন ।"

"আমি তো ভেবেই পাইনে ।"

"আমি ছাত্রই নই । আমি বুক সেলার । এতদিন অন্যের দোকানে কাজ শিখছিলুম, সবে নিজের দোকান খুলেছি ।"

বাদল বলল, "হাউ ইন্টারেস্টিং !" বাদলের কল্পনা দপ করে জ্বলে উঠল । আহা, তারও যদি একটি বইয়ের দোকান থাকত । দুনিয়ার বাছা বাছা বই সেখানে বিক্রী হত, বই বিক্রীর অবসরে সে নিজে সেই সব বই পড়ে শেষ করত ।

কলিন্স তাকে দোকানে যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখল । বলল, "যদি কোনোদিন নষ্ট করবার মতো সময় আপনার হাতে থাকে তবে আসবেন আমার দোকানে । যত খুশি বই ঘাঁটবেন । তর্ক করবেন । আরো অনেকে আসেন ।"

সিটি অঞ্চলে দোকান । একটা ছোট গলির একপ্রান্তে basement-এর ভিতর । বাদল একদিন বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে উপস্থিত হল । দেখল কলিন্স একা বসে কাজ করছে একটি কোণে । দুখানা ঘরে নূতন ও পুরাতন বই সযত্নে সাজানো । কতক শেল্‌ফের উপর, কতক টেবলের উপর । এ ছাড়া শো-উইণ্ডোতে কিছু টাটকা বই পথিককে হাতছানি দিচ্ছে ।

এক সঙ্গে অনেক বই দেখলে বাদল শোকার্ত হয় । জীবন ব্যর্থ গেল, পৃথিবীর জ্ঞান সঞ্চয় প্রায় অনাস্বাদিত রইল । প্রতিদিন মানুষের জ্ঞাতব্য স্তূপাকার হয়ে চলেছে, কিন্তু দিনের পরিমাণ সেই চব্বিশ ঘণ্টা ।

বাদলকে দেখে কলিন্স ছুটে এল । তার হাতে প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে তার কবজির হাড়গুলোকে মটকায় আর কি রাহুর প্রেম । ছ ফুট লম্বা ষণ্ডা ছেলে, অট্টহাসিতে ছাত ফাটায়, কথা বলে যেন গাঁক গাঁক করে । বাদলেরই সমবয়সী কিন্তু ইয়া মোটা তার হাড়, ইয়া শক্ত তার মাংসপেশী, ইয়া চওড়া তার বুক । বাদলের কান্না পেতে লাগল তার সঙ্গে নিজের তুলনা করে ।

কলিন্স্ বলল, "আমার সহকারীটি গেছে তার লাঞ্চ খেতে । তাই একা । আপনার খাওয়া হয়েছে ?"

বাদল বলল, "না ।"

কলিন্স বলল, "তবে এক সঙ্গেই খেতে যাওয়া যাবে। সহকারীটি ফিরলে তার উপর দোকানের ভার দিয়ে যাব।"

কলিন্স বাদলকে বই পেড়ে পেড়ে দেখায়। বইয়ের ভিতরটার চেয়ে বাইরেটারই সমালোচনা করে বেশী। কারা ছেপেছে, কারা প্রকাশ করেছে, বইয়ের বাজার কেমন,—এই সব বলে। কলিন্সের অভিলাষ শুধু পুস্তক-বিক্রেতা নয় পুস্তক-প্রকাশকও হবে, নিউ ইয়র্কে থাকবে তার শাখা। বাদলের দেশে—কলকাতায়—শাখা স্থাপন করতেও পারে। সবই ক্রমে ক্রমে হবে। সকলেই সামান্য থেকে আরম্ভ করে। এই দেখ না কেন, **Ernest Benn** এককালে কী ছিলেন, আর আজ কী হয়েছেন!

কলিন্সের বাহুতে যেমন বল, প্রাণে তেমনি অভিলাষ। নিজের হাতের জোরে সে একটা জিনিস তৈরি করে তুলছে, তার ভাগ্যের বিধাতা সে নিজে। এতে তার আত্মবিশ্বাস বিকাশ পাচ্ছে। কোনো একটা বড় দোকানের বড় চাকুরে হলে এমনটি হত না।

খেতে খেতে এই নিয়ে কলিন্সের সঙ্গে বাদলের আলোচনা। কলিন্স বলল, "আমার ব্যবসাকে [illegible] আমি লিমিটেড কোম্পানী হতে দেব না। লিমিটেড কোম্পানী হওয়াটা ব্যবসায়ের পক্ষে চরম অবস্থা। তার পরে সে হয় টিঁকবে, নয় ভাঙবে, কিন্তু বৃদ্ধি তার ঐ পর্যন্ত। টাকা? টাকা চাই বটে, কিন্তু তার চেয়েও যা চাই তা হচ্ছে কর্তৃত্ব। বৃদ্ধি চাই বলেই সর্বময় কর্তৃত্ব চাই।"

বাদল বলল, "আপনি তা হলে ডেমক্রেসীতে আস্থাবান নন, মিস্টার কলিন্স?"

রেস্তোরাঁর ওয়েট্রেস্‌দের প্রতি সম্মানবশত কলিন্স তার স্বভাবসিদ্ধ উদ্দাম হাসিকে অতিকষ্টে চাপল। বলল, "ডেমক্রেসীর নমুনা দেখাতে পারেন?"

বাদল বলল, "কেন, ইংলণ্ড?"

কলিন্স আবার হাসি চাপল। চাপাহাসি মুখের এক স্থানে বাধা পেয়ে মুখের সর্বত্র চারিয়ে গেল। বলল, "ওটা আগে ছিল ছদ্মবেশী অলিগার্কী, এখন ছদ্মবেশী ব্যুরোক্রেসী। কন্‌সারভেটিভ বলুন, লিবারল বলুন, লেবার বলুন, যেই রাজত্ব করুক না কেন ইংলণ্ডের শাসনযন্ত্র যেমন চলছে তেমনি চলতে থাকবে। আমার মতো উচ্চাভিলাষী লোক পলিটিক্সে গিয়ে বড় জোর টুঁটো প্রাইম মিনিস্টার হত। তাতে আমোদ নেই, মিস্টার সেন। আমোদ আছে স্যার আলফ্রেড মণ্ড হওয়ায়। ব্যবসায় জগতের মুসোলিনী হওয়ায়।"

বাদল চিন্তা করতে লাগল।

কলিন্স্‌ বলল, "এদেশে পলিটিক্স এদেশের সর্বনাশ করছে। এর মঙ্গল এর পলিটিক্সে নেই। জনকতক বড় ইকনমিস্ট, বড় বৈজ্ঞানিক ও বড় বিজ্‌নেস আইডিয়ালিস্ট—যেমন মণ্ড্‌—এরাই একজোট হয়ে এ দেশকে বাঁচাতে পারে। নান্যঃ পন্থাঃ।"

বাদল বলল, "কেন অমন কথা বললেন ওর কৈফিয়ৎ দিন, মিস্টার কলিন্স।"

কলিন্স তার প্রিয় খাদ্য রোস্ট বীফ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। উত্তর করল না। কিন্তু বোঝা গেল কী একটা বলতে তার মন আঁকু-পাঁকু করছে।

বাদল সেই সুযোগে আরো একটি প্রশ্ন করল। বলল, "অমন করে একটা প্রথম শ্রেণীর শক্তিকে ক'বছর বাঁচিয়ে রাখা যায়; ইটালীর কথা আলাদা, ইটালী একটা বাজে নেশন, তাকে না করে কেউ ভয় না করে কেউ ভক্তি।"

কলিন্স এতক্ষণে মুক্তকণ্ঠ হয়েছিল। বলল, "কিন্তু ইটালীর শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা যে অসীম। বড় ইকনমিস্ট বড় বৈজ্ঞানিক ও বড় বড় আদর্শবাদী বণিক যদি ইটালীর জোটে তবে কোনো ব্যুরোক্রেসী তাদের পদে পদে হোঁচট খাওয়াবে না। যদি আমাদের ভাগ্যে জোটে—জুটেছে আমাদের ভাগ্যে—তবে আমাদের শাসনযন্ত্র হবে তাদের প্রতিকূল। আর এদেশে যে-সব রাজনৈতিক দল আছে তারা যেমন নির্বোধ তেমনি কল্পনাকুণ্ঠ এবং মেয়েমানুষের মতো হিংসুটে।" এই বলে সে হাস্যবিদীর্ণ হতে গিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে থেমে গেল।

নারীনিন্দা শুনে বাদল বিরক্ত হয়ে চুপ করল।

২

কলিন্স মোটা গলায় গাঁক গাঁক করে গান করতে করতে কাজ করে। বাদল তার পাশের চেয়ারে বসে বই পড়ে। ইচ্ছা করে কলিন্সের মতো কাজের লোক হয়, কিন্তু দু একদিন শখের শিক্ষানবিশী করে দেখল দোকানদারীতে মন লাগছে না, বই পড়ার নেশা দুর্বার হচ্ছে। ময়রার দোকানে কাজ শিখতে গেলে বাদল বোধ হয় চুরি করে মিষ্টান্ন ধ্বংস করত। কোনো সত্যিকারের ময়রা তা করে না।

বাদল বই পড়ে আর থেকে থেকে তর্ক করে। কলিন্স চতুর ব্যবসাদার, তার দোকানের আগন্তুকদের সে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে। তাঁরা বই কিনুন বা না কিনুন পড়ে দেখুন। পড়ে তর্ক করুন, গল্প করুন, চা খান। কলিন্স সবাইকে এ কথা বলে রেখেছে। নষ্ট করবার মতো সময় যাঁর হাতে থাকে তিনিই একবার কলিন্সের দোকান হয়ে যান। তাঁদের কেউ বা প্রোফেসার, কেউ বা ব্যাঙ্কের কেরানী, কেউ ছাত্র। কলিন্সের ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে কেউ তাকে ধাপ্পা দেবার কথা মনে আনেন না। কারণ একবার ধাপ্পা দিলে দ্বিতীয়বার মুখ দেখাতে পারবেন না, তাতে নিজেকেই বঞ্চিত করা হয়।

কলিন্সের দোকান যেন জনকয়েক বন্ধুর যৌথ দোকান। এঁরা মূলধন খাটাননি, লভ্যাংশও পান না। কিন্তু এঁরা বই কেনার উপলক্ষে যে পরিমাণ অর্থব্যয় করেন

সেটার বহু গুণ ফিরে পান বিনা মূল্যে আরো অনেক বই পড়তে পাওয়ায় এবং দশজনে মিলে চিন্তা-বিনিময় করায়। কলিন্স সবাইকে খুলে বলে রেখেছে, "আপনারা এখানে যে টাকাটা খরচ করেন সেটার থেকে দোকানের খরচা ও দোকানদারের মজুরি বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে আমি আরো বই কিনি, বইগুলিকে আরো বেশী জায়গা দিই এবং আপনাদের আরামের জন্তে আরো ভালো বন্দোবস্ত করি। দোকানটি বাড়তে থাকুক এই আমার কামনা ; সেই সঙ্গে আমিও যেন নেহাৎ অনাহারে না মরি।"

কাজেই দোকানটির প্রতি সকলেরই বিশেষ মমতা। একবার এসে কেউ খালি হাতে ফিরে যান না বড় একটা। অন্তত একখানা বই কি পত্রিকা কেনেন। কতকগুলি বাঁধা খরিদ্দার থাকায় কলিন্সের দোকান এই অল্প দিনের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। সে আরো মূলধন খাটাতে ইচ্ছুক, কিন্তু পরের কাছ থেকে সংগ্রহ করলে পাছে পরের মুরুব্বিয়ানা সহ্য করতে হয় সেইজন্তে মনের মতো অংশীদারের প্রতীক্ষা করছে। সে চায় তারই মতো বিজ্‌নেস্ আইডিয়ালিস্ট, যে মানুষ নিজের স্বার্থের চেয়ে দোকানের স্বার্থকে বড় করবে।

বাদলের যদি টাকা থাকত তবে বাদল কলিন্সের অংশীদার হত। কিন্তু এখনো সে তার বাবার গলগ্রহ। এজন্তে তার মাঝে মাঝে গ্লানি বোধ হয়। তখন সে কী করবে ভেবে কাতর হয়, কিন্তু লজ্জার খাতিরে সুধীদাকে বলতে পারে না, পাছে সুধীদা বাবাকে জানায়। অনুশোচনায় খাওয়া বন্ধ করে, কিন্তু না খেয়ে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। একবেলা কিছু না খেলে অন্তবেলা দুগুণ খায়। মনকে বোঝায়, ধার নিচ্ছি বৈ তো নয়। বাবার টাকার পাই পয়সা হিসাব করে বাবাকে ফিরিয়ে দেব, সায় সুদ। তিনি যদি না নেন তো তাঁর নামে একটা লাইব্রেরী করে দেব। এই ভেবে সে হিসাব করতে বসে অদ্যাবধি তার বাবা তার দরুণ কত খরচ করেছেন। জন্মদিন থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত মাসে গড়পড়তা পঞ্চাশ টাকা করে ধরা যাক। তাহলে দাঁড়ায় বিলেত আসার পূর্বাহ্ন অবধি মোট বারো হাজার টাকা। মাঝখানে কয়েক বছর সে স্কলারশিপ পেয়েছে। সেটা না হয় বাদ দেওয়া গেল। তারপর আসার সময় ও আসার পর থেকে একুনে আঠারো হাজার টাকা। সর্বমোট ত্রিশ হাজার টাকা। Compound interest হিসাব করবার মতো ধৈর্য বাদলের ছিল না। আচ্ছা, দশ হাজার টাকাই না হয় সুদ স্বরূপ দেওয়া গেল। তা হলে দাঁড়ায় চল্লিশ হাজার টাকা। এখনকার বিনিময়ের হারে তিন্ হাজার পাউণ্ড। ভবিষ্যতে যদি এই বিনিময় হার টেঁকে তবে মাত্র তিন হাজার পাউণ্ড তার মতো ব্যারিস্টারের এক বছরের আয় থেকে শোধ করে দেওয়া সম্ভব।

আপাতত কলিন্সের ব্যবসায় মূলধন ঢালতে হলে বাবাকে বিরক্ত করতে হয়। একে তো ভারতবর্ষীয় মূলধন "লাজুক"। তা ছাড়া ভারতবর্ষ নিজেই এখন মূলধনের অল্পতায়

কষ্ট পাচ্ছে, ঘরের মূলধন বাইরে পাঠালে নিজের প্রতি অন্যায় করবে। ভারতবর্ষের প্রতি বাদলের দরদ অকৃত্রিম। তবু দে সরকার বলে, "আপনি মশাই ভারতবর্ষের কেউ নন। ভারতবর্ষের electrification ইত্যাদির জন্যে মাথা ঘামান কেন? সেটা আপনার সাম্রাজ্যের মধ্যে বলে?"

বাদলকে ওরা ইচ্ছা করে ভুল বোঝে। ক্ষ্যাপায়। ব্যঙ্গ করে। বলে, "শাসিতের দল ছেড়ে শাসকের দলে ভর্তি হয়ে অনেক স্থবিধা আছে, সেন সাহেব। কিন্তু তাতে নূতনত্ব নেই। বছর পঞ্চাশ আগে জন্মালে বাহবা পেতেন। কিন্তু এটা গান্ধী-যুগ। এ যুগে স্বয়ং শাদা চামড়ার অধিকারী অধিকারিণীরা ভারতীয় হতে পারলে ধন্য হয়।"

বাদল যত বলে, "আমি ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স থেকে ইংরেজ হচ্ছিনে, গভীরতম অভিরুচি থেকে হচ্ছি", ওরা ততই ক্ষ্যাপায়। বলে, "যদি বুল্‌গেরিয়ান হতেন, হাঙ্গেরিয়ান হতেন, চেক হতেন তবে প্রমাণ হত গভীরতম অভিরুচি বটে।"

ওদের মধ্যে একজন আমেরিকা-ফেরৎ বাঙালী ছাত্র ছিল। সে বলে, "সেন সাহেব কিন্তু ঘোড়দৌড়ের দিনে ভুল ঘোড়ার উপর বাজী রাখছেন। ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। একে একে নিবিছে দেউটি। আর পঞ্চাশ বছর পরে ইংলণ্ড হবে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তি। সময় থাকতে আমেরিকান হন, মিস্টার সেন। তা যদি না পারেন, তবে রাশিয়ান।"

বাদল তাদের বিশ্বাস করাতে পারে না যে তার ইংলণ্ডপ্রীতির হেতু আর যাই হোক এটা নয় যে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের মালিক কিংবা পৃথিবীর সেরা নেশন। ইংলণ্ড যদি কাল ভারতবর্ষের অধীন হয় তা হলেও সে ইংরেজ থাকবে। Lafcadio Hearn যে কারণে জাপানী সেও সেই কারণে ইংরেজ। সেই কারণটি হচ্ছে মনের পক্ষপাত।

কলিন্সের সঙ্গেও তার এই নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। কলিন্স বলে, "ইংলণ্ডে বহু বিদেশী বাসা বেঁধেছে—ইহুদী, আর্মিনিয়ান, গ্রীক, রাশিয়ান, ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান। গত শতাব্দীতে যতগুলো বিপ্লব হয়ে গেছে ইউরোপের নানা দেশে, তার প্রত্যেকটাতে কিছু না কিছু পলাতক ইংলণ্ডে এসে আশ্রয় নিয়েছে ও অবশেষে ইংরেজ হয়ে গেছে। এই শতাব্দীতে হল রাশিয়ায় বিপ্লব, ইংলণ্ডে আজ রাশিয়ান শরণাগত বহু সহস্র। ভারতবর্ষেও একটা বিপর্যয় অনিবার্য, ভারতবর্ষ থেকেও দলে দলে পলাতক আসবে এবং তাদের আশ্রয় দিতে আমরা ধর্মত বাধ্য।"

বাদল মর্মাহত হয়ে বলে, "কিন্তু আমি তো পলাতক নই, আশ্রয় চাইনে। আমি প্রেমিক, আমি চাই গৃহ। ভারতবর্ষে থেকে আমি কর্মী ও নেতা হতে পারতুম, এখনো ফিরে গিয়ে হতে পারি। কিন্তু ওতে আমার তৃপ্তি হবে না। আমি থাকব সভ্যজগতের কেন্দ্রস্থলীতে। আমি বাসিন্দা হব সেইখানকার যেখান থেকে ও যেখানে এসে চিন্তা ও

কর্মের বিশ্বব্যাপী প্রবাহ আরব্ধ ও অবসিত হচ্ছে। জীবনের প্রতি আমার মনোভাব ইংরেজের মনোভাবের সদৃশ। তাই আমি ইংরেজ।"

কপিল রসিকতা করে বলে, "সাবাস্। কিন্তু আমাদের এই খেয়ালী ওয়েদারকে বরদাস্ত না করতে পেরে শেষকালে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কোরো না, সেন।"

৩

দিবারাত্র একটা অনবচ্ছিন্ন উত্তেজনার মধ্যে বাস করতে করতে বাদল সুধীকে ভুলল। সাতদিনে একবারও দেখা হয় না। সুধী ফোন করলে অন্যে ফোন ধরে, বাদল বাড়ি থাকে না। বাদল ফোন করলে কেবল বলে নতুন কার সঙ্গে আলাপ হল ও তাঁর সঙ্গে কী নিয়ে তর্ক হয়ে গেল। এতে সুধীর সন্তোষ হয় না। সে বাদলকে আরো গভীর ভাবে জানতে ও পেতে চায়।

আগের মতোই সে বন্ধুবৎসল আছে, দিনান্তে অন্তত একবার তার বাদলকে মনে পড়ে। বাদল আজ কী করল কী ভাবল কী ভাবে দিনটির ও নিজের পরিচয় পেল— বাদলকে শুধাতে চায়, পাটনার মতো। বেশীদিন আগের কথা তো নয় যখন তারা পরস্পরকে নিজ নিজ জীবনের নূতনতম উপলব্ধির অংশ দিত। তখনকার দিনে তাদের জীবনে ত্বরা ছিল না, দুবেলা নব নব অতিথির আকস্মিক আগমন ঘটত না, তাদের জগতের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র দুই। বিলাতে এসে সুধী নিজের জগৎকে জনবহুল করেনি, তার পরিচিত ও আলাপীর সংখ্যা একাধিক হলেও তার বন্ধু যেটি ছিল সেটিও আর নেই। মনের কথা যেই পুঞ্জীকৃত হয়ে মনকে ভারাক্রান্ত করে অমনি সে উজ্জয়িনীকে চিঠি লিখতে বসে। তবু বাদলের স্থান পূরণ হয় না।

বাদলকে একদিন সুধী বহুকষ্টে পাকড়াও করল। সুধী জানত বাদল রবিবার বেলা করে ওঠে। বাদলের বাড়ীর কাউকে খবর না দিয়ে সুধী এক রবিবারের সকালে সোজা গিয়ে বেল টিপল। উইল্‌সরা ঐ দিনটা একটু বাদশাহী ধরনে ঘুমায়, ওদের ঘুম ভাঙল না। বেচারা বাদল তার ভাঙা ঘুম জোড়া লাগবে এই আশায় একটা পুরোনো স্বপ্নের উপসংহার রচনা করছিল, অগত্যা সেই অপ্রসন্ন মনে নিচে নেমে এল।

"তুমি।"

"চিনতে পেরেছিস এই যথেষ্ট।"

"কিন্তু বুঝতে পারছিনে।"

"তা হোক, আজ দিনটা পরিষ্কার। আয়, বাসের মাথায় চড়ে শহর বেড়াই।"

ওটা একটা নতুন আইডিয়া। বাদল উৎসাহের সঙ্গে রাজি হল। কিন্তু মিসেস উইল্‌সের যখন ডাক পড়বে তখন অনুপস্থিত থাকলে যে মুশকিল। সুধীর পরামর্শ অনুসারে

বাদল মিসেস উইল্‌স্‌কে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেল।

যে দিকে খুশি সে দিকে যাবে, যতক্ষণ খুশি ততক্ষণ বেড়াবে, খিদে পেলে কোথাও নেমে খাবে, জল এলে বাসের ভিতর ঢুকবে—এই হল তাদের সেদিনের প্রোগ্রাম।

বাদল বললে, "কতকাল তোমার সঙ্গে কথা কওয়া হয়নি, সুধীদা। আশ্চর্য, বাংলা এখনো অনায়াসে বলতে পারছি। এই কয়েক সপ্তাহে ভয়ানক ইংরেজ বনে গেছি।"

সুধী বলল, "ঐ নিয়ে তোর সঙ্গে আজ তর্ক করতে এসেছি, বাদল। তোকে মনে করিয়ে দিতে চাই বিলেত আসার আগে তুই ও আমি একদিন সন্ধ্যাবেলা গঙ্গার ধারে বসে কী ব্রত গ্রহণ করেছিলুম।"

"অতীতকে মনে করে রাখতে আমার প্রবৃত্তি হয় না, সুধীদা। অতীতকে মন থেকে না নড়াতে পারলে বর্তমানকে আসন দিতে পারিনে। আহূত অতিথির মতো সে দরজার বাইরে পায়চারি করতে করতে কখন এক সময় সরে পড়ে অপমানের গ্লানিতে।"

"তবে কি তুই বলতে চাস্ যে মানুষ তার অতীতের প্রতিশ্রুতি ভুলবে, সংকল্প রক্ষা করবে না, ঋণ শোধ করবার সময় এলে বলবে কিসের ঋণ' ? তোর ইংরেজরাও এই কথা বলেন নাকি ?"

বাদল ইন্‌ডিগ্‌নান্ট্‌ হয়ে বলল, "ইংরেজ কখনও কথার খেলাপ করে না। রাশিয়া যেমন ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ করল, তারপর ঋণটি করল অস্বীকার, ইংলণ্ড তেমন করে না, করতে পারে না।"

"অত উত্তেজিত হস কেন ? আমি কি এমন আভাস দিয়েছি যে ইংলণ্ড আমেরিকার হাত পা ধরে ঋণের বহরটা লঘু করবার চেষ্টায় আছে এবং তার সেই কাকুতি মিনতির স্বপক্ষে রকমারি যুক্তি দেখাচ্ছে ?"

বাদল রীতিমতো ক্ষেপে গেল। সুধী বলল, "এই চুপ, চুপ, চুপ, পাশের বেঞ্চির লোকগুলো ভাববে কালো মানুষগুলো বাঁদুরে ভাষায় বিষম বচসা করছে !"

বাদল বলল, "ভারি তোমার ভালো মানুষ আমেরিকা। শাইলকের অবতার। মানুষের বিপদে সাহায্য করে মহত্ত্বের ভড়ং করলেন। এখন চান মোটে একটি পাউণ্ড মাংস।"

দিনটি সত্যিই স্নিগ্ধরৌদ্রোজ্জ্বল ছিল। ইংলণ্ডের শীতকালে এমনটি হয় না। সুধী ও বাদল উভয়েরই মনের উপর থেকে একটা পর্দা উঠে গেছল।

হাস্যোদ্ভাসিত মুখে দুজনে দুদিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলল। লণ্ডনের স্থলে স্থলে বহু পুরাতন পার্ক কিংবা বাগান থাকায় ঋজু দীর্ঘ বীচ বার্চ ওক্ প্রভৃতি বৃক্ষের সঙ্গে পঞ্চাশবার দেখা হয়ে যায়। মানুষের তুলনায় ওরাই সূর্যের আলোর বেশী সমঝদার। সুধী ওদের দিকে ও বাদল পথিকদের দিকে দৃষ্টি নিবিষ্ট করল। একজনের পক্ষপাত প্রকৃতির

প্রতি, অপরজনের পক্ষপাত মানুষের প্রতি। সুধী ভাবে, এই যে ওক্ ফার পাইন গাছগুলি এরা কোনো ইংরেজের চেয়ে কম নয়, দেশ এদেরও দেশ, হয়তো এদেরই বেশী, কারণ দেশের মাটিকে এরা সাতপাকে জড়িয়েছে এবং দেশের আলো হাওয়া সকলের আগে ও সকলের চেয়ে বেশী করে এদেরি অঙ্গে ঝঙ্কার তোলে। মানুষের সংসারে মানুষ নিজেকে অত্যন্ত বড় বলে বিশ্বাস করুক ক্ষতি নেই, কিন্তু বিশ্বসংসারে মানুষ অসংখ্য জাতির মধ্যে একটি জাতি এবং এই কথা মনে রেখে তার বিনয়ী হওয়া ভালো। বাদল ভাবে, জয় মানুষের জয়। যা-কিছু দেখছি সব মানুষের হাতের ছোঁয়া ও মগজের ছাপ নিয়ে মূল্যবান হয়েছে, নইলে ঝুটা দলিলের মতো তারা থেকেও থাকত না। এই দেশের মাটি জল আকাশ এ দেশের মানুষের স্বাক্ষর বহন করে যা-কিছু বিশেষত্ব পেয়েছে, নইলে আমি ইংলণ্ডে জন্মাতুমও না, আসতুমও না।

রবিবারের সকাল। দিনটিও উজ্জ্বল্। দলে দলে স্ত্রী পুরুষ পার্কের অভিমুখে চলেছে। যারা পেরেছে তারা কাল সমুদ্রকূলে গেছে; যারা পারে তারা আজও যাচ্ছে, যারা পারে না তাদের যাবার মতো জায়গা লণ্ডনের বৃহদায়তন বৃক্ষগহন অসমতল উপবনগুলি। হ্যাম্পস্টেড্ হীথ, কেনউড, রিজেন্টস্ পার্ক, সাউথ কেনসিংটন, হাইড পার্ক। প্রত্যেকটাতে লোকারণ্য। তবু ঘাসের উপর ঝোপের ভিতর প্রণয়ী প্রণয়িনীরা অর্ধশয়ান রয়েছে এবং তাদেরই কাছ দিয়ে বয় স্কাউটরা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে।

দলে দলে সৈনিক শোভাযাত্রায় চলেছে। মিলিটারী ব্যাণ্ড বাজছে। বাচ্চারা আগে ভাগে ও বুড়োবুড়ীরা পিছু পিছু চলছে। ফুটপাথ দিয়ে ঠেলা গাড়িতে চড়ে যাচ্ছেন হাত-পা ভাঙা দ কিংবা নবজাত শিশু। সামরিক সংস্কার বৃদ্ধ ও মুমূর্ষু থেকে শিশুতে সংক্রামিত হচ্ছে। পাশ দিয়ে চলে গেল সৈনিকের মতো সার বেঁধে ও পা ফেলে কালো ইউনিফর্ম পরা বালিকার দল। ওরা গির্জায় যাচ্ছে। ফুটপাথের খোঁড়া ভিখারী ও হাতকাটা ভিখারী এতক্ষণ হাত দিয়ে ও পা দিয়ে ছবি আঁকছিল, কার্টুন আঁকছিল। শোভাযাত্রা দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়েছে; তাদের ছবি দেখার ভান করে কোনো দয়ালু ভদ্রলোক তাদের চিৎ-করে-রাখা টুপিতে দুটি পেনী ফেলে দিয়ে গেছেন।

৪

সুধী বলল, "বাদল, জীবনের সঙ্গে flirt করার নাম বাঁচা নয়। এ তুই করছিস কী? জীবনের কাছে একদিন যে অঙ্গীকার করেছিস অন্যদিন তা মনেও আনবিনে?"

বাদল অবাক হয়ে বলল, "সুধীদা, তুমি কোন অঙ্গীকারের কথা বলছ?"

এরূপ প্রশ্নের জন্যে সে প্রস্তুত থাকেনি। Woolworth-এর মুড়ি ও মুড়কির মতো সব জিনিস এক দরে বিক্রী করবার দোকান দেখে চিন্তা করছিল, একই কোম্পানীর এক

জাতীয় chain store আজ লণ্ডনের সর্বত্র। কাল পৃথিবীর সর্বত্র ছাইবে। এইসব chain store বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে দ্রুতগতিকে একটা economic unit করে তুলছে। পৃথিবীকে ঐক্যবন্ধনে বাঁধবার এ এক অভিনব শিকল। নাইবা থাকল এর পিছনে আদর্শ। বিনা আদর্শবাদে যদি জগতের প্রগতি হয় তবে কী দরকার আদর্শবাদের ?

ঐ শোভাযাত্রার কুফল ফলবার আগে এইসব chain store-এর সুফল ফলবে। যুদ্ধ করতে গিয়ে ব্যবসার ক্ষতি করতে কেউ রাজি হবে না ; স্বার্থপরতা দিয়ে জগতের স্থায়ী মঙ্গল হবে, স্বার্থত্যাগ দিয়ে যা হয়েছে তা ক্ষণকালীন।

এমন সময় সুধীর খাপছাড়া প্রশ্ন শুনে বাদলের চিন্তার খেই গেল হারিয়ে।

সুধী বলল, “কথা ছিল আমরা দুই স্বতন্ত্র পথ দিয়ে একই সত্যের অভিসারী হব। তুই নিবি ইনটেলেক্টের মার্গ, আর আমি ইনটুইশনের মার্গ। এবং দুজনেই রইব শেষ পর্যন্ত অনভিভূত অনুত্তেজিত ও মোহমুক্ত। তার বদলে এ কী দেখছি ? দেখছি তুই পথভ্রষ্ট হয়ে চোরা গলিতে পা দিয়েছিস ও ইচ্ছাপূর্বক মাদক ব্যবহার করছিস।”

বাদল বলল, “থাম। চার্জগুলো একে একে শোনাও এবং বোঝাও।”

“এক নম্বর চার্জ এই যে, ইংরেজ হবার জন্যে আদা নুন খাবার কোনো যৌক্তিকতা নেই, ওটা অপথে চলা।”

“আমি নট-গিল্‌টী।”

“বেশ। কৈফিয়ৎ দিতে হবে।”

বাদল কিছুক্ষণ নিঃশব্দে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তার কাজের কারণ নিশ্চয় আছেই, কিন্তু কাজের পর কাজ জমে উঠে কারণটাকে কোন পাতালে চাপা দিয়ে fossilএ পরিণত করেছে। এখন স্তরের পর স্তর খুঁড়ে মৃত ও জীর্ণ কারণকে অবচেতনার “hades” থেকে চেতনার প্রাণলোকে উত্তীর্ণ করা যাক।

বাদল মনোরাজ্যের দিকে দিকে মোটর হাঁকিয়ে দিল। ফেরার কারণটাকে পাকড়াও করে আনা চাই-ই, নইলে মুণ্ডু নেবে।

আবিষ্কারের উত্তেজনায় হঠাৎ লাফিয়ে উঠে তারপর বসে পড়ে বলল, “তুমি ভারতবর্ষের দৃষ্টিতে সত্যের পরিচয় নেবে, ঠিক করেছ। ওর বিপরীত হচ্ছে ইংলণ্ডের দৃষ্টি। ইংরেজের চোখে জীবনকে কেমন দেখায় তাই জানবার জন্যে আমার ইংরেজ হওয়া। নইলে তুমি কি মনে কর, সুধীদা, যে ইংরেজী পোশাক ও ইংরেজী চালএর প্রতি vulgar অনুরাগবশত আমি বিলিতি বাঁদর সেজেছি ?”

সুধী বাদলের পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, “রাগ করিসনে, বাঁদর। কিন্তু পোশাকের বাঁদরামির চেয়ে আত্মার বাঁদরামি আরো শোচনীয়, আরো সাংঘাতিক। মনে কর্ হাতীর সাধ গেছে পাখীর জীবনের স্বরূপ দেখবে। সে কেমন মূর্খতা বল্ দেখি।”

বাদল সুধীর হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, "হাতীর অমন সাধ যায় না, যেহেতু সে অনিবার্যভাবে হাতী। তুমি কি জোর করে বলতে পার, সুধীদা, যে তুমি ও আমি অনিবার্যভাবে ভারতীয় ?"

"অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ আমরা হিন্দু হয়ে জন্মিয়েছি বলে আমরণ আমরা হিন্দু থাকতে বাধ্য ? ভারতবর্ষে জন্মিয়েছি বলে অন্য দেশের সিটিজ্‌ন্ হতে পারিনে ? সমস্ত সভ্য দেশে naturalisation-এর ব্যবস্থা আছে, এই ইংলণ্ডেই কত বিদেশীকে ইংরেজ হয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে এ জাতীয় ব্যাপার ভূরি ভূরি। সমস্ত সভ্য দেশে বিদেশিনীকে স্বামীর ন্যাশনালিটী দেওয়া হয়, এর পিছনে কি একটা সহজ সত্য নেই, সুধীদা ?"

সুধী হেসে বলল, "ওগুলো সম্পত্তির ও সন্তানের খাতিরে। আত্মার খাতিরে যে নয় তা জোর করে বলতে পারি, বাদল। তুই তেমন ইংরেজ হলে আমি আপত্তি করতুম না রে। তবে শ্রীমতী উজ্জয়িনীর দশা ভেবে বিচলিত হতুম। সে যে ক্রমেই 'কট্টর' স্বদেশী হয়ে উঠছে।"

বাদল কৌতূহল চেপে গম্ভীরভাবে বলল, "তাঁকে আমি নিষ্কৃতি দেব, সুধীদা।" তারপরে কৌতূহলের উপর থেকে চাপ তুলে নিল। বলল, "তাঁর কাছ থেকে খুব চিঠি পাও বুঝি ?"

"পাই বৈ কি। তবে চিঠিগুলো আমাকে উপলক্ষ করে যাকে লেখা তার হাতে দিতে পারলে খুশি হই।"

"না, না, না।" বাদল সাতঙ্কে বলল। "ওসব মেয়েলি বাংলা চিঠি পড়বার সময় বা শখ নেই আমার। জবাব যখন লিখতে পারব না তখন শুধু পড়েই বা করব কী ! একটা কথা তোমাকে বলি, সুধীদা, আমি ওঁর পাতিব্রত্যকে প্রশ্রয় দিতে চাইনে। বরঞ্চ উনি আমার উপর রাগ করে আমাকে ত্যাগ করুন ও ভুলুন এই আমার মনোবাঞ্ছা।"

সুধী বলল, "কিন্তু বাদল, ওর দিকে যা আছে তা পাতিব্রত্যের চেয়ে সরস।"

"না, না, না, সুধীদা। তাকেও আমি প্রশ্রয় দিতে পারব না। আমি ভালোবাসা টালোবাসা জানিনে, সুধীদা। ওটা খুব সম্ভব একটা glandular action. কার শরীরের মধ্যে কোন ক্রিয়া চলছে সে খবর নিয়ে আমার কী লাভ ? আমার ইন্‌সম্নিয়া কিছু কমবে ?"

আহত হয়ে সুধী বলল, "হ্যাঁ, ইংরেজ হয়েছিস বটে ঠিক। দোকানদারের মতো লাভ লোকসান ওজন করতে শিখেছিস দয়া মায়া স্নেহ প্রীতিরও।"

বাদল তখনও ভাবছিল বিশ্বব্যাপী chain store-এর দ্বারা মানব ঐক্যের কথা।

বলল, "ব্যঙ্গ কর আর যাই কর এ এক মহৎ সত্য যে, দোকানদারদের দিয়ে পৃথিবী যতটা ঐক্য পাবার ততটা পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো পাবে। ইউরোপীয় দোকানদারেরা ঘা মেরে এশিয়ার ঘুম ভাঙিয়েছে, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেছে ও আফ্রিকাকে মানুষ করেছে। এই আজ রেল জাহাজ এরোপ্লেন দেশে দেশে মানুষকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, এই যে স-তার ও বেতার টেলিগ্রাফের সাহায্যে আমাদের সংবাদপত্রগুলি সারা দুনিয়ার তাজা খবর দু বেলা আমাদের দিচ্ছে, এ সব তো দোকানদারেরই স্বার্থপরতার দ্বারা সম্ভব হল।"

সুধী তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "সাধু, সাধু! আর কিছুদিন এই ধরনের ট্রেনিং পেলে রদারমীয়ার কি বীভারব্রুক তোকে লুফে নেবে দেখিস। যেমন পাকা সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠেছিস ভয় হয় পাছে লাট হয়ে বাঁকীপুরেই যাস্।"

সুধীদাও তাকে ভুল বোঝে। অভিমানে বাদলের মুখ ফুটছিল না। সুধী তার মনোভাব আন্দাজ করে বলল, "তোর sense of humour নেই, তুই কিসের ইংরেজ? চল্, কোথাও খেতে যাই।"

ভোজনের পরে বাদলের মনে পড়ল সুধীদার তার নামে আরো একটা চার্জ আছে। বলল, "তোমার দু নম্বর চার্জ কোথায়, সুধীদা?"

সুধী বলল, "থাক্, থাক্, এক দিনের পক্ষে যথেষ্ট বেদনা দিয়েছি। একেই তো আমার ছায়া মাড়াস নে, এর পর হয়তো আমাকে দেখে চিনতে দ্বিধা বোধ করবি।"

বাদল জেদ ধরে বলল, "না, সুধীদা, একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক। নইলে তোমার ঐ কথাগুলো আমার স্মরণে খচ্ খচ্ করবে যে জীবনের সঙ্গে আমি flirt করছি।"

সুধী বলল, "ক্ষমা প্রার্থনা করি, বাদল; কথাগুলো একটু কটু হয়ে গেছে।"

বাদল অধৈর্য হয়ে বলল, "থাক্ সে কথা। এখন আস্তিন থেকে বার কর তোমার দ্বিতীয় অভিযোগ।"

সুধী দুষ্টুমি করে তার আস্তিন দুটো ঝাড়ল। তার ফলে বাদল আরো চটছে অনুমান করে সে গম্ভীর হয়ে বলল, "এক দেশ থেকে অন্য দেশে আসা সহস্র জনের জীবনে ঘটছে। কেই বা তোর মতো নেচে বেড়াচ্ছে শুনি?"

বাদল বলল, "ঐখানেই তো গলদ। ওরা আসে 'এক দেশ থেকে অন্য দেশে।' আমি আসছি আপনার মনোমত দেশে। উত্তেজনা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু মোহ বলছিলে কাকে?"

"কোন জিনিসকে বাড়িয়ে দেখার নাম মোহ।"

"নিজের জিনিসকে মানুষ একটু বাড়িয়ে দেখেই থাকে। তা ছাড়া আমার ইংলণ্ড তো একটা আইডিয়া। যেমন তোমার ভারতবর্ষ একটা আইডিয়া। আপন মনের সৃষ্টির

সম্বন্ধে সব মানুষের দুর্বলতা আছে।"

"কিন্তু আমার ভারতবর্ষ একটা আইডিয়া নয়, বাদল। সেখানে আমার রক্তমাংসের প্রিয়জন আছে। ওদের সঙ্গে আমার নাড়ীর টান। সেই টানে ওরা আমাকে এই মুহূর্তেই টানছে। এদেশে কোনো ভারতীয়কে দেখলে আমার হৃদয় প্রীতিতে উদ্বেল হয়। কিন্তু কোনো ইংরেজকে দেখলে তোর যা হয় সেটা অজানাকে জানবার উত্তেজনা ও সুলভকে দুর্লভ কল্পনা করবার মোহ। যে দরের মানুষের সঙ্গে মিশে তুই রোমাঞ্চ বোধ করিস, বাদল, তুই নিজে তাদের থেকে ঢের উঁচু দরের।"

বাদল অনুধাবন করতে লাগল। বাস্তবিকই সুধীদার অন্তর্দৃষ্টি আছে। যা বলছে নেহাৎ ভ্রান্ত নয়। তবে কিনা, তবে কিনা—বাদলের উদ্দেশ্য ও উপায় আলাদা, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি আলাদা, সে যা করছে তা অন্যের পক্ষে মিথ্যা হলেও তার নিজের পক্ষে সত্য। মোহ এবং উত্তেজনা যদি বিষ হয় তবে বাদল হচ্ছে নীলকণ্ঠ; অপরে যা আত্মসাৎ করে লাভবান হতে পারে না বাদল তা পারে। গর্বে বাদলের বুক ফুলে উঠল। তার সত্যের সন্ধান সর্বজনপরিত্যক্ত পথে। মধ্যযুগে জন্মালে সে বোধ করি তান্ত্রিক হত।

বাদল আবেগের সঙ্গে বলল, "আসবে, সে দিন আসবে। আমি আমার অপথে চলতে চলতে একদিন এমন পরশ পাথর পেয়ে যাব যে এই আপাত অর্থহীন flirt করা পরম অর্থপূর্ণ বলে প্রমাণিত হবে। যে আগুন আমার প্রাণে জ্বলছে, সুধীদা, তুমি আমার নিকটতম বন্ধু আজও তার তেজের পরিমাপ পাওনি। আমার সব তুচ্ছতা, সব ভ্রান্তি, সব পাপ সেই আগুনে ভস্ম হয়ে যাবে। অতএব মা ভৈঃ।"

সুধী তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মনে মনে তাকে আশীর্বাদ করতে লাগল।

৫

সুধীদার অভিযোগ বাদলের আচরণে দাগ রেখে গেল না, কিন্তু মনের ভিতর বিঁধে রইল। রাত্রে যখন সামাজিকতার উৎসাহ ও মোহ মিইয়ে আসে তখন শুয়ে শুয়ে বাদল সুধীদার কথাগুলোকে ভিতর থেকে উপরে তুলে রোমন্থন করে। দিনের বাদল ও রাত্রের বাদল যেন দুজন মানুষ। রাত্রে বাদল একলাটি বিছানায় পড়ে বেশ একটু ভূতের ভয় পায়, পুরু কম্বলের তলায় মুখ গুঁজে গরম জলের চামড়া-বোতলটাকে কাঁকড়ার মতো আঁকড়ে ধরে, হাঁটু দুটোকে ক্রমে ক্রমে মাথার কাছে এনে কুকুর-কুণ্ডলী পাকায়।

রাত্রের বাদল ভারি অসহায়, বড় দুর্বল। থেকে থেকে তার পা কন্ কন্ করে, সর্দিতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। এ সবের প্রতিক্রিয়া তার মনের উপর হয়। সে হঠাৎ খুব অনুতাপপ্রবণ হয়ে ওঠে, দিনটা যে একেবারে নষ্ট গেছে এ বিষয়ে তার সন্দেহ থাকে

না, জীবনটা মোটের উপর ব্যর্থ যাচ্ছে। এই রকম সময় সুধীদার উক্তির দাম বেড়ে যায়। সুধীদা স্বর্ণমৃগের পিছনে ছুটে আয়ু ক্ষয় করছে না, একটা লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছে, হোক না কেন স্থিতিশীল লক্ষ্য। বাদলের লক্ষ্য দিন দিন বদলাচ্ছে, দিন দিন সরে যাচ্ছে। এত ছুটাছুটি করেও তো বাদলের প্রত্যয় হচ্ছে না যে বাদল কিছুমাত্র এগুচ্ছে।

বাদলের বয়সের ইংরেজ যুবক ঐ কলিন্স, কী নিখুঁত স্বাস্থ্য তার, কী উদ্দাম হাস্য, কী গম্ভীর অর্গ্যান-কণ্ঠস্বর। ধরাকে সরা জ্ঞান করে, অথচ এতটুকুও অহংকার নেই তার মনে, এতটুকু হিংসা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা নেই তার স্বভাবে। বাদল যখন কলিন্সের বগলে হাত পুরে দিয়ে রাস্তায় চলে তখন তার এমন লজ্জা করে! সেই যে গল্পে আছে দৈত্যের সঙ্গে বামনের বন্ধুতা। কলিন্সের প্রাণোচ্ছলতার নিত্য নূতন নিদর্শন বাদলকে ঈর্ষান্বিত করে, কিন্তু অক্ষমের ঈর্ষা তার অক্ষমতাই বৃদ্ধি করে। পাল্লা দিয়ে তার সঙ্গে গল্‌ফ্ খেলতে গেছল। হাস্যাস্পদ হয়ে ফিরেছে, অবশ্য নিজের চোখে। কলিন্স তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছে, “হবে, হবে, অভ্যাসে কী না হয়!” এই বলে নিছক প্রাণোল্লাসে মুখ দিয়ে হুর্‌র হুর্‌র আওয়াজ করেছে। তারপর পেট ভরে খেয়েছে ও খেয়ে উঠে বিলিয়ার্ড খেলেছে। বাদলের খাওয়া দেখে চোখের কোণে দুষ্টু হাসি হেসেছে—একটা পাখীর খাওয়া।

এই যে ইংরেজ, এর মতো ইংরেজ হতে পারবে কি? এরই মতো প্রাণ প্রস্রবণ? এমনি প্রাণপূর্ণ, অথচ মৃত্যুভয়শূন্য? একদিন কলিন্স বলেছিল, “যুদ্ধ? আবার বাধুক না? ভয় কি? সেই সুযোগে এরোপ্লেন চালানো শিখে নেওয়া যাবে। দেশও দেখা হয়ে যাবে বিস্তর।” বাদল বলেছিল, “মরণ ঘটবে না?” কলিন্স ভীষণ হল্লা করেছিল। বলেছিল, “রাস্তায় চলতে চলতে মোটর চাপা পড়ে ও বাড়ীতে বসে হার্ট ফেল হয়ে যত লোক মরে যুদ্ধে তার চাইতে এমন কী বেশী লোক মরে? যদি মরেই, তাতে কী? তুমি কী ভাবছ মরাতে কেবলি দুঃখ, মজা একেবারেই নেই।

এর মতো ইংরেজ না হতে পারে যদি, তবে বৃথা এ সাধনা। সুধীদার সাধনায় সিদ্ধি হবে, আরো কত যুবকের সাধনায় সিদ্ধি হবে। সকলে এগিয়ে যাবে নিজ নিজ নির্বাচিত পথে, বাদলকে ধাক্কা দিয়ে কত টম্ ডিক্ হ্যারী এগিয়ে যাবে বাদলের নির্বাচিত পথে। ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করে কলিন্স যে start পেয়ে গেছে সেটা কেবল তার মগজে নয়, তার স্বাস্থ্যে তার শৌর্যে তার জীবনীশক্তিতে। বাদলের মতো সে রাত ভোর করে দেয় না ভাবনায়। ভাবে সে অতি অল্প সময়। তবু তার ভাবনাটুকু পাকা, কারণ সে ভাবনা বাদলের ভাবনার মতো দুর্বল দেহ এবং ক্ষীণ জীবনীশক্তির ফল নয়, রুগ্‌ণা জননীর সন্তান নয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয় প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত নয়। বিশুদ্ধ মননক্রিয়া ভারতবর্ষে নেই, মনের জমিতে চাষ করতে গেলে হাজার আগাছার সঙ্গে আপোস

করতে হয়, সেখানে সাহিত্য-সমালোচনার মধ্যে সমাজের স্বার্থ ঢোকে, সৌন্দর্য-বিচারের ভিতর মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা। সুধীদা বিজ্ঞের মতো ইন্‌টুইশনের মার্গ অবলম্বন করেছে, সে-সম্বন্ধে ইউরোপে তাকে ওরা অথরিটি বলে স্বীকার ও সম্মান করবে। আর বাদলকে বলবে, হ্যাঁ, ইন্টেলেক্‌চুয়ালদের সমাজে পাত্তা পাবার যোগ্য বটে, কিন্তু আপ-টু-ডেট থাকবার জন্যে প্রাণপাত করেছে, তাই জগৎকে দেবার মতো প্রাণ অবশিষ্ট নেই। পাল্লা দিয়ে সঙ্গ রাখবার জন্যে যৎপরোনাস্তি করেছে, তাই চিন্তানায়ক হবার ক্ষমতা খুইয়েছে।

হায়, হায়, সেও যদি start পেয়ে থাকত, সে যদি ইংরেজ হয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকত, তবে তার সঙ্গে পেরে উঠত কোন ধৃষ্ট? তাকে চেষ্টা করে ইংরেজী শিখতে হত না, বাংলার বদলে শিখত ফরাসী, সংস্কৃতের বদলে ল্যাটিন। পারিবারিক জীবনে পেত বৈজ্ঞানিক মনোভাব, ইস্কুলেও বিজ্ঞানচর্চা করবার সুযোগ পেত। কলেজে ইউরোপের ভাবী ইন্টেলেক্‌চুয়ালদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে জেনে রাখত কাদের সঙ্গে তার জীবনব্যাপী প্রতিযোগিতা; এবং তাদের শক্তিরও পরিমাপ করে রাখত। ভারতীয় ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামাটাই বোকামি, ওদের দৌড় চাকরির ও বিয়ের বাজার অবধি। ওদের মধ্যে প্রথম হতে চাওয়াটা রীতিমতো misleading—তাতে করে শক্তির চালনা হয় ভুল দিকে। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকগুলো বাদলের প্রয়োজনের পক্ষে অবান্তর, সুতরাং বাদলের অপাঠ্য। হায়, হায়, কী মহামূল্য চারটি বৎসর সে কলেজে নষ্ট করেছে! ইস্কুলে যা নষ্ট করেছে তার জন্যে অনুতাপ করা মিথ্যা, কেননা তখন তার জ্ঞান ছিল না সে জীবনে কী চায়, কোনখানে তার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কলেজে ঢুকতে তার অন্তর সায় দেয় নি, নেহাৎ তার বাবা তাকে বিলেত পাঠাতে প্রস্তুত ছিলেন না বলে চারটি বছর একটা পিঁজরাপোলে অপব্যয় করতে হল। সুধীদা বুদ্ধিমান, ম্যাট্রিকের পর দু বছর পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষ বেড়িয়েছে, নন্‌কোঅপারেশনের কল্যাণে খদ্দরের ভেক ধারণ করে সুধীদা যেখানেই যায় সেখানকার কংগ্রেসওয়ালাদের দলে ভিড়ে যায়, 'স্বরাজ-আশ্রমে' খায়। তারপর একদিন বাদলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বাদলের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারল না। কলেজে ভর্তি হয়ে বাদলের সঙ্গী হল বটে, কিন্তু পড়াশুনায় সেইটুকু মনোযোগ করল যেটুকু থার্ড ডিভিশনের পক্ষে আবশ্যক। দিনের পর দিন সুধীদা ক্লাস পালিয়ে গঙ্গার ধারে শুয়ে নৌকার গুণটানা নিরীক্ষণ করেছে। ভারতবর্ষের আকাশে নানা আকারের নানা আকৃতির ও নানা বর্ণের মেঘ অভিনয়ের আসর জমায়। তাদের প্রাত্যহিক আসরে সুধীদা কখনো অনুপস্থিত থাকেনি। প্রতিবেশীর রোগে শোকে তথা শুভকর্মে সুধীদাকে সমান ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে। সুধীদা বুদ্ধিমান, বাদলের মতো দ্বিধায় আন্দোলিত উৎসাহে উদ্বেলিত অবসাদে অবনত হতে হতে জীবন-প্রবাহের অপচয় করে নি। তীরের মতো এক লক্ষ্যের অভিমুখী হয়েছে।

৬

দিনের বাদল লাফ দিয়ে বিছানার থেকে উঠে এলার্ম দেওয়া টাইমপীস্‌টার ঘ্যানঘ্যানানি থামিয়ে দেয়। ভাবে ঘুমিয়ে কোনো দিন তৃপ্তি আমার জীবনে আসবে না, তৃপ্তিকে বাদ দিয়ে জীবন যাপনের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে মুখ হাত ধোয়া হয়ে যায়। পোশাক পরে নিতে হয় সারা দিনের মতো। এক রাশ নেকটাই-এর থেকে একটা বেছে নিতে হবে, প্রতিদিন ঐ একই সমস্যা, কোনটা ছেড়ে কোনটা নিই। সকাল বেলার এই যে পরীক্ষা, এই তো সারা দিনের পরীক্ষার অগ্রদূত। কোনটা ছেড়ে কোনটা ভাবি, কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি, কোনটা ছেড়ে কোনটা করি। ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে ভাবে, সতেরোই ফেব্রুয়ারী ১৯২৮ জগতের ইতিহাসে মাত্র একটিবার এসেছে লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে, মাত্র একটি দিনের জন্যে। আজ রাত্রি বারোটার পর থেকে আর এর নাগাল পাওয়া যাবে না, মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও না। এই দিনটিকে কী-ভাবে-কাটানো ছেড়ে কী-ভাবে-কাটাতে হবে সেই হচ্ছে আজকের ধাঁধা।

ধাঁধার জবাব খাঁ করে দেওয়া যায় না, কিন্তু খাঁ করে একটা টাই টেনে নিয়ে পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে বেখাপ। ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে আরেকটা নিয়ে কতক সন্তোষ পায়। এ ছাড়া উপায় নেই, এর নাম trial and error-এর মার্গ, এই মার্গ বাদলের। সুধীদার চলা বাঁধা রাস্তায়, তাকে ভাবতে হয় না। কিন্তু বাদলের চলা একশোটা পথ থেকে বেছে একটাতে। সে যতই এগোয় ততই দেখে তার সামনে একশোটা পথ একশো দিকে চলে গেছে। একবার এটাতে একবার ওটাতে কিছুদূর চলে। মনঃপূত হয় না। ফিরে এসে তৃতীয় একটা পথ নেয়। এইটেতে কতক সন্তোষ পায়। কিন্তু বেশ খানিকটা গিয়ে দেখে যে এই পথেরও একশো শাখা। আবার সেই trial, সেই error এবং অবশেষে সেই আপাত সত্য। সুধীদার এই বালাই নেই। সুধীদার সামনে মাত্র একটি পাকা সড়ক, পাড়াগাঁয়ের সদর রাস্তা, ঐ রাস্তা ধরে একটা অন্ধও অক্লেশে আর একটা অন্ধকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সুধীদা গেঁয়ো, বাদল শহুরে।

এ কথা মনে হতেই সুধীদার প্রতি বাদলের করুণা সঞ্চার হল। সে আর একবার চুলে ব্রাশ বুলিয়ে দিয়ে টাইটা-তে দুই টান মেরে তর্ তর্ করে নিচে নেমে গেল। মিসেস উইল্‌স্ নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ তার অপেক্ষায় আছেন। মিস্টার তো খুব সকাল সকাল খাওয়া শেষ করে বিদায় হন। ডেলি প্যাসেঞ্জার কিনা, যেতে হয় সেই কোন মুল্লুকে—ঈস্ট্ এণ্ডে।

বাদলকে দেখে মিসেস উইল্‌স্ বললেন, “আজ কে একজন তোমাকে ফোনে খুঁজছিল, বার্ট।”

বাদল খপ করে তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, “কে, কলিন্স্ ?”

মিসেস উইল্‌স্ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গের ঢঙে বললেন, “হবে। বলেছে আজ সন্ধ্যা-বেলা ওর সঙ্গে খেয়ে থিয়েটারে যেতে। যাচ্ছ, কেমন ?”

বাদল বলল, “যাওয়া তো উচিত। ওকে আগে থাকতে কথা দিয়ে রেখেছি যে যেদিন ওর সুবিধা হবে সেদিন এক সঙ্গে থিয়েটার যাওয়া যাবে।”

“বেশ, বেশ। মিস্টার উইল্‌স্‌কেও তুমি হার মানালে। তিনি তো সাতটায় ফেরেন, তুমি কিছুদিন থেকে ফিরছ বারোটায়।”

বাদল আফসোস জানিয়ে বলল, “কী করি, মিসেস উইল্‌স্। ওয়াই-এম্-সি-এতে হপ্তায় দিন দুয়েক না গেলে চলে না, একটু গান বাজনা হয়, বহু লোকের সঙ্গে আলাপ। Rationalist Press Association-এর বুড়োদের সঙ্গেও একদিন ভাব করতে যাই। King's College-এ একটা লেকচার নিচ্ছি। এ ছাড়া বন্ধুদের প্রায়ই সোহো অঞ্চলে খাওয়াতে নিয়ে যেতে হয়।”

মিসেস উইল্‌স্ স্নেহের সুরে বললেন, “তা হলে সোহোর কাছে বাসা করলে হয়। বারোটা রাত্রে গৃহস্থবাড়ীতে কে তোমার জন্যে জেগে থাকবে বল ? গরম কোকো না খেলে তোমার ঘুম আসে না বলে কে অত রাত্রে উনুন ধরাবে রোজ রোজ ?”

বাদল ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল, “আমার জন্যে আপনাকে এতটা কষ্ট করতে হয় আমি জানতুম না, মিসেস উইল্‌স্, বিশ্বাস করুন।”

মিসেস উইল্‌স্ নরম হয়ে বললেন, “বার্ট, আমি তোমার দিদির মতো ; সেই অধিকারে তোমাকে যদি কিছু বলি তুমি অনধিকার চর্চা মার্জনা করবে তো ?”

“নিশ্চয় করব, কেট্।” মিসেস উইল্‌স্‌কে ভাইয়ের অধিকারে “কেট” বলে সম্বোধন করা এই প্রথমবার। বাদলের বুক নূতনত্বের হর্ষে অথচ পাছে মিসেস উইল্‌স্ কিছু মনে করেন সেই ভয়ে হঠাৎ কেঁপে উঠল এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত শান্ত হল না। যেন নদীর উপর দিয়ে একটা স্টীমার চলে গেল।

মিসেস উইল্‌স্ কৌতুক-হাস্য চেপে বললেন, “তা হলে বলি। তোমার বয়সের ছেলেরা নিজের মা-বোনেরও মুরুব্বিয়ানা পছন্দ করে না আজকাল। তোমাকে অভয় দিচ্ছি যে মুরুব্বিয়ানার অভিপ্রায় নেই তোমার দিদির। তোমাকে বিবেচনা করতে বলি, এই যে তুমি রাত করে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছ এতে কি তোমার লেখাপড়ার ক্ষতি হবে না ? যে উদ্দেশ্যে তোমার মা বাবা তোমাকে এত দূরদেশে পাঠিয়েছেন সেই উদ্দেশ্য বিফল হবে না ?”

বাদল বিরক্ত হয়ে বলল, "আমি সাধারণ ছাত্র নই, কেট্‌। আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিতে পারি যে, আমি বাড়িতে বই না ছুঁয়েও অন্য সকলের চেয়ে ভালো করে পাস হতে পারি।"

কেট্‌ বললেন, "অন্য সকলে তো ভারতীয় নয় এ ক্ষেত্রে। এটা ইংলণ্ড।"—তাঁর স্বজাতি-সম্বন্ধীয় গর্ব আঘাত পেল। তিনি বললেন, "মানছি আমাদের ছাত্ররা বোকা-সোকা, তোমাদের মতো অবলীলাক্রমে একটা বিদেশী ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারে না, অমন সবজান্তাও নয়। তবু, বার্ট, খাটুনিরও একটা পুরস্কার আছে, মেধা দিয়ে খাটুনির অভাব পূরণ করতে পারবে না।"

বাদলের আজ তর্ক করার ইচ্ছা ছিল না। একটি দিদি পেয়ে সে গোপন পুলকে শিউরে শিউরে উঠছিল। বলল, "কেট্‌, আমার জীবন অন্য রকম, আদর্শ অন্য রকম। সত্যি কথা বলতে কি, আমি পাস করা না করা নিয়ে খুব বেশী চিন্তিত নই। মনটাকে রোজ কসরৎ করিয়ে fit রাখছি, মনের ক্ষুধাকে অখাদ্য না দিয়ে সুখাদ্য দিচ্ছি, মনের দিক থেকে ধীরে অথচ স্থির ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছি, এই আপাতত যথেষ্ট। তবে এইটুকুতে আমার সন্তোষ নেই, আমি পৃথিবীর সমস্ত বড় মানুষের সমকক্ষ হতে চাই—সাধনায়, বেদনায়, উপলব্ধিতে ও আবিষ্কারে। মনের মতো উন্নতি হচ্ছে না, আয়ু নষ্ট হচ্ছে প্রচুর, মাঝে মাঝে নিরাশায় নুয়ে পড়ছি ও অনুশোচনায় ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে দেখছি—না, অনুশোচনা জিনিসটা এমন খারাপ যে তাতে ক্ষতির পরিমাণ শুধু বাড়ন্ত দেখায় না, বেড়ে ওঠেও—তবু আমার মনে হয় আমি আর কিছু না হই বাদলচন্দ্র সেন তো হচ্ছি।"

কেট্‌ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "তোমার সমস্ত কথা বুঝতে পারলুম না, বার্ট্‌, কিন্তু তোমাকে আমার আন্তরিকতম শুভকামনা জানাই।"—হেসে বললেন, "তা বলে রাত করে বাড়ি ফেরার সমর্থন করতে পারিনে। কোন দিন কোন স্ত্রী-জানোয়ারের কবলে পড়বে, সোহো তো বড় সুবিধের জায়গা নয়; ছাত্রদের পক্ষে লণ্ডন যে ঘোর প্রলোভনসংকুল এ কথা কি তোমার মা বাবা জানতেন না? অক্সফোর্ড কেম্‌ব্রিজের নাম কি তাঁদের অজানা?"

বাদল জোরে ঘাড় নেড়ে বলল, "হোপলেস। অক্সফোর্ড কেম্‌ব্রিজের ছেলেরা জীবনের কী জানে, কী বোঝে? যেখানে প্রলোভন নেই সেখানে জীবন নেই। আমি জীবনের দ্বারে বিদ্যার্থী, লণ্ডন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর দরজা।" এই বলে সে এক সেকেণ্ড থেমে বলল, "কেট্‌।" তার ভারি মিষ্টি লাগছিল ঐ সম্বোধনটি।

কেট্‌ বললেন, "কী?"

বাদল অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "না, কিছু না। বাক্যটা সমাপ্ত করবার সময় সম্বোধন করতে এক সেকেণ্ড দেরি হয়ে গেল। ওটা বাক্যের শেষাংশ, কেট্‌। যেমন এটা।"

বাদলের রোমাঞ্চ হচ্ছিল।

৭

পাওয়ার স্ট্রীট রাসেল স্কোয়ার ইত্যাদি অঞ্চলে বাদল পা দেয় না, যেহেতু ওসব অঞ্চলে সর্বদাই দশ বিশ জন ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ও দেখা হতে হতে আলাপ হয়ে যায়। ভারতীয়দের চিনতে পারা সহজ। কী পরস্পর সাদৃশ্যই যে তাদের মধ্যে আছে।—মারাঠা মাদ্রাজী বাঙালী কাশ্মীরী হিন্দু মুসলমান পার্শী সকলেই দেখতে একরকম। ভারতবর্ষের বাইরে এসে সবাই পরেছে ইংরেজী পোশাক, তাই দিয়ে তাদের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য চাপা পড়েছে, অথচ তাদের আকৃতিতে এমন কিছু আছে, যেটা কেবল ভারতবর্ষীয়ের বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যের জোরে তারা সহজেই চিহ্নিত।

বাদল তাদের এড়িয়ে চলে। তাদের কাছ থেকে তার শেখবার কিছু নেই। জীবনের বিশটি বছর তাদের দিয়েছে, তার বেশি দিতে পারে না, দিলে অন্যদের প্রতি অবিচার করা হয়। সামনের বিশ বছর ইংলণ্ডকে ও ইউরোপকে দিয়ে তার পরে সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে, সর্বত্র বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করবে, বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠার অধিকারী হবে। বাদলের দায়িত্ব কি বড় কম দায়িত্ব। এত বড় মানব জাতিটার ঐক্য, প্রগতি ও শান্তি যে ক'জন চিন্তাশীল মানুষকে উত্যক্ত করছে বাদলও, তাদের একজন। বার্নার্ড শ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল্, বাদল সেন—এঁরা বয়সে ছোট বড় হলে কী হয়, এঁরাই সকলের হয়ে আগ বাড়িয়ে দেখছেন, এঁরাই মানব-সেনানীর স্কাউট দল, এভোল্যুশন-তরণীর এঁরাই পাইলট। শ, রাসেল, ক্রোচে, ডিউই (Dewey), ওয়েল্‌স্, রলাঁ।—এঁরা তো চিরকাল বাঁচবেন না, এঁদের স্থান পূরণ করবার জন্যে যাঁদের এগিয়ে যাবার কথা তাঁদের অনেকেই গত মহাযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন, যাঁরা অবশিষ্ট আছেন তাঁরা অর্থাৎ ডি-এইচ-লরেন্স, টি-এস-এলিয়ট, মিড্‌লটন মারী, জেমস্ জয়েস্, জাঁ-রিশার ব্লশ, স্টেফান ৎসোয়াইগ্, টোমাস মান ইত্যাদিও একদিন মানবের দেশ থেকে বিদায় নেবেন। তখন বাদলের পালা।

বাদল তাই ব্রিটিশ মিউজিয়ামের উত্তর সীমানা মাড়ায় না। ভারতীয়দের মধ্যে এক সুধীদার সঙ্গেই তার যা কিছু সম্বন্ধ।

কিন্তু সেদিন কার মুখ দেখে উঠেছিল, Mudie-র লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে বাস ধরতে যাচ্ছে এমন সময় পিছন থেকে কে যেন ডাকল, "মিস্টার সেন।" ফিরে দেখে একজন ভারতীয়। ভারতীয়টি বলছে, "চিনতে পারেন?" বাদল কিছুক্ষণ চিন্তা করে। ভারতীয়টি বলে, "সেই যে বম্বের জাহাজে মিথিলেশকুমারীকে তুলে দিতে এসে দেখা হয়েছিল—"

বাদলের মনে পড়ে যায়। বাদল খুশি হয়ে বলে, "আপনি কি মিস্টার নওলকিশোর?" —পাটনার লোক। পরিচিত। অমায়িক। ভারতীয়দের প্রতি দূর থেকে বাদলের যতটা বিতৃষ্ণা নিকট থেকে ততটা নয়, দেখা গেল। সে নওলকিশোরকে সঙ্গে নিয়ে ঘণ্টাখানেক পায়ে হেঁটে গল্প করে বেড়াল। পাটনার খবর জানতে তার দিব্যি ইচ্ছা করছিল। ভারতবর্ষের খবর কাগজে যা পায় তা অকিঞ্চিৎকর, পড়েও না। নওলকিশোরের মুখে শুনতে মন যাচ্ছিল গান্ধী কেমন আছেন, কী তাঁর ইদানীন্তন কর্মপন্থা, মডারেটরা সাইমনের উপর বিরূপ হয়ে থাকবে কদিন, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধছে কি না। খুব আশ্চর্য লাগছিল এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে। এত কথাও তার মনে আছে। পরিত্যক্ত দেশ সম্বন্ধে এতটা কৌতূহলই বা তার এল কোথেকে।

নওলকিশোর কিন্তু ছটফট করছিল তার নিজের খবর বলতে। সে এক রকম পালিয়েই এসেছে, বাড়ী থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করে না। দিন সাতেক একটা বোর্ডিং হাউসে আছে, শীঘ্রই মিথিলেশকুমারীর বাসায় জায়গা খালি হবে, বাদল যেন মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা করতে ভোলে না। মিথিলেশকুমারীর ঠিকানাটা দিল। বলল, "তিনি ও আপনি ছাড়া এদেশে আর তো কেউ নেই আমার।"

মিথিলেশকুমারীর কথায় বাদলের মনে পড়ল কুবেরভাইয়ের কথা। আহা, তার সঙ্গে আবার দেখা হয় না? খাসা লোক কুবেরভাই, সে না থাকলে জাহাজের দিনগুলো মিথিলেশকুমারীর ভক্তের দলে যোগ দিয়ে আড্ডা দিতে দিতে ব্যর্থ যেত।

কিন্তু অতীতের স্মৃতিকে প্রশ্রয় দিতে নেই। নওলকিশোরের পাল্লায় পড়ে তার একটা ঘণ্টা নষ্ট হয়েছে। আর না। বাদল দমকা হাওয়ার মতো বিদেশে সহায়বন্ধুহীন বেচারা নওলকিশোরকে হতভম্ব করে দিয়ে বলল, "আচ্ছা, গুড বাই, মিস্টার প্রসাদ, আপনাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি। আশা করি ইংলণ্ড আপনার উপভোগ্য হবে। গুড বাই।—" এই বলে একটা চলন্ত বাসে লাফ দিয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কলিন্স ও মিলফোর্ড বাদলকে দেখে একবাক্যে বললেন, "মর্নিং, সেন।" কলিন্স কাজ করবার ফাঁকে ও মিলফোর্ড বই ঘাঁটার ফাঁকে Prayer Book Measure সম্বন্ধে মত বিনিময় করছিলেন। কলিন্স বলল, "সেন, তুমি কী?"

বাদল বুঝতে না পেরে বলল, "হাউ ডু ইয়ু মীন্?"

কলিন্স বলল, "ওঃ! আই বেগ্ ইওর পার্ডন্। মিলফোর্ড হচ্ছেন হাই চার্চম্যান্, আমি মডার্নিস্ট। তুমি কী?"

বাদল বলল, "তাই তো!"—একটু চিন্তিত হল। ইংরেজ হতে যাচ্ছে, অথচ চার্চের সঙ্গে অল্পাধিক যুক্ত নয়, এ কেমন কথা? কলিন্সের মতো আধুনিকপন্থীও ওয়াই-এম্-সি এ'তে থাকেন, খ্রীস্টান বলে নিজের পরিচয় দেয়। মডার্নিস্ট হচ্ছে চার্চ অব ইংলণ্ডের সেই

সব সদস্য যারা একবারে চার্চ ছেড়ে দিতে চায় না, তাকে এ কালের উপযোগী করে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। খ্রীস্টধর্মের এরা এক বিজ্ঞানশোধিত সংস্করণে বিশ্বাসী।

বাদল বলল, "আমি ? আমি ফ্রী-থিঙ্কার।"

মিলফোর্ড বললেন, "ভারতবর্ষের সকলেই কি তাই ? আমি শুনেছিলুম ওরা মূর্তিপূজা করে।"

বাদল বিরক্ত হয়ে বলল, ভারতবর্ষের ওরা যা করে আমিও যে তাই করব এমন কোনো কথা নেই। তা ছাড়া মূর্তিপূজা রোম্যান ক্যাথলিকরাও করে, মিস্টার মিলফোর্ড।"

কলিন্স চোখ টিপে বলল, "এবং অ্যাংলো ক্যাথলিকরাও।"

বাদল জানত হাই চার্চম্যানরা বহু পরিমাণে রোম্যান ক্যাথলিক ভাবাপন্ন। বস্তুত তাদের সেই রোম্যান ক্যাথলিক ভাব দেখে পার্লামেন্টের সন্দেহ হয় যে, তারা রোম্যান ক্যাথলিক যুগে দেশকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তাই তাদের সমর্থিত Prayer Book Measureকে পার্লামেন্ট বাতিল করে। তবু ওটার সামান্য পরিবর্তন করে আবার ওটাকে পার্লামেন্টে পেশ করবে ওরা। এই নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেছে।

বাদল বলল, "আচ্ছা, মিস্টার মিলফোর্ড, কেন আপনাদের এই অধ্যবসায় ? দেশ যে এগিয়ে চলেছে তা কি আপনার আর্চবিশপদের চোখে পড়ে না ?"

মিলফোর্ড গম্ভীরভাবে বললেন, "এগিয়ে যাওয়া আপনি কাকে বলেন, মিস্টার সেন ? যে মানুষটা সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে যায় সেও তো এগিয়েই যায়।"

কলিন্স বলল, "'কেন' ছেড়ে এখন 'কেমন-করে' নিয়ে আলোচনা করা যাক। পার্লামেন্ট যদি এবারেও বাতিল করে তা হলে কী উপায় ?"

মিলফোর্ড shrug করলেন। বললেন, "পার্লামেন্টের সুমতির উপর আমাদের আস্থা আছে। থ্যাঙ্ক গড, এখনো এ দেশটা সোশ্যালিস্টদের হয়নি।"

ইংলণ্ডের চার্চ সরকারী টাকায় চলে, তার বিশপরা সরকারী চাকুরে। সোশ্যালিস্টরা রাজ্যভার পেলে চার্চের ভাতা বন্ধ করে দিতে পারে, কারণ এ যুগে স্টেট ও চার্চ একাত্ম নয়, এ যুগের অনেক প্রজার ধর্মমত চার্চের থেকে ভিন্ন, তাদের খাজনায় পরিচালিত হবার অধিকার চার্চের নেই।

বাদল বলল, "সোশ্যালিসম আমিও চাইনে। কিন্তু স্টেটের কর্তব্য সকলের প্রতি ন্যায় বিচার করা। খাজনা দেব আমি, আর তার ফলভোগ করবেন আপনি, এ যে আমার প্রতি অবিচার।"

মিলফোর্ড একবার কাশলেন। বললেন, "Sorry, কিন্তু খাজনার ফলভোগ করতে আপনাকেও তো বারণ করিনি, আপনাকে আমরা আহ্বান করছি। চার্চের চোখে সকলেই

সমান, চার্চের কাছে সকলেই প্রিয়—যেমন রাজার চোখে, রাজার কাছে। আচ্ছা, রাজতন্ত্রেও তো অনেকের আপত্তি দেখি, তাঁদের খাজনায় রাজপরিবারকে পোষণ করা তা হলে অন্যায় ?"

বাদল বলল, "রাজতন্ত্র কি ইংলণ্ডে আছে ভাবছেন ? রাজতন্ত্রের বেনামীতে গণতন্ত্র কাজ করছে। রাজা যাঁকে বলছেন তিনি আসলে একজন আমলা। তাঁকে তাঁর মাইনে দিতে হবে বৈ কি।"

মিলফোর্ডের বয়স বেশী নয়, তিনি King's Collegeএ থিয়লজীর ছাত্র। থিয়লজীর ছাত্রের সঙ্গে বচসা করা নিষ্ফল জেনে কলিন্স্ কাজে মন দিয়েছিল ও চুপি চুপি হাসছিল। বাদল বলল, "এই কলিন্স, ভারি স্বার্থপর তো, তর্কে যোগ দাও না কেন ?"

কলিন্স বলল, "দেখছ না ওঁর কত বড় বড় দাড়ি। একেবারে মধ্যযুগের মানুষ। তর্কের গিলেট-ক্ষুর দিয়ে ওঁর ঐ সব মধ্যযুগীয় সংস্কার কামিয়ে সাবাড় করা কি এক আধ ঘণ্টার কাজ, মাই ডিয়ার চ্যাপ্ ?"

মিলফোর্ড বললেন, "এমন দাড়ি বহু সাধনায় মেলে। চার্চের মতো এর একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে, তোমাদের সোশ্যালিসমের মতো ভুঁইফোড় নয়। চেঁছে সাফ করা তো ছ মিনিটের কাজ, পনের যোল শতাব্দী ধরে গজিয়ে তুলতে পার ?"

কলিন্স বলল, "তোমার দাড়ির যে অত বয়স তা কি জানতুম, ডিয়ার ওল্ড বয় ?"

মিলফোর্ড বলল, "ঠাট্টা নয়, কলিন্স। কত বড় একটা আইডিয়া রয়েছে এর পিছনে। একটি রাজা, একটি রাষ্ট্র, একটি চার্চ—যেমন একটি ভগবান, একটি খ্রীস্ট, একটি Holy Ghost."

কলিন্স্ টেবিল চাপড়ে বলল, "হিয়ার হিয়ার।"

বাদল ভাবছিল মিলফোর্ডের মতামত যে অমন হবেই তার আর আশ্চর্য কী। সে যে থিয়লজীর ছাত্র, পাস্ করলে চার্চের অধীনে চাকরি পাবে। যে ডালে তার বাসা সেই ডালকেই সে কাটবে কোন দুরাশায় ? কিন্তু পার্লামেন্ট যখন ভর্তা ও চার্চ ভার্যা তখন পার্লামেন্টের সুমতির (অর্থাৎ চক্ষুলজ্জার) উপর আস্থা রাখা ছাড়া চার্চের গত্যন্তর নেই। চার্চের আত্মসম্মান থাকলে চার্চ নিজের থেকেই পৃথক হয়ে যেত। এতগুলো বিরাট হাসপাতাল চাঁদার উপর চলছে ; রোম্যান কাথলিক ও ননকনফর্মিস্টরা রাষ্ট্রের বিনা সাহায্যে নিজ নিজ ধর্মের ব্যবস্থা করেছে ; এ্যাংলিকানরা কেন চাঁদা করে চার্চের ভার নেয় না ? তা হলে তো ইংলণ্ডের লোকের কর-ভার কমে। যেমন ফ্রান্সের লোকের কর-ভার কম। কী বল, কলিন্স ?"

কলিন্স বলল, "আমিও তাই বলি, সেন। পরের খাজনার চেয়ে নিজের লোকের চাঁদা নিশ্চয়ই স্বাধীনতা বাড়ায়। চাঁদার আশায় নিজের লোকের প্রতি কর্তব্য

করতেও চাড় হয়। কিন্তু ওরা কি একথা শোনে? প্রেস্টিজ ওদের বড়ই প্রিয়। পিছনে রাজশক্তি থাকার প্রেস্টিজ, অতীতকালের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার প্রেস্টিজ, নিছক টাকা পয়সার দিক থেকেও দিলদরিয়া ভাব—লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন।"—মিলফোর্ড ইতিমধ্যে বিদায় নিয়েছিলেন। কলিন্স বলে চলল, "তা ছাড়া আরো ফ্যাকড়া আছে। সরকারী সাহায্য না পেলে অনেকগুলো বেসরকারী endowments থেকে বঞ্চিত হবার কথা। তাতে চার্চের ভয়ানক আর্থিক ক্ষতি হয়।"

৮

সুধীর দিনগুলি ঘটনাবিরলভাবে কাটছিল। মিউজিয়ামের লাইব্রেরীতে তুলনামূলক দর্শন, সমাজতত্ত্ব ও প্রাচীন সাহিত্য পড়া তার প্রাত্যহিক কাজ। রবিবার জন-কয়েক ভারতীয় বন্ধুর খোঁজ খবর নিতে হয়, তাদের সঙ্গে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মনে হয় ভারতবর্ষে আছে, তাদের কারুর সঙ্গে বাংলাতে, কারুর সঙ্গে হিন্দীতে কথা কয়ে আরাম পায়। আড্-ওয়ানী নামের একটি সিন্ধী ছেলে তার বিশেষ অনুগত হয়ে পড়েছে, মিউজিয়ামে তার পাশের আসনে বসে, লাঞ্চের সময় তার সঙ্গে ঘোরে এবং সে যখন যা বলে নিজের নোট বুকে সযত্নে টুকে রাখে। বলে, "নতুন একটা আইডিয়া। আমার থীসিসের মধ্যে কোথাও এক জায়গায় ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে।" বেশ নম্রস্বভাব ছেলেটি, মুখে বিনয়ের হাসি লেগেই আছে, সুধীকে ডাকে "চক্রবর্তীজী", গোঁড়া স্বদেশী। তার গবেষণার বিষয় "ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ।"

আড্‌ওয়ানী বলে, "চক্রবর্তীজী, জাত বা caste আপনারা যাকে বলেন সিন্ধুপ্রদেশে তা নেই। আমাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের কথা তো জানেনই, আমাদের মধ্যে যারা হিন্দু তাদের মধ্যে মোটামুটি দুটি শ্রেণী—যারা লেখাপড়ার কাজ করে আর যারা গতর খাটায়। অনেকটা ইংরেজদের professional and working classes আর কী। পাঞ্জাবে ব্রাহ্মণ আছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের চেয়ে কায়স্থ নাকি বড়। এমনি করে সমগ্র ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থা কত যে বিচিত্র, স্বতোবিরুদ্ধ ও জটিল তার ইয়ত্তা হয় না। সব ভেঙে একাকার করে দেওয়া যায় না, চক্রবর্তীজী? একধার থেকে কমিউনিস্‌ম—?" আড্‌ওয়ানী কথাটা শেষ না করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

সুধী হেসে বলে, "কেন? আপনার থীসিস লেখার সুবিধা হবে বলে?"

আড্‌ওয়ানী অত্যন্ত বিনয়পূর্বক বলে, "না না, তাই কি আমি বলেছি? জাতীয় ঐক্যের খাতিরে যাবতীয় বিভিন্নতা দূর হওয়া উচিত, এই আমার বিশ্বাস।"

"আপনি ও আমি বাঙালী ও সিন্ধী; ব্রাহ্মণ ও 'আমিল'। তা বলে কি আমরা কোনো দুজন ইংরেজের তুলনায় পর? দুজনের মধ্যে একটি সহজ ঐক্যবন্ধন নেই কি?"

"সেটা—সেটা—বুঝলেন কি না ? সেটা আমরা ইংলণ্ডে আছি বলে। ভারতবর্ষে থাকলে আমরা নিজেদের অনৈক্যের কথাই আগে ভাবতুম।"—এই বলে কাতর দৃষ্টিতে তাকায়। যেন তার যুক্তির কোনো মূল্য নেই যদি সুধী না সমর্থন করে।

সুধী বলে, "ইংরেজ তার স্বদেশে থেকেও বিশ্বের অন্যান্য জাতির সঙ্গে নানা সূত্রে যুক্ত আছে, স্বদেশে থেকেও সকলের সংবাদ রাখে। তার খবরের কাগজগুলি খুলে দেখুন, আদার খবর থেকে জাহাজের খবর পর্যন্ত সব রকম খবর সেগুলিতে থাকে এবং সেগুলিতে সম্পাদকীয় আলোচনা হয় বিশ্ব-রাজনীতি, বিশ্ব-অর্থনীতি নিয়ে। কেমন ?"

আড্‌ওয়ানী মাথাটাকে অত্যধিক নুইয়ে বলে, "ঠিক।"

সুধী বলে, "অন্যান্য জাতিদের সঙ্গে অহর্নিশ নিজেদের জাতিটিকে তুলনা করতে পায় বলে ওরা ঐক্যের সম্বন্ধে সচেতন থাকে। তা বলে ওদের চেতনায় যে ওদের ঘরোয়া অনৈক্যের অংশ নেই তা নয়। কাউন্টি ক্রিকেট ম্যাচের সময় ওদের কাউন্টি-প্রীতি মাথা নাড়া দেয়, ভাষাগত প্রসঙ্গ উঠলে ওদের প্রাদেশিকতা গা-ঝাড়া দেয়।"

আড্‌ওয়ানী যেন কী একটা আবিষ্কার করেছে। বলে, "একেবারে ঠিক। Devonshire-এর ভাষা, Lincolnshire-এর ভাষা, স্কটল্যাণ্ডের ভাষা এই নিয়ে কি কম তামাশা বাধে!"

সুধী বলে চলল, "আমাদের যখন বিশ্ব-চেতনা বাড়বে তখন জাতীয় ঐক্যবোধ বাড়বে, তা আমরা স্বদেশেই থাকি আর বিদেশেই থাকি। 'জাতি' 'জাতি' করলে জাতীয়তা আসে না, 'বিশ্ব'-'বিশ্ব' করলে আসে।"

আড্‌ওয়ানী চটপট টুকে নিল।

সুধী বলে চলল, "ঐক্যবোধই অনৈক্যবোধকে স্বীয় অঙ্গীভূত করবে, যেমন শাদা রঙ সকল রংকে আত্মসাৎ করে। সব কটা রঙকে মুছে দিলে যা দাঁড়ায় সে হচ্ছে কালো রঙ। অর্থাৎ কোনো রঙ নয়। কিছু নয়। অনৈক্যকে বেবাক লুপ্ত করলে ঐক্যও থাকবে না, আডওয়ানীজী। সেই ভয়ে কমিউনিসমও শ্রেণীগত অনৈক্যকে বাঁচিয়ে রাখার উপায় করেছে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে।"

আড্‌ওয়ানী উৎসাহের সহিত টুকতে থাকল।

দে সরকারের সঙ্গে রবিবারগুলোতে প্রায়ই দেখা হয়। ছোটখাট একটি আড্ডা বসে। আড্ডার সকলেই বাঙালী। আমেরিকা-ফেরত সেই যে ছেলেটির নাম মৃণাল চৌধুরী সেও তার হাইগেটের বাসা থেকে ব্লুমসবেরীতে আসে।

দে সরকার বলে, "আমাদের এই মিলনটিকে বলা যাক 'ত্র্যহস্পর্শ'। একজন মিষ্টিক, একজন বৈজ্ঞানিক, একজন ম্যান অব দি ওয়ার্লড্।"

সুধী বলে, "আমি মিষ্টিক হলুম কবে ?"

মৃণাল চৌধুরী বলেন, "আর আমি বা কিসের বৈজ্ঞানিক ? জানি তো যৎসামান্য রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং।"

দে সরকার বলে, "চারজন হলে বেশ কয়েক হাত তাস খেলা যেত। চক্রবর্তী, আপনি খেলেন তো ?"

সুধী বলে, "নিশ্চয়।"

দে সরকার বলে, "তবে আর আপনি ওরিয়েন্টাল 'ইওগী' বলে বুড়ীদের মহলে পসার জমাবেন কী করে ? কৃষ্ণমূর্তি স্মার্ট ইংরেজী পোশাক পরে অর্ধেক মক্কেল হারিয়েছে।"

রসিক মানুষ, রসে টস্ টস্ করছে। চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা, কোনো ব্রিজখোর মহিলার নাম ঠিকানা জানা আছে আপনার ?"

চৌধুরী বলেন, "কেন বলুন তো ?"

"তাও বলতে হবে ? তবে শুনুন। দেশ থেকে যা পাই তাতে কুলোয় না। আর এ শালারা তো আমাদের দেশে থাকতে নিজের দেশ থেকে এক পেনীও নেয় না, আমিই বা কেন গরীব দেশের টাকা এনে ধনীর দেশে ছড়াব ? সুযোগ পেলে দু দশ শিলিং উপার্জন করতে ছাড়িনে। Public Barএ ঢুকে বিলিয়ার্ড খেলি, প্রায়ই জিতি। ব্রিজ খেলার নিমন্ত্রণ জুটিয়ে নিই। ব্রিজের বৈঠকে নৈশভোজনটা মেলে, সেই সঙ্গে খেলা জেতার দক্ষিণাও।"

চৌধুরী বলে, "বাস্তবিক, কত টাকাই যে আমরা বিদেশে পড়তে এসে বিদেশীকে দিই ! আবার সেই টাকা দেশে ফিরে শ্বশুরের কাছ থেকে, জনসাধারণের কাছ থেকে, করদাতার কাছ থেকে আদায় করি।"

দে সরকার উষ্মার সহিত বলে, "আদায় করেন, না, কাঁচকলা ! আপনার নিজের দিক থেকে ওটা হয়তো একটা investment, কিন্তু দেশের দিক থেকে dead loss। বিলেতের কাছ থেকে কেউ কোনো দিন একটা পাউণ্ডও ফিরে পেয়েছে ?"

সুধী তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেয়। বলে, "না না, শুধু আর্থিক লাভ ক্ষতি খতিয়ে দেখলে চলবে না। বিদেশে এসে আমরা চড়া দাম দিয়ে যে অভিজ্ঞতা ও যে মানসিকতা কিনে নিয়ে যাচ্ছি সেটার ফল আমাদের সাহিত্যে সমাজে ও রাজনীতিক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করছি। অপ্রত্যক্ষভাবে সে যে আমাদের সভ্যতাকে ও সংস্কৃতিকে পরিপূর্ণতা দিচ্ছে এবং বিশ্বের গ্রহণযোগ্য করছে এও আমাদের স্বীকার না করে উপায় নেই। গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, জগদীশ তাঁদের বয়সে আমাদেরি মতো মূল্যদান করেছিলেন।"

দে সরকার পরিহাসচ্ছলে বলে, "ওঃ ! সেই জন্যে বুঝি বাদলচন্দ্র সেন মাসে মাসে

পঁচিশ পাউণ্ড চালচ্ছেন। আমার কিন্তু কোনো আশা নেই, মিস্টার চক্রবর্তী, গান্ধী কি রবীন্দ্রনাথ হবার। আমি অভিজ্ঞতাও নিচ্ছি, তার সঙ্গে সঙ্গে দামও নিচ্ছি। মাছের তেলে মাছ ভেজে খাচ্ছি আর কী!"

৯

ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গ না পেলে সুধীর দিন কাটে না। যে বাড়ীতে শিশু নেই সে বাড়ীতে বাদলের উল্লাস, সুধীর অসোয়াস্তি। মার্সেলকে আদর করতে তার অনেক সময় নষ্ট হয়, কিন্তু নষ্ট করবার জন্যেই তো সময়ের সৃষ্টি, যে মানুষ সময়কে সোনার বাসনের মতো সিন্দুকে বন্ধ রাখে সে নিজেকেই বঞ্চিত করে।

"আয়, আয়, কেমন আছিস আজ? গল্প শোনাতে হবে? 'ধ্রুব'র গল্প শুনবি? 'ধ্রুব' বলে সেই যে ছেলেটি বনে গিয়ে একমনে ভগবানকে ডাকছিল আর তার চারদিকে বাঘ সিংহ গর্জন করে বেড়াচ্ছিল, শুনবি তার গল্প?···বাঘ সিংহ কেমন গর্জন করে শুনতে চাস? তুই-ই শুনিয়ে দে না?···দূর, ওটা কি বাঘের মতো হল? ও তো বাঘা কুকুরের ঘেউ ঘেউ।···কখনো বাঘ দেখিসনি? আচ্ছা, রোস্ তোকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাব একদিন। কী করে যাবি তুই? তোর যে গাড়িতে চাপলে বমি আসে।···হাঁটতে পারবি কেন অতখানি—হেণ্ডন থেকে রিজেন্টস্ পার্ক! তুই বেজায় ভারি, তা নইলে তোকে কাঁধে করে নিয়ে যেতুম।"

মার্সেলকে সুধী এক নতুন ধরনে ইতিহাস শেখায়।

"তুই যখন আরো ছোট ছিলি তখনকার কথা তোর মনে পড়ে?···পড়ে?···কী মনে পড়ে?···তুই একবার বিছানায় থেকে পড়ে গেছলি, ভারি কাঁদছিলি, তোকে তোর মা এসে তুললেন, তুলে একটা 'টেডি' ভালুক ধরিয়ে দিলেন। কেমন, এই তো?···তোর যেমন এত কথা মনে আছে তেমনি তোর বাবারও কত কথা মনে আছে। তাঁর যে বাবা ছিলেন তাঁরও কত কথা মনে ছিল। তিনি মারা গেছেন। মানুষ মারা গেলে তার মনে-রাখা কথাগুলো যদি কেউ জানতে চায় তবে বড় মুশকিলে পড়ে। তোর ঠাকুরদাদা বেঁচে থাকলে তোকে তাঁর গল্প বলতেন, এখন তুই কার কাছে তাঁর গল্প শুনবি?···তোর বাবার কাছে? তোর বাবা যদি আজ মারা যান তবে কার কাছে শুনবি?—"

মার্সেল মাথা দুলিয়ে বলে, "না, বাবা মারা যাবে না।" তার চোখ ছল ছল করে।

সুধী বলে, "না রে, আমি কি তাই বলেছি? আচ্ছা, ধর্, তোর বাবা তাঁর ঠাকুরদাদার গল্প শুনতে চান। তাঁর বাবা তো বেঁচে নেই, কে তবে ও-সব গল্প মনে রেখেছে যে বলবে···বুঝলি? সেই জন্যে বইতে করে সব কথা লিখে রেখে যেতে হয়। আগেকার লোকের গল্প বড় বড় বইতে লেখা রয়েছে। আমরা যতই বড় হই ততই বড়

বড় বই পড়ি, পড়ে জানতে পাই আমাদের ঠাকুরদাদাদের ঠাকুরদাদা, তাদের ঠাকুরদাদাদের ঠাকুরদাদা, এমনি সব বুড়ো বুড়ো মানুষদের ছেলেবেলার গল্প, বেশি বয়সের গল্প, খাওয়াপরার গল্প—কী খেত ওরা, কোথায় পেত ওই সব খাবার, মাটিতে ফলাত, না, শিকার করে আনত, কী পরত ওরা, কোথায় পেত ওই সব কাপড়, কল দিয়ে তৈরি করত, না, জীবজন্তুর চামড়া থেকে বানাত—এই সব গল্প। আর গান গাওয়া, ছবি আঁকা, সুন্দর সুন্দর বাড়ী, ঘর, আসবাব, বাসন, খেলনা তৈরি করা, এই সকলের গল্প। আর জঙ্গল কাটা, পাহাড়-পর্বতে চড়া, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া, বিদেশী মানুষদের সঙ্গে জিনিসের বেচাকেনা, ওদের সঙ্গে ঝগড়া বাধলে ঢাল তলোয়ার নিয়ে মারামারি, কাটাকাটি, হুলুস্থুলু ব্যাপার।"

মার্সেল চক্ষু বিস্ফারিত করে তন্ময় হয়ে শোনে। গম্ভীর ভাবে বলে, "হুলুস্থুলু ব্যাপার!"

সুধী তার গাল দুটো টিপে দিয়ে বলে, "এই গল্পকে বলে ইতিহাস। কোন কাল থেকে কত মানুষ তাদের গল্প তাদের ছেলেপুলে নাতিনাতনীদের জন্যে রেখে গেছে। কেউ বইতে লিখে রেখে গেছে, কেউ পাথরের গায়ে খোদাই করে রেখে গেছে, কেউ লিখতে জানত না বলে তৈজসপত্রের মধ্যে চিহ্ন রেখে গেছে। অনেক দিনের গল্প জমেছে রে মার্সেল। সব তো এক দিনে বলা যায় না। কিছুটা আমি তোকে বলব, বাকীটা তুই বইতে পড়বি।"

মার্সেল খুশি হয়ে বলে, "হুঁ।" কিন্তু তার খুশি চাপল্যে ব্যক্ত হয় না। সে যেন ঝরণা নয়, দীঘি। শান্ত, সমাহিত, বিরলধ্বনি।

১০

উজ্জয়িনীর আকস্মিক "ভাগবত উপলব্ধি"র সংবাদ সুধীকে কেবলমাত্র হাসি জোগাল না, সে বাদল এবং উজ্জয়িনী উভয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে গভীর বেদনা বোধ করল। রসিকতা করে হালকা ধরনের চিঠি লিখে উজ্জয়িনীকে কাঁহাতক সান্ত্বনা দেওয়া যায়? সে তো ছোট খুকীটি নয়।

বাদল যদি তাকে সামান্যমাত্র প্রশ্রয় দিত তাহলে উজ্জয়িনী অনেক দুঃখ সয়েও মোটের উপর সুখে থাকত, নিয়মিত স্বামীর চিঠি না পেলে ভাবত তিনি ব্যস্ত আছেন ও নিয়মিত তাঁর কুশল সংবাদ অন্য কারুর চিঠিতে পেলেই নিশ্চিন্ত হত। কিন্তু বাদলটা এমন অমানুষ, ভদ্রতার খাতিরেও তাকে এক লাইন লেখে না। বাদল কি তবে সত্যি সত্যিই তাকে ছাড়বে? ছি, ছি! এমন গুণবতী সদ্বংশীয়া পাত্রী সে পেত কোথায়? ইংরেজ বিয়ে করাই যদি তার অভিপ্রায় ছিল তবে কাকামশাইকে সেই কথা খুলে বললেই

হত, তার ফলে যদি বিলেত আসা বন্ধ হত তাও সই। বিলেত আসার নানা উপায় ছিল, অপেক্ষা করলে হয়তো স্টেট স্কলারশিপ পাওয়া যেত, যদিও বেহারের ওরা বাঙালীকে ও-জিনিস কিছুতেই নাকি দেবে না। কয়েক বছর চাকরি করেও তো টাকা জমানো যেত। বাদলের যদি এতই আগ্রহাতিশয্য তবে সুধীকে বললে সুধী নিজের আসা বন্ধ করে বাদলকে অর্থ সাহায্য করত, অন্তত টাকা ধার দিত।

কিন্তু একটি মেয়েকে এমন করে বঞ্চনা করা, শুধু একটি মেয়েকে নয় তার ও নিজের পিতাকে পাকা খেলোয়াড়ের মতো চালমাৎ করা—এ দুর্বুদ্ধি বাদল পেল কোথায়? যার ব্যক্তিগত জীবনে এত বড় অন্যায় সে বিশ্বের অন্যায় দূর করবে, মস্ত চিন্তানায়ক হবে? বিশ্ব কি কখনো তার এ অপরাধ ক্ষমা করতে পারবে?

বিয়েতে বাদলের মত ছিল না, সুধী সে কথা জানত। কিন্তু বিয়ের পরে সকলেরই মত বদলায়, এ কথাও সুধীর অজানা ছিল না। বৌ অপছন্দ হলে কেউ কেউ ভারি চটে যায়, এও সত্য। কিন্তু তা বলে কোন ভদ্র সন্তান বৌকে বয়কট করে না, বাদল যেমন করেছে।

বাদলকে এই বিয়েতে সুধী প্ররোচনা দিয়েছিল, দেবার সময় ভেবেছিল বিয়ের পর তার পাগলামি সেরে যাবে। এখন যে এর পরিণাম এমন হবে তা তো সে কল্পনায় আনতে পারে নি। এই তো তার বন্ধু চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বিয়ের নাম শুনলে মারতে আসত, কিন্তু যেই বিয়েটি করা অমনি ভায়ার চেহারা আহ্লাদি গোছের হয়ে উঠল। ভায়া বিলেত এসে অবধি দুবেলা দুখানা করে প্রেমপত্র লিখে এক সঙ্গে চোদ্দখানা খাম ডাকে দিচ্ছে—একখানা লিখলে পাছে সেখানা হারিয়ে যায়, দুখানা লিখলে পাছে দুখানাই হারিয়ে যায়! তাই চোদ্দখানা। সেগুলো মেল্-ডে'র দুদিন আগে পোস্ট করা চাইই—পাছে মেল্ ফেল হয়।

না, বাদলের শুভবুদ্ধির উপর সুধীর আস্থা আছে। এই সাময়িক ইংরেজিয়ানা সময়ের ধোপে টিঁকবে না। বাদল দেশেও ফিরবে, উজ্জয়িনীকে গ্রহণও করবে। আর উজ্জয়িনী? স্বামীর কাছে আদর না পেলে সব মেয়েরই ধর্মে মতি যায়। বিশেষত উজ্জয়িনীর কাছে ঠাকুর দেবতা যখন খুব একটা নতুন জিনিস। ওটাও সাময়িক। ধোপে টিঁকবে না।

তবু কী জানি কেন সুধীর অন্তর থেকে হাহাকার উঠতে লাগল। বাদল হয়তো সত্যিই ভারতবর্ষে ফিরবে না, ভারতবর্ষের প্রতি কোনো দিন তার মমতা ছিল না, দেশে থাকতে সে সারাক্ষণ বিদেশী বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকত, দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে ভুলেও দৃকপাত করত না। কলেজে তার বন্ধু ছিল না একটিও—এক সুধী ছাড়া। যারা তাকে শ্রদ্ধা করত, তারাও তাকে দাম্ভিক মনে করে ভয়ে তার কাছে ঘেঁষত না। যারা তাকে

গ্রন্থকীট ইত্যাদি বলে তার প্রতিভাকে উড়িয়ে দিত তারাও তার সম্মুখীন হতে সাহস পেত না। অধ্যাপকদের বাদল অবজ্ঞা করত, অধ্যাপকরাও বাদলকে কথাটি কইতেন না। হেন বাদল দেশে ফিরে বিদেশীর মতো বোধ করবে। তাই নাও ফিরতে পারে।

আর উজ্জয়িনীই কি বাদলের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকের সহধর্মিণী হতে পারবে? প্রতিভা নি-। ব্যক্তির সহধর্মিণী হতে পারা অসীম সহিষ্ণুতাসাপেক্ষ। কেবল সহিষ্ণুতা নয়, আত্মবিলোপসাপেক্ষ। উজ্জয়িনীর মধ্যে ব্যক্তিত্ব জ্বল্ জ্বল্ করছে। সেই বা বাদলকে সইতে রাজি হবে কদিন?

এ সমস্যার একমাত্র সমাধান বিচ্ছেদ, কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের মতো কুৎসিত ব্যাপার অল্পই আছে। বনিবনা হল না, অত্যন্ত খেদের বিষয়, তুমিও পৃথক থাক, আমিও পৃথক থাকি। কিন্তু পুনর্বিবাহ! ছি, ছি! জীবনে শুধু একবারমাত্র বিবাহ করা যায়, সে উৎসবের পুনরাবৃত্তি অসুন্দর।

উজ্জয়িনীর মনটাকে ধীরে ধীরে সুন্দর উদার অনুশোচনাহীন বিচ্ছেদের জন্যে প্রস্তুত করতে হবে। সে যেন নিজেকে হতভাগিনী ভেবে জীবন্মৃত না হয়, যেন রক্তমাংসের ক্ষুধায় জর্জর না হয়, যেন কঠিন আত্ম-নিপীড়নের দ্বারা জীর্ণ না হয়। অবিবাহিত থেকেও তো কত নারী মহীয়সী হয়েছেন। যেমন এলেন কেই। উজ্জয়িনীও প্রকৃতপক্ষে অবিবাহিতা।

বেশ, বেশ, সিস্টার নিবেদিতাই হোক সে। কিংবা মীরাবাই। দুটিই বড় মনোহর আদর্শ। কিন্তু উজ্জয়িনী নিজেই তৃতীয় একটি মনোহর আদর্শ স্থাপন করুক। তার প্রতিভাশালী স্বামীকে সে অকুণ্ঠিতচিত্তে মুক্তি দিল এবং নিজের ব্যক্তিত্বকে বিলোপ থেকে বিনষ্টি থেকে রক্ষা করল। অন্যথা তাঁকেও ক্ষতিগ্রস্ত করত, নিজেকেও। এইরূপ যে বিচ্ছেদ এ তো প্রকারান্তরে মিলন।

উপেক্ষিতা

১

প্রভু কহে, এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে, কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্য সার॥

বীণা নিবিষ্ট মনে ও বিনম্র স্বরে পাঠ করছে, বীণার শাশুড়ী মালা জপ করতে করতে ব্যাখ্যা করছেন, উজ্জয়িনী স্তব্ধ হয়ে শুনছে। তার চোখে জলের আভাস।

শাশুড়ী বলছেন, "স্বধর্মাচরণ বেশ ভালো জিনিস বৈকি; জীবমাত্রেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করলে তবে তো সৃষ্টি থাকবে; কিন্তু ওর ভিতরে একটু কথা আছে মা। সেইজন্যেই গৌরচন্দ্র বললেন এটা বাহ্য। না, না, বাজে নয়, বাজে নয়।"—মুচকি হেসে আপন মনে বলে যাচ্ছেন, "বাহ্য। তার মানে বাহ্যিক। তুমি আমি স্বধর্মাচরণ করছি কিছু একটা ফল

কামনা করে। নিজে সেই ফল ভোগ করব এই আমাদের অভিলাষ। গৌরহরি বললেন, এ তো বাহ্যিক। এর থেকে গূঢ় কিছু জ্ঞান তো বল। রায় রামানন্দ বললেন, আছে বৈকি প্রভু।"—হাসিমুখে মাথা নেড়ে বললেন, "আছে। ফলটুকু শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করতে হবে। আমি কাজ করে যাব, তিনি ফল ভোগ করবেন। আমি রাঁধব, তিনি খাবেন। আমি ঘর বাঁধব, তিনি বাস করবেন। আমি ধন সংগ্রহ করব, তিনিই মালিক হবেন। বুঝলে না, মা।"

উজ্জয়িনী ঘাড় নেড়ে জানাচ্ছে—হ্যাঁ, বুঝেছে।

বীণা আবার পাঠ করছে :—

প্রভু কহে, এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে, স্বধর্মত্যাগ সর্ব সাধ্য সার॥

শাশুড়ী বললেন, "ওমা আমার কী হবে। বল কি গৌর, এও বাহ্য? এঁ্যা।"—মুচকি হেসে বলছেন, "একটু মজা আছে। কর্ম করব কেন? কী দরকার? যিনি এত বড় জগৎ চালাচ্ছেন তিনি কি আমারই সামান্য কর্মটুকুনের উপর নির্ভর করেন? বল তো মা। আমি খাওয়ালে তিনি খাবেন, নইলে খেতে পাবেন না, এ কি একটা কথা হল?"

উজ্জয়িনী ঘাড় নেড়ে জানাচ্ছে—না, তা কি হয়।

শাশুড়ী বলছেন, "মহাপ্রভুকে সন্তুষ্ট করা কি সহজ? কত বড় বড় নৈয়ায়িককে তর্কে পরাস্ত করেছেন যিনি, রায় রামানন্দ কিনা তাঁকে করতে চান পরীক্ষা। বলে ফেললেই তো হয় যে, শ্রীরাধার প্রেমই সর্ব সাধ্য সার। না, সে কথাটা বলবার নাম করবেন না। এটা বলবেন, ওটা বলবেন, সেটা বলবেন না। ভারি বুদ্ধিমান লোক, তার সন্দেহ কি? কিন্তু প্রভুর সঙ্গে বুদ্ধির খেলায় কি পারবেন? দেখো তোমরা শেষে তিনি কেমন—না, না, আগে থেকে বলে ফেলব না, মা।"

থেমে বলছেন, "হ্যাঁ, কী বলছিলুম। একেবারে ছেড়ে দিতে হবে। কাজকর্ম ছেড়ে দিতে হবে। তাঁকে বলতে হবে, ঠাকুর, তোমার কাজ তুমি আমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে চাও তো করিয়ে নাও। যা তোমার খুশি। আমি তোমাকেই জানি, তোমাকেই ভালোবাসি, তোমাকে ভেবে আনন্দ পাই, তোমাকে দেখে কৃতার্থ মানি। আমাকে খাটিয়ে নিতে চাও তো নাও, কিন্তু আমি তোমার সুমুখ থেকে স্বেচ্ছায় এক পা নড়ব না।"

উজ্জয়িনী এবার বুঝতে পারছে না, কিন্তু সেকথা স্বীকার করতে সংকোচ বোধ করছে। শাশুড়ী সেটা অনুমান করে বলছেন, "বুঝবে, মা, বুঝবে ক্রমে বুঝবে। সব কি একদিনে হয়। তোমার বয়সে আমরা কী অবোধ ছিলুম, কী পাতকী ছিলুম। তাঁর কৃপা না হলে কি কেউ কিছু বুঝতে পারে। তোমার উপর তাঁর এখন থেকেই কৃপা দেখে বড়ই আশ্চর্য হয়েছি, মা।"

উজ্জয়িনীর চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে। সে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বীণার শাশুড়ীর পায়ের ধুলো নিয়ে কী বলতে চাইছে, কিন্তু তার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ। তার হৃদয় ভাবাবেগে আকুল হয়ে তার চোখ দিয়ে ঝরণার মতো ফুটে বেরচ্ছে ছুটে বেরচ্ছে।

শাশুড়ী বলছেন, "থাক্, মা থাক্। হয়েছে, খুব হয়েছে। পাগলী মা আমার। কত বড়লোকের মেয়ে, কত বড়লোকের বৌমা, কিন্তু কী চমৎকার স্বভাব। ঠিক যেন একটি পল্লীবধূ।"—তিনি উজ্জয়িনীর চিবুক স্পর্শ করে সেই হাত নিজের মুখে ছোঁয়ালেন।

রোজ দুপুরে উজ্জয়িনী বীণাদের বাড়ী যায়। ধর্মগ্রন্থ পাঠ হয়। কোনোদিন শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কোনোদিন শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ, কোনোদিন শ্রীপদকল্পতরু। এমন জিনিস পৃথিবীতে ছিল সে জানত না। এত দিন কেউ তাকে জানায়নি বলে সকলের উপর তার অভিমান—বাবার উপর, স্বামীর উপর, সুধীদার উপর। ওঁরা নিজেরাও যেমন বঞ্চিত উজ্জয়িনীকেও তেমনি বঞ্চিত করে রেখেছিলেন। কিন্তু ভগবান তো আছেন, তিনি উজ্জয়িনীর উপর কৃপা করে বীণাকে ও বীণার শাশুড়ীকে পাঠিয়ে দিলেন। করুণাময়ের করুণা। যতদিন তাঁর করুণা না হয় ততদিন বঞ্চিত থাকা ছাড়া উপায় কী!

দিবারাত্র একটা আবেশের মধ্যে বাস করে—স্নান করে, আহার করে, আলাপ করে, চিন্তা করে, ধ্যান করে, শয়ন করে। অকারণে তার মন কেমন করে, কারুর জন্যে নয়, এমনি। চোখ দিয়ে হু হু করে গরম জল উথলে পড়ে, দেহে রোমাঞ্চ লাগে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত তড়িৎ রেখা ছুটে যায়। বীণা শাশুড়ীর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে ভাবে কিন্তু লজ্জায় পারে না—"মা, হবে তো? আমার মুক্তি হবে তো? অধম পাতকী আমি, মূঢ়মতি দুর্মতি!"

বীণা সেদিনকার মতো পাঠ শেষ করছে :—

প্রভু কহে, এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে, ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥"

শাশুড়ী সগর্বে বলছেন, "কেমন, মা, শুনলে তো? শুনলে তো রায় নিজ মুখে স্বীকার হলেন যে প্রভুর সঙ্গে এ ভুবনে কেউ পারবে না! কাল শুনো রায় আরো কী বললেন। সে ভারি মজা। একেবারে নাকে খৎ যাকে বলে। বললেন, আমি কিছুই না জানি। যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী।"

শাশুড়ী জোরে হেসে উঠলেন। বীণা বাধ্য হয়ে হাসির ভান করছে। এত বড় একটা তামাশার কথা, না হাসলে অপদস্থ হতে হয়। কিন্তু উজ্জয়িনী হাসতে পারছে না। সে ভাবছে শ্রীরাধার প্রেম কি মানুষে সম্ভব? জীব যতদিন শ্রীরাধার মতো প্রেমিকা না হয়েছে ততদিন কি তার মুক্তি সম্ভব?

শ্রীরাধার কথা ভাবতে তার কী যে ভালো লাগে। পদাবলীর শ্রীরাধার সঙ্গে ইতিমধ্যে তার পরিচয় হয়েছে। "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়," "রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা," "সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম", ইত্যাদি তার মুখস্থ হয়ে গেছে। গান তার আসে না। তবু যখন একা থাকে তখন আপন মনে গুন্ গুন্ করে গায়। বেচারি রাধিকার জন্যে তার শোক উথলে ওঠে। যে কৃষ্ণ তাঁকে এত ভালোবাসলেন ও ভালোবাসালেন সেই কৃষ্ণ কিনা একদিন তাঁকে ফেলে মথুরায় চলে গেলেন। আর ফিরে এলেন না। রাধার দুঃখ জানাবার জন্যে নাকি ব্রজের গোপবালকরা অবশেষে তাঁর কাছে গেছল। তিনি নাকি তাদের চিনতেই পারলেন না, পারবেন কেন, তিনি যে তখন মথুরার রাজা।

নিজের জীবনের সঙ্গে রাধিকার জীবনের কথা মিলিয়ে উজ্জয়িনীর ব্যথা দ্বিগুণ হয়। বাদল কি কোনোদিন বিলাত থেকে ফিরবে? উজ্জয়িনী যখন শ্বশুরের সঙ্গে বিলাত যাবে তখন তাকে কি বাদল স্ত্রী বলে স্বীকার করবে?

উজ্জয়িনীর চিন্তার জল কোথা থেকে কোথায় গড়ায়।

২

উজ্জয়িনী তার বাবাকে ভোলেনি। সে নিজে যে আনন্দ পাচ্ছিল তার বাবাকে—শুধু তার বাবাকে কেন, বিশ্বের সব সংশয়বাদীকে—সেই আনন্দের বার্তা দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিল। তার সংশয় ছিল না যে অন্যান্য সংশয়বাদীরাও তারই মতো আবিষ্কারের আনন্দে আত্মহারা হবে এবং উদ্বাহু হয়ে হরিসংকীর্তনে নামবে। তাই তার বাবাকে অতি গদ্‌গদ ভাবে তার অভিনব অভিজ্ঞতার সংবাদ দিয়েছিল। উত্তরে তিনি লিখেছেন—

মা, তোর দিদিদের আচরণ আমাকে তেমন ব্যথিত করেনি কোনোদিন, তোর এই শোচনীয় অধঃপতন আজ যেমন করছে। ছি ছি খুকী, তুই করছিস কী, হয়েছিস কী! এতদিন তোকে হাতে গড়লুম, তোর মনটা যাতে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হয় তার জন্যে তোকে শিশু বয়স হতে বিজ্ঞানশিক্ষায় ব্রতী করলুম, যুক্তি এবং তথ্য এই দুই অশ্বকে দিয়ে তোর কৈশোরের রথ পরিচালন করলুম, সারথি স্বয়ং আমি। আজ দেখি তুই শত্রুপক্ষের শিবিরে ভাবাবেশে ধেই ধেই করে নাচছিস, অবসাদে ঢলে পড়ছিস, অশ্রুরসে গলে

পড়ছিস। ধিক্!

তোর মধ্যে আমার সনাতন স্বদেশের সনাতন দুর্বলতাকে প্রত্যক্ষ করে আমার আর কিছুতে মন বসছে না। দূর হোক্, কী হবে এ দেশে দর্শনচর্চা, বিজ্ঞানচর্চা, বিশুদ্ধ যুক্তি তথ্যের উপাসনা, scientific attitude! রক্তের মধ্যে নেশার প্রতি টান ইংরেজের ডাণ্ডা খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল, কিন্তু ইংরেজ তো স্থায়ী হবে না, কাল ওরা গেলে পরশু আমরা তন্ত্র মন্ত্র পুরাণ নিয়ে বোতল হাতেকরা মাতালের মতো বুঁদ হয়ে যাব, চুর হয়ে যাব। ইংরেজী শিক্ষা যে আমাদের রক্তে মেশেনি তার প্রমাণ তো ভূরি ভূরি দেখছি। বৃথাই এতদিন এত ইন্‌জেক্‌শন নেওয়া, দুর্বলতা তো জীবাণু নয় যে ইন্‌জেক্‌শনে মরবে।

হতাশ হয়ে গেছি, খুকী। তুই যদি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ তবে ভারতবর্ষের অতীত কে!

বাদলের উপর এখনো আমার ভরসা আছে। সেই হয়তো এই মরা দেশে ভাগীরথীর ধারা আনবে। যতটুকু তার সঙ্গে আলাপ করেছি, করে আশান্বিত হয়েছি। টাকা সিকি আধুলি দুয়ানি কোনো কিছুকে সে না বাজিয়ে নেয় না। যতই হোক না কেন তার বাজার দর, যতই থাকুক না কেন তার উপর রাজার মাথার ছাপ। মানি না বলতে পারা সহজ, আজকালকার অনেক ছেলে তো কিছু মানে না, তার কারণ দর্শাতে পারে একমাত্র বাদল। বাদল যেমন মানে না তেমনি মানেও। বিচার ফল, পরীক্ষা ফল, গবেষণার ফল তার কাছে আসল টাকার মত দামী।

বাদল হয়তো জীবনে কিছু করে যেতে পারবে না, আমাদের দেশে আমরা কাউকে কিছু করে যেতে দিই না, কেবল বিবাহ চাকুরী বক্তৃতা ছাড়া। আমার জীবন যেমন স্ত্রী-কন্যার স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে ব্যয়িত হল ওর জীবনও হয়তো তেমনি ব্যর্থ যাবে। বড় জোর চাঁদা দিয়ে দু-চারজন দরিদ্র ছাত্রকে কলেজে পড়াবে, দু-একটা ইস্কুল কি লাইব্রেরী কি হাসপাতাল বসাবে, সরকারী চাকুরে হয়ে খদ্দর পরে তাক লাগিয়ে দেবে। এমনি করে তার নিজের জীবন আমাদের শিক্ষিত সাধারণের জীবনের মতো ট্র্যাজিক হবে। না, না, ট্র্যাজেডী অত সস্তা নয়, অত একঘেয়ে নয়, আমাদের ব্যর্থতা নিয়ে কোনো কবি ট্র্যাজেডী লিখবেন না। বীরত্বের ব্যর্থতা নিয়ে ট্র্যাজেডী, স্থবিরত্বের ব্যর্থতা নিয়ে প্রহসন। আমরা মনের দিক দিয়ে জন্ম-স্থবির। ছাত্র-জীবনে দু দিনের জন্যে দপ করে উঠি, চাকুরী জুটলে বিবাহ করে নিভে যাই।

তবু বাদলের উপর আমার এইটুকু ভরসা আছে যে সে কিছু না করতে পারুক তার scientific attitudeটিকে সারা জীবন জীইয়ে রাখবে। ওটা বড় কম কঠিন কাজ নয়, ওই তো সত্যকারের দেশের কাজ। আমার স্বপ্নের ভারতবর্ষে অন্নবস্ত্রের অভাব হয়তো ঘুচবে না, দারিদ্র্য এই রকমই লেগে থাকবে। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ পর্যবেক্ষণ করবে

পরীক্ষা করবে সিদ্ধান্ত গড়বে সিদ্ধান্ত ভাঙবে, কোনোরূপ সহজ মীমাংসাকে প্রশ্রয় দেবে না, প্রত্যেক স্বতঃসিদ্ধকে সন্দেহ করবে। যখনি অলৌকিক কিছু দেখবে বা শুনবে অমনি একবার ডাক্তারকে দিয়ে চক্ষু বা কর্ণ পরীক্ষা করিয়ে নেবে। ম্যাজিককে প্রাণপণে ঘৃণা করবে, miracleকে যতদিন নিজে ঘটাতে না পারে ততদিন হেসে উড়িয়ে দেবে। তা বলে কেবল বৈনাশিক হবে না, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রগ্রন্থ পড়বে ও ঈশ্বরভক্তকে প্রণাম করবে। তবে এও সমস্তক্ষণ মনে রাখবে যে অল্প বয়সে কোনো নদীর গভীরতা নির্ণয় করতে নামা নিরাপদ নয়। বড় হয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দ্বারা মনকে মজবুৎ করে পাকা ডুবারীর মতো আধ্যাত্মিকতার সমুদ্রে অবতরণ করবে। দর্শনের সঙ্গে ভক্তির, যুক্তির সঙ্গে সংস্কারের, নীতির সঙ্গে লোকাচারের ও জ্ঞানের সঙ্গে পারলৌকিক পাটোয়ারীবুদ্ধির গোঁজামিলন দেখতে দেখতে বুড়ো হয়ে গেলুম। যেমন প্রাচীন ভারত তেমনি আধুনিক ভারত—গোঁজামিলনের দুই বিরাট ওস্তাদ। গোঁজামিলনকে সমন্বয় নাম দিয়ে বিবেকানন্দের দল বেশ কিছু দিন কালোয়াতীর আসর জমালেন। এতদিনে এরা এঁদের যথোপযুক্ত কর্ম পেয়ে গেছেন। সেটা দরিদ্র নারায়ণ সেবা। এদের পূর্বে ব্রাহ্মরা উপনিষদের সহিত বাইবেলের ও উভয়ের সহিত পাশ্চাত্য দর্শনের গোঁজামিল ঘটিয়ে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন; ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করলেন যে সমাজ সংস্কারই তাঁদের প্রকৃত কাজ। আমার পিতা আনুষ্ঠানিকতা পরিত্যাগ করে শুদ্ধমাত্র সংস্কারকার্যে ব্রতী হলেন।

আজ ভারতবর্ষের দক্ষিণ উপকূল হতে কী এক উদ্যমের বার্তা কানে আসছে। কামনা করি তা গোঁজামিলনের অতীত হোক। তবু দেশের মাটির উপর সন্দেহ রয়ে গেছে, খুকী। দেশের জল বাতাস মানুষকে পুরাদমে খাটতে দেয় না। মানুষ চালাকি দিয়ে ফাঁকি পুষিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এখনি তো শুনছি ওরা বিজ্ঞানকে অবজ্ঞা ও করুণা করছেন। বিজ্ঞানের বড় বড় তত্ত্বগুলো নাকি যোগবলে আবিষ্কার করা যেতে পারে, scientific method-এর নাকি কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। এ সব শোনা কথা, সত্য কিনা জানি না, সত্য হলে ভীত হব। চিরকাল একদল মানুষ লোহাকে অবজ্ঞা করে সোনা তৈরি করবার কৌশল খুঁজেছে। অথচ আজ আমরা জানি লোহা বড় তুচ্ছ ধাতু নয়; লোহা ছিল বলেই এত বড় সভ্যতার বিপুল উপকরণসম্ভার সম্ভব হল নইলে এঞ্জিন হত না, যন্ত্র হত না, রেল হত না, পুল হত না, এমন কি সামান্য একটা ছুঁচ হত না। লোহা এবং কয়লা মিলে সভ্যতাকে এতদূর এগিয়ে দিয়েছে, লোহা এবং পেট্রোলিয়াম মিলে আরো অনেক দূর নিয়ে যাবে। তোমার সোনা তো অত্যন্ত শৌখীন ধাতু, ওর কাজ উপকরণ নির্মাণ নয়, উপকরণ বিনিময়সৌকর্য। তাও আজ বেহাত হয়ে কাগজের হাতে পড়ল। পণ্ডিচেরীর alchemistগণ মানবপ্রকৃতির লোহাকে সোনা করবার প্রক্রিয়া

অনুসন্ধান করতে গিয়ে সেকালের alchemistগণের মতো ভ্রান্ত পথে ঘুরে ফিরে শ্রান্ত হলে পরে "al"-টুকুর মোহ কাটিয়ে শুধু chemist হবেন। তখন এই লোহাকে এর যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে এর দ্বারা কত কী করিয়ে নেবেন। সোনার দ্বারা এত কিছু করানো যেত না, সোনার যথার্থ কাজ অলঙ্করণ।

আমি বলি মানব-প্রকৃতিকে সকলে এক জোট হয়ে অবজ্ঞা করায় মানব-প্রকৃতির বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। মানুষকে মুক্তি নির্বাণ salvation ইত্যাদির আশায় বিপথগামী না করলে মানুষ তার বিচিত্র প্রকৃতির অনুশীলন করতে করতে এতদিনে পথ পেয়ে যেত। স্বর্ণযুগের পশ্চাদ্ধাবন যেমন লৌহযুগকে পিছিয়ে দিল, নইলে. দুই হাজার বছর আগে রোটারি মেশিনে বই কাগজ ছেপে বার হত, তেমনি দেব-প্রকৃতির মিথ্যা সম্মোহন মানব-প্রকৃতিকে দুই তিন হাজার বছর পিছিয়ে রেখেছে। সময় নষ্ট করতে নেই, মৃত্যুর পরের কথা পরে বোঝা যাবে, আপাতত যতদিন বেঁচে আছি ততদিন যেন মানব-প্রকৃতিকে সহজ চরিতার্থতা দিই—খাই, শুই, কাজ করি, খেলা করি, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করি, আঁকি, লিখি, গাই, বাজাই, নাচি, ঝগড়া করি, সন্ধি করি, ঘরে ডেকে আতিথেয়তা করি, ছুটে যেয়ে সেবা সাহায্য করি, ভালোবাসায় মানুষের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ পাতাই ও দুজনে মিলে বংশরক্ষা করি। "Give human nature a chance"—এই আমার বাণী।

৩

পত্রসূত্রে পিতার সঙ্গ পেতে উজ্জয়িনীর বিশেষ ভালো লাগে। তার পিতা তিনি, বন্ধু তিনি, গুরু তিনি। কিন্তু অধুনা তাঁর পত্র উজ্জয়িনীকে পীড়া দিচ্ছে। ছেলের সঙ্গে মতের অমিল হলে মায়ের মনে যেমন পীড়া লাগে। বিশেষত সে মত যদি ধর্মবিশ্বাসসংক্রান্ত হয়। উজ্জয়িনী তার ঘরের দেয়ালে লম্বমান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতিকে বলে, "প্রভু, তুমি রাগ কোরো না, বাবা অতবড় পণ্ডিত হলে কী হয় সার্বভৌমের মতো একদিন পরম ভক্ত হবেন।

অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক, স্বেদ, কম্প থরহরি।
নাচে গায়, কান্দে পড়ে প্রভু পদ ধরি॥

বেচারা বাবা! কোনোদিন তোমার কৃপা হল না তাঁর উপর, আপনা থেকে তো কেউ হরিভক্ত হতে পারে না!"

বাবার চিঠি দুতিনবার পড়লে হয়তো তার মর্ম গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু না, পড়তে চায় না, কি হবে পড়ে! যারা জন্মান্ধ তারা জন্মান্ধের মতোই তর্ক করবে, সূর্য চন্দ্র উড়িয়ে দেবে, তর্কের স্বপক্ষে এমন সব কথা বানিয়ে বলবে যার উত্তরে শুধু একটা

দেশলাইকাটি জ্বাললেও ঢের হয়, কিন্তু জন্মান্ধ যে। তার থেকে আলোর সত্যতার প্রমাণ পাবে না। স্বয়ং শ্রীভগবান ছাড়া এদের উদ্ধার করবার ক্ষমতা আর কারুর হাতে নেই। মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।

উজ্জয়িনী বীণার শাশুড়ীর ইষ্টদেবতা অষ্টধাতুর গোবিন্দজী মূর্তির সেবা দেখতে যায়। তার শ্বশুর আজকাল প্রায়ই সফরে বেরন, অস্থায়ীভাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন।

ভোর হল, শাশুড়ী ইতিমধ্যে গঙ্গাস্নান করে এসেছেন, ফুল তুলে এনেছেন। গোবিন্দজীর ঘুম ভাঙল, গোবিন্দজী স্নান করলেন, প্রসাদ সেবন করলেন। এ তাঁর প্রাতর্ভোজন। যথাকালে মধ্যাহ্নভোজন হবে, গোবিন্দজী শয়ন করবেন, চামর দুলানোর দরকার হবে। অপরাহ্নে তাঁর ঘুম ভাঙলে আর একবার ভোজন। নূতন সজ্জা। ফুলের মালা পরিধান। তারপর তাঁর আরতির সময় হবে। ধূপধুনা জ্বলবে। শাঁখ বাজবে, কাঁসি বাজবে, ঘণ্টা বাজবে। স্বয়ং কমলবাবু ঘণ্টা বাজাবেন, বীণা বাজাবে শাঁখ, উজ্জয়িনী কাঁসি। গোবিন্দজী কিছুক্ষণ দুলবেন। রাত্রিভোজন করবেন। নিদ্রা যাবেন।

উজ্জয়িনী এতদিন জানত বীণারা মাত্র তিনজন মানুষ। তা তো নয়। ওরা চারজন। গোবিন্দজী ওদেরই একজন। তাঁকে ওরা ধাতুমূর্তি বলে ভাবতে পারে না, তিনি যদি ধাতুমূর্তি হন তবে ওরাই বা এমন কী! ওরাও তো মৃৎপিণ্ড মাত্র। গোবিন্দজী খাচ্ছেন, পাখা হাতে করে হাওয়া করতে হবে, বড় গরম খাবার মুখে দিতে ওঁর নিশ্চয়ই কষ্ট হবার কথা। গোবিন্দজী ঘুমোচ্ছেন। চুপ চুপ চুপ। জোরে কথা কইলে ওঁর ঘুম ভেঙে যাবে। বাইরে কে ডাকাডাকি করছে, ওকে চুপ করতে বল তো ঝি।

প্রতিমা যে কত জীবন্ত, কত সত্য হতে পারে উজ্জয়িনী প্রত্যক্ষ করল। কে বলবে গোবিন্দজীর প্রাণ নেই! আহা দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। কী হাসি, কী চাউনি! মাঝে মাঝে বেশ মনে হয় গোবিন্দজী সব কথা শুনছেন, শুনে টিপে টিপে হাসছেন। শাশুড়ী বলেন, "ও কি কম পাজী! ঐখানে বসেই সমস্ত সৃষ্টি চালাচ্ছে, গোপিনীদের সঙ্গে কেলি করছে, শুক-সনকাদি মুনিরা তপস্যা করে ওর দেখা পাচ্ছেন না, ঐ টুকুটুকু পা দিয়ে বলি রাজাকে পাতালে চেপে রেখেছে।"

উজ্জয়িনীর কল্পনাচক্ষু স্বর্গ মর্ত পাতাল পরিক্রমা করে, বৃন্দাবনে আটকে যায়। আছে, আছে, এখনো বৃন্দাবন ঠিক সেই রকমটি আছে। রাধা তেমনি অভিসারিণী, কৃষ্ণ তেমনি বংশীধারী। কেউ চর্মচক্ষুতে প্রত্যক্ষ করতে পায় না, মানবীয় শ্রুতিপথে শ্রবণ করতে পায় না। তবু কল্পনাবৃত্তির চালনা করলে আভাসটা ইঙ্গিতটা পায়। ভক্তিবৃত্তির চালনা করলে কিছুই অগোচর থাকে না। ধন্য বীণার শাশুড়ী। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছেন সৃষ্টিপরিচালন, বৃন্দাবনলীলা, শুক-সনকের তপস্যা, বলির প্রতি ছলনা! কী

সাহস তাঁর, বলেন কিনা "পাজী"। ভক্তি কত বেশী হলে সাহস এত বেশী হয়।

এই উপলব্ধির কাছে দরিদ্রসেবা, সমাজসংস্কার, দেবপ্রকৃতি পরিগ্রহ, দেশের স্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক মনোভাব—সব তুচ্ছ, সব উপেক্ষণীয়। সারাক্ষণ তাঁকে দর্শন করতে স্পর্শ করতে সেবা করতে চাই। অন্য কিছু করবার জন্যে সময় কই? উজ্জয়িনীর ঘুম মাঝরাত্রে ভেঙে যায়, ভোর হতে আর কত দেরি? ফুল তুলতে হবে যে! গঙ্গাস্নানে যাবার জো নেই, শ্বশুর শুনতে পেলে বকবেন, ভোরবেলা স্নান করে উঠলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ভারি তো ঠাণ্ডা লাগা। লাগুক না একটু। ঠাণ্ডা লাগলেই যদি নিমোনিয়ায় দাঁড়াত, আর নিমোনিয়া হলেই যদি মরণ হত তা হলে দুনিয়া উজাড় হয়ে যেত। আর মরণ হলেই বা কী! কৃষ্ণনাম জপ করতে করতে মরবে, বৃন্দাবনে গোপী হয়ে জন্মাবে, গোপীরা তো মুক্ত হয়েই আছে, মুক্তির ভাবনা করতে হবে না।

৪

বিলাতী মেল। সুধীবাবুর চিঠি। পাটনার ঠিকানায় উজ্জয়িনীর নামে সুধীবাবুর চিঠি এই প্রথম এল। বিলাতে কি অন্য কোনোরকম ডাকটিকিট চলে না কিংবা বার হয় না? ঐ সনাতন রাজার মাথা, তাও মুকুটহীন ও প্রায় টাকপড়া? আমেরিকার ডাকটিকিটে কেমন ওয়াসিংটন ফ্রাঙ্কলিন লিঙ্কন। জার্মানীর ডাকটিকিটে কেমন গ্যয়টে কাণ্ট বিসমার্ক। ফ্রান্সের টিকিটে কেমন—

সুধীর চিঠি পড়ে উজ্জয়িনী থ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার নিঃশ্বাস পড়ল না, যখন পড়ল তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। অনেকক্ষণ তার চিন্তা-প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে রইল, যখন বইল তখন দুচোখ বেয়ে বইল।

বাদলকে তো সে সত্যি ভোলে নি। 'ভুলে থাকা সে তো নয় ভোলা।' তার কঠিন গভীর তপশ্চর্যা বাদলেরই মুক্তির জন্যে, তার নিজের মুক্তি এমন কিছু জরুরি নয়। কিন্তু এ কেমন মুক্তি বাদল চায়? উজ্জয়িনীর সঙ্গে সম্বন্ধ থেকে মুক্তি? বাদল তা হলে অন্যকে তার সঙ্গিনী করবে? উজ্জয়িনী এখন থেকে কী বাস্তবে কী কল্পনায় সর্বতোভাবে নিঃসঙ্গ? সুদূর ভবিষ্যতেও বাদলের সঙ্গ পাবে না জানলে কল্পনাও ফাঁকা হয়ে যায় যে! নীরস হয়ে যায় যে! কী নিয়ে উজ্জয়িনীর দিন কাটবে? ধর্ম নিয়ে? হঠাৎ তার মনে হল ধর্ম-কর্ম সব মিথ্যা, স্বামীই সব। বীণার ধর্মে মত্তি আছে, কারণ তার স্বামী আছে। বীণার শাশুড়ীর ধর্মে প্রেরণা আছে, কারণ তাঁর স্বামীর চিহ্ন আছে।

কিন্তু সেটা শুধু ক্ষণকালের জন্যে। পর-মুহূর্তে সে নিজেকে দৃঢ় করল। নিবেদিতার কেউ ছিল না। পাশ্চাত্য মনস্বিনীরা কুমারী। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য স্বজন সংসার ত্যাগ করেছিলেন। উজ্জয়িনীও ত্যাগ করবার জন্যে বিয়ের আগে প্রস্তুত ছিল। ছেলেখেলার মতো

একটা রাত্রের বিয়ে, তার দরুণ এমন কী পরিবর্তন ঘটেছে যে উজ্জয়িনী বাদলকে ধ্রুবতারা করে জীবনান্তকাল অবধি পথ চলবে ?

উনিই আমার স্বামী, উনি আমার সঙ্গী হবেন।—এই বলে সে শ্রীকৃষ্ণের পটখানার দিকে চাতকের মতো চেয়ে রইল। আবার তার চোখ দিয়ে ও গাল বেয়ে ঝরণা ছুটতে লাগল, তার জামায় বাধা পেয়ে চুপ চুপ করতে লাগল। হেতুহীন অবাধ্য অশ্রুর উপর তার রাগ হল. রাগ করে চোখ দুটোকে অতিরিক্ত মুছতে মুছতে পদ্মের মতো লোহিত করে তুলল। তবু জল ক্ষরে, লোহিত পদ্মে শিশিরবিন্দু টলমল করে, ক্রমশ যখন জলাধিক্য হয় তখন সরোবরগর্ভে লোহিত পদ্ম টল টল করে।

সেদিন বীণা তাকে দেখে বলল, "সত্যি ভাই, কেমন করে পার ?"

উজ্জয়িনী আশ্চর্য হয়ে বলল, "কী পারি ?"

বীণা তার স্বভাবসিদ্ধ সংকোচের সঙ্গে বলল, "কিছু না, এমনি বলছিলুম।"

উজ্জয়িনী চেপে ধরল। বীণা বলল, "উনি এক দিনের জন্যে কোথাও গেলে আমি মরে যাই। বিলেতে যাবার কথা ওঁরও উঠেছিল। আমি বললুম, যাও না ? কে ধরে রাখছে ? উনি বললেন, বিলেতে না গিয়েও বিদ্যাসাগর হওয়া যায়। হ্যাঁ ভাই, তুমি তো ফিজিক্স্ পড়েছ, না ?"

উজ্জয়িনী আবেগ দমন করে বলল, "পাগল !"

বীণা টের পেল না আঘাত কোনখানে লাগল। বলে চলল, "কোনো কাজে লাগলুম না ভাই। স্বামীর একেবারে অযোগ্য। কেন যে তিনি এত ভালোবাসেন আজো বুঝলুম না।"

উজ্জয়িনী সহসা বলল, "বল দেখি আমিই কেন এত ভালোবাসি ?"

"কাকে ?"

"তোমাকে ?"

"যাঃ। তোমার যা কথা। ভারি দুষ্টু। আমাকে মুখ্যু দেখে ঠাট্টা করছ।"

"না ভাই বীণা। তোমা বিনা আমি আর কারুকে ভালোবাসিনে।"

"ওমা, আমার কী হবে। আর কারুকে ভালোবাসো না ? সত্যি বলছ ? তিন সত্যি ? ইস। মেয়ের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে উনি কেমন সত্যবাদী।"

"তুমি বিশ্বাস না করলে আমি কী করব বল !"

উজ্জয়িনীর ভাঙা কণ্ঠস্বর বীণাকে দমিয়ে দিল। কিছু একটা ঘটেছে নাকি ? শুনেছে বটে সে স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য কোনো কোনো পরিবারে হয়। কিন্তু তার জানাশুনা সকল স্বামীস্ত্রীই সুখী। সে ও তার স্বামী তো জন্মজন্মান্তর সুখী হয়ে এসেছে। যদিও তার একরত্তি যোগ্যতা নেই, তবু উনি নিজ গুণে অভাগীর সব দোষ ক্ষমা করেন।

অন্য কোনো মেয়ে হলে পীড়াপীড়িপূর্বক উজ্জয়িনীর মন থেকে কথা বার করত। কিন্তু বীণার স্বভাব অমন নয়। সে ধীরে ধীরে উজ্জয়িনীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকল। তারপর উঠে গিয়ে ঠাকুরের চরণামৃত এনে তাকে খাইয়ে দিল। বলল, "কল্যাণ হবে।" তবু উজ্জয়িনীর মুখখানা বিমর্ষ দেখে তার আর সহ্য হল না। সে আঁচলের খুঁট দিয়ে নিজের চোখ মুছতে লাগল।

উজ্জয়িনী হেসে উঠে বলল, "বাঃ, বেশ মেয়ে তো। ভালোবাসি শুনে খুশি হয়ে কিছু খাওয়াবে, না, কেঁদেই ভাসালে।"

বীণা লজ্জিত হয়ে বলল, "যাও। কী যে বল। আমার বুঝি ওসব শোনবার বয়স আছে।"

উজ্জয়িনী নেহাৎ অরসিক নয়। মাঝে মাঝে তারও মুখ খুলে যায়। বলল, "তার চেয়ে বল, যার তার কাছে কি ওসব শোনবার বয়স আছে। সকলে তো কমলবাবু নয়।"

বীণা খপ করে উজ্জয়িনীর মুখে হাত চাপা দিয়ে তারপর কী মনে করে সরিয়ে নিল এবং নিজের দুই কান দুই হাতে বন্ধ করল।

৫

উজ্জয়িনী কথাটা ভেঙে বলল না, বলতে পারল না। বীণা তার বন্ধু বটে, কিন্তু বন্ধুকেও কি সব কথা বলা যায়? হয়তো বলা যায়, যদি তেমন-তেমন বন্ধু হয়, যদি সমদশাপন্ন বন্ধু হয়। স্বামীপরিত্যক্তার ব্যথা স্বামীসোহাগিনী কি বুঝবে! মনে মনে করুণা করবে, কিন্তু করুণা কে চায়!

বাবাকে লিখতে পারে না, মাকে জানাতে পারে না, বোনেরা পর। শ্বশুরকে বলবার মতো নয়, বীণার শাশুড়ীর সঙ্গে বয়সের দূরত্ব অনেক। সুধীবাবুকে ভালো করে চেনে না। তিনি তার দাদার মতো, তার ইচ্ছা করে তাঁকে দাদা বলে ডাকতে, কিন্তু অধিকার নেই। তিনি যদি দাদা হতে অসম্মত হন। তা ছাড়া তাঁর সঙ্গে মতেরও অমিল ঘটবে। উজ্জয়িনীর ধর্মকর্মকে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে ব্যঙ্গ করেছেন, অমর্যাদা করেছেন। তুচ্ছ গৃহকর্ম, রাঁধা আর খাওয়া আর খাওয়ানো—যা পশুতেও করে—তাই কিনা সুধীবাবুর মতে ধর্মের মতো করণীয়। বীণা ওকাজ করে তার স্বামীর জন্যে, স্বামীর জননীর জন্যে, উজ্জয়িনী কার জন্যে করে মরবে? তার স্বামী নেই, স্বামী না থাকায় শ্বশুরও নেই।

এ বাড়ীতে থাকা বিবেকসঙ্গত কি না উজ্জয়িনী ভাবতে আরম্ভ করল। বাবার কাছে ফিরে যেতেও মন চায় না। বাপ রে! সেখানে শুষ্ক নীরস বিজ্ঞান ছাড়া আর যদি কিছু থাকে তবে সেটা মা'র [illegible]। তুমি এখন বিবাহিতা মেয়ে, তোমার এটা করা

উচিত, ওটা শেখা উচিত, সেটা বলা উচিত। অমন করে হাসতে নেই, এমন করে চলতে নেই, তেমন করে পরতে নেই। মা ইতিমধ্যে বহুবার চিঠি লিখে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর সেই মিশনারী বন্ধুনীকে পাঠাতে চেয়ে উজ্জয়িনীর উত্তর পাননি।

বীণাদের গোবিন্দজীকে ছেড়ে কোথাও যাবার কথা ভাবা যায় না। উজ্জয়িনী মনকে চোখ ঠারে—বাদলের মুখ থেকে তো ওকথা শোনেনি, শুনেছে সুধীর মারফৎ। বাদল নিজে বলুক, তারপর দেখা যাবে। ততদিনে নিশ্চয়ই একটা উপায় গোবিন্দ দেখাবেন। হয়তো বৃন্দাবনেই নিয়ে যাবেন, রাখবেন কোনো কুঞ্জে। কিংবা তীর্থে তীর্থে ঘোরাবেন। কোথাও থাকতে দেবেন না। লীলাময়ের লীলা। ভক্তকে দুঃখ দেওয়াই তো তাঁর চিরকেলে রীতি।

বাদলের উপর উজ্জয়িনীর অভিমান অন্য রূপ ধারণ করল। সে পদাবলী মন্থন করে অভিমানের কবিতায় লাল পেন্সিলের দাগ দেয়। শ্রীরাধাকে অবহেলা করে কিংবা বিস্মৃত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গেছেন। শ্রীরাধা কৃষ্ণকথা চিন্তা করছেন, কৃষ্ণরূপ ধ্যান করছেন ও আত্মনিপীড়নের সীমা মানছেন না। উজ্জয়িনী চোখের জলে ডুবতে ডুবতে এই সব পড়ে। তার ভারি তৃপ্তি হয়। সে যে সকলের থেকে দুঃখিনী, সে যে যৌবনে যোগিনী, সে যে প্রিয়-প্রত্যাখ্যাতা এই পরম গৌরব। হবে, হবে, তেমন দিন হবে যেদিন বাদল অনুতপ্ত হয়ে উজ্জয়িনীর পায়ে ধরে সাধবে। গলদশ্রুনয়নে বলবে, তখন বুঝতে পারিনি তুমি কী মহীয়সী, তখন চিনতে পারিনি তুমি দেবী। এত বড় তপশ্চর্যা ব্যর্থ যাবে না, এ কঠোর নিষ্ঠা এর নিশ্চয়ই পুরস্কার আছে।

বাদল যদি তাকে চিঠি লেখে উজ্জয়িনী ঘটা করে উত্তর লিখবে। বাদলের রথ বাদলকে মথুরায় নিয়ে গেছে, বাদল রাজা হোক, অভাগিনী উজ্জয়িনীকে মন থেকে মুছে ফেলুক, বৃন্দাবনকে—ভারতবর্ষকে—ভুলে থাক্। উজ্জয়িনীর জীবন তো ব্যর্থ হয়ে গেছেই, কিন্তু ব্যর্থতার মধ্যে তার পরম সার্থকতা সে এক হিসাবে শ্রীরাধার চাইতেও দুঃখিনী, শ্রীরাধার ললিতা বিশাখাদি সখী ছিল, তার এমন কেউ নেই যার কাছে প্রাণের ব্যথা বলে হৃদয়ভার লঘু করতে পারে।

উজ্জয়িনী মেঝের উপর শোয়া শুরু করল। একটি হাতকে বালিশ করে, অন্য হাতটি দিয়ে বইয়ের পাতা উল্টায়, চোখ মোছে। ঘর সংসারের কাজ দেখা চুলোয় গেল, ছাই ঘর সংসার, ঘর সংসারের কাজ তাকে কোন স্বর্গে নিয়ে যাবে শুনি ? নিজের জন্যে সে কিছু দাবি করছে না, একবেলা চারটি ভাত (গোবিন্দজীর প্রসাদ হলেই ভালো হত, কিন্তু তার উপায় নেই), একটু দই (উজ্জয়িনী দই বড় ভালোবাসে), যে-কোনো ফল। বেঁচে থাকবার পক্ষে এই অনেক, কিন্তু কেন বেঁচে থাকতে হবে হে ভগবান বলে দাও। পৃথিবীতে কার জন্যে, কী জন্যে বেঁচে থাকা দরকার ? যারা দেশকে স্বাধীন করছে, জন-

সাধারণের দৈন্য দারিদ্র্য দূর করছে, পীড়িতের সেবা ও রুগ্ণের শুশ্রূষা করছে তারা দীর্ঘজীবী হোক, কিন্তু আমি উজ্জয়িনী কারুর উপকার করতে পারব না, আমি চাই নিজের মুক্তি, আমাকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাও।

উজ্জয়িনী ভক্তিমার্গে বীণাকে ছাড়িয়ে গেল। বীণা তার ঐকান্তিকতা দেখে উল্টো বুঝল। ভাবল বেচারি বুঝি তার প্রবাসী স্বামীর জন্যে কাতর হয়ে পড়ছে ক্রমে ক্রমে। তবু মুখ ফুটে বলছে না। বিরহ বীণার জীবনে দীর্ঘকালীন হয়নি, তার স্বামী থাকেন পাটনায় ও পিতা আরায়, সে বাপের বাড়ী গেলে স্বামী শনি রবিবার সেইখানে কাটিয়ে আসেন। কয়েক দিনের বিরহও বীণাকে কান্না পাইয়ে দেয়, তাই থেকে সে জানে যে মাসের পর মাস যে নারী প্রোষিতভর্তৃকা সে নারী জীবন্মৃত না হয়ে পারে না। পারে বটে তারা, যাদের কোলে শিশু ও হাতে বৃহৎ সংসারের ভার, অধিকবয়স্কা গিন্নী-বান্নী মানুষ। আহা বেচারি উজ্জয়িনী।

বীণা বলে, "বাস্তবিক, ভাই, এ বড় অন্যায়। ছেলে বিলেত যাবে, যাক; কিন্তু তাকে বিয়ে দিয়ে পাঠানো কেন? তার নিজের মনেও কষ্ট, তার বৌয়ের মনেও কষ্ট। দুদিনেই মায়া পড়ে যায় যে। বেচারা বাদলবাবুরও কি কম কষ্টটা হচ্ছে। বিরহ, ভাই, এমন ধারালো জিনিস, এদিকেও কাটে ওদিকেও কাটে। ওর দেশবিদেশ নেই। বিলেতেও বাদলবাবু ঠিক তোমারি মতো দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন।"

উজ্জয়িনী রসিকতা করে বলে, "হিম লাগলে কমল শুকিয়ে যায় জানি, কিন্তু বাদল যে নিজেই হিমশীতল।"

বীণা কানে আঙুল দিয়ে মিষ্টি হাসে। বলে, "যাও। যত সব বাজে কথা!"

৬

পাটনায় আসার দু'মাসের মধ্যে উজ্জয়িনীর এমন পরিবর্তন হবে কে জানত। যোগানন্দের কাছে বাদলের কাছে রায়বাহাদুরের একটা দায়িত্ব আছে। যোগানন্দ যদি বেড়াতে এসে বলেন, "হ্যাঁ। এ কী করেছ, মহিম। মেয়েটাকে ভদ্র-সমাজের অযোগ্য করে তুলেছ।" কিংবা বাদল যখন ফিরে এসে বলবে, "এই আমার স্ত্রী!" তখন রায়বাহাদুরকেই কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

বেশ তো ছিল সে বহরমপুরে, তার মা-বাবার কাছে, তাকে পাটনায় এনে বৈষ্ণবী হয়ে ওঠার সুযোগ না দিলেই হত। তাকে বাধা দিতে সাহস হয় না, পরের মেয়ে, হাজার হোক। পাশের বাড়ীর সেই বুড়ীটা ও ছুঁড়ীটা কখন এসে দীক্ষা দিয়ে যায়, তারা ভদ্রমহিলা না হলে তাদের ধমকে দেওয়া যেত, কিন্তু ভদ্র পুরুষের এটুকু অধিকার নেই যে নিজের বাড়ীতে অপরিচিতা ভদ্রমহিলার যাতায়াত ঠেকায়।

এই দুমাসের মধ্যে উজ্জয়িনী বড় কোথাও বেরয়নি। যাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে তাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করেনি। রায়বাহাদুরের ব্যারিস্টার ও সিবিলিয়ান বাঙালী মুরুব্বিরা ইতিমধ্যেই পরিহাস করে বলেছেন যে জুনিয়র মিসেস সেন নাকি সিনিয়র মিসেস সেন-এর মতো পর্দানশীন। (যদিও বাদলের মা বহুকাল মৃত তবু রায়বাহাদুরের সমবয়সীদের পক্ষে পনেরটা বছর যেন সেদিন।)

অগত্যা রায়বাহাদুর মিসেস গুপ্তের প্রস্তাব অনুসারে মিসেস স্যামুয়েলসকে আনাবার চেষ্টা করলেন, উজ্জয়িনীর অজ্ঞাতসারে চিঠিপত্র চলতে থাকল। মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ নিজের দুই ছেলেকে ইউরোপীয় ইস্কুলে দিয়ে দেশীয় মেয়েদের ইংরেজী শেখাবার জন্তে এক প্রাইভেট ইস্কুল খুলেছেন, কাজেই তিনি সহজে আসতে রাজী নন। তবু তাঁর টাকার টানাটানি এবং ইস্কুলের থেকে টাকা যা হয় রায়বাহাদুর তার দুগুণ দিতে প্রস্তুত।

একদিন রায়বাহাদুর মফস্বলে গেছেন, একখানা ট্যাক্সি তাঁর বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে হর্ন বাজাল। উজ্জয়িনী প্রাতঃস্নান করে সবে ধ্যান করতে বসেছে, শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি ক্রমশ বাদলের মূর্তি হয়ে উঠছে, ঠিক এমন সময় কে এসে বলল, "মা, মেমসাহেব এসেছেন।"

কোনো মেমসাহেবের এই অসময়ে আসার কথা ছিল না, বাঙালী মেমসাহেব না ইংরেজ মেমসাহেব তাও জানা নেই। উজ্জয়িনী রামপিয়ারীকে জেরা করবে ভাবল। কিন্তু ততক্ষণ মেমসাহেবকে অভ্যর্থনা করবার কেউ নেই, তাঁর প্রতি অভদ্রতা হবে। নূতন করে কাপড় পরতেও সময় লাগে। উজ্জয়িনী উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে সেই কাপড়েই নেমে গেল, যা থাক কপালে।

মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ বোধ করি আশা করেছিলেন মিসেস গুপ্তের কন্তাকে দেখবেন তাঁরই মতো সুবেশা সুন্দরী, তাঁরই মতো সপ্রতিভ। উজ্জয়িনীকে চিনতে পারলেন না। বললেন, "আমি কি একবার মিসেস সেনের সঙ্গে দেখা করতে পারি ?"

উজ্জয়িনী আশ্চর্য হয়ে বলল, "মিসেস সেন ! কে তিনি ? আপনি ভুল বাড়ীতে আসেননি তো ?"

ভদ্রমহিলা অপ্রস্তুত বোধ করলেন। "পিওন তো বলে এইটেই রায়বাহাদুর এম্‌-সি সেনের বাড়ী।"

"কিন্তু তাঁর স্ত্রী তো বেঁচে নেই।"

"আমি জানি। কিন্তু আমি যাঁকে চাই তিনি তাঁর পুত্রবধূ।"

তখন উজ্জয়িনীর মনে পড়ল যে তাকেও মিসেস সেন বলে ডাকা যেতে পারে। বাদল তাকে পত্নীত্ব থেকে বঞ্চিত করলেও পত্নীপদ থেকে বিচ্যুত করেনি।

সে লজ্জিত হয়ে বলল, "আমিই সেই।"

মিসেস স্যামুয়েল্‌স তাঁর নামের কার্ড দিয়ে বললেন, "বটে ? এত বড়টি হয়েছ ?

যখন তোমাকে বাঁকুড়ায় দেখেছিলুম তখন বোধ করি তোমার বয়স বছর দশেক ছিল। কিন্তু তোমার খ্রীস্টান নামটি ভুলে গেছি, মাই ডিয়ার।"

উজ্জয়িনী খ্রীস্টান নয়। মনে মনে বিরক্ত হল। কিন্তু এই স্নেহপরায়ণা মহিলাটির কাছে বিরক্তি প্রকাশ করতে পারল না। বলল, "বাড়ীতে আমাকে বেবী বলে ডাকত, কিন্তু আমার নাম উজ্জয়িনী। আমি বৈষ্ণব।"—গম্ভীরভাবেই বলল।

মিসেস স্যামুয়েল্‌সের বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ হবে। চুলে সামান্য পাক ধরেছে। ঋজু, সুঠাম গড়ন। সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা। যতক্ষণ হ্যাট মাথায় দিয়ে বসেছিলেন ততক্ষণ তাঁর চোখদুটির সৌন্দর্য ঢাকা পড়েছিল, হ্যাট খুলে রেখে বললেন, "ডারলিং, আমি তোমার মায়ের বন্ধু, মায়ের মতো। তোমার মায়ের অনুরোধে তোমার সঙ্গে থাকতে এসেছি। তোমার দিদিরা আমাকে আন্টি বলে ডাকত মনে পড়ে। তুমিও তাই বলে ডেকো।"

মায়ের উপর উজ্জয়িনী কোনোদিন প্রসন্ন ছিল না। সে ছোটবেলায় ভাবত তার মা নেই, সে আকাশ থেকে তারার মতো খসে পড়েছে। বড় হয়ে বুঝল, মা আছে বটে, কিন্তু না থাকলেও চলত। এখন তার মনে হতে লাগল, না থাকলেই ভালো হত।

মিসেস স্যামুয়েল্‌সকে নিয়ে সে করে কী! তার ধর্মকর্মের মধ্যে তিনি কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন। তাঁর কাছে সর্বদা হাজিরা দেওয়া যায় না, অথচ তাঁকে সঙ্গ দেবার তাঁর তত্ত্ব নেবারও লোক চাই। বাঙালী হলে বাঙালীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে পাড়া বেড়াতেন। এঁর রান্নার ব্যবস্থা অবশ্য সহজেই হতে পারে, বাড়ীতে বাবুর্চি আছে, কিন্তু কে এঁর সঙ্গে বসে খাবে? মায়ের উপর উজ্জয়িনীর রোষ অহেতুক নয়।

কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল যে তার শ্বশুরও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তিনি যে কয়দিনের জন্যে মফস্বলে গেছেন ও কবে ফিরবেন এটা উজ্জয়িনীর অবিদিত হলেও মিসেস স্যামুয়েল্‌সের নয়। শ্বশুরের প্রতি মমত্ব তার এদানীং কমে আসছিল, সুধীবাবুর চিঠি পাবার পর। বাদল যখন তার কেউ নয় তখন বাদলের পিতাও অনাত্মীয়। তাঁর উপর উজ্জয়িনীর অশ্রদ্ধা বেড়ে গেল। পুত্রবধূকে কোনো শ্বশুর এমন বিপদেও ফেলে যায়! তাও অল্পবয়স্কা পুত্রবধূ।

৭

রায়বাহাদুর ইচ্ছা করেই গা-ঢাকা দিয়েছিলেন, পাছে মিসেস স্যামুয়েল্‌সকে অভ্যর্থনা করবার মুহূর্তে উক্ত মহিলার সম্মুখেই উজ্জয়িনী শ্বশুরের কাছে কৈফিয়ৎ চায়। ব্যাপারটা এতক্ষণে তার ঠাহর হয়ে গেছে, এখনো যদি বা তার রাগ থাকে তবু বিস্ফোরকের মতো শব্দ করে ফেটে বেরবে না। এই ভাবতে ভাবতে তিনি সফর থেকে ফিরলেন।

উজ্জয়িনী শ্বশুরের সঙ্গে কথাটি কইল না। মিসেস স্যামুয়েল্‌সের কাছে শ্বশুরকে

ইনট্রডিউস করে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ বললেন, "দিনটি চমৎকার। না?" রায়বাহাদুর বললেন, "হেঁ-হেঁ হেঁ-হেঁ। হবেই তো, হবেই তো। আপনার আগমনে আনন্দে গিয়াছে দিক ছেয়ে। সিগ্‌রেট খান তো, ম্যাডাম?"

মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ বললেন, "না। ধন্যবাদ।"

রায়বাহাদুরের বাস্তবিকই আনন্দ উথলে উঠছিল। একটা জ্যান্ত মেমসাহেব তার বাড়ীতে স্থায়ী অতিথি। এ কি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম? কালকেই বাঙালী মহলে তাঁর প্রেস্টিজ বেড়ে যাবে। পরন্তু ইংরেজও তাঁর বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করে যাবে। তার পরের দিন গেজেট। তিনি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কায়েমী হলেন। রাজার জন্মদিনে নতুন খেতাবের ষোল আনা সম্ভাবনা রইল। মানুষের আর কী কাম্য থাকতে পারে?

"মাফ করবেন, ম্যাডাম, ট্রেনে আপনাকে আনতে যেতে পারিনি। চাপরাসী মোটর নিয়ে গেছল তো ঠিক?"

"গেছল বৈ কি। আপনার করুণা।"

"হেঁ-হেঁ-হেঁ। Please don't mention it. মহাসম্মানিত অতিথি আপনি। আমি হিন্দু। আমাদের কাছে অতিথি হলেন স্বয়ং নারায়ণ।"

রায়বাহাদুর সাড়া না পেয়ে একটু উৎসাহিত হয়ে বললেন, "You are divinely beautiful".

মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ সতের বৎসর এদেশে আছেন। চাটুবাক্য ইতিপূর্বে অসংখ্যবার শুনেছেন। সেকেলে ধরনের ভারতীয়রা ওটাকে একটা নির্দোষ আর্ট জ্ঞান করে থাকেন। যেমন ইংরেজ দোকানদারও করে থাকে। তিনি শুধু একবার মুচকে হাসলেন।

রায়বাহাদুর আরো উৎসাহিত বোধ করলেন। প্রথম দিনেই অতিথির প্রতি এমন সব বিশেষণ প্রয়োগ করলেন যা প্রথম বয়সে আত্মীয়-বিশেষের প্রতি প্রযোজ্য। অকস্মাৎ তাঁর তারুণ্য ফিরে এল বুঝি। কিংবা ভীমরতি এগিয়ে এল। যা হোক এমন কোনো ব্যবহার তিনি করলেন না যা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ বা অসাধু। এক জাতীয় পুরুষ আছে তারা পোষা কুকুরের মতো। তারা মনিবকে কামড়ায় না, পরকে তাড়া করে যায়। মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ রায়বাহাদুরকে এক আঁচড়েই চিনে নিলেন। নিরীহ প্রাণীর উপর রাগ করে কী হবে। একটু পিঠ চাপড়ে দেওয়াই বিধি।

মিসেস স্যামুয়েল্‌স্‌কে সঙ্গ দেবার জন্যে রায়বাহাদুর টেবিলে খেলেন, আমিষ খেলেন ও উজ্জয়িনীকে বাধ্য করতে না পেরে বাইরে বিরক্ত হলেও অন্তরে আশ্বস্ত হলেন। উজ্জয়িনী উপস্থিত থাকলে রসের কথা হত না। উজ্জয়িনী মেয়েটা যে আস্ত পাগল এবং তাকে সর্বতোভাবে মানুষ করবার ভার যে তিনি একা বহন করতে অপারগ এই কথাটা মিসেস স্যামুয়েল্‌স্‌কে বাছা বাছা ইংরেজী ফ্রেজ ও ইডিয়মের সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম

করালেন। পরিশেষে বললেন, "হিন্দু আমিও। কিন্তু ঐ যে কুসংস্কার—ম্লেচ্ছের সঙ্গে আহার করব না কিংবা ম্লেচ্ছের সঙ্গে নাচব না—খাঁটি হিন্দুত্ব ওর বহু ঊর্ধ্বে। পাশের বাড়ীর মেয়েরা ওটা বোঝবার মতো বুদ্ধিবিদ্যার অধিকারিণী নন। উজ্জয়িনীকে ওদের কবল থেকে উদ্ধার করবার জন্যে আপনি অবতীর্ণ হয়েছেন, আপনি ওর সেভিয়ার।"

মিসেস স্যামুয়েল্‌স শুধু ওষ্ঠবিকাশ করলেন। উৎসাহ পেয়ে রায়বাহাদুর পুনরায় তাঁকে হিন্দুত্বের মর্ম অবগত করালেন। ম্লেচ্ছের সঙ্গে আহার করব না, ম্লেচ্ছের সঙ্গে নাচব না, এগুলো অন্ধবিশ্বাসীদের বাড়াবাড়ি। রায়বাহাদুর এইমাত্র আহার করে প্রমাণ করে দিলেন যে তিনি বাড়াবাড়ির বিরোধী। এবার একটু নাচতে পারলেই প্রমাণটা সর্বাঙ্গীণ হত, কিন্তু কেউ শিখিয়ে না দিলে তিনি কেমন করে নাচবেন?

৮

উজ্জয়িনী কর্তব্য স্থির করতে পারছিল না। বাদল তার কেউ নয়। কাজেই এ বাড়ী তার বাড়ী নয়। এখানে যা ঘটছে ঘটুক, সে বাধা দেবার কে? কিন্তু বাদল একথা নিজ মুখে বলেনি, নিজে চিঠি লিখে জানায়নি। সুধীবাবুর কথাই কি চূড়ান্ত হতে পারে? তা যদি না হয় তবে উজ্জয়িনী এ বাড়ীর উপর থেকে অধিকার প্রত্যাহার করবে না, এখানেই থাকবে এবং এর অনাচার সহ্য করবে। মিসেস স্যামুয়েল্‌সকে সে আমন্ত্রণ করেনি, তিনি তার মায়ের পরামর্শে তার শ্বশুরের অতিথি, এবং অতিথির যেটুকু প্রাপ্য তদতিরিক্ত পাবার দাবি রাখেন না। শাশুড়ীর অবর্তমানে উজ্জয়িনীই এ বাড়ীর গৃহিণী, অতিথি যেন সেটা স্মরণ রাখেন।

আবার তার চিন্তার ধারা ঘুলিয়ে যাচ্ছিল। অতিথি বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে শ্বশুরের কাছে যেরূপ অভ্যর্থনা পেয়েছেন সেইরূপ চলতে থাকলে অচিরেই গৃহিণীর স্থান নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধবে। তখন উজ্জয়িনীকেই সরে যেতে হবে। তখনকার লজ্জা থেকে সে বাঁচবে কেমন করে? বাপের বাড়ী চলে যাবে—কিন্তু সে বাড়ীতেও লজ্জা, সে বাড়ীতে তার শ্রীকৃষ্ণের অসম্মান। আচ্ছা, দেখা যাবে তখন। অত আগে থাকতে ভেবে কী হবে। কোথাও যদি আশ্রয় না মেলে তবে তো ভালোই, তবে তো প্রভু নিজেই তাকে আশ্রয় দেবেন তাঁর বৃন্দাবনে। মীরার মতো সে গাইবে।—

চাকর রহস্যুঁ বাগ লগাস্যুঁ
নিত্‌ উঠ দরশন পাস্যুঁ
বৃন্দাবন কি কুঞ্জে গলিন্‌মে
তেরি লীলা গাস্যুঁ।

আহা, সে কী জীবন, কী সৌভাগ্য। বৃন্দাবন। শ্রীবৃন্দাবন। নীপতমালতরুপুঞ্জিত

কুঞ্জ, কালিন্দীর উজান গতি, অদৃশ্য রাখালের বেণুধ্বনি, চির বসন্তের গীতগন্ধরূপময় উৎসব। আহা।

উজ্জয়িনী ভাবে, মানব মানবীর ছদ্মবেশে এখনো সেখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা শ্রীদাম সুদাম ললিতা বিশাখা চিত্রলেখা ইত্যাদি বিচরণ করছেন, কেবল চিনে নিতে পারলে হয়। ধবলী শ্যামলীর গোষ্ঠ হয়তো নেই, অঘাসুর বকাসুর পূতনা ইত্যাদি অবশ্য রূপকথা, কিন্তু যা শাশ্বত যা সাধকসাধারণ আবহমানকাল দিব্য-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে এসেছেন, যা জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস বলরামদাসের যুগেও বিদ্যমান ছিল তা কি আজ না থাকতে পারে। ঐতিহাসিক ঘটনা একবার ঘটে, ইতিহাসের মানুষ একবার জন্মায় ও একবার মরে, ইতিহাসের জগতে আরম্ভ ও সমাপ্তি আছে। কিন্তু ইতিহাসরচয়িতার অগোচর একটি মায়ালোক আছে, তার সংবাদ যাঁরা রাখেন তাঁরা বলেন যে তার যৌবন অনাদ্যন্ত, তার অধিবাসিগণ অজরামর। এই সেই মায়ালোক আমাদের এই পৃথিবীতেই ছদ্মবেশে অবস্থিত।

উজ্জয়িনী অতিথিকে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করল, কিন্তু তাঁকে ধরাছোঁয়া দিল না। বেশীর ভাগ সময় নিজের ঘরে বন্ধ থাকে, বই পড়ে, ধ্যান করে, চিন্তা করে। হঠাৎ খেয়াল হলে নেমে গিয়ে বীণাদের বাড়ীর দরজায় টোকা মারে। বীণা দরজা খুলে দিলে কৈফিয়ৎ দেয়, "এক জায়গায় ঠেকছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীরাধাকে বাদ দেওয়া হয়েছে কেন ? কী তাঁর অপরাধ ?" বীণাটা সত্যিই মুখ্যু। জন্মাবধি এই সব পড়ছে, তবু এমন প্রশ্নের উত্তর জানে না, বোধ হয় কোনো প্রশ্নই তার মনে ওঠে না। তার শাশুড়ী তো স্পষ্ট বলছিলেন সেদিন, "আমরা সারা জীবন চর্চা করেও বৈষ্ণব শাস্ত্রের যা জানিনে উজ্জয়িনী এই এক মাসের মধ্যে তা জেনেছে। পূর্বজন্মের সুকৃতি আর শ্রীগোবিন্দের করুণা। নইলে এমন তো কখনো দেখা যায় না।"

মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ উজ্জয়িনীর শিক্ষায় ও সামাজিকতায় সাহায্য করতে এসেছেন, তার শ্বশুরের চাটুবাক্য শুনতে আসেননি। তিনি এসে অবধি উজ্জয়িনীর নাগাল পাচ্ছেন না। সে খাওয়া দাওয়া করে নিজের ঘরে, মিসেস স্যামুয়েল্‌সের সঙ্গে দেখা হলে বলে, "কেমন আছেন ? রান্না পছন্দ হচ্ছে তো ? ওবেলা আপনার কী কী ভালো লাগবে ? আচ্ছা, আপনি স্যালাড ভালোবাসেন কি ?" এর পর বলে, "দেখুন আন্টি, আমি পাগল মানুষ। আমার দোষ ধরবেন না। আমার নিগূঢ় সাধনায় আমি যে আনন্দ পাচ্ছি সেই আমার একমাত্র কৈফিয়ৎ।" মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ এর উপর বলবার মতো কথা পান না। বিমর্ষ হয়ে যান। তিনি স্নেহপ্রবণ মানুষ। তাঁর সন্তানরা দূরে। এই মেয়েটিকে আপনার করতে পারলে তাঁর সন্তানবিরহ উপশমিত হয়। কিন্তু দুজনের দুই স্বতন্ত্র ধর্মমত। তিনি শুনেছেন কৃষ্ণ অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ও কুটিল ব্যক্তি ছিলেন, মোটেই যীশুর মতো নির্মলচরিত্র

না। হিন্দুরা যে কেন তাঁর মূর্তি পূজা করে তা নিয়ে তিনি বিস্মিত ও দুঃখিত হয়েছেন। শিক্ষিত ভদ্রলোকরাও তাঁকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি। অথচ বিশুদ্ধ কুসংস্কার বলে অবজ্ঞা করতেও পারেন না। গীতার অনুবাদ তাঁকে স্থলে স্থলে আশ্চর্য করেছে। কিন্তু ওগুলির উপর নিশ্চয়ই খ্রীস্টধর্মের প্রভাব পড়েছে। কেমন করে পড়েছে ও কবে পড়েছে তিনি বলতে পারবেন না। কিন্তু Farquhar সাহেব মিথ্যা বলবার পাত্র নন। যেমন করে হোক হিন্দুদের ধর্ম যে লৌকিক কুসংস্কারের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় তত্ত্বের সংমিশ্রণ এইরূপ একটা ধারণা মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ পোষণ করে আসছিলেন।

অন্যান্য খ্রীস্টান মিশনারীবংশীয়ার মতো তাঁর ধর্মপ্রচারের বাতিক ছিল না, তিনি অপরকে ভজানোর জন্যে আহার নিদ্রা ত্যাগ করতেন না। তাঁর মনে কষ্ট হত এই বলে যে শিক্ষিত লোকেও স্বেচ্ছায় salvationএর সুযোগ হারাচ্ছে। তিনি মনে মনে সেই সব ভ্রান্ত আত্মার জন্যে প্রার্থনা করতেন।

৯

ক্রমশ রায়বাহাদুরের অন্য মূর্তি দেখা গেল। তিনি চাকর মহল লণ্ডভণ্ড করে ধমকে বেড়াতে লাগলেন। মেমসাহেবকে শুনিয়ে শুনিয়ে একটাকে বলেন, "এই উল্লুক, হামারা মকানমে ইতনা রোজ কাম করতা হ্যায়, আবহিতক পীকদানিটি দুরস্ত নেহি কিয়া?" আর-একটাকে দেখতে না পেয়ে বলেন, "কাঁহা গিয়া শূয়ারকা বাচ্চা? উস্‌কা কমন্‌সেন্স্ কব্ হোগা? মেম সাব্‌কা তক্‌লিফ্ হোতা রহা।"

ঘেউ ঘেউ করে পরকে তাড়া করে নিয়ে যাবার পর ডালকুত্তা যেমন প্রভুর পায়ে ফিরে এসে ল্যাজ নাড়ে ও জিভ বার করে, রায়বাহাদুর তেমনি মিসেস স্যামুয়েল্‌সের চেয়ারের কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে বসেন ও অকারণে হেঁ-হেঁ হেঁ-হেঁ করেন। একজাতীয় মানুষ আছে তাদের হাসি অবিকল কুকুরের জিভ-বের-করা মাথা-কাঁপানো চোখ-জলজল-করা আনন্দ-জ্ঞাপনের মতো।

মিসেস স্যামুয়েল্‌স্‌কে তিনি নিজের ঘরটা ছেড়ে দিয়েছেন। উজ্জয়িনীরটাই ছিল সব চেয়ে বড় এবং সাজানো ঘর। কিন্তু তাকে বেদখল করতে তাঁর সাহসে কুলায়নি। আই-এম্-এস্ অফিসারের কন্যা, ওর দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় এখন গবর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার মেম্বার। উজ্জয়িনীকে তিনি ভয় এবং সমীহ করে থাকেন। তাকে পুত্রবধূরূপে পাওয়া তাঁর পক্ষে কত বড় সম্মানের বিষয়। তাই তাঁর ইচ্ছা থাকলেও উজ্জয়িনীকে তার ঘর থেকে নড়তে বললেন না।

মেমসাহেবকে বললেন, "ম্যাডাম, এ বাড়ীতে আপনার যারপরনাই অসুবিধা হচ্ছে জানি। কিন্তু আর দেরি নেই।"—হেঁ-হেঁ-হেঁ করলেন। ব্যাপারটাকে রহস্যময় করে

তুলে তারপর সেই রহস্যের নিরাকরণ করলেন।—"আর দেরি নেই। দিন কয়েকের মধ্যেই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে পাকা হব। তারপর উঠে যাব ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠিতে। কিন্তু—"

ব্যাপারটাকে আর একটু ঘোরাল করার জন্যে চশমার নিচে ও গালের ভাঁজে আর একবার হাসির লহর তুললেন। শালগ্রাম শিলার মতো মাথার গড়ন। অর্থাৎ মাথার পিছনটা একটা ঢিপির মতো। সেদিক থেকে কপালের দিকটা ঢালু। যৌবনকালে যখন চুলের জঙ্গল ছিল তখন এই অদ্ভুত চড়াই উৎরাই ঢাকা পড়েছিল। এখন কানের উপরকার দুটি ওয়েসিস ছাড়া বাকীটা মরুভূমি।

"কিন্তু পাটনাতে হয়তো রাখবে না, ম্যাডাম। ছোটখাট একটা জেলা দেবে। যথা, পুরী। পুরী গেছেন, ম্যাডাম?···গেছেন। ঘোর পৌত্তলিক স্থান। ভালো লাগেনি নিশ্চয়।···লেগেছে? হেঁ হেঁ হেঁ।···সমুদ্র কার না ভালো লাগে? বিশেষত আপনার।"

মিসেস স্যামুয়েল্‌স্‌ নীরব। বেশী কথা বলা তাঁর জাতীয় স্বভাবে নেই। অল্পকথা বলতে তিনি কুণ্ঠিত হচ্ছিলেন। বাক্যের অভাবে হাস্য বিধেয়। তাই সমস্তক্ষণ তাঁর মুখে মৃদু হাসির সলতে জ্বলছিল। তিনি স্বভাবত লজ্জাশীলাও বটে।

রায়বাহাদুর একতরফা বকে চললেন। "রিটায়ার করতে এখনো বছর সাতেক দেরি। কমিশনার হতে পারা খুব বেশী অবিশ্বাস্য নয়।" ওটুকু গদগদভাবে বললেন। যখন তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তখন তাঁর গলার স্বরের সঙ্গে নাকের স্বর যোগ দেয়। "তবে ঐ যে হতভাগা স্বরাজিস্টগুলো কমিশনার পদ তুলে দেবার ধুয়ো ধরেছে তার ফলে দেশের কী পরিমাণ ক্ষতি হবে সেটা তো ধীরভাবে বিবেচনা করছে না। বাস্তবিক, ম্যাডাম, কমিশনার পদ উঠে গেলে শান্তি ও শৃঙ্খলাও উঠে যাবে।"

স্যামুয়েল্‌স্‌-জায়া এদেশের শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে মোটামুটি এই জানেন যে বড়লাট ও প্রাদেশিক লাট ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিসের সাহায্যে রাজকার্য চালান। কমিশনারের প্রয়োজন ও পদমর্যাদা তাঁর জ্ঞানের বাইরে। তিনি অজ্ঞতার পরিচয় দিতে না চেয়ে টিপে টিপে হাসতেই থাকলেন।

রায়বাহাদুর থামলেন না। কমিশনারের বেতন, নিজের বেতন, নিজের ব্যয়তালিকা, নিজের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, আর একখানা মোটর কেনার আবশ্যকতা, নূতন কুঠির সাজসজ্জার কথা এই সব নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক বক করলেন। আপিসের সময় হলে ঘটা করে আফশোস জানালেন।—"একলাটি আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে, গল্প করবার সাথীর অভাব সে কি আমি বুঝতে পারিনে? অল্পবয়সীদের সঙ্গে আমাদের মনের মিল হবে কেন? ওরা জীবনের কতটুকু জানে, কী-ইবা দেখেছে। খালি বুড়ো মানুষের মতো নিরামিষ খেলে ও মালা গড়ালে হল।"—উত্তেজিত হয়ে নাকী সুরে বক্তব্য সমাপন

করলেন।—“কোনো কোনো বুড়ো মানুষ আছেন তাঁদের লজ্জা নেই, অল্পবয়সীর কানে পাকামির মন্ত্র দেন। নিছক ঈর্ষা—তাছাড়া আর কিছু নয়, ম্যাডাম। নিজের ছেলে বিলেত যেতে পারল না, আই-সি-এস হবার সুযোগ হারিয়ে দেড়শ টাকা মাইনের লেকচারার হল, অতএব পরের ছেলের উপর শোধ তুলতে হবে সে বেচারার বৌকে বিগড়ে দিয়ে। ধনী মানুষ কৃতী মানুষ দেখলে কারুর কারুর চোখ টাটায় কেন বলতে পারেন? নানাদিক থেকে তাকে অসুখী করে তুলে তারপর বলা হয় কিনা, ধনের শাস্তি ও মানের সাজা বিধাতা দিয়েছেন। ধিক্ ধিক্ ধিক্!” (পাঠক ইচ্ছামত চন্দ্রবিন্দু বসিয়ে নেবেন।)

মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। বুঝতে পারলেন না কার প্রতি কটাক্ষ করা হল।

১০

মনের কথা খুলে না বললে মনের ব্যথা হালকা হয় না। বীণার শিক্ষা দীক্ষা হয়তো হাই স্কুল অবধি গেছে, কিন্তু তার বুদ্ধির দৌড় ও কল্পনার গতি উজ্জয়িনীর সম-দূর নয়। উজ্জয়িনীর সমস্যা বীণার অভিজ্ঞতার বাইরে। তার জগতে সবাই সুখী, সকলে সপ্রেম। ব্যথা বড় জোর বিরহব্যথা। দুঃখ সাধারণত রোগভোগের বা চাকরী না হবার দুঃখ। খেদ একমাত্র নিঃসন্তান রইবার খেদ। উজ্জয়িনী ইতিমধ্যেই বীণার অন্তর চিনে নিয়েছে। বোন হিসাবে বীণার তুলনা নেই। নিরহঙ্কার নিঃস্বার্থ নিরভিমান, সরলতার প্রতিমূর্তি, স্নেহসেবার অবতার। কিন্তু সখী হিসাবে বীণা অচল।

বীণাকে সে বারংবার পরীক্ষা করেছে, পাস-এর সুযোগ দিয়েছে। কদমকুঁয়ার একটু দক্ষিণে রেলরাস্তা। রেলরাস্তা ছাড়িয়ে খাল ডিঙিয়ে পাকা সড়কের দুধারের বুনো ফুল তুলে বেড়ানো উজ্জয়িনীর অপরাহ্নকালীন নিত্যকর্ম। সেই সব ফুল দিয়ে মালা গেঁথে বীণাদের গোবিন্দজীকে উপহার দেওয়া হয়। বীণা মাঝে মাঝে তার সহকর্মী হয়। বীণাকে সঙ্গে না নিলে যে তার ভয় করে এমন নয়। উজ্জয়িনী মানুষকে ভয় করে না। কে তার কী করতে পারে? গায়ে হাত তুললে কান মলে দেবে। হাত চেপে ধরলে লাথি চালাবে। উজ্জয়িনী বীণার মতো সরলা অবলা নয়। পিতার সঙ্গে টেনিস খেলেছে, শিকার করেছে, তার কবজিতে পুরুষমানুষের কবজির সমান জোর। সে শাড়ী পরে শাড়ীকে খাটো করে নিয়ে। তাই তার পক্ষে দৌড়ানো অস্বচ্ছন্দ নয়, দৌড়ানোর অভ্যাসও তার আছে। সে হাঁটে পুরুষমানুষের মতো জোরে জোরে পা ফেলে। তার বাবার সঙ্গে সকালবেলা পায়ে হেঁটে বেড়ানোর দরুন সে সামরিক কায়দায় হাঁটতে অভ্যস্ত। বীণাটা নেহাৎ মেয়েমানুষ। হাঁটে যেন কেন্নোর মতো crawl করতে করতে।

মাথায় কাপড় দিয়ে পুরুষ পদাতিকদের চোখে নিজেকে এত রহস্যাচ্ছন্ন করা কেন? ওরা প্রাণভরে চেয়ে দেখুক, দেখে হাসি পায় তো হাসুক, কান্না পায় তো কাঁদুক, পিছু ধরে তো বকুক। যতক্ষণ না গায়ে হাত তুলেছে কিংবা পথের বাধা হয়েছে ততক্ষণ ওরা নিরাপদ। তারপরে কিন্তু ওদের অপরাধের মার্জনা নেই। উজ্জয়িনী বিনা দ্বিধায় ওদের খুন করে ফেলতে পারে। তার বৈষ্ণবধর্ম আততায়ীকে প্রশ্রয় দিতে বলে না, বললেও সে শুনবে না। শ্রীকৃষ্ণ যে কংসারি।

বীণাকে সঙ্গে নিয়ে যায় মনের বোঝা নামাতে। কিন্তু বীণাটা এমন নির্বোধ যে ঠিক জায়গাটিতে সাড়া দেয় না। কথা উঠল, "বিলেত দেশটা মজার। সেখানে যেই যায় সেই হয়ে যায় কাজের লোক।" এক্ষেত্রে বীণার বলা উচিত ছিল, "তাই নাকি, তাই উজ্জয়িনী? বাদলবাবু চিঠি লেখেন না প্রতি সপ্তাহে?" প্রশ্নটা শুনলে উজ্জয়িনী সুদীর্ঘ উত্তর দিত। তার উত্তর শুনে বীণা হয়তো বলত, "বল, বল উজ্জয়িনী, কেন এমন হল? তুমি তো কোনো অপরাধ কর নি? তুমি তো সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী ও তন্বী। বিলেতের মেয়ের না হয় রঙ সুন্দর, কিন্তু তোমার যে মন সুন্দর, উজ্জয়িনী।" উজ্জয়িনীর চোখের বাষ্প জল হয়ে ঝরে পড়ত। বীণা আঁচলের প্রান্ত দিয়ে ঝরা জল মুছে নিত, ঝরন্ত জলকে বাধা দিত। দুই সখীতে অনেকক্ষণ চুপ করে বাণীবিনিময় করা হলে বীণা বলত, "ভয় কী? বিরাট বিশ্ব, তারার মেলায় পৃথিবী একটা জোনাকি, সামান্য পার্থিব ব্যথা তোমাকে অভিভূত করতে পারে না, উজ্জয়িনী। তুমি বিশ্বদেবের পায়ে সুখদুঃখের পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করে নিশ্চিন্ত হও।" কিংবা বলত, "স্বামী সব নয়। স্বামীর চেয়ে যিনি প্রিয় যিনি নিকট, তিনি তোমার উপায় করবেন। ভাবনা কিসের?"

কিন্তু বীণা উজ্জয়িনীর কাল্পনিক বীণা নয়, কাজেই মজার কথাটা শুনে বলে, "আমি জানি। আমার সেজকাকা যখন বিলেতে ছিলেন তখন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করতেন কিনা, তাই তাঁর চিঠি আসত দুমাসে একবার। তা বলে উদ্বিগ্ন হওয়া তোমার সাজে না, উজ্জয়িনী। এবারকার মেলে না আসে আসছে বারের মেলে আসবে, না এলে আমাকে বোলো।" তার ডাগর দুটো চোখে সরল বিশ্বাসের নিশ্চয়তা ব্যঞ্জিত হয়। উজ্জয়িনী মুগ্ধ হয়ে তাই দেখে, প্রসঙ্গটা চেপে যায়।

অন্য একদিন আমবাগানের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে বলে, "আচ্ছা, কে কার স্বামী কে কার স্ত্রী, এটা পূর্বজন্ম থেকেই স্থির হয়ে থাকে, না?"—একথা শুনে বীণা যদি বলত, "নিশ্চয়। বাদলবাবুর সঙ্গে যেদিন তোমার বিয়ে হল সেইদিন হঠাৎ তোমার ওকথা মনে হল। তারপর ধীরে ধীরে প্রত্যয় হল, কেমন? ঠিক বলেছি কি না, ভাই উজ্জয়িনী।" এর উত্তরে উজ্জয়িনী বিয়ের রাত্রের একটা স্মৃতি-সুরভিত বর্ণনা দিত। তার পরের সেই কয়েকটি পরম মহার্ঘ দিন সেগুলিকে বিস্মৃতির বৈতরণীর ওপার থেকে এপারে আনত।

বীণার প্রশ্নকে উপলক্ষ করে নিজে আর একবার সেই বিগত অবস্থার মধ্যে বাঁচবার স্বাদ পেত। বীণা তার বর্ণনা শুনে বলত, "এক জন্মে এর বেশী সুখ কেউ পায় না। তুমি যা পেলে তা অমৃত, তার স্মৃতিও অমৃত, তার চিন্তা তো অমৃতই, তার কল্পনাও অমৃত।" উজ্জয়িনীর সাধ যেত কাঁদতে। বীণার কাঁধে মাথা রেখে সে আমবাগানের নির্জনতার মধ্যে অলস চরণে চলতে চলতে দাঁড়াত। আর একবার অতীতের মধ্যে বাস করে নিত।

কিন্তু বীণা তো উজ্জয়িনীর মানসী সখী নয়, সে যা, সে তাই। সে অতি সরল গদ্য। সে বলল, "শুধু এ জন্মে নয়, পরজন্মেও সেই একই স্বামীস্ত্রী। জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ—[illegible]।"

পলায়ন

১

বাদল হচ্ছে ভাবের মানুষ। এক একটা ভাবনা নিয়ে বিভোর থাকে, কখন রাত ভোর হয়ে যায় সে খবর রাখে তার এলার্ম টাইমপিস। খাচ্ছে, কিন্তু কী খাচ্ছে খেয়াল নেই, সঙ্গিনীর কথাগুলি মনোযোগীর মতো শুনছে, কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে বলছে, "ক্ষমা চাইছি, কেট্। কী বলছিলে ঠিক ধরতে পারিনি।" ট্রেনে কিংবা বাস-এ চড়ে কোথাও যাচ্ছে, আপন মনে ফিক্ করে হাসছে। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, গাড়ী থেকে নামবার কথা ভুলে গেছে। মাঝে মাঝে দয়া করে ক্লাসে উপস্থিত হয়, সেখানেও প্রোফেসারের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে যে তিনি মনে করেন ইনি তন্ময় হয়ে শুনছেন। বাদলের সৌভাগ্যক্রমে ছাত্রকে প্রশ্ন করার রীতি ইংলণ্ডের অধ্যাপক মহলে নেই, নতুবা বাদল পদে পদে অপদস্থ হত।

ইদানীং তার মাথায় কী এক ভাব চেপেছে, সে কিছু একটা দেখলেই ভাবে, বাস্তবিক, বিশ বছর পরে দেশে ফিরছি, ফিরে দেখছি দেশের তুমুল পরিবর্তন ঘটে গেছে। যেখানে ছিল Foundling Hospital সেখানে এখন ফাঁকা জমি, শুনছি সেখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের বাড়ী উঠবে। মন্দ প্রস্তাব নয়, কিন্তু funny। অত বড় একটা পুরাতন ইমারৎ আমি দেখতে পেলুম না, আমার আসার আগেই ভেঙে ফেলেছে। ১৯২৪ সালে ভাঙল Devonshire House; এখন সেখানে হোটেল আর ফ্ল্যাট। মন্দ নয়, কিন্তু funny। রিজেন্ট স্ট্রীটের চেহারা বদলে গেছে, Strand তো এখন বেশ চওড়া হয়েছে, পার্কলেন-এর আভিজাত্যগর্বিত প্রাসাদ এখন ধনগর্বিতদের রুচি অনুযায়ী প্রথমে ধূলিসাৎ ও পরে পুনরায় নির্মিত হচ্ছে, Dorchester House নাকি হবে Dorchester Hotel। মন্দ নয়, যুগের দাবি মানতে হবেই তো, কিন্তু funny। আমার

অনুপস্থিতিতে দেশটার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল।

বিশ বছর আগে মাটির নীচে এত রেল লাইন ছিল না, ইলেকট্রিসিটির দ্বারা চালিত হত না কোনো ট্রেন। রাস্তায় মোটরের ভিড় ছিল না, এত মোটর বাস কল্পনার অতীত ছিল, এই যে সব পথ-প্রান্তীয় গারাজ এগুলি অধুনাতন। ট্র্যাফিক একটা মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিসের হাতে নিয়ন্ত্রণের ভার থাকা আর পোষাচ্ছে না দেখছি। রেলের মতো সিগ্‌ন্যাল চাই রাস্তায় রাস্তায়। অটোমেটিক সিগ্‌ন্যাল।

বাস্তবিক, বিশ বছর পরে দেশে ফিরতে বড় funny লাগে। সিটি অঞ্চলের শ্রী দেখ! ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড-এর সাবেক কালের বনেদী সৌধ নতুন ছাঁচে তৈরি হবে কেউ ভাবতে পারতে? আর লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্ক কিনা পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে। হা হা হা!

মহাযুদ্ধের চিহ্নাবশেষ বাদল লণ্ডনের সর্বত্র আবিষ্কার করছে। যথা, সন্ধ্যার আগে দোকান বাজার বন্ধ করা। এ নিয়ম তো প্রাগ্‌যুদ্ধীয় ইংলণ্ডে ছিল না। তখনকার রাস্তাগুলো অর্ধেক রাত্রি অবধি আলো-ঝলমল করত। শত্রুপক্ষের এরোপ্লেন আলো দেখলে বোমা ছুঁড়বে বলে D. O. R. A. (Defence of the Realm Act) সন্ধ্যার পর অন্ধকারের যবনিকা টেনে দিল। ইস্, ছিল বটে সে একদিন! মাথার উপর সাঁই সাঁই করে এরোপ্লেন ছুটেছে, কানের কাছ দিয়ে গোলা বন্ বন্ করে ধাওয়া করেছে, জলের নিচে সাবমেরিন কিলবিল কিলবিল, ডাঙার উপর "Tank" গড়গড় গড়গড়। তখন বাদল ছিল বহু দূরে, এত বড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল বাদলের অনুপস্থিতিতে, বাদলের বিনা সহযোগে।

২

অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মেয়েরা কেশ ও বেশ হ্রস্ব করেছে। তারা আর গজেন্দ্রগামিনী নয়। বাদলদের পাড়ার অনেক মেয়ের বাইসিক্‌ল্ আছে। কত মেয়ে মোটর সাইক্লিস্টদের পিছনে বসে প্রাণ হাতে করে বেড়াতে বেরয়। থিয়েটারে বেআব্রু মেয়ে শত শত। নাচের বাতিক সংক্রামক হয়েছে। মন্দ বাতিক নয়। স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বাদল নাচ শিখতে চেয়েছিল। কিন্তু কেট্ বিশেষ আপত্তি করেছেন। বলেছেন, "তোমার সঙ্গীতের কান একেবারেই নেই, বার্ট। তোমার পদক্ষেপ বেতালা হবে।" বাদল ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তার ধারণা ছিল সে ইচ্ছা করলেই যে কোনো বিষয়ে কৃতী হতে পারবে। মানুষ কী না পারে? "What a man has done a man can do." ইচ্ছা করলে বাদল একজন বিচক্ষণ সেনাপতিও হতে পারত। বৈজ্ঞানিক কিংবা মেরু-আবিষ্কারক, সঙ্গীতকার কিংবা ফিল্‌ম্ স্টার, বণিক কিংবা ইঞ্জিনীয়ার যা খুশি তা হতে পারা কেবলমাত্র ইচ্ছা, উদ্যোগ, সময় ও সাধনা সাপেক্ষ। "অসম্ভব" বলে কোনো কথা নেপেলিয়নের

অভিধানে ছিল না, বাদলের অভিধানেও নেই।

কেট্ এর উত্তরে বলেছিলেন, "নাচ তো খুব কঠিন বিষয় নয়, বার্ট্। চাও তো তোমাকে আজকেই শিখিয়ে দিতে পারি। কী জান, ও জিনিসটা আজকাল এত খেলো হয়ে উঠেছে যে কোনো ভদ্রলোকের ও জিনিস মানায় না।"

বাদল গম্ভীর ভাবে বলেছিল, "ওকথা আমারও মনে হয়েছিল, কেট্। বাস্তবিক মহাযুদ্ধের পর থেকে ইংলণ্ডের স্ত্রী-চরিত্র থেকে dignity চলে যাচ্ছে। আমরা পুরুষরাও এর জন্যে বহু পরিমাণে দায়ী। সিরিয়াস্ মেয়ে দেখলে আমাদের গায়ে জ্বর আসে।" এই বলে বাদল তার কলেজের সহপাঠী ও সহপাঠিনীদের বর্ণনা দিয়েছিল। সহপাঠিনীরা সামনের সারিতে বসে। প্রোফেসারের প্রত্যেকটি আপ্তবাক্য খাতায় টুকে নেয়। সহপাঠীরা এই নিয়ে তাদের অসাক্ষাতে রসিকতা করে থাকে। কেউ কেউ তাদের কার্টুন আঁকে। ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নের একটি "সোশ্যাল"-এ বাদল নিমন্ত্রিত হয়েছিল। সেখানে ছেলেরা ও মেয়েরা মিলে "There was a miner, Fortyniner" ইত্যাদি হাস্যসঙ্গীত গেয়েছিল। বাদলের কাছে যে মেয়েটি বসেছিল সে বলেছিল, "আপনি গাইছেন না যে।" বাদল বলেছিল, "গানটা জানা থাকলে তো?" মেয়েটি তার নিজের বইখানা বাদলের সঙ্গে ভাগ করে বাদলকে বলেছিল, "গলা ছেড়ে গান ধরুন। সকলেই আনাড়ি, কে কার ভুল ধরবে?" বাদল তাই করেছিল। কিন্তু সে কি জানত যে গানটা এত লঘু? আস্তে আস্তে গাইতে গাইতে হঠাৎ শেষের দিকে এক নিঃশ্বাসে ও একসঙ্গে সবাই চেঁচিয়ে উঠল—

"Then I kissed her little sister
And forgot my Clementine."

বাদলের তো লজ্জায় বাক্‌স্ফূর্তি হল না। দিনের বেলার ঐ সব লক্ষ্মী মেয়ে সন্ধ্যা বেলা এই সব গানে ছেলেদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে? বাদল পরে ভেবে দেখেছিল। অন্যায়টা এমন কী হয়েছিল? চুম্বন করা তো কথা বলার মতোই একটা শারীর ক্রিয়া। এদেশে তো ভাই-বোন মা-বাবা সবাই সবাইকে চুম্বন করে। কিন্তু ওটা না হয় মাফ করা যায়। গানের পর সেই যে নাচটা হল সেটাতে বাদল যোগ দিতে না পেরে এক কোণে চুপ করে বসেছিল। পুরুষ সংখ্যা কম পড়ে যাওয়ায় মেয়েরা জোড়া জোড়া হয়ে নাচতে বাধ্য হচ্ছিল। তাদের কারুর কারুর হাতে ছেলেবেলাকার টেডি ভালুক কিংবা অন্য রকম পুতুল ছিল। ছেলেরা পাছে সিরিয়াস্ বলে পরিহাস করে সেই জন্যেই যে তারা অতিরিক্ত ছেলেমানুষী করছিল বাদল এক কোণে বসে এইরূপ গবেষণায় ব্যাপৃত ছিল। সেই সময় একটি ছেলে এসে তার সঙ্গে গল্প জমায়। ওয়েল্‌স্ থেকে এসেছে, জোন্স তার নাম। তার সঙ্গে যোগ দিতে এল তার বন্ধু দক্ষিণ আফ্রিকা আগত টম্‌লিন্‌সন্। মাঝে মাঝে একবার করে আসতে বসতে গল্প করতে ও পালাতে থাকল ভ্যান্ কোপেন। বাদল জিজ্ঞাসা করল, "ওলন্দাজ?" ভ্যান্

কোপেন বিরক্তি চেপে বলল, "মা ইংরেজ সুতরাং আমিও।" তাকে কেউ ওলন্দাজ বলে পর ভাববে এটা কি তার সহ্য হতে পারে! যাক্, ভ্যান্ কোপেন শৌখীন মানুষ। তার গোঁপ ছুঁচল। পোশাক পরিপাটী। জোন্স, টম্‌লিন্‌সন ও ভ্যান কোপেন তিনজনেই আইন পড়ছে। বাদলের সঙ্গে তিন মিনিটে ভাব হয়ে গেল।

জোন্স বলল, "ভ্যান কোপেন আজ বড় বেশী নাচছে।"

টম্‌লিন্‌সন বলল, "কাউকে বাদ দিচ্ছে না। প্রত্যেকের সঙ্গে একবার করে।"

জোন্স বলল, "লোকটা কেমন জোগাড়ে।"

টম্‌লিন্‌সন বলল, "মেয়েদের মিষ্ট কথায় তুষ্ট করতে জানে।"

বাদলের কেমন যেন মনে হল আজকালকার ছেলেরা মেয়েদের তেমন সম্মান করে না। মেয়েরাও সম্মানপ্রার্থী নয়। অবশ্য বাদল অবাধ মিশ্রণের পরম পক্ষপাতী। অর্থহীন ও কৃত্রিম ব্যবধান স্ত্রী-পুরুষের মনে পরস্পরের প্রতি মোহ রচনা করে। মোহ সত্যের শত্রু, বাদলের চক্ষুঃশূল। কিন্তু সম্মানের চেয়ে কাম্য কী থাকতে পারে? পুরুষ যেমন পুরুষের সঙ্গে অব্যাহতভাবে মিশেও সম্মান দাবি করে ও পায় নারীও তেমনি পুরুষের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশুক ও সম্মানের প্রতি কপর্দক আদায় করে নিক। ভিক্টোরীয় যুগে তাদের সম্মান ছিল, স্বাধীনতা ছিল না। আমাদের যুগে তাদের স্বাধীনতা আছে, বহিঃসম্মান আছে, কিন্তু আন্তরিক সম্মান নেই। বাদলের মর্মে পীড়া লাগছিল।

সেদিনকার গল্প কেট্‌কে বলায় তিনি কৌতুকহাস্য করলেন। বললেন, "তোমার একটুও humour-জ্ঞান নেই। কোথায় কী প্রত্যাশা করতে হয় জান না। পড়ার সময় পড়া, মেলার সময় মেলা, উৎসবের সময় উৎসব, কাজের সময় কাজ। এই আমাদের রীতি। আফিসের পোশাক পরে জলকেলি করিনে, জলকেলির পোশাক পরে টেনিস খেলিনে, টেনিসের পোশাক পরে থিয়েটারে যাইনে। যখন যেমন। তুমিও চাও আমরা শবানুগামীর পোশাক পরে পেচকের মতো গম্ভীর হয়ে জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে দিই?

বাদল বলে, "বা রে, তা কখন বললুম?"

কেট্ বলেন, "প্রকারান্তরে বললে। কিশোর ছেলে, কিশোরী মেয়ে। ওরা পরস্পরের সম্মান নিয়ে কী করবে শুনি? একেই তো দুঃখের জীবন ওদের সামনে। জীবন-সংগ্রামে কে কোথায় তলিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। প্রথম যৌবনের এই কটা দিন ওদের যা খুশি করতে দাও, বার্ট্। তোমার মতো মহাপুরুষ তো সকলে হবে না, হতে পারবে না, হতে চাইবে না।"

কিছুক্ষণ থেমে বললেন, "তোমার ভাই বোন না থাকায় তুমি একটা কিম্ভূত বালক হয়ে বেড়েছ। অল্পবয়সীরা ভাইবোনেরই মতো কিলাকিলি চুলাচুলি করবে, তারপর হাসি-তামাশায় যেন হিংসা ভুলে যাবে। তা নয় তো সকলে সব সময় ভালো ছেলে ভালো

মেয়ে হয়ে এক মনে বড় বড় বিষয় ভাববে, এমন সৃষ্টিছাড়া কল্পনা তোমার মতো ক্যাপাদের মগজে গজায় ।"

বাদল এর উপর কথাটি কইল না । মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল (এই নিয়ে চতুর্থ বার) কেটের সঙ্গে নেহাৎ দরকারী সাংসারিক বিষয় ছাড়া বাক্যালাপ করবে না ।

কেট্ তার ভাবটা আঁচতে পেরে বললেন, "অমনি রাগ হল ? আচ্ছা, নাও এই দুধটুকু লক্ষ্মী ছেলের মতো খেয়ে ফেল তো আগে । গায়ে জোর না হলে রাগ করবে কী দিয়ে ?"

৩

সব চেয়ে বড় পরিবর্তন শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি । বিশ বছর আগে পার্লামেন্টে শ্রমিক সদস্য ছিলেন নগণ্য । আজ লেবার পার্টি ইংলণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যাভূয়িষ্ঠ দল । ইতিমধ্যে ট্রেড্‌স্ ইউনিয়ন কাউন্সিল পার্লামেন্টের দোসর হয়ে উঠেছে । হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন ট্রেড্‌স্ ইউনিয়ন কাউন্সিল একচ্ছত্র হবে । বাদল ভারতবর্ষে থাকতে ইংলণ্ডের General Strike-এর খবর পেয়েছিল । ইংলণ্ডে এসে ধনিকে শ্রমিকে পথে ঘাটে মারামারি দেখতে পায়নি । তাদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু ছুটকো বিরোধ চোখে পড়ে না । কেউ কারুর প্রতি অভদ্রাচরণ করে না । বরঞ্চ বড়লোকের বেশী মান । বাদলের পোশাক থেকে তাকে বড়লোকের মতো মনে হয় । সেই জন্যে হোক কি সে বিদেশী বলেই হোক, বাদলকে বাস্ কণ্ডাক্টর, ট্রেনের টিকিট কলেক্টর, পোস্টম্যান, দুধওয়ালা, রেস্তোর্ঁার লোক, দোকানের লোক, ইত্যাদি সকলেই সম্বোধন করে "সার্" বলে । ভিক্ষুকরা তার কাছে মন খোলে, ফুটপাথের গায়ে রঙিন চক্‌খড়ি দিয়ে যে সব খোঁড়া বা কুঁজো ছবি আঁকে তারা বাদলের বাঁধা আলাপী ।

এই সব বেকার মানুষের জন্যে কী যে করা যায় সে সম্বন্ধে বাদল ভাবুকদের লেখা পড়ে নিজেও ভাবে । কিছুদিন থেকে লিবারল্ পার্টির প্রস্তাব নিয়ে খুব সোরগোল পড়ে গেছে । লিবারলরা বলেন ধনী লোকের উপর ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি না করে সকল শ্রেণীর লোকের সঞ্চিত অর্থ খাটিয়ে আরো রাস্তা ও আরো খাল তৈরি করা হোক, পতিত জমি আবাদ করা হোক, জঙ্গল রোপণ করা হোক । দেশের ধনবৃদ্ধিও হবে, বেকার মানুষের কাজও জুটবে । লিবারলরা গবর্নমেন্টকে দিয়ে এসব করাতে চান না । ধনিকে শ্রমিকে নিজেরাই একমত ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসব করুন । গবর্নমেন্ট কেবল বাধা না দিলেই হল । লিবারলদের নালিশ এই যে কন্‌সারভেটিভ গবর্নমেন্ট ছোট ছোট নিষেধের ডোরে দেশের লোকের হাত পা বেঁধে রেখেছেন । উক্ত গবর্নমেন্ট সাহায্যও করছেন না, পরামর্শও দিচ্ছেন না, নতুবা কয়লার খনিকদের সঙ্গে মালিকদের ও ব্যবসায়ের শ্রমিকদের

সঙ্গে অপরাপর ধনিকদের এতদিনে সন্ধি হয়ে যেত।

সার্ আলফ্রেড মণ্ড্-এর সঙ্গে শ্রমিক প্রতিভূদের কথাবার্তার বিবরণ বাদল মনোযোগ সহকারে পড়ছিল। কিন্তু অব্যাপারীর পক্ষে ওর পরিভাষায় দন্তস্ফুট করা দুর্ঘট। বাদলের বন্ধু কলিন্স অবশ্য দোভাষীর কাজ করে। তবু অর্থনীতির ভাষা বড় দুর্বোধ্য। বাদল যদি আজন্ম ইংলণ্ডে থাকত তা হলে মুখে মুখে সেই সব শব্দের সংজ্ঞা জেনে নিত যে সব শব্দ ইংরেজ সাধারণের পক্ষে সহজ এবং বাদলের পক্ষে দুরূহ। Safeguarding, derating প্রভৃতির উপর সবাই পাঁচ দশ মিনিট বক্তৃতা করতে পারে, একা বাদল কিছু বলতে ভয় পায়। তারপর Free Trade ও Protection—এ নিয়ে এখনো ইংলণ্ডের লোক ঠিক তেমনি উত্তেজিত রয়েছে যেমনটি ছিল সত্তর আশী বছর আগে কবডেন্-এর যুগে। লিবারলদের অধিকাংশই Free Trade চায়, কন্সারভেটিভরা অধিকাংশই চায় Protection। লেবার পার্টির লোক কোনটা যে চায় ওরাই জানে কিংবা ওরাও জানে না। ওদের এক কথা, সোশ্যালিসম্ চাই। ছোট ছেলের মুখে যেমন একটি মাত্র দাবি, "খাব।" খাওয়া ছাড়া অন্য কিছু করা বোঝে না, দুনিয়ার সঙ্গে ওদের পরিচয় মুখগহ্বরের মধ্যস্থতায়।

ইংলণ্ডের পার্টি পলিটিক্স ইংলণ্ডের প্রধান জিনিস। প্রায় আড়াই শ বছর কোনো না কোনো আকারে ইংলণ্ডে পার্টি আছে। বংশানুক্রমে কোনো কোনো পরিবারের লোক টোরী কিম্বা হুইগ। ভারতবর্ষের মানুষ যেমন ব্রাহ্মণ কিংবা কায়স্থ হয়ে জন্মায় ইংলণ্ডে জন্মায় কনসারভেটিভ কিংবা লিবারল্ হয়ে। বাদল কোন পার্টির লোক? গোড়ায় কনসারভেটিভদের প্রতি তার টান ছিল। কিন্তু ওরা সাধারণত হাই চার্চের সভ্য। বাদল নাস্তিক। নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী, Non-Conformist, ইহুদী ইত্যাদি বাধ্য হয়ে লিবারল্ দলের দিকে ঝোঁকে। তারপর Free Trade-এর আদর্শ বাদলের মনের মতো। পৃথিবীর যাবতীয় দেশে বাণিজ্য অবাধ হোক, কোথাও শুল্ক না লাগে। যার যা খুশি বেচুক, যার যা খুশি কিনুক। বেচাকেনা অবাধ হলে এত মনকষাকষিও থাকবে না। ইস্, জ্বালাতন করে তুলেছে। মেছোহাটার মতো ব্যাপার। ফ্রান্স ও আমেরিকা তো একবারে নির্লজ্জ।

বাদল 'টাইম্স্' বন্ধ করে 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' নিতে আরম্ভ করল। কিন্তু সোজাসুজি নিজেকে লিবারল্ বলে ঘোষণা করল না। পীল, পামারস্টন, গ্লাডস্টোন রোস্‌বেরীর নামের কুহক তাকে লিবারল্ দলের দিকে আকর্ষণ করছিল। কিন্তু যে দলের কেবল অতীত আছে, ভবিষ্যৎ নেই, সে দলে যোগ দিয়ে বাদল কার কী উপকার করবে? কিন্তু ভবিষ্যৎ যে নেই তাই বা কেমন করে বলা যায়! লিবারল্ গবর্নমেন্ট হয়তো অসম্ভাব্য, কিন্তু যতদূর মনে হয় ভাবীকালের ইংলণ্ডে দুই দলের বদলে তিন দল কায়েমী হবে। এক সময় মানুষের বিশ্বাস ছিল সত্য মিথ্যা বলে পরস্পরবিরোধী দুটি মাত্র দিক আছে,

এখন আরো একটা দিক মানুষের চোখে পড়ছে। লিবারল্ দল দেশের লোকের তৃতীয় চোখ ফুটিয়ে দেবে।

৪

বাদল ছিল হাড়ে হাড়ে ডেমক্রাট। তার ইউটোপিয়ায় সকলে স্বাধীন, সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবে একজনের স্বাধীনতা যেন অপরের স্বাধীনতার সঙ্গে সংঘর্ষ না বাধায় এটুকু দেখতে হবে। এটুকু দেখার জন্যে সকলের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডল এবং প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতৃস্থানীয় জনকতক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা মন্ত্রী। রাষ্ট্র যার নাম সেটা আর কিছু নয়, সেটা তোমার আমার স্বাধীনতার সীমা-নির্দেশের জন্যে তোমার আমার কাছে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তোমার আমার হাতে তৈরি এক প্রকার যন্ত্র। যন্ত্রের যন্ত্রী তুমি আমি।

তাই ফাসিস্‌ম্ ও বোলশেভিস্‌ম্ বাদলের চোখের বিষ। আমি যন্ত্রী নই, আমি যন্ত্রের অঙ্গ কিংবা অধীন, যন্ত্রই ভগবান আমি তার পূজারী—ওঃ। বাদলের নাস্তিক মন যুদ্ধং দেহি বলে চীৎকার করে ওঠে। চাইনে শান্তি চাইনে আরাম, অন্নবস্ত্রের স্বাচ্ছন্দ্য যাদের কাম্য তারা ব্যক্তির চেয়ে রাষ্ট্রকে বড় করুক। কিন্তু আমি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, আমার প্রতিবেশীর খাতিরে আমার অধিকারের খানিকটা আমি ছাড়তে রাজী আছি, কিন্তু সবটা ত্যাগ করতে আমি কস্মিন্‌কালে পারব না।

ডেমক্রেসী রাজাদের সমাজ। আমরা সবাই রাজা। কেবল নিজ নিজ রাজ-অধিকারকে সংঘর্ষমুক্ত করবার জন্যে আমাদেরি কতক অধিকার আমরা ডান হাত থেকে নিয়ে বাঁ হাতে রেখেছি, ঘর থেকে সরিয়ে সভায় ন্যস্ত করেছি। আর ফাসিস্‌ম্-বোলশেভিস্‌মের সমাজ দাসের সমাজ। কিছু আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে নিজেদের ক্ষমতা অস্বীকার করেছি, যা নিজেদেরি রচনা তার ক্ষমতার পরিমাণ নির্ধারণ করে দিইনি, পরন্তু ভাবে গদ্‌গদ হয়ে বলছি, আহা রাষ্ট্র! সে কি যে-সে জিনিস! সে যদি হয় জগন্নাথের রথ তবে আমরা সামান্য পোকা মাকড়। সে হচ্ছে অব্যক্ত, অব্যয়, সর্বক্ষম, পরম রহস্যময়। ভাগবত বিভূতি বিশিষ্ট অথবা অতিমানুষিক শক্তিসম্পন্ন। আমরা কেবল তাকে মান্য করতে পারি, তার সেবা করতে পারি, তার জন্যে মরতে ও মারতে পারি।

ইংলণ্ডের প্রতি বাদলের পক্ষপাত প্রধানত ইংরেজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দরুণ। রাষ্ট্র যেদিন রাজার মধ্যে মূর্ত ছিল সেদিন সে রাষ্ট্রের অধিকার সঙ্কুচিত করেছে, প্রজার অধিকার প্রসারিত করেছে। Magna Carta-র অনুরূপ অন্য কোনো ইতিহাসে আছে কি? রাজাকে ক্রমশ ডেমক্রাট করে আনা হয়েছে। নাম ছাড়া রাজা-প্রজার প্রভেদ বড় কিছু নেই। ফ্রান্সও ডেমক্রেসীর দেশ। কিন্তু তার ডেমক্রেসী ভুঁইফোঁড়। ফরাসী বিপ্লব আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত এবং উক্ত আন্দোলন ইংলণ্ডত্যাগী

ইংরেজেরই কীর্তি (কিংবা কুকীর্তি। বাদলের মনে হয় আমেরিকা ইংলণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেই ভালো করত। অবশ্য অধীনের মতো নয়, সমানের মতো)। ফরাসী যে লিবার্টি মন্ত্রের উপাসক সে বিষয়ে বাদলের সন্দেহ ছিল না, কিন্তু লিবার্টির চেয়ে ইকুয়ালিটির উপর ফরাসীর বেশী ঝোঁক। ফরাসী যদি সাম্য পায় তবে স্বাধীনতা ছাড়তে রাজী। কিন্তু ইংরেজ মোটের উপর উঁচু নিচু ভালোবাসে, তার সমাজে অনেক ধাপ, কিন্তু বাক্যের ও কর্মের স্বাধীনতা প্রত্যেকের আছে, তার চেয়ে যা দামী—চিন্তার স্বাধীনতা—তা ক্যাথলিক ফরাসীর নেই, প্রোটেস্টাণ্ট ইংরেজের আছে।

বাদল সাম্যের চেয়ে স্বাতন্ত্র্যকে কাম্য মনে করে। সে যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে চলতে চায়, কেউ যদি তাকে ঠেকাতে আসে তবে তার বিরক্তির সীমা থাকে না। ইংলণ্ডে এসে অবধি সে প্রতি সন্ধ্যায় পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছে, অন্ধকার গলির ভিতর ঘুরেছে, কেউ তাকে বাধা দেয়নি, সন্দেহ করে তার পিছু নেয়নি। ইংলণ্ডের পুলিস ভদ্র। তার কারণ পুলিসের কাজই হল ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষণ করা—প্রত্যেক ব্যক্তির। যখনি পুলিসের দ্বারা ব্যক্তির অমর্যাদা ঘটেছে তখনি তার প্রতিকারের জন্যে লোকমত জাগ্রত হয়েছে। কিছুদিন পূর্বের একটি ঘটনা বাদলের মনে পড়ে। হাইড পার্কে একজন স্বনামধন্য বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে একটি শ্রমিক-শ্রেণীর অনূঢ়া তরুণীকে কুরুচিকর অবস্থায় পুলিসে দেখতে পায় এবং ধরে নিয়ে থানায় আটকে রেখে মেয়ে পুলিসের বিনা সহায়তায় তাকে প্রশ্নবাণে জর্জর করে। পার্লামেণ্টে এ নিয়ে কথা উঠল, অনুসন্ধানের জন্যে কমিশন বসল। ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ।

স্বাধীনতা যদি থাকে তবে সাম্যের কী যে প্রয়োজন বাদল বুঝতে পারে না। সে তো কারুর সঙ্গে সমান হতে চায় না। সে নিজেই একটা দিক্‌পাল, একটা গৌরীশঙ্কর কি কাঞ্চনজঙ্ঘা। অপরে তার সমান হতে সাধনা করতে চায় তো করুক, কিন্তু বাদল করবে সাম্যের কামনা। তবে আইনের চোখে সবাই সমান হোক ; যথা ডিউক অব ইয়র্ক তথা জন স্মিথ্‌ কয়লার খনির মজুর। পার্লামেণ্টের নির্বাচক হবার অধিকার সকলকে দেওয়া হোক। সকলের প্রাণের দাম সমান হোক, একটা বুড়ো ভিখারীকে খুন করলে যে অপরাধ একজন ধনকুবেরকে হত্যা করলে তার চেয়ে বেশী অপরাধ যেন না হয়। এগুলো সাম্যবাদের অঙ্গ নয়, এগুলো স্বাতন্ত্র্যবাদেরই সামিল। কাজেই বাদল সাম্যবাদের কাম্যতা দেখতে পায় না।

প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি করুক, অনবরত করতে থাকুক। প্রত্যেকে ক্রমাগত এগিয়ে যাক, ধনে মানে জ্ঞানে কর্মে চিন্তায়। সমাজ তো একটা শোভাযাত্রার মতো। পিছনে জায়গা পাওয়া লজ্জার কথা নয়, পেছিয়ে পড়াটাই লজ্জার। বাদল তো ক্লাসে সকলের শেষ সারিতে বসত ও বসে।

বাদলের মতবাদ অবিকল লিবারল্ দলের মতবাদ। কন্‌সারভেটিভরা পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের শত্রু, সোশ্যালিস্টরাও তাই। দু'পক্ষেই রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়ে ঐ ক্ষমতার দ্বারা ব্যক্তির উপর জবরদস্তি করতে কৃতসংকল্প। এক পক্ষ গাঁথবে উঁচু tariff দেয়াল। বিদেশী পণ্যের উপর চড়া শুল্কের হার উশুল করবে। অপর পক্ষ চায় বড়লোকের উপর বিপুল ট্যাক্স চাপিয়ে সেই টাকায় বেকারকে অলসকে প্রতিপালন করতে। কেলেঙ্কারী! Dole-এর টাকায় ওরা বিয়ে করে, সন্তান সন্ততির জনক জননী হয়। ধনীর চাঁদায় চলতে-থাকা হাসপাতালে চিকিৎসা পায়, ধনীর চাঁদায় সমুদ্রকূলে হাওয়া বদলাতে যায়। ছিঃ ছিঃ ওদের আত্মসম্মান নেই।

৫

পলিটিক্স নিয়ে মিসেস উইল্‌স্ তর্ক করেন না। মিস্টার উইল্‌স বাদলের সঙ্গে খুব ভদ্রভাবে বাক্য বিনিময় করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে পারেন না। ভদ্রলোক খেটে খুটে অনেক দূর থেকে আসেন। পেট ভরে রোস্ট বীফ খান, আস্ত জন বুলের মতো চেহারা। প্রথম যৌবনে নাকি বক্সার ছিলেন, এখনো তার পরিচয় দিয়ে থাকেন স্ত্রীর উপর রেগে টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করে। (বাদল ক্রমশ জানতে পেরেছে যে তিনি স্ত্রীকে মুষ্ট্যাঘাত করতে একদা ভালোবাসতেন, কিন্তু স্ত্রী যেদিন থেকে ভোট দেবার অধিকার পেয়েছেন সেদিন থেকে তিনি স্ত্রীর প্রতি হঠাৎ সশ্রদ্ধ হয়েছেন।) তারপরে একে একে নানা ব্যবসায় লোকসান দিয়ে অবশেষে করছেন ডক্-এর ম্যানেজারী। অদ্যাপি তাঁর ভূতপূর্ব দোকানের পুরোনো ছাপানো কাগজপত্র বাড়ীতে পাওয়া যায়, গিন্নী তাতে বাজার-হিসাব লেখেন।

এ বাড়ীতে আসার পর থেকে মিস্টারের সঙ্গে বাদলের তেমন বনছে না। মিস্টার হচ্ছেন গোঁড়া সোশ্যালিস্ট। সান্ধ্য সংবাদপত্রখানা হাতে করেই বাড়ী ফেরেন, বাদলের মতো ট্রেনে কিংবা বাস্-এ ফেলে আসেন না। এসেই গজ গজ করেন, কন্‌সারভেটিভরা arn't playing the game। কিংবা থেকে থেকে একটু হি হি করেন, বাই-ইলেকশন-গুলোতে লেবার পার্টির লোক জিতে চলেছে। এই বলে আওড়ে যান :—Darlington, Stockfort, East Ham, Hammersmith, Northampton, না না—Stourbridge, Northampton, Hull, বাদলের দিকে চেয়ে বলেন, "Now what do you say to that ?"

আগামীবার জেনারেল ইলেকশনে লেবার পার্টিই যে পার্লামেন্টের সংখ্যাভূয়িষ্ঠ দল হবে এ বিষয়ে মিস্টার উইল্‌সের সংশয় দিন দিন অপসৃত হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর সংশয়াত্মক শ্লেষ তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। স্ত্রী বলেন, "আর দেরি নেই, জর্জ।

'Jerusalem in England's green and pleasant isle'-এর আর দেরি নেই।"

বাদল বলে, "কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে একমত মিস্টার উইল্‌স্। লেবার পার্টি এবার পার্লামেন্টে লট বহর নিয়ে ঢুকবেই।" বাদল-কথাটা গম্ভীরভাবে বলে, তবু মিস্টার উইল্‌সের বিশ্বাস হয় না যে বাদল ব্যঙ্গ করছে না। তিনি বাদলের দিকে কটমট করে তাকান।

বাদল যেন মস্ত রাজনীতিবিশারদ। বলে, "আমার ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে এই যে লেবার যদিও কন্‌সারভেটিভদের থেকে সংখ্যায় গুরু হবে এবং লিবারলদের থেকে তো হবেই, তবু অন্য দুই দল যোগ দিলে হবে সংখ্যায় লঘু।"

মিস্টার উইল্‌স্ চটে গিয়ে বললেন, "Damn the Liberals". তাঁর মনে ১৯২৪ সালের সেই Zinovieff letter-এর স্মৃতি হুল ফোটাতে থাকল।

বাদলও ক্ষেপে গেল। বলল, "আমি আপনাকে বলে রাখছি দুপক্ষের কোনো পক্ষকেই এবার লিবারলরা সাহায্য করবে না। নেমকহারাম লেবার, চিরশত্রু কন্‌সারভেটিভ কোনো পক্ষকে এবার মন্ত্রিত্ব করতে দেওয়া যাবে না। লিবারলরা নিজেরাই গভর্নমেণ্ট চালাবে।"

উত্তেজনার মুখে বাদল ওকথা বলল বটে, কিন্তু পরে তার মনে হয়েছিল, সে কি সম্ভব? কোনো একটা বিল পাস না হলেই তো পদত্যাগ করে লজ্জা পরিপাক করতে হয়।

সে মুখ তুলে দেখল যে মিস্টার ও মিসেস দুজনে মুখ টিপে টিপে হাসছেন। হয়তো ভাবছেন ছোকরা বদ্ধ পাগল!

অবশেষে মিস্টার বললেন, "ভারতবর্ষে বুঝি তাই হয়?"

বাদল আহত বোধ করল। তর্কের মাঝখানে দেশ তুলে অপমান করা কেন? তা ছাড়া বাদলকে যে ভারতবর্ষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ভারতীয় মনে করে, তাকে বাদল ক্ষমা করে না। সেদিন মিসেস উইল্‌স্ জিজ্ঞাসা করছিলেন, "বার্ট্, তোমাদের ভাষায় scissorsকে কী বলে?" বাদল বলেছিল, "কী জানি, কেট্, আমি ও ভাষা ভুলে গেছি।" তিনি এমন ভাবে তার দিকে তাকিয়েছিলেন যেন সে একটা দ্রষ্টব্য বস্তু। আর সেও তাঁর উপর তেমনি রাগ করেছিল যেমন রাগ করেছিল কুম্ভকর্ণ, হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে দেওয়ায়। মনে মনে একটা ভাব নিয়ে তার দিন কাটছিল, সে ইংলণ্ডে আছে, সে ইংরেজ, ইংলণ্ডের বাইরে তার অতীত ছিল না। হঠাৎ তার ধ্যানভঙ্গ করা হল।

তথাপি এ বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র যাবার চিন্তা তার মনে উদিত হয়নি। হল, যখন মিঃ উইল্‌সের সঙ্গে তার ক্ষণস্থায়ী খণ্ডযুদ্ধ ঘটতে লাগল। একদিন সে বলছিল, "আজ এক

পাত্রী এক মজার প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি বলেন, জন্মনিয়ন্ত্রণ নিশ্চয়ই দরকার, কিন্তু রাস্তার কোণের nasty flapperরা যেভাবে করে সেভাবে, না, St. Joseph, St. Ethelreda ইত্যাদি যেভাবে করতেন সেভাবে ?"

মিসেস উইল্‌স খিল খিল করে হেসে উঠলেন। বললেন, "পাত্রী-সাহেবের রসবোধ আছে।"

বাদল বলতে লাগল, "কিন্তু মজা সেখানে নয়, কেট্। একটু পরেই পাত্রীপুঙ্গব বলছেন, ক্যাথলিকদের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে, নিগ্রোদের সংখ্যা লাফ দিয়ে বেড়ে চলেছে। আমরা যদি অস্বাভাবিক উপায়ে নিজের সংখ্যা কমাই ও বলবীর্য হারাই তবে আমাদের ভবিষ্যৎ থাকে না। পরিশেষে তিনি দ্বাদশ সন্তানের জনক কোনো এক ব্যক্তিকে আদর্শ বলে রচনা শেষ করেছেন।"

জর্জ এতক্ষণ গম্ভীরভাবে আহার করছিলেন। আহার্য অবশিষ্ট রেখে তিনি কথাবার্তায় যোগ দেন না। পরিতৃপ্তির ভার সংবরণের জন্যে তিনি ভাল করে ঠেস দিয়ে বসলেন ও বিনা বাক্যব্যয়ে পাইপ ধরালেন। দাঁতের ভিতর দিয়ে কথা বেরিয়ে এল, "তোমরা আমাকে মাফ করবে, কেমন ?"

তিনি বাদলকে জেরা করলেন। "কেন ? কী দরকার ? জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অভাবে সমাজে কী ক্ষতি ঘটছে ?"

বাদল হতাশ হয়ে বলল, "আপনি নিজেই এর উত্তর দিন, মিস্টার উইল্‌স্। কেননা আপনার দলের লোকই ভুক্তভোগী।"

মিসেস উইল্‌স্ কপট গাম্ভীর্যের সহিত বললেন, "বার্টের কাণ্ডজ্ঞান নেই। কীটপতঙ্গের মতো সন্তান বৃদ্ধি না করলে লেবার দলের ভোটার সংখ্যা বাড়বে কী করে শুনি ? তোমার অত সাধের ডেমক্রেসীর পরিচালন-ভার তো সেই দলের হাতে যাদের পিছনে ভোট বেশী ?"

মিস্টার উইল্‌স্ যেন ধরা পড়ে গেলেন। স্ত্রীকে বক্র দৃষ্টিতে শাসন করলেন। বাদলকে বললেন, "ক্যাপিটালিস্টদের হাতে আছে ধন। আমাদের হাতে আছে জন। আমরা যদি আমাদের অস্ত্র ত্যাগ করি তবে অনায়াসে হটে যাব। ওরা আগে ওদের অস্ত্র সমর্পণ করুক, তার পরে আমরাও আমাদের করব।"

৬

এমন বাড়ীতে টিঁকে থাকা বাদলের পক্ষে দুষ্কর হচ্ছিল। কেট্ সব কথাতেই সবাইকে ব্যঙ্গ করেন, কখনো জর্জকে কখনো বাদলকে কখনো আমন্ত্রিত অতিথিদের। তাঁর নিজস্ব মতবাদ যে কী তা বাদল বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আবিষ্কার করতে পারল না। বাদলের

ধারণা প্রত্যেকেরই একটা সুস্পষ্ট সুবোধগম্য মতবাদ থাকা আবশ্যক। যার নেই সে অমানুষ। তাই কেটের প্রতি সে বিমুখ হয়ে উঠেছিল। বাদলের যদি অন্তর্দৃষ্টি থাকত তবে সে এই তিন মাসে নিশ্চয়ই টের পেত যে কেটের প্রধান দুঃখ তিনি নিঃসন্তান। এবং অর্থাভাববশত নিঃসন্তান। পলিটিক্স ইত্যাদিতে তাঁর মন নেই, তবে স্বামীর যখন ওতেই মন বেশী তখন ওবিষয়ে উৎসাহের ভান করতে হয়।

জর্জের উপর বাদলের বিরূপ ভাব প্রথম থেকেই। তিনি কথায় কথায় ভারতবর্ষের মহারাজাদের টেনে আনতেন, তাঁর বিশ্বাস বাদল রাজবংশীয় হবে। তিনি কোথায় শুনেছিলেন যে ব্রাহ্মণদের প্রভাব ওদেশের সর্বত্র। কাজেই বাদলও ব্রাহ্মণবংশীয় হওয়া সম্ভব। তারপর বেনিয়াদের ধনের সংবাদ যে ইংলণ্ডে পৌঁছায়নি তা নয়। "The wicked bania"। অতএব বাদল বেনিয়াবংশীয়ও বটে। একাধারে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-বৈশ্য। ভদ্রলোকের অমন বিশ্বাসের কারণ ছিল। বাদল খরচ করত রাজার ছেলের মতো। তার নিজের লাইব্রেরীর পিছনেই মাসে চার পাঁচ পাউণ্ড বাঁধা খরচ। প্রতিদিন একে খাওয়ায় তাকে খাওয়ায় এবং বাড়ী ফিরে এসে গল্প করে। ময়লা কাপড় বলে ফরসা কাপড়কেও সে ধোপার বস্তায় দেয়। রোজই কিছু না কিছু কিনে আনছে। কেট্‌কে উপহার দিচ্ছে। একটা সুন্দর রিস্ট্‌ওয়াচ, এক তাড়া গ্রামোফোনের রেকর্ড, হাত ব্যাগ, কাপড়ের ফুল।

জর্জের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বাদল স্থির করল এবাড়ী ছেড়ে দেবে। কোনো বাড়ীতে তিন মাসের বেশী থাকবে না, এ সঙ্কল্প তার মনে পড়ে গেল। তখন সে কেট্‌কে না জানিয়ে অন্যত্র থাকবার জায়গা খুঁজল। কলিন্সকে বলল, "ওয়াই-এম্‌-সি-এ'তে হবে?" কলিন্স বলল, "উহুঁ। এক বছর আগে যারা আবেদন করেছে তারা এখনো পায়নি।" বাদল ক্ষুণ্ণ হল। তার ভারি ইচ্ছা ছিল যুবকদের সঙ্গে সর্বক্ষণ থেকে একটা নতুন স্বাদ পেতে। হৈ হৈ করবে, টো টো করবে, লণ্ডনের মধ্যস্থলীয় হট্টগোল কেমন লাগে সেটার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে। তার ফলে হয়ত এমন অনিদ্রায় ভুগবে যে হাসপাতালে ঢুকবে। সেও ভালো, হাসপাতালের অভিজ্ঞতাও তার দরকার। সেখানে রোগীদের নার্সদের সঙ্গে ডাক্তারদের সঙ্গে ভাব করবে। কী মজা।

ব্লুমস্‌বেরীতে দেদার ইণ্ডিয়ান। রাসেল স্কোয়ারেও ইণ্ডিয়ান দেখা যায়। ওদিকে নয়। হ্যাম্পস্টেড তো ইণ্ডিয়ানদের পাড়া হয়ে উঠেছে। ওদিকে নয়। সিটিতে রাত্রে মানুষ থাকে না, ওদিকে নয়। সাবার্ব-এ থাকলে লণ্ডনের জনসংঘাত-মদিরা পান করা যায় না। ওদিকে নয়। বাদল হাইড্‌ পার্ক ও কেনসিংটন পার্কের সংলগ্ন অঞ্চল পায়ে চষে বেড়াল। এবার তার খেয়াল হল হোটেলে ঘর নেবে। পাওয়া যায়, কিন্তু অনেক ভাড়া। এত ভাড়া দিলে বইপত্র কেনার জন্যে বড় বেশী বাকী থাকে না। বাদল সপ্তাহে চার পাউণ্ড অবধি খাওয়া ও থাকার জন্যে খরচ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু অত সস্তায়

ওসব অঞ্চলের হোটেলে জায়গা পাওয়া অসম্ভব। বেচারা বাদলকে ঐ সব অঞ্চলের মায়া কাটাতে হল। সকাল বেলা পার্কে বেড়ানোর আশা রইল না। কত বড় ফ্যাশানেব্‌ল্ জিনিস সে হারাল। স্বয়ং বার্নার্ড শ সেখানে পায়ে হেঁটে বেড়ান। বাদলের অভিলাষ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবে। পার্কের বাতাস গায়ে লাগলে রাত্রে তার ভালো ঘুম হতে পারে। যাতে ঘুম ভালো হয় সে জন্তে সে কত ওষুধ পথ্য খেয়েছে, কিছুতে কিছু হয়নি।

চেল্‌সীর এক রেসিডেন্সিয়াল হোটেলে বাদল আশ্রয় পেল। চেল্‌সীতে চিরদিন সাহিত্যিক ও শিল্পীরা বাস করে এসেছে। সুইফ্‌ট্, স্টীল, স্মলেট, লি হাণ্ট, কারলাইল, টার্নার, হুইস্‌লার, রসেটী, এঁরা বাদলের পূর্বাধিবাসী। ম্যানেজার বাদলকে একটি খালি ঘর দেখাতেই বাদলের অমনি পছন্দ হয়ে গেল; বাদল কথা দিল এবং কথার সঙ্গে অগ্রিম টাকা দিল।

মিসেস উইল্‌সন যখন সমস্ত শুনলেন তখন শুধু বললেন, "আচ্ছা।" তাঁর মন-কেমন করতে থাকল, কিন্তু মুখে তেমনি কৌতুক হাস্য। বাদল ভাবল, যাক, তিনিও ছাড়া পেয়ে বাঁচলেন। আমি কী কম জালিয়েছি তাঁকে। সাড়ে বারোটা অবধি আমার কোকো তৈরি করে দেবার জন্তে বসে থাকা, এই কষ্ট স্বীকার করার কী মূল্য আমি তাঁকে দিতে পেরেছি। ডিয়ার ওল্ড কেট্। বিদায়কালে তাঁকে সে কী উপহার দিয়ে যাবে ভাবল।

জর্জ প্রমাদ গণলেন। বাদলকে পেয়ীং গেস্টরূপে পেয়ে তিনি ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্কে কিছু জমাতে পেরেছিলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওকে কিছু বলেছ টলেছ নাকি?" স্ত্রী উত্তর দিলেন, "ওটা একটা পাগল। বলে তিন মাসের বেশী কোথাও থাকবে না।" জর্জ লক্ষ্মী-পেঁচার মতো মুখ করে থাকলেন। কী ভাবলেন, হঠাৎ বললেন, "কার্ট্, শুনেছ? লিবারল্‌রা ল্যাঙ্কাস্টার বাই-ইলেকশন জিতেছে? তোমাকে আমার অভিনন্দন করা উচিত।" কিন্তু ভবী ভোলে না। বাদল বলে, "ধন্যবাদ, মিস্টার উইলস্। আর একটা কথা শুনেছেন? আমি চেলসীতে উঠে যাচ্ছি? বেশী দূর নয়, মাঝে মাঝে দেখা হবে।"

বেগতিক দেখে জর্জ প্রস্তাব করলেন, বাদল যদি তার বন্ধুকে ঐ বাড়ীতে পেয়ীং গেস্ট করে দেয়। ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে ঐ বাড়ীতে কোনো প্রেজুডিস্ নেই। মিস্ মেয়ো যে কত বড় মিথ্যাবাদিনী সেটা ঐ বাড়ীর মানুষ যেমন বুঝেছে—বিশেষত বাদলের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য পেয়ে—তেমন আর কেউ এ দেশে বোঝেনি। বাড়ীর ছেলের মতো থাকা একমাত্র ঐ বাড়ীতেই সম্ভব।

বাদল বলল, "কিন্তু আমার ইণ্ডিয়ান বন্ধু তো দুটি তিনটির বেশী নেই। তাঁরা যেখানে আছেন সেখান থেকে নড়বেন বলে তো মনে হয় না। আপনারা একবার বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখুন। লণ্ডনে দুহাজার ভারতীয় ছাত্র আছে, মিস্টার উইলস্।"

মিসেস উইলস্ রঙ্গ করে বললেন কি সত্যি সত্যি বললেন বোঝা গেল না—বললেন,

"কিন্তু আর একটিও বার্ট নেই, মিস্টার উইলস্।"

পরদিন বাদল অতি সহজভাবে বিদায় নিল। যেন এক রাত্রির অতিথি। একবার পিছু ফিরে চাইল পর্যন্ত না। ফিরে চাইলে দেখতে পেত মিসেস উইলস্ তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে। তাঁর দৃষ্টি বাষ্পাক্ত। তবু তাঁর অধরে কৌতুকের আভা।

৭

হোটেলের জীবন বাদলকে প্রমত্ত করল। কোলাহলবিরল বৃহৎ ভোজনাগার, এক একটি টেবিলের চারিধারে দলে দলে সুসজ্জিত নরনারী। করিডর পদশব্দমুখর, মেয়েদের জুতোর খট্ খট্, পুরুষদের জুতোর গুম্ গুম্। কোন ঘরে কে থাকে বাদল জানে না, কিন্তু একটু সকাল সকাল উঠলে দেখতে পায় বন্ধ দরজার বাইরে জোড়া জোড়া মেয়েলি জুতো, পুরুষালি জুতো কিংবা বুট। বাদলের দুই পাশের দুই ঘরে থাকেন দুজন মহিলা, সামনের ঘরে একজন ভদ্রলোক। একটু দূরে কয়েকটি দম্পতি। ওঁদের কারুকেই বাদল দেখেনি, কিন্তু ওঁদের জুতো দেখেছে। রাত্রে বাদল সকাল সকাল ঘুমতে যায়, ওঁরা দেরি করে ফেরেন। আবার যেদিন বাদল দেরি করে ফেরে সেদিন হয়তো ওঁরা আগেই ফিরেছেন। সন্ধ্যাবেলা ভোজনাগারে বসে বাদল প্রায়ই অনুমান করার খেলা খেলে; অপরিচিত অপরিচিতাদের মধ্য থেকে নিজের প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীদের নিশানা করে। একদিন যাদের নিশানা করে পরদিন তাদের পছন্দ হয় না, অন্যদের নিশানা করে।

হোটেলের ঘরগুলো ছোট ছোট। ঘরে বসে পড়াশুনা করা যায় না। অবশ্য পড়াশুনার জন্যে যদি না আলাদা ঘর নেওয়া হয়। চিত্রকরদের জন্যে স্টুডিওর বন্দোবস্ত এ হোটেলে নেই, কিন্তু এর আশে পাশে স্টুডিও ভাড়া পাওয়া যায়। বাদল তার বইপত্র নিয়ে নীচে নেমে এসে লাউঞ্জ-এ বসে। বাদলের শৈত্যবোধ কিছু বেশী। তুলোর এবং পশমের একজোড়া গেঞ্জির উপরে শার্ট এবং পুলোভার এবং তার উপর কোট চাপিয়ে তবু বাদলের গরম বোধ হয় না, সে ঠিক আগুনের কাছটিতে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। আগুনের লকলকে শিখা তার দিকে এগিয়ে আসে, তার ব্রাউন মুখ রাঙা আলোয় দীপ্তিমান দেখায়। ক্রমশ লাউঞ্জ থেকে অধিকাংশ লোক নিজ নিজ কাজে চলে যায়। বাদলের কাজ থাকলেও কাজে মন নেই; বাইরে বড় ঠাণ্ডা, বিশ্রী টিপ টিপ বৃষ্টি, আকাশ ঘোলাটে। এই লণ্ডনে দুহাজার বছর অর্ধসভ্য, সভ্য ও অতি-সভ্য মানুষ বাস করে কাজ করে সৃষ্টি করে আসছে। তবু এমন ওয়েদার কিছুতেই বাদলের বরদাস্ত হচ্ছে না, যতই কেন সে বলুক, "এই তো আমাদের খাঁটি স্বদেশী শীত, খাঁটি স্বদেশী বৃষ্টি। আহা! কী পুলক জাগছে!"

প্রতিদিন নূতন লোক আসে, পুরোনো লোক যায়। বাদলের পাশের ঘরের দরজার

বাইরে ভৃত্যকর্তৃক সাফ করবার জন্যে রাখা জুতোর আকার প্রকার থেকে বোঝা যায় প্রতিবেশী পরিবর্তন হয়েছে। মনটা প্রথমে একটু উদাস হয়ে যায়—আহা, কে লোকটা ছিল, তার সঙ্গে একবার চোখের দেখাটাও হল না। পরমুহূর্তে মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। কে এসেছে একবার দেখতে হচ্ছে কিন্তু। কিছুদিন পরে জন্মায় ঔদাসীন্য। শুধু যাওয়া, শুধু আসা। কী হবে কারুর চেহারা দেখে। দেখলে তো মনে থাকবে না? এই ছমাসে বাদল লাখ লাখ মানুষ দেখেছে লণ্ডনের পথে পথে। চোখ বুজলে কারুর চেহারা স্মৃতির নিকষে ফুটে ওঠে না তো?

তার কারণ বাদল অন্যমনস্ক মানুষ। দেখেও দেখে না কিছু। তবু তার দেখার সাধটি আছে, সকলের যেমন থাকে। লণ্ডনে আছি, অথচ সেণ্ট পল্স্ দেখি নি.? অমনি চলল বাদল সেণ্ট পল্স্ দেখতে। কিন্তু তার অজ্ঞাতসারে তার বাস কখন ব্যাঙ্কপাড়ায় পৌঁছেছে। যাক্ গে, পরে কোনোদিন দেখা যাবে এখন। সেণ্ট পল্স্ তো পালিয়ে যাচ্ছে না, আমিও এই দেশের স্থায়ী বাসিন্দে। আদত কথা, তার চোখের কৌতূহলের চাইতে মনের কৌতূহল বেশী। মন নিত্য নতুন সত্যের সোপান বেয়ে কোন উর্ধ্বে চলেছে। যেটাকে অতিক্রম করছে সেটাকে ভুলে যাচ্ছে, সেটা একটা "না", সেটা একটা অসত্য। অতীত অসত্য, বর্তমান সত্য, ভবিষ্যৎ বহুগুণ সত্য।

আগুন পোহাতে পোহাতে বই পড়া কিংবা কিছু ভাবা, মাঝে মাঝে হাই তুলে গত রাত্রের অনিদ্রা ঘোষণা করা, হঠাৎ মগজে একটা আইডিয়ার আবির্ভাব হলে চেয়ার ছেড়ে পায়চারি করা, পায়চারি করতে করতে দুই হাত দিয়ে চুলগুলোকে জড়িয়ে ধরা (তাতে মাথা ব্যথা কিছু কমে), এবং পরিশেষে চেয়ারে ঝাঁপিয়ে পড়ে চোখ বুজে অসাড় হয়ে থাকা, বাদল তার এই সমস্ত মুদ্রাদোষের জন্যে অল্পদিনের মধ্যে প্রসিদ্ধ হতে পারত, কিন্তু তার হোটেলে খেয়ালী শিল্পীদের পদার্পণ ঘটত অহরহ। তাদের মুদ্রাদোষের তুলনায় বাদলের ওগুলো অতি সাদাসিদে, অতীব আর্টশূন্য। তাদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে দুই একবার পাগলা গারদ ঘুরে এসেছে। কাজেই বাদলের মুদ্রাদোষ তাদের চোখ কাড়ে না।

তবে এই বিদেশী মানুষটির সঙ্গে আলাপ করতে তাদের আগ্রহ জন্মায়। তাদেরি সমধর্মা, যদিও রঙটা অন্য রকম বলে দলে টেনে নিতে দ্বিধা বোধ হয়। বাদল চোখ না তুলে বুঝতে পারে অনেকে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। শোনবার জন্যে কান পেতে রাখে ওরা তার কথা বলাবলি করছে কি না। কিন্তু ওরা তো মুখে বলে না, চাউনিতে বলে। কখনো কদাচ চোখ তুলে বাদল টের পায় ঘরের লোক বিনি কথায় বলাবলি করছে বিদেশীটি ইংরেজী ভাষার এত বড় বড় দুরূহ বই পড়ে বুঝতে পারে কী করে? পাতার পর পাতা উলটিয়ে চলেছে দুই তিন মিনিট পর পর। মনোযোগ ও চিন্তাকুলতা থেকে

বোঝা যায়, চাল দিচ্ছে না, সত্যিই পড়ছে ও পড়ে বুঝছে। পড়তে পড়তে মুচকে হাসছে এক আধ বার, মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে।

বাদলের সঙ্গে আলাপ করতে তাদের ভারি কৌতূহল, কিন্তু ইংরেজ যতই বোহিমিয়ান বা খেয়ালী হোক, গায়ে পড়ে আলাপ করতে জানে না। বাদলও লাজুক মানুষ। বিলেতে আসা অবধি কতক সপ্রতিভ হয়েছে বটে তবু স্খলিত হবার ভয়টি তার যায়নি। কারুর সঙ্গে কথা বলার আগে মহলা দেয় কী কী বলবে ও কী ভাবে বলবে। বাক্যের গড়ন শব্দের যোজনা উচ্চারণের ঝোঁক ক্রমাগত বদলাতে বদলাতে এক কথা আরেক হয়ে দাঁড়ায়, তবু বাদলের জেদ—সে যা বলবে তা distinguished হওয়া চাই। কে বলছে? না, বাদল বলছে। যে-সে লোক নয়। বক্তব্যের চেয়ে বক্তার ব্যক্তিত্ব বড়। একজনের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে যাবার পরে বাদল নিজের উক্তির রোমন্থন করতে লেগে যায়। যা বলল তাই অন্য কত রকম ভাবে ভঙ্গীতে ও ভাষায় বলতে পারত, বললে হয়তো তার যোগ্য হত, একথা ভাবতে ভাবতে সে সঙ্কল্প করে—যেচে কারুর সঙ্গে কথা কইবে না, গায়ে পড়া প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হলে এমন কিছু বলবে যার থেকে আবার প্রশ্ন না ওঠে। কিন্তু কার্যত তা ঘটে না। বাদল তর্কশিরোমণি। সামান্য বিষয়েও তর্কের গন্ধ পেয়ে দ্বন্দ্ব বাধায়।

৮

জাহাজে কুবেরভাইয়ের কাছে বাদল দাবা খেলা শিখেছিল। অতি আনাড়ির মতো খেলত, চর্চার অভাবে একাগ্রতার অভাবে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারেনি। প্রায় ভুলে গেছল বললে চলে।

আগুন পোহাতে পোহাতে বই পড়ার ফাঁকে বাদল লক্ষ্য করত কুঁজো মতন একটি যুবক, বয়স বছর পঁয়ত্রিশ হবে, প্রতিদিন দাবা খেলেন। তাঁর খেলার সাথী কিন্তু প্রতিদিন এক নয়। কোনো দিন প্রৌঢ়া, কোনো দিন কিশোরী, কোনো দিন বৃদ্ধ, কোনো দিন যুবক। পরম নিঃশব্দে খেলা চলে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্রতিপক্ষকে কাঁচা খেলোয়াড় দেখলে তিনি নিজেই প্রতিপক্ষের চাল বাৎলে দেন। প্রতিপক্ষকে কোনোমতে খেলার আসরে টেনে রাখবার জন্যে তিনি সুবিধের পর সুবিধে করে দেন, নিজের ঘুঁটিগুলিকে একে একে মারতে দেন। তাঁর মতো ধৈর্য তো সকলের নয়।

বাদল পায়চারি করতে করতে এক একবার খেলার কাছে দাঁড়ায়। মনে মনে উভয় পক্ষের চাল দেয়। অজ্ঞাচারণ দেখলে বিরক্ত হয়ে স্বস্থানে ফিরে যায়। আকর্ষণ এড়াতে না পেরে আবার কিছুকাল পরে পা বাড়ায়। ততক্ষণে হয়তো খেলার ছক প্রায় শূন্য হয়ে এসেছে। যুবকটির এক একটা বোড়ে এক একটা মন্ত্রী (Queen) হয়ে পুনর্জন্ম

পেল বলে। প্রতিপক্ষের অন্তরাত্মা খেলায় ইস্তফা দিয়ে পলায়নের জন্যে উন্মুখ। কিন্তু যুবকটি তা হতে দেবেন না। পলাতককে খোরাক দিয়ে বেঁধে রাখবেন বলে তাঁর অশ্বের আড়াই চালের ঘরে নিজের একটি বোড়েকে নিঃসহায় অবস্থায় এগিয়ে দিলেন।

একদিন বাদল হাতের বইখানাকে মাথার উপর ঘোড়সওয়ার করে চোখ বুজে কী একটা ভাবছে, তার সামনের চেয়ারে কে একজন এসে নিঃশব্দে বসলেন। বাদল চোখ চেয়ে দেখল সেই দাবা-খোর যুবক। বাদল ইতিমধ্যে তাঁর নাম জানতে পেরেছিল। মিস্টার ওয়েলী।

বাদল একটু ভদ্রতা করে বলল, "আজ দাবা খেলছেন না যে, মিস্টার ওয়েলী?"

মিস্টার ওয়েলীর চোখ ফিকে নীল, মুখ ফ্যাকাশে। তিনি কখনো হাসেন না। তাঁর মুখের মাংসপেশীগুলো নিথর, ভাবের আবেশে কাঁপে না। অথবা তাঁর মনের ভাব সব সময় একই রকম। তাঁর চোখের পাতা পড়ে, কিন্তু চোখের তারা নড়ে না। তাঁর সেই স্থিরদৃষ্টিকে তিনি বাদলের অভিমুখীন করলেন, যেন তার উপর সার্চলাইটের আলোক ক্ষেপ করলেন।

অতি ধীর ও স্পষ্ট উচ্চারণ, যেন কামানে গোলা দাগছেন।—"আপনি কি আজ আমার খেলার সাথী হবেন?"

বাদল প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু উৎসাহিত হয়ে উঠল।—"অল্ রাইট।"

সার্চলাইট তার মুখের থেকে অপসৃত হয়ে দাবার ছকের উপর নিবদ্ধ হলে পরে বাদল স্বস্তি বোধ করল। কাঁচা খেলোয়াড়ের যা দোষ, বাদল একধার থেকে যাকে হাতের কাছে পেল তাকে মেরে সাবাড় করল। তবু শেষকালে চালমাৎ হয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। ওয়েলী লোকটা যাদুকর। বাদল শ্রদ্ধার সঙ্গে ওয়েলীর করমর্দন করল।

দিন কয়েক পরে ওয়েলীর সঙ্গে বাদলের আলাপ দাবার ছক ডিঙিয়ে দার্শনিক মতবাদে উপনীত হল। ওয়েলী হচ্ছেন বিশুদ্ধ র‍্যাশনালিস্ট। সব জিনিসের উৎপত্তি উপাদান প্রকৃতি ও পরিণতি অনুসন্ধান করেন। মায়ের কবর খুঁড়ে botanise করতে ভয় পান না। দুনিয়ায় যা কিছু আছে তা হয় physicsএর, নয় biologyর, নয় psychologyর অধিকারভুক্ত।

ওয়েলী কোনো জিনিসকে ভালো বা মন্দ বলেন না, কারুর ভালো বা মন্দ চান না। তাঁর জিজীবিষা নেই। তিনি বেঁচে আছেন, কারণ বাঁচা ছাড়া আর অন্য কিছু করতে পারেন না, করবার ইচ্ছা যে নেই। আত্মহত্যা করলে যে অস্তিত্ব থাকবে না অথবা আবার বাঁচতে হবে না, এর প্রমাণ কই? তাঁর মৃত্যুভয় নেই, মৃত্যু যখন আসে আসুক। মৃত্যু যখন আসবে তখন বোঝা যাবে যে, মোটর গাড়ীর ড্রাইভার বেহুঁশিয়ার কিংবা

ব্যাধিবীজরা শরীর যন্ত্রকে অচল করেছে।

"আমরা যে এত 'আমি' 'আমি' করি, এই 'আমি'টা কে বলতে পার, সেন? একটা cell অসংখ্য হয়েছে, একত্র রয়েছে। তারা আপন প্রণালীতে কাজ করে যাচ্ছে, যেমন একদল পিপীলিকা করে থাকে। তাদের আশ্রয় করে অসংখ্য ব্যাক্‌টিরিয়া বাস করছে। আমি কিছুই টের পাইনে। আমি প্রত্যক্ষ করিনি যে আমার শরীরের শিরায় শিরায় রক্ত ছুটছে। আমি স্বচক্ষে দেখিনি আমার পাকস্থলী কিংবা যকৃৎ। নিজের ঘর সংসার সম্বন্ধে এই তো আমার জ্ঞান। তবু বলতে হবে এসব নিজের?

বাদল কোনোদিন এদিক থেকে ভাবেনি। ওয়েলীকে সে বিশেষ সমীহ করতে লাগল।

" 'ইচ্ছা' কাকে বলবে, সেন? কার ইচ্ছা? ঐ সমস্ত cell-এর ইচ্ছা? cell-সমষ্টির ইচ্ছা? ইচ্ছার লক্ষ্যটা কী? আরও কিছুকাল জীবনধারণ? দুদিন কম বেশীতে কী আসে যায়? জীবন যদি যায়ও, তবে এমন কী আসে যায়? cell-গুলো বাড়তে পাবে না, শুকিয়ে গুঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত atom-গুলো তো থাকবে? Personal immortalityর কথা ওঠে না, যেহেতু person বলে কিছু নেই। আর atomic immortality তো স্বতঃসিদ্ধ।"

বাদল চিন্তা করে। তার মতবাদের থেকে ওয়েলীর মতবাদ উত্তর মেরুর থেকে দক্ষিণ মেরুর মতো স্বতন্ত্র। তবু দুই মেরুতে কী যেন সাদৃশ্য আছে। বাদল থেকে থেকে ওয়েলীর কাছে ছুটে যায়। "আচ্ছা, মিস্টার ওয়েলী, এ বিষয়ে আপনার আইডিয়া কী?" ওয়েলীর উত্তরের উপর কথা বলতে পারে না। অত বড় তার্কিক মূক হয়ে যায়। ওয়েলী যেন যাদু জানেন। ওয়েলীকে বাদল ভয় করে। লোকটা যেন মানুষ নন। উত্তাপশূন্য, আবেগশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, রিপুজিৎ। তাঁর সুখের আশা কিংবা দুঃখের আশঙ্কা নেই। না নিজের জন্যে, না পরের জন্যে। মানবজাতি থাক্ বা লুপ্ত হয়ে যাক, তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। দেশের গৌরব, জাতির প্রগতি, সভ্যতার ক্রমবিকাশ ইত্যাদি তাঁকে মাতায় না, ভাবায় না। নিজের আদর্শ অনুসারে সমাজকে ঢেলে সাজাবার অভিলাষটি বহু র‍্যাশনালিস্টের আছে, যদিও তার প্রয়োজন যে কী তা তাঁরা বলতে পারবেন না। পৃথিবীই বা থাকবে কদিন! মানবজাতিই বা থাকবে কদিন! ব্যক্তিবিশেষ তো বীজ বপন করে ফল ভোগ করবার আগে মরবে। তবে কেন বিশুদ্ধ র‍্যাশনালিসম্ ফেলে ফলের পশ্চাদ্ধাবন?

ভালো মন্দ বলে কিছু নেই। আজ যেটাকে ভালো বলে তার পিছু নিচ্ছি কাল সেটাকে মন্দ বলে নিজের বুদ্ধিকেই বিদ্রূপ করব। না, সেন, "কোনো কিছুই ভালো কিংবা মন্দ নয়। **Nothing matters in the last analysis.**"—একটু থেমে বলেন,

"তোমাদের একালের ইউটোপিয়া আর কিছু নয়, সেকালের স্বর্গের নামান্তর ও রূপান্তর। তার মূল হচ্ছে বর্তমানের প্রতি অসন্তোষ, বর্তমানে অতৃপ্তি। তার ফুল হচ্ছে ভবিষ্যতের সম্পূর্ণতা, কাল-সাপেক্ষ perfection."

ওয়েলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল। বাদল তাঁকে নিজের সুখ দুঃখের কথা বলল। রাত্রে তার ঘুম হয় না বিশ্বের ভাবনা ভেবে। সুধীদার নাম করে বলল সুধীদা ইন্‌টুইশনের ও বাদল ইন্‌টেলেক্‌টের মার্গ অবলম্বন করেছে। সুধীদা রোজ এগিয়ে যাচ্ছে, বাদল পারছে না। বাদল যেন একটা বৃত্তের চারিদিকে (?) ঘুরছে, ঘুরে ফিরে সেই একই জায়গায় আসছে। তার একমাত্র আনন্দ সে ইন্‌টেলেক্‌টের লীলাভূমিতে ঘর করেছে, ইউরোপ তার মহাদেশ, ইংলণ্ড তার দেশ।

ওয়েলী অনবরত পাইপ টানেন। টানতে টানতে বাদলের কথা এক মনে শুনে যান। নিজের কথা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলতে চান না, কিন্তু বাদল যখন পীড়াপীড়ি করে তখন বলেন, "আমি নিজে এই মুহূর্তে এই স্থানে আছি কি না তার প্রমাণ পাচ্ছিনে, সেন। আমি একেবারে আছি কি না তুমিই বলতে পার। ওরা বলে, 'I think, therefore I am.' কিন্তু সেটা হচ্ছে begging the question, কারণ 'I think' এই বাক্যের যে 'I' শব্দটি সেইটির অস্তিত্ব নিয়ে তো যত প্রশ্ন। না, সেন, আমার নিজের কোনো কথা নেই।"

বাদল অপ্রস্তুত হয়ে যায়। সে ভগবান মানে না, কিন্তু আত্মা মানে। ওয়েলীর কথা শুনে তার সন্দেহ জন্মায়। তাই তো, আত্মা কি নেই ? আত্মা যদি না থাকে তো চিন্তার কী প্রয়োজন ? অকারণ এত অনিদ্রা। অর্থহীন ঐ ইন্‌টুইশন ও ইন্‌টেলেক্‌ট্‌। না, না, এ হতেই পারে না। আত্মা আছে। অন্তত অহং আছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে বাদল নাস্তিক, অহং সম্বন্ধে আস্তিক।

ওয়েলীকে যেই একথা বলা অমনি উনি বলেন, "Illogical."—বাদল মূক হয়ে যায়। দিগ্বিজয়ীর নিঃশব্দ পরাজয়।

৯

রাত্রে বাদল স্বপ্ন দেখল শয্যা শূন্য পড়ে আছে, সে নেই। ঘরে নেই, বাইরে নেই, আকাশে কিংবা বাতাসে নেই। সে নেই। তার বিছানার উপর এক মুঠো ছাই পড়ে আছে।

বাদল ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তার ঘুম ভেঙে গেল। তবু বিশ্বাস হল না যে সে আছে। লাফ দিয়ে উঠে সুইচ্‌ টিপে আলো জ্বালাল। আহ্লাদের বেগ সংবরণ না করতে পেরে মিস্টার ও মিসেস উইল্‌সকে ডেকে তুলবে কিনা ভাবতেই তার মনে পড়ল এটা হোটেল।

বিছানায় ফিরে যেতে তার সাহস হচ্ছিল না, যদি আবার তেমন স্বপ্ন দেখে। তখন ভোর হয়ে আসছিল ? ভাগ্যক্রমে সেদিন আকাশে মেঘ ছিল না। বাদল চেয়ার টেনে নিয়ে জানালার ধারে গিয়ে বসল। সামনের দিকে ঝুলে-পড়া টুপি মাথায় গোঁপওয়ালা খুদে গাড়োয়ান আপাদবক্ষ চটের থলে মুড়ি দিয়ে পশুবোধ্য ধ্বনিবিশেষ উচ্চারণ করতে করতে চলেছে। লোমশপাদ অশ্বের খুর থেকে খট্ খট্ আওয়াজ উঠছে।

বাদল রাত্রের দুঃস্বপ্ন ভুলল। নিজের ও অপরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার সহজ প্রত্যয় তাকে আনন্দে আপ্লুত করল। ওয়েলী মানুষটা পাগল। এত বড় একটা স্বতঃসিদ্ধকে কিনা সন্দেহ করেন। ইণ্ডিয়াতে একদল মানুষ আছে, তাদেরকে বলে মায়াবাদী। বাদল তাদের উপর সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত অপ্রসন্ন। তাদের অপরাধ তাদের সঙ্গে বাদল তর্ক করতে পারে না, তারা আগাগোড়া সব উড়িয়ে দেয়। যার সঙ্গে তর্ক করতে পারে না তাকে বাদল নিজের ব্যক্তিগত শত্রু জ্ঞান করে। তার মুখ দর্শন করে না। তার নাম বাদলের অশ্রাব্য। শুধু মায়াবাদী না, যারা কর্মফলবাদী তারাও বাদলের শত্রু। বাদলের ইচ্ছা করে তাদের গালে ঠাস ঠাস করে চড় মেরে বলতে, "এও তোমাদের কর্মফল।"

ইংলণ্ডে এসে নব্যতন্ত্রের মায়াবাদী দেখে বাদলের বিস্ময় এবং বিতৃষ্ণা জাগছিল। ইংলণ্ড এমনতর মানুষের দেশ নয়। একে ইণ্ডিয়ায় চালান দেওয়া আবশ্যক। গিয়ে আলমোড়ায় মঠ করুন কিংবা পণ্ডিচেরীতে আশ্রম। এখানে বলে রাখা দরকার আলমোড়া কিংবা পণ্ডিচেরী সম্বন্ধে বাদলের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। এবং সন্ন্যাসীদেরকে বাদল outlaw জ্ঞান করত বলে তাদের দিক থেকে যে বলবার কিছু থাকতে পারে সে বিষয়ে তার খোঁজ ছিল না, হুঁশ ছিল না।

একটু পরে ওয়েলীর সঙ্গে ব্রেকফাস্টের সময় দেখা হবে তখন তাঁকে বাদল বলবে কী ? মনে মনে একটা বক্তৃতা তৈরি করতে গিয়ে বাদল সেই ঘোর শীতকালেও ঘেমে উঠল। এমন কিছু বলা চাই যার উত্তরে ওয়েলী একটা কথাও বলতে পারবেন না। তেমন যুক্তি কই ? ওয়েলী যদি বলেন, স্বতঃসিদ্ধ আবার কী ? বর্বরের কাছে বেড়াল যে বাঘের মাসী এও তো একটা স্বতঃসিদ্ধ।

বাদল অবশেষে স্থির করল সুধীদার কাছে বুদ্ধি ধার করব। যেই চিন্তা সেই কাজ। ছুটল টেলিফোন করতে।

"হ্যালো।"

"মিস্টার চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলতে পারি ?"

সুজেৎ সুধীর সন্ধানে সিঁড়ি ভেঙে দৌড়ল। সুধী নেমে এল। "কে ?"

"আমি বাদল। ভয়ানক মুশকিলে পড়েছি।"

"সে কী রে ! বাসা ছেড়ে কোথায় চলে গেছিস, মিসেস উইল্‌স্ ঠিকানা দিতে

পারলেন না। কী হয়েছে।"

"আত্মা আছে, তার স্বপক্ষে কী যুক্তি দেওয়া যেতে পারে?"

সুধী অবাক হয়ে রইল।

বাদল বলল, "এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তর্কে হেরে গেছি। ভীষণ মন খারাপ।"

সুধী বলল, "আয় না, তোর সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি, উপলব্ধি বিনিময় করা যাক।"

বাদল বলল. "না, সুধীদা। আমার অজ্ঞাতবাসের প্রয়োজন আছে।"

বাদলের প্রশ্নের উত্তরে সুধী বলল, "আত্মা আছে, এর স্বপক্ষে একমাত্র যুক্তি—আত্মা আছে। ওর বেশী আমি জানিনে। এবং নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করতে আমি লজ্জিত নই, বাদল।"

বাদল বিরক্ত হয়ে বললে, "আমি তোমার মতো defeatist হতে পারব না। আমি পরাজিত হয়েছি বলে লজ্জায় মৃতপ্রায়। তবু জেতবার জন্তে প্রাণপণ করব।"

বাদল ভাবল, নিরামিষ খেয়ে খেয়ে সুধীদাটা একটা vegetable বনে গেছে। আমি কিন্তু বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি দেব না। বাদল টেলিফোনের রিসিভার স্বস্থানে ন্যস্ত করতে যাচ্ছিল, কী ভেবে আবার তুলে নিল। সুধী বলল, "বাদল, শোন্। একদিন মিউজিয়ামে আয়।"

বাদল বলল, "কী দরকার? তোমার ও আমার সাধনমার্গ এক নয়। দুজনে দুই পথে চলতে চলতে যদি কোনোদিন কোনো এক চৌমাথায় মিলিত হই তবে সেই দিন কাফেতে বসে পথের গল্প করা যাবে। আমাকে নিজের মতো চলতে দাও, প্রভাবিত কোরো না।"

সুধী কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকল। বাদল ডাকল, "সুধীদা!"

"কী?"

"তোমাকে defeatist বলেছি বলে ক্ষমা চাইছি। আসলে তুমিই সুখী। তোমার মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব সন্দেহ নেই, তুমি যা বিশ্বাস কর তার প্রমাণ খুঁজতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হও না, তাকে প্রমাণ করতে যাওই না।"

সুধী বলল, "বাদল, পরের কাছে প্রমাণ করবার চেষ্টা প্রকারান্তরে নিজের কাছেই প্রমাণ করবার প্রয়াস। ওটাতে নিজের দুর্বল প্রত্যয়ের পরিচয় দেয়। তা ছাড়া ওটাতে পরকে অনাবশ্যক প্রাধান্য অর্পণ করে বিচারকের সিংহাসনে বসিয়ে। যা সাদা চোখে দেখছিস তাকে বিশ্বাস করে তার থেকে রস সংগ্রহ কর। সাদাকে সাদা বলে প্রমাণ করে তর্কে জেতবার নাম commonsense-শূন্যতা।"

বাদল তো ভারি চটে গেল। ফোন ফেলে দিয়ে দিগ্বিদিক ভুলে যে ঘরে ঢুকল সে

ঘরে ওয়েলী বসে পাইপ টানছিলেন। বাদল পালাবার পথ পেল না। ওয়েলীর নিঃশব্দ নিশ্চেষ্ট আকর্ষণ তাকে চলৎশক্তিরহিত করল। সে মূঢ়ের মতো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে বলল, "গুড্ মর্নিং।" ওয়েলী মাথাটা ঈষৎ নেড়ে গুড্ মর্নিং জানালেন, বাদল আশ্বস্ত হল। তার কেমন যেন ভয় ওয়েলীর কণ্ঠস্বরকে, স্বল্পসংখ্যক শব্দকে। ওয়েলী যখন একটিও কথা কইলেন না তখন বাদলের শঙ্কা দূর হল। সে ধীরে ধীরে পিছু হটতে হটতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

১০

পরদিন সকালবেলা ওয়েলীর মুখ দেখে বাদল ঠিক করে ফেলল এ হোটেলে থাকা পোষাবে না। এক মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে রেখেছে, তবু পালাতেই হবে। তার বয়স অল্প, প্রাণে অনন্ত অভিলাষ, সে যে হতে হতে কী হয়ে উঠবে কল্পনা করতে গিয়ে রোমাঞ্চিত হয়, জগতের যত মহাপুরুষ তাঁদের সকলের সঙ্গে এক সারিতে বসবার যোগ্যতা অর্জন করবে সে। তার কল্পলোকে পদে পদে যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও করমর্দন তাঁরা কলিন্স্ মিলফোর্ড দে সরকার নন, আত্ম-অবিশ্বাসী ওয়েলী নন, তাঁরা দান্তে গ্যয়টে শেক্সপীয়ার প্লেটো অ্যারিস্টটল গৌতম বুদ্ধ। তাঁরা অতি পুরাতন হয়েও অতীব নবীন। আপনার উপর তাঁদের অটল বিশ্বাস। আপনাকে তাঁরা যে পরিমাণ শ্রদ্ধা করেছেন সেই পরিমাণে শ্রদ্ধেয় হয়েছেন। বাদল দুবেলা জপমন্ত্রের মতো উচ্চারণ করে—আমি নিজেকে শ্রদ্ধা করি, আমি নিজেকে আরো শ্রদ্ধা করতে চাই। আমি শ্রদ্ধেয় বলেই আমি আছি, আমি শ্রদ্ধার যোগ্য না হয়ে থাকলে আমার অস্তিত্ব থাকত না।

পলায়ন করাতে শক্তির পরিচয় দেয় না, কাজটা শ্রদ্ধাযোগ্য তো নয়ই। তবু বাদল পালাবে স্থির করল। ভেবে চিন্তে স্থির করল এমন নয়। হঠাৎ পাগলা কুকুর কিংবা ষাঁড় দেখলে যেমন দৌড় দেওয়া সাব্যস্ত করতে হয় এক্ষেত্রেও তেমনি। বাদলের মন দ্বিধা করলেও প্রবৃত্তি অস্থির হল। অতএব বাদল আর দেরী করল না। জিনিসগুলো একটা ট্যাক্সিতে চাপিয়ে ম্যানেজারকে বলল, "টাকা ফেরত চাইনে। হোটেলের ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইনি। অন্য কারণে অন্যত্র যাচ্ছি।" ম্যানেজার হাসির ভান করে বলল, "আশা করি আবার কোনোদিন শুভাগমন করবেন।"

বাদলের মনটা এক নিমিষে হালকা হয়ে গেল। অকস্মাৎ তার মনে হল তার কেউ নেই কিছু নেই কোনো ভাবনা নেই কোনো দায়িত্ব নেই। দিনটি পরিষ্কার ছিল। কোনো পার্কের কাছ দিয়ে যখন মোটর চলে যায় রাশি রাশি almond-মুকুল বাদলের চোখে অরুণ রঙের নেশা লাগিয়ে দেয়। অকবি বাদল উপমা খোঁজে। অতি মূল্যবান যার সময় সে খানিকটা সময়ের অপব্যয় করে। ভারতবর্ষে এই তো হোলি খেলার দিন।

এদেশেও গাছে গাছে ডালে ডালে হোলি খেলা চলেছে।

বাদলের বিশেষ কোনো ঠিকানায় যাবার কথা ছিল না। খুব সম্ভব ওয়াই এম সি এ'তে গিয়ে উঠত। কিন্তু সেখানেও তিন চার দিনেব বেশী রাখে না, যদি না অনেক আগে থেকে আবেদন করে স্থায়ী বোর্ডার হওয়া যায়।

সোফারকে বলল, "ভিক্টোরিয়া।"

যাক, কিছুদিনের মতো লণ্ডনের বাইরে গিয়ে অজ্ঞাতবাস করা যাক। মন স্বীকার না করলেও আত্মারাম জানেন কী শীত! কী বৃষ্টি। কী কুয়াশা! কী ধোঁয়া। কুয়াশা আর ধোঁয়া মিলে কী ফগ। কি অন্ধকার।

ভিক্টোরিয়া স্টেশন। একপ্রান্তে ইউরোপ-অভিমুখী ও ইউরোপ-আগত ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম। অপর প্রান্তের প্ল্যাটফর্মে দক্ষিণ ইংলণ্ডের ট্রেন সমাবেশ।

যে গতি-হিল্লোল মোটরে আসবার সময় বাদলকে মাতিয়ে রেখেছিল মোটর থেকে নেমেও বাদল তার প্রভাব সর্বাঙ্গে অনুভব করছিল। বিলম্ব করল না। আইল অব ওয়াইটের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। বাদলকে কোলে নিয়ে এমন দৌড় দিল যে পোর্টস্মাথ-এ পৌঁছতে ঘণ্টা দুয়েকও লাগল না।

সমস্ত পথ বাদল নিজের দেশকে প্রবল আগ্রহের সহিত চক্ষুসাৎ করছিল। লণ্ডনের আশে পাশে ফ্যাক্টরী। লণ্ডনের আওতা অতিক্রম করলে ছোট ছোট গ্রাম। মাঠে ঘোড়ায় টানা লাঙল দিয়ে চাষ করা হচ্ছে। বন্ধুর অনুর্বর ভূমির উপর সবুজ রঙের বার্নিশ করা। গাছে গাছে নতুন পাতা ও নতুন পাখী। গাছ কিংবা পাখী কারুর নাম বাদল জানে না, ওদের সম্বন্ধে বাদলের কোনোদিন কৌতূহল বোধ হয়নি।

বাদল কখনো ভাবছিল, আচ্ছা, গাছের সঙ্গে পাখীর এমন মিতালি কেন ও কবে থেকে? গাছ মাটি ছেড়ে নড়তে পারে না, পাখী আকাশে আকাশে উড়ে বেড়ায়। স্থিতির সঙ্গে গতির পরিণয় অদ্ভুত নয় কি?

কখনো ভাবছিল, এখনো ঘোড়ায় টানা লাঙল? এরা tractor কেনে না কেন? বাণিজ্যে আমাদের দেশ যেমন অগ্রসর কৃষিতে তেমন নয়, এ বড় আফসোসের কথা।

এক একবার ওয়েলীকে মনে পড়ে যাচ্ছিল।

বাদলের সাজানো বাগান শুকিয়ে যেত যদি ওয়েলীর 'লু' বাতাস প্রতিদিন তার উপর দিয়ে ছুটে যাবার পথ পেত। ইচ্ছার স্বাধীনতা, উদ্যোগের স্বাধীনতা, স্বাধীন মানুষের উদারমতি গবর্নমেণ্ট, অবাধ বাণিজ্য, উন্নত শিল্প, জ্ঞানের বিকাশ ও প্রসার, যানের উৎকর্ষ ও দ্রুতগতি, জাতিতে জাতিতে অক্ষতিকর প্রতিযোগিতা, কচিৎ এক আধটা যুদ্ধ—যা কিছু বাদল সমস্ত জোরের সঙ্গে বিশ্বাস করে ওয়েলী এক ফুৎকারে নিবিয়ে দেন।

ওয়েলীর কাছ থেকে পালাতে হল, এ লজ্জা বাদল ভুলতে পারছিল না। নিজের পরাভবের জন্যে বাদল ওয়েলীকে দোষ দিল। দিয়ে ভারী আত্মপ্রসাদ বোধ করল।

তারপর তার মনে পড়ে গেল সুধীদাকে। কী মজা। সুধীদা টের পাবে না বাদল কোথায়। কেউ জানতে পাবে না সে কোথায় উধাও হয়ে গেছে। শুধু জানবে তার ব্যাঙ্ক। কিন্তু ব্যাঙ্কের লোক একজনকে অপরজনের ঠিকানা জানায় না। ওটা ওদের নীতিবিরুদ্ধ। কাজেই সুধীদা জব্দ।

ব্যাঙ্কে বাদলের শ'দুই পাউণ্ড জমা রয়েছে। ছমাসের মতো সে নিশ্চিন্ত। এই ছমাস কাল সে নিভৃত চিন্তা করবে। মননের মতো আনন্দ কিছুতে নেই। দুনিয়ায় এমন কোনো বিষয় থাকবে না যা নিয়ে বাদল মন খাটাবে না। মনের মতো দেশ, মনের মতো ঋতু, একটু নিরিবিলি একটি কুটীর, দুবেলা লঘুপাক আহার্য, সারাবেলা পায়ে হেঁটে বেড়ানো কিংবা মাঠের উপর গড়িয়ে পড়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকা—অবশ্য ওয়েদার যদি আজকের মতো প্রসন্ন হয়। কী আনন্দ! কী মুক্তি!

পোর্টস্মাথ। খেয়া জাহাজ অপেক্ষা করছিল। ওপারে ওয়াইট দ্বীপ। দূর থেকে তার বনবীথি দেখা যায়।

বাদল ভাবছিল, আমার বাপ নেই, স্ত্রী নেই, দাদা নেই, বন্ধু নেই, কেউ নেই। আছে নিজের উপর শ্রদ্ধা। তাই থেকে অনুমান হয় নিজে আছি। আমি আছি, আর আছে আমার মন। আমরা দুটি সঙ্গী।

পলায়নের পরে

১

মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট-এর সঙ্গে সুধীর পরিচয় ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগারে। উক্ত গৃহে দিনের পর দিন পাশাপাশি বসতে বসতে কত পাঠক পাঠিকার মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হয়ে পরিণয়ে পরিসমাপ্ত হয়েছে, পরিচয় তো সামান্য বিষয়। প্রথমে হয় গুড মর্নিং বলাবলি। তারপরে দৈবক্রমে একদিন দুজনের লাঞ্চ খাওয়া হয় একই রেস্তোরাঁর একই টেবিলে। তখন একটু আবহচর্চা হয়। "এ বছর বৃষ্টিটা কিছু বেশী বলে মনে হয়।" "আমি তো আগস্ট মাস থেকে বৃষ্টির বিরাম দেখছিনে।" "ওঃ, আপনি গ্রীষ্মকালে এদেশে ছিলেন না। সারা গ্রীষ্মকালটা ভিজে রয়েছিল।" সেদিন ঐ পর্যন্ত। পরেও একদিন দৈবাৎ ঐ টেবিলেই দুজনের সাক্ষাৎ। সুধীকে দেখে মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট বললেন, "এই যে আপনি আজও এখানে। এখানকার খাওয়া আপনার পছন্দ হয় দেখছি।" সুধী বলল, "অনেক ঘুরে শেষে এইখানে ভিড়ে গেছি। এরা নিরামিষটা বাস্তবিকই ভালো রাঁধে।" মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট পরিহাস করে বললেন, "নিরামিষ যে রাঁধে এইটাই হচ্ছে half the battle. তারপর ভালো রাঁধে সেটা তো রীতিমত দিগ্বিজয়।" সুধী বলল, "ভালো রান্নার জন্যে আমি এক মাইল হাঁটতে রাজি আছি।" মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট এর উত্তরে বললেন, "ভালো রান্নার অঙ্গীকার দিতে পারব না, কিন্তু নিরামিষ যদি ভালোবাসেন তবে আমাদের ওখানে একদিন আপনার নিমন্ত্রণ রইল, মিস্টার—।" সুধী তাঁর অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ করে দিল।

রিম্‌লেস চশমার পিছনে তাঁর ঈষৎ নিমীলিত চক্ষু পরিহাসকালে প্রায় নিমীলিত দেখায়। বয়স ষাটের এদিকে কিংবা ওদিকে। চুল এখনো সেকেলে ধরনে বাঁধা, সব পেকে গেছে। গাল বেশ ফুলকো, স্বাস্থ্যের বর্ণচ্ছটায় রঙিন। ভরাট গড়ন, দীর্ঘ ঋজু আকার। সুধী এলেন টেরীর সঙ্গে তুলনা করল। পোশাক মসৃণ কালো সাটিনের। বাম হাতের একটি আঙুলে একটি আংটি, দেখে মনে হয় বাগ্‌দানের।

রবিবার মধ্যাহ্নভোজনের সময় ডক্টর মেলবোর্ন-হোয়াইট সুধীকে দেখে বললেন, "One more unfortunate! এলেনর, তুমি এঁকে কবে ভজালে?"

মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট নিরামিষ turtle soup পরিবেশন করে নিরামিষ lamb cutlets-এর ঢাকা খুলতে যাচ্ছিলেন। ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "মিস্টার চক্রবর্তীকে কনভার্ট করা যেন নিউকাস্‌লে কয়লা বয়ে নিয়ে যাওয়া। আচ্ছা মিস্টার চক্রবর্তী, মিসেস বেসান্টের সঙ্গে আপনার জানাশুনা আছে?"

সুধী বলল, "আমি থিয়সফিস্ট নই।"

এলেনর বললেন, "নন্? তবে কেমন করে নিরামিষাশী হলেন?"

সুধীকে ভারতবর্ষের সাত্ত্বিক আদর্শের প্রসঙ্গ পাড়তে হল। শেষে সুধী বলল, "জৈনদের নাম শুনেছেন?"

এলেনর বললেন, "শুনেছি বৈ কি। সেই যাদের শব শকুনে খায়। উঃ!" (শিউরে উঠলেন।)

সুধী হেসে বলল, "আপনি যাদের কথা ভাবছেন তাদের বলে পার্শী।"

"ওঃ পার্শী! How dreadful! শুনলে আর্থার? তোমার গ্রীকদের পরম শত্রু সেই যে পার্শিয়ানরা, তারাই—মানে তাদের বংশধররাই—ওঃ How dreadful!"

সুধী জানত না যে মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইটের দুই নম্বর বাতিক ইংলণ্ডে শবদাহ প্রচলিত করা। এজন্যে তিনি ও তাঁর বন্ধুরা একটি সমিতি করেছেন। যাঁরা চাঁদা দিয়ে সভ্য হবেন তাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁদের শব সমিতি কর্তৃক দাহ করা হবে। শবদাহ-কার্য ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। সমগ্র দেশের মধ্যে হয়তো একটি কি দুটি Crematorium আছে।

মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট সুধীকে সভ্য হবার জন্যে অনুরোধ করলেন। সুধী প্রথমটা

আশ্চর্য ও পরে কৌতুক বোধ করে বলল, “আমি তো পার্শী নই। আমি হিন্দু। আমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে অন্য সকলে তাকে ঘাড়ে করে শ্মশানে নিয়ে যায়, ঝড় বৃষ্টির রাত্রেও; একটি পেনী মজুরি নেয় না।”

ডক্টর মেলবোর্ন-হোয়াইট গম্ভীরভাবে বললেন, “প্রাচীন গ্রীকরা শব দাহ করত, না শবকে গোর দিত সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে।” অন্যমনস্ক অধ্যাপককে দাবড়ি দিয়ে তাঁর ভগিনী বললেন, “কিন্তু আধুনিক পার্শীদেরকে আমাদের সমিতির সভ্য করতে হবে, আর্থার।”

মেলবোর্ন-হোয়াইট পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলে সুধী জানতে পারল এঁদের পূর্বপুরুষ কেউ রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রধান মন্ত্রী লর্ড মেলবোর্নের আত্মীয় ছিলেন। লর্ড মেলবোর্নের একখানি প্রতিকৃতি এঁদের বসবার ঘর অলঙ্কৃত করছে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে মিস্‌ মেলবোর্ন-হোয়াইট বলছিলেন, “the Melbourne grit” তাঁদের পরিবারের বিশেষত্ব। তাঁর বিষয়ে সুধীর সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তাঁর ভাইটি বড় বেচারা মানুষ। বয়সেও তাঁর বড়। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। মস্ত ক্লাসিকাল স্কলার, গিল্‌বার্ট মারের মতো প্রখ্যাত না হলেও তেমনি বিদ্বান। ভাইবোন দুজনেই অনূঢ়, তবে ভাইয়ের জীবনে কখনো কোনো রোমান্স ঘটেছিল কিনা তার সাক্ষ্যস্বরূপ তাঁর আঙুলে অঙ্গুরীয় নেই। আকারে আয়তনে ভাইটি খর্ব ও ক্ষীণ; কিন্তু তাঁর দাড়ির বহর তাঁকে বাড়িয়ে দেখায়। বোনের অতি-সজাগ চক্ষু তাঁর পরিচ্ছদকে মলিন কিংবা কুঞ্চিত হতে দেয় না। অন্যান্য বিষয়েও তাঁর উপর বোনের অত্যাচার অবিরত লেগে রয়েছে। বোনটি এতটা পটু না হলে ভাইটিও বোধ করি এতটা অপটু হতেন না। আক্ষেপ করে বলছিলেন, “হতে চেয়েছিলুম ক্লাসিকাল নায়ক, হয়ে দাঁড়ালুম ক্লাসিক্সের অধ্যাপক। কাজের মধ্যে পড়া আর পড়ানো।”

সুধীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “ছাত্র?”

সুধী উত্তর দিয়েছিল, “হাঁ, সার।” প্রবীণ ব্যক্তিকে সার বলে সম্মান দেখিয়ে সুধী সম্মান বোধ করে। বাদলের মতে সকলেই সমান। সমানে সমানে সহজ ভদ্রতা চলুক, উচ্চতা নীচতার ভান কেন?

ডক্টর মেলবোর্ন-হোয়াইট বলেছিলেন, “কিসের ছাত্র?”

সুধী বলেছিল, “জীবনশিল্পের।”

“তা হলে প্রাচীন গ্রীকদের দ্বারস্থ হতে হয়।”

“কিন্তু তারা কি বেঁচে আছে?”

“আছে বৈ কি। যে একবার বেঁচেছে সে চিরকাল বেঁচেছে। মরে তারাই যারা জন্ম থেকে মরা। প্রকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃতবৎসা, মিস্টার চক্রবর্তী।”

সুধী সবিনয়ে বলেছিল, "যুদ্ধের জন্তে কি আপনি শোক করেন না, স্যার ? এই যে গত মহাযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ বীর—"

"কেন ? যুদ্ধে কি মানুষ এই প্রথম মরল ? ট্রয়ের যুদ্ধে বছরের পর বছর কি ও নকার অনুপাতে কম মানুষ মরেছে ? যদি বল ট্রয়ের যুদ্ধ অনৈতিহাসিক, তবে Peloponnesian War ?"

কোন কথা থেকে কোন কথা এসে পড়ল। সুধী ভাবছিল সেদিনকার মতো উঠবে কি না। ডক্টর মেলবোর্ন-হোয়াইট বললেন, "কী নাম ?—বাবগড্ গীতা, না, কী যেন বইখানার নাম ? আমি পড়েছি।"

সুধী বলল, "শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা।"

"ওতে লিখেছে যারা মরে রয়েছে তারাই মরে, কাজেই মারা সম্বন্ধে দ্বিধা বোধ করা কাপুরুষতা। সংস্কৃত আমি জানিনে, কিন্তু গ্রীকের সঙ্গে তার ভাষার ও ভাবের বহু সাদৃশ্য তারা আবিষ্কার করেছে যারা দুটোই জানে। তুমি দুটোই জান ?"

"আমি সংস্কৃত সামান্য জানি। গ্রীক একেবারেই না।"

"একেবারেই না ? এ-কে-বা-রেই না।"

সুধী লজ্জিত হয়ে নিঃশব্দ রইল।

ডক্টর মেলবোর্ন-হোয়াইট তাকে খানকয়েক বইয়ের তালিকা দিয়ে তারপরে বলেছিলেন, "রবিবারগুলোতে আমার কাছে এসো, সংস্কৃত ও গ্রীক চর্চা করা যাবে।"

ক্রমশ যখন ঘনিষ্ঠতা হল তখন ডক্টর মেলবোর্ন-হোয়াইট সুধীকে তাঁর জীবনের ব্যর্থতার কথা বললেন। তাঁর বোন তাঁকে নজরবন্দী করে রেখেছেন। কোথাও যেতে দেন না। ১৯০৯ সালে Roosevelt যখন আফ্রিকায় শিকার করতে যান তখন তাঁর দলের মধ্যে আমাদের ডক্টরেরও নাম ছিল, কিন্তু এলেনর তাঁকে যেতে দিলেন না। ১৯১২ সালে তিনি স্কটের সঙ্গে দক্ষিণ মেরু যাত্রা করবেন ঠিক হয়ে গেছল, কিন্তু সে বারেও এলেনর দিলেন বাধা। ১৯১৪ সালে তিনি বয়স ভাঁড়িয়ে সৈন্যদলে নাম লিখিয়েছিলেন, কিন্তু এলেনর জানতে পেরে পণ্ড করে দিলেন। গ্রীক হবার একটাও সুযোগ তিনি পেলেন না। যে বিদ্যা জীবনে রূপান্তরিত হতে পারে না সে যেন অচল স্বর্ণমুদ্রা, তাকে বাজারে ভাঙানো যায় না, পকেট করে সবাইকে দেখিয়ে বেড়ানো ছাড়া তার অন্য সদ্ব্যবহার নেই ! হিউম্যানিটারিয়ান বোনের উৎপাতে তিনি মাংসাহার তো ত্যাগ করেছেনই। তাঁর দাঁড়ি কামানোরও হুকুম নেই, পাছে অসাবধান হয়ে মাংস কেটে ফেলেন।

২

পাঁচ শত ডিম চাই।

কোনো এক অনাথাশ্রমের জন্যে ঈস্টার মহোৎসবের দরুন পাঁচ শত ডিম চাঁদা করার ভার মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইটের উপর পড়েছে। তিনি তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করে বেড়াচ্ছেন কে কটা ডিমের মূল্য ভিক্ষা দিতে পারবে। সুধীকে পাকড়াও করে বললেন, "এই যে মিস্টার চক্রবর্তী। আপনার নামে কত লিখব বলুন। একশোটা?" সুধী কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইল, বুঝতে পারল না ব্যাপারটা কী।

মিস্ তাঁর চশমার ওপার থেকে মিটি মিটি চাউনি ক্ষেপণ করে মিষ্টি হেসে বললেন, "ওদের তো কেউ আপনার লোক নেই। আমরা না দিলে কে দেবে বলুন। মোটে পাঁচশোটা ডিম। আর্থার একশোটা দিতে দয়া করে রাজি হয়েছেন। না আর্থার?"

ডক্টর বললেন, "কই? না।"

মিস্ বেশ জোরে জোরে অথচ ধীরে ধীরে বললেন, বলবার সময় তর্জনীর দ্বারা তাল দিতে দিতে। —"আর্থার, গেল বছর তুমি একশোটা দিয়েছিলে। তার আগের বছরও একশোটা। অনাথাশ্রমের ছেলেমেয়েরা তাদের আর্থার কাকার নাম মনে রেখেছে। তুমি কি এ বছর তাদের নিরাশ করতে চাও?"

ডক্টর সুধীর সঙ্গে এমনভাবে চোখাচোখি করলেন যেন তার অর্থ, "দেখলে তো! আমি বলেছিলুম কি না।" কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাড়িতে হাত বুলালেন। তার পর সান্ত্বনার সুরে বললেন, "গ্রীকদের মধ্যে যোগ্যের পুরস্কার ছিল, কিন্তু অযোগ্যের প্রতি সকরুণ ভিক্ষা ছিল না। এটা আমাদের হৃদয়বৃত্তির শৌখিনতা।"

মিস্ তখন নিবিষ্টমনে একশোটা ডিমের বাজারদর কষছিলেন। কান দিলেন না। সুধী বলল, "দানশীলতা আমার দেশে চিরদিন অযোগ্য পাত্রের অপেক্ষা রেখেছে; কারণ যোগ্য পাত্র তো দান চায় না।"

ডক্টর বললেন, "কিন্তু দানশীলতাই যে একটা দুর্বলতা। ভারতবর্ষ ওটাকে প্রশ্রয় দিলেন কেন ও কবে থেকে?"

সুধী বলল, "পুরাণে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী আছে। তিনি স্ত্রীকে বিক্রয় করে সাম্রাজ্যদানের দক্ষিণা জুটিয়েছিলেন। ইতিহাসে হর্ষবর্ধনের সম্বন্ধে পড়েছি, তিনি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর যথাসর্বস্ব দান করে নিঃসম্বল হতেন। অসংখ্য উদাহরণ আছে। আমার মনে হয় আমাদের সমাজব্যবস্থার মধ্যে এর অর্থ নিহিত আছে। কতকগুলো লোক বলবান বিদ্বান ধনবান ও অন্য কতকগুলো লোক নিরাশ্রয় মূর্খ ও দরিদ্র হয়েই থাকে। সমাজ এদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে সর্বদা সচেষ্ট না থাকলে দক্ষিণ অঙ্গের অতি বৃদ্ধি ও বাম অঙ্গের অতি ক্ষয় ঘটবে এবং পরিশেষে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে সমাজ

ডিগবাজি খাবে। এই চেয়ারখানার একটা পায়া ভাঙলে যে দশা হয় সেই দশা। সেই জন্যে দান করাটা দাতার গরজ। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে দান করতে হয় এবং দানের সঙ্গে দিতে হয় দক্ষিণা।"

মিস্ যে সব কথা শুনছিলেন তা কাউকে জানতে দেননি। হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, "শুনলে তো, আর্থার? সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার সংকেত? তোমার গ্রীকরা অপঘাতে ম'লে ক্রীতদাস পুষে। রোমানরা ম'লে ক্রীতদাসকে সিংহের খাঁচায় পুরে মজা দেখতে দেখতে। তুমি কি তোমার স্বজাতির তেমনি মৃত্যু চাও? আমি জানি তুমি বলবে মৃত্যু যার ঘটে রয়েছে তারই ঘটবে। কিন্তু আমি গ্রীক নই, আমি Destiny মানিনে। যাকে প্রতিরোধ করতে পারি তাকে যতক্ষণ পারি ততক্ষণ যতদূর সাধ্য ততদূর প্রতিরোধ করব। যা ঘটা উচিত নয় তাকে ঘটতে দেব না।"

সুধীর দিকে ফিরে বললেন, "দেখুন দেখি মিস্টার চক্রবর্তী, যুদ্ধ একটা জিনিস যা সভ্য মানুষের কলঙ্ক। নির্বোধে লড়াই করে তিল তিল করে মরে—ওঃ সে কী অকথ্য যন্ত্রণা! বুদ্ধিমানেরা মিথ্যাকথায় খবরের কাগজ ভরিয়ে মনের মধ্যে নরক নিয়ে বাঁচে এবং বেশ দু'পয়সা করে খায়। আমরা নারীরা চিরকাল ঠাকুর দেবতার কাছে প্রার্থনা করে চোখের জলে ভেসে অনাহারে অল্পাহারে দিন কাটিয়ে প্রিয়জনকে হারিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখলুম ফল হয় না। আগুন একবার যদি লাগে তবে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ না করা অবধি নেবে না। আগুন যাতে না লাগে তারই ব্যবস্থা করতে হবে। তাই আমাদের এই No More War Movement. কিন্তু আর্থার কিছুতেই এতে যোগ দেবে না।"

সুধী বলল, "অমন করে কি যুদ্ধ নিবারণ করা যায়, মিস মেল্‌বোর্ন-হোয়াইট? অবশ্য আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করবার অনুমতি দেন।"

মিস্ একটু ক্ষুব্ধ হলেন। ধরে রেখেছিলেন সুধীও তাঁদের দলে। বললেন, "বিশ্বের লোকমত যদি আমাদের দিকে হয় তবে যুদ্ধ করবে কারা ও কার সাহায্যে?"

সুধী সবিনয়ে বলল, "ডক্টর মেলবোর্ন-হোয়াইটের মতো যুদ্ধকে আমি কাম্য মনে করিনে, বরঞ্চ আপনারই মতো দূষণীয় জ্ঞান করি। কিন্তু যুদ্ধের জড় আমাদের প্রত্যেকেরই চরিত্রে উপ্ত থেকে আমাদের চিন্তায় বাক্যে ও কার্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। পৃথিবীর অতি নগণ্য কোণে অতি সামান্য একজন মানুষ যদি একটিমাত্র মিথ্যা কথা বলে তবে সেই ছিদ্র দিয়ে মহাযুদ্ধের মহামারী পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হয়। যদি একটি মুহূর্ত মন্দ চিন্তা করে তবেও সেই কথা। যদি অন্যায় কাজ করে কিংবা কর্মবিমুখ হয় কিংবা পরিমাণ লঙ্ঘন করে তবেও সেই কথা। স্থায়ী যুদ্ধবিরতির কোনো সম্ভাবনা কোনো দেশে দেখতে পারছিনে, মিস্ মেল্‌বোর্ন-হোয়াইট। কোনো জাতির ধর্মে ত্রুটি আছে, কোনো জাতির

ফিলসফিতে, কোনো জাতির প্রকৃতিতে খাদ আছে, কোনো জাতির শিক্ষাদীক্ষাতে। আপনারা শেষোক্তটার—শিক্ষাদীক্ষার—উপর ঝোঁক দিয়েছেন। আপনাদের উদ্যমের প্রশংসা করি।"

মিস্ মনোযোগপূর্বক সমস্ত শুনছিলেন। কাগজপত্র ব্যাগে পুরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনি বোধ করি পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত না দেখে কার্যক্ষেত্রে নামবেন না, মিস্টার চক্রবর্তী। কিন্তু কথায় কথায় আমাকে ভোলাতে পারবেন না যে আপনার কাছে আমার অনাথ বালকবালিকারা একশোটির ডিমের আশা রাখে।"

সুধী তাঁর দিকে একখানি পাউণ্ড নোট বাড়িয়ে দিল।

ডক্টর বললেন, "আসুন কঠোপনিষৎ পড়া যাক।"

৩

Bayswater অঞ্চলে মেল্‌বোর্ন-হোয়াইটদের বাগান-বেষ্টিত বাড়ী। দুজন মানুষের পক্ষে বেশ বড় বলতে হবে। বেস্‌মেন্ট নেই। নিচের তলায় বসবার ঘর, খাবার ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর। উপর তলায় আর্থার এলেনর ও প্রৌঢ়া পাচিকা মিস্ ডব্‌সনের তিনটি সুইট্ (suite)। তেতালায় আর্থারের মস্ত লাইব্রেরী। তিনি থাকেন বেশীর ভাগ সময় সেইখানে কিংবা কলেজে, আর তাঁর ভগিনী থাকেন নিচের তলায় বসবার ঘরে—যার একদিকে একটি গ্র্যাণ্ড পিয়ানো এবং অপর দিকে একটি ডেস্ক—কিংবা সভা-সমিতিতে।

ভাই বোন উভয়ের আমন্ত্রণে সুধীকে এ বাড়ীতে ঘন ঘন আসতে হয়। একদিন আর্থার বলেন, "চক্রবর্তী, ট্র্যাজেডীর প্রকৃতি ও সংজ্ঞা সম্বন্ধে এই যে প্রশ্ন আজ তুললে এর উত্তর চিন্তা করতে আমার দু'একদিন লাগবে অথচ শ্রোতার জন্যে সাত দিন অপেক্ষা করলে সমস্ত ভুলে যাব। কাজেই তুমি পরশু আমার সঙ্গে কলেজে দেখা কোরো, একসঙ্গে গল্প করতে করতে বাড়ী আসা ও চা খাওয়া যাবে।" অন্যদিন এলেনর বলেন, "সুধী, অন্ধ কারুশিল্পীদের দেখতে চেয়েছিলে, কাল সুইস কটেজ স্টেশনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরো। কেমন? সেখান থেকে বাড়ী ফেরা যাবে। তোমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে জন কয়েক বন্ধুকে চা খেতে ডেকেছি।"

ভাইবোনের মধ্যে ভাবসংক্রান্ত বিবাদে সুধী মধ্যস্থ হয় ও শেষ পর্যন্ত একটা সমন্বয় ঘটিয়ে উভয়কেই খুশি করে। ওঁরা ভাবেন, তাই তো, আমাদের মতবাদে মিল যত আছে অমিল তত নেই তো! তাঁরা একদিন প্রস্তাব করেছিলেন সুধী তাঁদের বাড়ী স্থায়ী অতিথি হলে তার জন্যে জায়গা করে দিতে পারবেন। সুধী বলেছিল, মার্সেলকে ছেড়ে কোথাও নড়তে পারবে না। বাস্তবিক ঐ মেয়েটার প্রতি সুধীর মায়া পড়ে গেছল। দেশে ফেরবার সময় তাকে কেমন করে ছেড়ে যাবে ভাবতে তার এখন থেকেই মন কেমন

করে। বিদেশে আমার এই এক কষ্ট, বিদেশী মানুষের সঙ্গে স্নেহ মমতার জোড় লোহার সঙ্গে চুম্বকের মতো যত সহজে লাগে তত সহজে ভাঙে না।

আর্থার তাঁর প্রকাণ্ড পুস্তকাগারের এক কোণে হারিয়ে যান। আত্মগোপনের দ্বারা আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি কোনো কোনো পশুপক্ষীর বর্ণকে বনজঙ্গল গাছপাতা বালুমাটি সমান করে তোলে, শিকারী যেন তাদের সন্ধান না পায়। ডক্টর মেলবোর্ন-হোয়াইটের দাড়িতে তাঁকে ধরা পড়িয়ে দেয়, নতুন চেষ্টার তিনি ত্রুটি করেন নি। তাঁর পোশাক তাঁর লাইব্রেরী ঘরের ওয়ালপেপারের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় এবং তিনি যেখানে বসে পড়েন সেখানে এত বই গাদা করেন যে তাঁর শ্মশ্রুবহুল মুখ ঢাকা পড়ে যায়। বিবরের ভিতরে বীভার নামক প্রাণীর মতো প্রবেশ না করলে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। যতক্ষণ না অন্তত চল্লিশখানা মোটা মোটা কেতাব তাঁর টেবিলের উপর পারনাসাসের মতো উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে ততক্ষণ তিনি স্নায়ুতাড়িত ভাবে ছুটাছুটি করতে থাকেন।

তাঁর লাইব্রেরীতে তাঁকে চা দিয়ে আসতে হয়, যেদিন তিনি চায়ের সময় বাড়ী থাকেন। লাইব্রেরীর পাশে ছাদের খানিকটা খোলা। সেখানে তিনি পায়চারি করতে ভালোবাসেন। কোনো কোনো দিন তাঁর প্রিয় শিষ্য বা প্রিয় বয়স্য সমাগত হলে তিনি ডেক্ টেনিস খেলেন সেখানে।

এদিকে তাঁর ভগিনীর দৃষ্টি নিম্নগামী। মালীকে খাটিয়ে ও নিজে খেটে তিনি তাঁর বাগানে যে মাসের যে ফুল সে মাসে সে ফুল ফুটিয়ে থাকেন। একটি কোণে একটি কুঞ্জের মতো আছে। সেখানে একটি ফোয়ারা আছে, সেটি তাঁর বিশেষ প্রিয়বস্তু। তার মূলদেশে রাজ্যের ঝিনুক জড় করা, কেবল ঝিনুক নয়—শাঁখ ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর খোলা। এগুলি তাঁর নিজের সংগ্রহ। বসবার ঘরের যে দিকটাতে বাগান সেই দিকে একটি বারান্দা আছে। সেখানে বসে তিনি বাগানের শোভা দেখতে দেখতে জামা তৈরি করেন। কাছেই একটি লতা দেয়াল বেয়ে দোতালায় তাঁর শোবার ঘরের জানালা পর্যন্ত উঠে গেছে।

রান্নাঘর ও ভাঁড়ারঘর হল মিস্ ডব্‌সনের রাজ্য। মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট সেখানে পদার্পণ করেন না, যদি না মিস্ ডব্‌সন আহ্বান করেন। মিস্ ডব্‌সন ভদ্রঘরের মেয়ে। তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে তাঁর হাতে রান্না ও বাজার ছেড়ে না দিলে তিনি হয়তো কাজ ছেড়ে দিতেন। তাঁর নিরামিষ রান্নার হাত ভালো, স্বভাব চরিত্র ধাত ভালো। মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট ঠিকা ঝি রাখতে পারতেন, কিন্তু আজকালকার দিনে এমন ঝি পাওয়া যায় না যার কিছুমাত্র দায়িত্ববোধ আছে। তাঁর প্যান্ট্রিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর Old China (চীনে মাটির বাসন) যা আছে তার দাম এখনকার বাজারে হাজার পঁচিশ টাকা। বাড়ীখানার চাইতেও সেগুলিকে তিনি প্রিয় মনে করেন। পাছে সেগুলি চুরি

যায় সেজন্ত তিনি প্যান্ট্রিতে ডবল চাবীর ব্যবস্থা করেছেন। মিস ডব্‌সনও এ বাড়ীতে আছেন প্রায় ষোল সতের বছর। মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইটকে "ম্যাডাম" বলে সম্বোধন করেন না, বলেন "মিস মেলবোর্ন-হোয়াইট।"

সুধীর পাগড়ী ও গায়ের রঙ মিস্ ডব্‌সনকে প্রথমটা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। তিনি দরজা খুলে দু'পা পিছিয়ে যেতেন। সুধী ইংরেজী বলতে পারে জেনে তিনি আশ্চর্য হলেও আশ্বস্ত হন। ক্রমশ সুধীর ভক্ত হয়ে পড়লেন। একদিন হাত পেতে বলেছিলেন ভাগ্য-গণনা করতে। সুধী পরিহাস করে বলেছিল, নিকটেই আপনার বিবাহের সম্ভাবনা দেখছি, মিস্ ডব্‌সন। মিস ডব্‌সন লজ্জায় সেই থেকে আর হাত পাতেন নি, তবে সপ্তাহে একদিনের বদলে দুদিন হাফ ছুটী নিতে আরম্ভ করলেন দেখে মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইটের আশঙ্কা হতে লাগল পাছে মিস্ ডব্‌সন সত্যিই বিয়ে করে কাজ ছেড়ে দেন।

৪

মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট বাড়ী ছিলেন না। ডক্টর সুধীকে লাইব্রেরীতে বসিয়ে মিস্ ডব্‌সনকে ডেকে বললেন দুজনের মতো চা দিতে।

সুধীকে বললেন, "বলছিলুম ট্র্যাজেডী কথাটার অপপ্রয়োগ দৈনিক কাগজে প্রতিদিন দেখতে পাই, তাই তোমাকে গোড়াতেই সাবধান করে দিচ্ছি যে অমন ট্র্যাজেডীর ব্যাখ্যা আমার কাছে প্রত্যাশা কোরো না, চক্রবর্তী।"

সুধী বলল, "না সার্, আমি যার কথা পেড়েছিলুম সেটা ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকদের মুখে শুনতে পাওয়া ট্র্যাজেডী।"

তিনি বললেন, "সেটাতে পরিণামের কথাই বলে, যে পরিণাম শোকাবহ তার কথা। আরম্ভ হল হয়তো সুখ সম্পদের মধ্যে, শেষ হল দুঃখ দারিদ্র্যে অকাল মৃত্যুতে, এই আমাদের ইংলণ্ডীয় ট্র্যাজেডী। কিন্তু গ্রীক ট্র্যাজেডী অমন নয়, চক্রবর্তী। তুমি যে বল'ছিলে সংস্কৃত সাহিত্যে ট্র্যাজেডী নেই সেটা বোধ করি তুমি ইংরেজী অর্থে বলছিলে।"

সুধী বলল, "গ্রীক অর্থটা কী তাই আগে শুনি।"

ডক্টর চা ঢেলে দিতে দিতে বললেন, "ক' টুকরা চিনি খাও?"

তারপর হেসে বললেন, "গ্রীক অর্থ হচ্ছে ছাগলের গান। এর উপর টীকা করা হয়েছে, ডাইওনিসাসের মন্দিরে ছাগবলি দেবার পরে নিহত ছাগলের উদ্দেশে যে গান করা হত সেই গান। হা হা হা। তোমার কি তাই মনে হয়?"

সুধী উত্তর দিল না। মৃদু হাসল।

তিনি বললেন, "সেকালে কোরাসদের নামকরণ হত পশু পাখীর নামে। যথা ব্যাঙের

কোরাস, তীমরুলের কোরাস, রামছাগলের কোরাস। রামছাগলের কোরাস যে একটা গম্ভীর ভাবাত্মক ও করুণ রসাত্মক ব্যাপার হবে তার আশ্চর্য কী? কোনো কোনো টীকাকার বলেন, অ্যারিস্টোফেনিসের 'ব্যাঙ' নামক কমেডী যেমন ব্যাঙের কোরাস থেকে সর্বপ্রাচীন ট্র্যাজেডী তেমনি রামছাগলের কোরাস থেকে।"

সুধীও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে হাসল।

তিনি শান্ত হয়ে বললেন, "আড়াই হাজার বছর পরে শব্দের ধাতুগত অর্থ দিয়ে তার সংজ্ঞা বা প্রকৃতি নির্ধারণ করা যায় না। গ্রন্থগুলি পড়ে তাদের তাৎপর্য সম্বন্ধে তোমার আমার যা ধারণা তাই তাদের তাৎপর্য। সদৃশতাৎপর্যবিশিষ্ট নাটকগুলিকে ট্র্যাজেডী আখ্যা দিয়ে তারপর ট্র্যাজেডীর অর্থ করলে মোটের উপর সেইটেই হবে যথার্থ অর্থ। আমি জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে সাহিত্যের ও বর্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে অতীতের বিচার করে থাকি, চক্রবর্তী। যারা কেবলমাত্র পণ্ডিত তাদের সঙ্গে আমার সেই কারণে বনে না।"

তিনি সুধীকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন সুধী সম্প্রতি সফক্লিসের "রাজা ঈডিপাস" পড়েছে। ঈডিপাসের পিতা পুত্র ভবিষ্যদ্বাণী শুনলেন যে সে একদিন পিতৃহত্যা করে নিজের জননীকে বিবাহ করবে। তিনি তার জন্মের অল্পদিন পরে তাকে বধ করবার জন্যে এক রাখালকে দিলেন। রাখাল দয়াপরবশ হয়ে তাকে এক বিদেশী পথিকের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল। বিদেশী রাজা ছিলেন অপুত্রক। পথিকের কাছে তিনি এই শিশুকে পেয়ে অতি যত্নে লালন করলেন। বড় হয়ে সে তার পালক পিতাকে আপন পিতা বলে জানল। হঠাৎ একদিন উপরোক্ত প্রকার দৈববাণী শুনে পাছে আত্মঘাতী হতে হয় সেই ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে এমন সময় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির রথের সারথি তাকে পথ থেকে হটে যেতে বলল। বাক্‌বিতণ্ডার ফলে সারথি ও রথী উভয়েই হলেন তার দ্বারা নিহত। সে পালাতে পালাতে শেষকালে যে দেশে উপনীত হল সে দেশের লোক তাকে তাদের মৃত রাজার স্থলে অভিষিক্ত করল ও বিধবা রাণীর সঙ্গে বিবাহ দিল। কালক্রমে তাদের সন্তান হল। অকস্মাৎ দেশে এল মহামারী। খোঁজ, খোঁজ, কোন মহাপাপে এমন ঘটল। সব প্রকাশ হয়ে পড়ল। রাণী দিলেন গলায় দড়ি। ঈডিপাস আপন হাতে দুই চক্ষু বিদ্ধ করে আপন ইচ্ছায় নির্বাসিত হলেন।

সুধী বলল, "সফক্লিসের রচনার গুণে গল্পটি এমন ঘোরালো আর কথোপকথন এমন জোরালো হয়েছে যে আড়াই হাজার বছরে কোনো নাট্যকার ঐ দুই দিকে উন্নতি দেখাতে পারেননি। তবে চরিত্রচিত্রণ বড় মোটা তুলিতে মূল রঙের সাহায্যে হয়েছে।"

ডক্টর সুধীর সঙ্গে একমত হলেন। সফক্লিস তাঁর প্রিয় নাট্যকার। তিনি বললেন, "সমস্যাসংক্রান্ত নাটক আধুনিক যুগে রাশি রাশি লেখা হচ্ছে, কিন্তু হতভাগ্য ঈডিপাসের

সমস্যাকে কোনো সমস্যাই অতিক্রম করতে পারছে না। পিতামাতার জন্যে, পুত্রকন্যার জন্যে, আপনার জন্যে কী খেদ কী লজ্জা কী গ্লানি ঐ একটা মানুষের। কিন্তু ট্র্যাজেডী আমি সেইটুকুকে বলব না। ট্র্যাজেডী হচ্ছে তাই যার কবল থেকে নিষ্কৃতি নেই, যা অবশ্যম্ভাবী, যাকে চুপ করে ঘটতে দেওয়া ও অসহায়ভাবে সয়ে যাওয়াই আমাদের কর্তব্য। এই যেমন গত মহাযুদ্ধ। ঐ নরকের ভিতর দিয়ে যেতেই হল আমাদের সবাইকে, কেউ প্রাণে মরে সকলের থেকে এগিয়ে গেল, কেউ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হারিয়ে মানসিক যন্ত্রণা লাঘব করল, কেউ আমার মতো অকর্মণ্য হয়ে সকলের থেকে বেশী ভুগল।"

সুধী মন দিয়ে শুনছিল। বলল, "ঈডিপাস যা করেছিলেন তা না জেনে করেছিলেন, তার দরুণ অনুশোচনার আবেগে আত্মপীড়ন করা তাঁর উচিত হয় নি। নিজের দুর্ভাগ্যকে সাধ্যমতো খণ্ডন করাতেই মনুষ্যত্বের জয়।"

ডক্টর বাধা পেয়ে বিরক্তি দমন করে বললেন, "কিন্তু দুর্ভাগ্য যে এরূপ ক্ষেত্রে অখণ্ডনীয়, মাই ডিয়ার ইয়ং ফ্রেণ্ড্। হয় বিধাতার নয় প্রকৃতির নয় অপরাপর মানবের stern necessity আমাদের দুর্ভাগ্যের মূলে। যেমন এক একটা ঝড় বা ভূমিকম্প তেমনি মানব সংসারের এক একটা ট্র্যাজেডী। ঝড়ের পরে যেমন আকাশ নির্মল হয়, বাতাস ঝির ঝির করে বয়, নব জীবনের উল্লাস অনুভূত হয়, তেমনি ট্র্যাজেডীর পরে। A stern necessity works itself out. দুই আর দুই মিলে চার হয়। তারপর আমরা বুঝি যা হয়ে গেছে তা মঙ্গলের জন্যে। ঈডিপাসকে দিয়ে দেবতারা প্রমাণ করলেন যে মানুষ যতই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্যের অধিকারী হোক অহংকারে আত্মহারা হোক তার পতনের বীজ তার উথানের মধ্যে গুপ্ত আছেই, সে বীজ অঙ্কুরিত হতে বিলম্ব করলেও ক্রমান্বিত হয়ে দশদিক আচ্ছন্ন করবেই।"

সুধী তাঁকে স্তব্ধ হতে দেখে ভরসা করে বলল, "বুঝেছি, আপনি যাকে ট্র্যাজেডী বলেন তাকে আমরা বলি কর্মফল।"

সুধী তাঁকে বোঝাল। তিনি বললেন, "আমি আমার অজ্ঞাতসারে যা করছি, তার ফল কি আমাকে ভোগ করতে হবে ? তা কি কর্মের ও কর্মফলের সামিল ?"

সুধী বলল, "নিশ্চয়। আইন জানিনে বলে বিধাতার আদালত আমাকে মাফ করবে না। সেইজন্যেই তো জ্ঞানার্জন করা আমাদের নিত্যকালীন কর্তব্য। কিন্তু জ্ঞান মানুষকে আত্মহননের প্রেরণা দিতে পারে না। ঈডিপাসের জীবনে কী প্রমাণ হল ? প্রমাণ হল এই যে সে যেন অত্যুচ্চ গম্বুজের চূড়ায় দাঁড়িয়েছে মাটির থেকে পাঁচশো হাত দূরে ; তাই দেখে তার মাথা গেল ঘুরে ; সে দিল লাফ। এটা কর্মফল নয়, নূতন কর্ম।"

ডক্টর মেনে নিতে পারলেন না। বললেন, "তোমার দেখা ও আমার দেখা দুই

স্বতন্ত্র ভূমি থেকে। আমি দেবতাদের স্বর্গ থেকে ঈডিপাস নামক একটি মানব: ম্যারিয়নেটকে দেখছি। তাকে দিয়ে একরকম খেলা দেখানো হল। খেলার থেকে শিক্ষা—Wait to see life's ending ere thou count one mortal blest. সব ট্র্যাজেডীই খেলা এবং প্রত্যেক খেলার পিছনে শিক্ষা উহ্য আছে। তা বলে আমি বলছিনে যে সকলের জীবনে ট্র্যাজেডী ঘটে। না, ও জিনিস অত সস্তা নয়, চক্রবর্তী। যাদের জীবন মহৎ উপাদানে তৈরি কেবলমাত্র তারাই ট্র্যাজেডীর নায়ক হয়ে থাকে। ঈডিপাস এই হিসাবে ভাগ্যবান।"

সুধী কী বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ডক্টর চা ঢেলে টেবিলটাকে নোংরা করে রেখেছিলেন। তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি পকেট থেকে রুমাল বার করতে গিয়ে হাতের ঘা লাগিয়ে একটা পেয়ালাকে দিলেন মেজের উপর কাত করে। মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট ঘরে ঢুকতেই দেখেন এই ট্র্যাজেডী। তাঁর বিরাট বপু শ্রমক্লান্তিতে ঘন ঘন আকুঞ্চিত প্রসারিত হচ্ছিল। তিনি কথাটি না বলে এক গাদা বইয়ের উপর ধপ্ করে বসে পড়লেন। তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। সুধী আলোর সুইচটা টিপে দিল। আলোর আকস্মিকতা সইতে না পেরে মিস হাত দিয়ে চোখ ঢাকলেন।

৫

"এই যে সুধী, এ বেলা এইখানেই খেয়ো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

"সে কী করে হবে মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট? আমার মাদাম যে খাবার নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকবে। আর মার্সেল গল্প না শুনে কিছুতেই ঘুমতে যাবে না।"

"আঃ, মার্সেল।"

"ওকে আজকাল ভগবানের গল্প বলি, মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট। ভগবান কে, কোথায় থাকেন, কী করেন, আমাদের সঙ্গে তাঁর কী সম্বন্ধ, তাঁর জন্যে আমরা কী করতে পারি। এই সব।"

"চমৎকার। তোমার মার্সেলকে দেখতে হবে একবার। তাকে নিয়ে আসতে পার না?"

"উহুঁ। গাড়িতে চড়লে তার অসুখ করে।"

মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট সামান্য একজন শ্রমিকশ্রেণীর লোকের বাড়ী যাবেন মার্সেলকে দেখতে, এটা আশা করা অন্যায়। কাজেই সুধী তাঁকে আমন্ত্রণ করতে পারল না। তিনিও প্রসঙ্গটা চাপা দিলেন। সুধীকে ছেড়ে আর্থারকে নিয়ে পড়লেন।

"তারপর আর্থার, কতক্ষণ বাড়ী এসেছ? চা খাওয়া হয়েছে? ভুলে যাওনি? কই,

তোমার পেয়ালা কোথায় ? সর্বনাশ ! এতক্ষণ টুকরাগুলো উঠিয়ে রাখনি ? অধ্যাপক হলে কি এমনি ভোলানাথ হতে হয় ? দেখেছ সুধী, আমার সেই পুরানো হলাণ্ডদেশীয় টী-সেট্-এর একটি পেয়ালা। হায় হায় ! মিস্ ডব্‌সনকে আমি হাজারবার বারণ করেছি। বিয়ে-পাগলী হয়ে তাঁর বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে।"

পেয়ালার ভাঙা অংশগুলি একত্র করে ধরে তিনি আস্ত পেয়ালার অনুসরণ করলেন। লোহার শিক দিয়ে ওগুলিকে ফুঁড়ে লোহার তার দিয়ে ওগুলিকে বেঁধে জোড়া যায়। সেজন্যে কালকেই তিনি বণ্ড স্ট্রীটের এক দোকানে যাবেন সংকল্প করলেন।

আর্থার প্রথমটা অপদস্থের মতো অধোবদনে ছিলেন। কিন্তু সুধীর সামনে এতখানি উচ্ছ্বাস দেখানো এলেনরের পক্ষে অশোভন হয়েছে মনে করে তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু বোনকে রীতিমতো ভয় করে চলতেন। সুধীর সামনে একটা কাণ্ড বাধাতেও তাঁর অপ্রবৃত্তি। সহসা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ছাদে পায়চারি করতে লাগলেন।

সুধী ভাবল এই সুযোগে বিদায় নেওয়া যাক। বলল, "মিস্ মেল্‌বোর্ন-হোয়াইট—"

"এত বড় একটা গালভরা নামে নাই বা ডাকলে সুধী। বোলো আণ্ট এলেনর। আমি তো কবে থেকে তোমাকে সুধী বলে ডেকে আসছি। কিন্তু দেখ দেখি আর্থারের পাগলামি ! বিয়ে করে থাকলে বৌটাকে ক্ষেপিয়ে তুলে ছাড়ত। আমি বলে সহ্য করি। অন্য কোনো বোন তাও পারত না। তুমিই বল না কেন, সুধী।"

"কিন্তু আণ্ট এলেনর, বয়ঃকনিষ্ঠের উপস্থিতিতে ওঁকে অমন কথা শোনানো ঠিক হয়নি আপনার। আমাকে বিদায় দিয়ে আপনি যান ওঁকে প্রসন্ন করুন।"

"সে কী ! তুমি খেয়ে যাবে না ? তোমার সঙ্গে যে অনেক কথা ছিল। আমি একটা দোকান আবিষ্কার করেছি যেখানে তাঁতের কাপড় পাওয়া যায়, তোমরা যাকে 'কাডার' বল। কিছু কিনেও এনেছি। কাল পোশাক তৈরি করব বসে।"

অগত্যা সুধীকে প্রস্তাব করতে হল, "আচ্ছা, তবে কাল এসে দেখে যাব।"

পরদিন আণ্ট এলেনর বাগানের দিকের বারান্দায় বসে রঙীন পশমের খদ্দরের উপর কাঁচি চালাচ্ছিলেন, সুধীকে অভ্যর্থনা করে বললেন, "ভিতর থেকে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে বস।…পেয়ালাটা নিয়ে বণ্ড স্ট্রীটে যাব ভাবছিলুম। তোমার যদি বিশেষ কাজ না থাকে এক সঙ্গে যাওয়া যাবে।…তোমার সেই ঈস্টার ডিমের কথা মনে আছে ? লেডী হেনরিয়েটা ব্লুমফিল্ড তোমাকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাতে বলেছেন। যদি তোমার কোনো দিন সময় হয় তবে আমার সঙ্গে তাঁর ওখানে গিয়ে দেখা করে আসা মন্দ নয়।…ও কী ? আমার জন্যে ফুল এনেছ ? কী ফুল ? স্নোড্রপ্। বহু ধন্যবাদ।"

সুধী বলল, "একটি বুড়ো ভিখারী পথে পাকড়াও করে এইটি হাতে গুঁজে দিল। ভাবলুম নতুন আণ্টকে উপহার দিয়ে সম্বন্ধটার সম্বর্ধনা করি।"

আণ্ট এলেনর শুধু বলতে থাকলেন, "Too nice of you, too nice of you." উঠে গিয়ে একটি ফুলদানীতে যত্ন করে স্নোড্রপ্ গুচ্ছটি রাখলেন। বাগান থেকে ভায়োলেট ফুল তুলে একটি ছোট্ট তোড়া বেঁধে সুধীর বাটনহোলে পরিয়ে দিতে গিয়ে দেখেন তার বাটনহোল নেই।

"তাই তো সুধী। অতটা লক্ষ করিনি। মিছিমিছি ফুলগুলিকে কষ্ট দিয়ে তুললুম। এখন কী করি! আচ্ছা, নিয়ে তোমার মার্সেলকে দিয়ো।"

"ধন্যবাদ, আণ্ট এলেনর। মার্সেল খুব খুশি হবে।"

আণ্ট এলেনরের কী যে বলবার ছিল বলতে ত্বরা দেখা গেল না। সুধীর একটু কাজ ছিল। কিংস্ ক্রস্ স্টেশনে গিয়ে দেশ থেকে আসতে থাকা একটি ছেলেকে অভ্যর্থনা করতে হবে। ছেলেটিকে সুধী চেনে না, যোগানন্দের পরিচয়লিপি থেকে তার নাম জেনেছে এবং তার নিজের টেলিগ্রাম থেকে তার পৌঁছানোর তারিখ, সময় ও স্থান।

বহুকাল উজ্জয়িনীর সংবাদ না পেয়ে তার উৎকণ্ঠা সঞ্চার হয়েছিল। এদিকে বাদলও নিরুদ্দেশ। কাকামশাই যথেষ্ট বড চিঠি লেখেন না, কেবলমাত্র বাদলের কুশল জিজ্ঞাসা করে ও সুধীর কুশল আশা করে ইতি করেন। নবাগত যুবকটি হয়তো দেশের ও দশের খবর দিতে পারবে। যুবকটির সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সুধী ব্যগ্র হয়ে রয়েছিল। আণ্ট এলেনরের সঙ্গে আলাপ জমছিল না।

আধ ঘণ্টাকাল বাগানের দিকে চেয়ে থেকে সুধী বলল, "দেশ থেকে একটি ছেলের পৌঁছানোর কথা আছে আজ, আণ্ট এলেনর।"

"বটে? তোমার বন্ধু বুঝি?"

"না, আণ্ট এলেনর। বন্ধু আমার একটিমাত্র। সে আজ মাস খানেক নিরুদ্দেশ।"

"নিরুদ্দেশ! অসম্ভব। স্থির জান নিরুদ্দেশ?"

সুধী চিন্তামৌন থাকল। চিন্তার কিছুটা দুশ্চিন্তাও বটে। মনটা কেমন করে উঠছিল। আণ্ট এলেনর হাতের কাজ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উত্তেজিত হয়ে বলছিলেন, "স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে খবর দিয়েছ? দাওনি? চল আজই দিয়ে আসি। বিদেশী ছেলেদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কোথায় যেন একটা সমিতি ছিল। খুঁজে বার করতে হবে সেটাকে। আচ্ছা, একটু বস, আমি কোটটা নিয়ে আসি, ছাতাটাও। ইস্, বৃষ্টিটা জোর নামল।"

এপ্রিল মাস। এই বৃষ্টি, এই রোদ। উইলিয়াম ওয়াটসন তার বর্ণনা করেছেন :—

"April, April,
Laugh thy girlish laughter
Then a moment after
Weep thy girlish tears."

সুধীর সেই কথা মনে পড়ল। অমনি বাদলের চিন্তা কোথায় তলিয়ে গেল। সৌন্দর্যের আকর্ষণ সুধীকে সব ভোলায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে আকাশের দিকে চেয়ে থেকে আহার নিদ্রার গণ্ডী লঙ্ঘন করে। তার প্রাণ শীতল হয় হৃদয় স্নিগ্ধ হয় অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও আত্মা পরিপূর্ণ হয়। আবেশ কিংবা উত্তেজনা, মূর্ছা কিংবা গদগদভাবে তাকে মত্ত কিংবা মূঢ় করে না। বেগবিহীন বর্ষাধারা সবুজ তৃণের উপর এমন ভাবে পড়ছিল যেন ঘুম পাড়ানোর সময় শিশুর মাথার উপর মায়ের হাতের চাপড়। জোরে নয়, পাছে শিশুর ঘুম না আসে। অথচ আস্তেও নয়, পাছে শিশু আদরের অস্বচ্ছলতা অনুভব করে থেকে থেকে চোখ মেলে চায়।

৬

আণ্ট এলেনর তাকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে নিতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু সুধী বলল, "আগে তার ব্যাঙ্কে একখানা চিঠি লিখে দেখি।"

আণ্ট বললেন, "তবে চল কিংস্ ক্রস্।"

চায়ের পেয়ালা সারাবার কথা তাঁকে মনে করিয়ে দিয়ে সুধী বলল, "ওকে একদিন এখানে নিয়ে আসব, আণ্ট এলেনর। আগে ও কোথাও উঠে বিশ্রাম করুক।"

একসঙ্গে খানিকটা পথ গিয়ে সুধী বিদায় নিল। কিংস্ ক্রস্ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর গাড়ি এলে দেখতে পেল একটি কামরায় চার পাঁচ জন ভারতীয় যুবক। কোনটি বিভূতিভূষণ নাগ—সুধীর মনে প্রশ্ন উঠল। সুধী একজনকে একটু নেপথ্যে ডেকে প্রশ্ন করতেই উত্তর পেল, "আমিই বিভূতি। আপনি কি—"

"হাঁ, আমিই। আপনার সঙ্গের জিনিসগুলি কোথায়?"

বিভূতিকে সুধী দে সরকারের ওখানে নিয়ে তুলল। দে সরকার বাসায় ছিল না, তার বাড়ীওয়ালী সুধীকে চিনত। একটি ঘরে জায়গা করে দিল। সুধী বলল, "এইবার আপনি বিশ্রাম করুন, বিভূতিবাবু, আমি ওবেলা আসব।"

বিভূতির বয়স সুধীর থেকে দু-এক বছর বেশী। নাদুস নুদুস গড়ন। গায়ের রঙ মিশ কালো। তার চেহারার বৈশিষ্ট্য তার চোখে ও গোঁফে। ডাগর কালো চোখ। পদ্ম-পলাশাকৃতি। সূক্ষ্ম কোমল গোঁফ, চিত্রার্পিতের মতো। তার চলন শান্ত মন্থর, ভাষা জড়ানো, টান বাঙাল।

বলল, "একটু বসুন। আচ্ছা, বাথরুমটা কোন দিকে?"

সুস্থ হয়ে সে যখন ফিরল তখন সুধী বলল, "উঠি তা হলে?"

বিভূতি অসহায়ভাবে বলল, "উঠবেন? ভাবছিলুম একবার সার্ নিকোলাস বিসটন বেলের সঙ্গে দেখা করতে যাব, বাবাকে বড় ভালোবাসতেন। পথ হারিয়ে ফেলব না,

সুধী বলল, "সে কী, মশাই ? স্নানাহার করে বাকী ঘুমটা ঘুমিয়ে নিন। দে সরকার ফিরুক। আমিও ফিরি। গল্পগুজব চলুক। ইংলণ্ডের জলহাওয়া সহ্য হোক। তারপর সার নিকোলাসের পালা।"

বিভূতি এক তাড়া কাগজ সুধীর সামনে ফেলে দিল। সাহেবদের সুপারিশ পত্র। বিভূতির বাবা শ্যামাচরণবাবুকে দেওয়া। Certified that Babu Shyama Charan Nag is a Sub Deputy Collector of rare ability……

সুধীর চেয়ারের পেছন থেকে ঝুঁকে পড়ে পিতৃ-গর্বিত পুত্র টিপ্পনি করল, "বেল সাহেব বাবাকে কানুনগো থেকে সাবডেপুটি করল। অকালে পেনশন না নিয়ে থাকলে এতদিনে ডেপুটি না করে ছাড়ত না, মিস্টার চক্রবর্তী। দেখি যদি বেল সাহেবকে ধরে মোবার্লি সাহেবকে চিঠি লেখাতে পারি।"

একটু পরে দে সরকার ফিরল। কাজেই সুধীর ওঠা হল না। দে সরকার সম্পূর্ণ পরিচিতের মতো হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "হাউ ডু ইউ ডু।" পেশাদার চালিয়াতের হাতের ঝাঁকানি খেয়ে বেচারা বিভূতির অন্তরাত্মা বুঝল দে সরকারের তুলনায় সে একটা গেঁয়ো ভূত। আমতা আমতা করে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

অসহায় মানুষ দেখলে দে সরকার তাকে নিয়ে তামাশা করতে ভালোবাসে। জিজ্ঞাসা করল, "ওয়েল, মিস্টার ন্যাগ, ন্যাগিনীটিকে কি এই দেশে সংগ্রহ করবেন, না, দেশে রেখে এসেছেন ?"

বিভূতি প্রথমটা বুঝতে পারল না। যখন বুঝল তখন লজ্জায় রাঙা হয়ে বলল, "দেখবেন ? এই দেখুন। সর্বক্ষণ বুকে করে রেখেছি।" পকেট থেকে একখানি ফোটো বার করে বিভূতি দে সরকারের চোখের সামনে ধরল। একটি অতি রুগ্না কৃশকায়া তরুণী, অস্বাভাবিক পাণ্ডুর ও বাঙালী মেয়ের পক্ষে যারপরনাই ফরসা। টিকল নাক, পাতলা ঠোঁট, ছুঁচল চিবুক, কাতর চাউনি।

দে সরকার ফস্ করে চারটে পকেট থেকে চারখানি ফোটো বার করে টেবিলের উপর চারখানা তাসের মতো ফেলে দিল। প্রথমটা বিভূতির মুখ থেকে তার মনের ভাব অধ্যয়ন করল। বিভূতি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। দে সরকার বলল, "ইস্কাবনের বিবি, চিড়িতনের বিবি, হরতনের বিবি, রুহিতনের বিবি। বলুন দেখি এরা আমার কে হয় ?"

বিভূতি সুধীর দিকে চাইল। সুধী মুচকে হাসছিল। দে সরকার ফোটোগুলো গুটিয়ে যথাস্থানে ন্যস্ত করল। তারপর বলল, "অসময়ে এলেন যে ? ইংলণ্ডে যারা পড়তে আসে তারা অক্টোবরের আগে আসে।"

বিভূতির এবার মুখ ফুটল। সে ফস্ করে বলল, "আসছে আগস্টে আই-সি-এস্ দেব।"

দে সরকার বলল, "বয়স আছে তো ?"

বিভূতি সখেদে বলল, "একবার দেবার বয়স আছে, দুবার দেবার নেই। কী করি বলুন, শ্বশুর মশাই পাঠাতে চান না, তাঁর ঐ একটি মেয়ে কিনা—"

"বুঝেছি। পাছে বিধবা হয় !"

"ছি। আপনি যা তা বলবেন না। আমার ছেলে দুটি—"

"ইতিমধ্যেই ? ভালো করেছেন, মশাই। বেশ করেছেন। বিদেশে এসে স্ত্রীকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু কিছু খেয়েছেন টেয়েছেন ? না ? দেশী খাবার পছন্দ করেন তো রাঁধতে লেগে যাই।"

বিভূতির মুখভাব থেকে মনে হল তার বিলম্ব সইবে না। অগত্যা দে সরকার তাকে রেস্তোরাঁয় টেনে নিয়ে চলল। তাকে এক হাতে ও সুধীকে অন্য হাতে। এ পাড়ার লোক বোহিমিয়ান হোক না হোক বোহিমিয়ানের কদর বোঝে। তিনটি কালো মানুষ দল বেঁধে চলেছে, দুজনের বগলে একজনের দুই হাত ভরা, কেউ ভ্রূক্ষেপও করল না। একটা ইটালিয়ান রেস্তোরাঁয় তিনজনে টুমাটোর সঙ্গে Spaghetti-র ফরমাস দিল।

৭

দে সরকারের কোথায় যেন এন্‌গেজমেন্ট ছিল। সে সুধীকে ও বিভূতিকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে ছুটি নিল।

সুধী বলল, "বিভূতিবাবু, ক্যাপ্‌টেন গুপ্তরা কেমন আছেন ?"

বিভূতি বলল, "শুনছিলুম তিনি বেলুচিস্থান বদলি হয়ে যাচ্ছেন। আগে খুব মিশতেন। আজকাল কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। তবে বাবাকে বড় ভালোবাসেন। দেখা করতে গেলে দোতলায় ডেকে পাঠান। বলেন, খবর কী শ্যামাচরণ, তোমার নাতিরা কেমন আছে ? বাবা বলেন, ছেলেটিকে এবার বিলেত পাঠাচ্ছেন তার শ্বশুর। আমার সাধ্য কী বলুন, যে আপনাদের সঙ্গে পাল্লা দিই। যদি একখানা চিঠি লেখেন আপনার জামাইকে—। গুপ্ত সাহেব বলেন, দুঃখের কথা কেন বল, ভাই। মেয়ে কিংবা জামাই কেউ আমার খোঁজ নেয় না। King Lear-এর মতো সবাই আমাকে ছেড়েছে। …বাবার চোখে জল এল তাঁর দশা দেখে।"

সুধী উজ্জয়িনীর সংবাদ জানতে চাইল।

বিভূতি বলল, "ওটা একটা পাগলী। ওর বিয়ের আগে প্রায়ই দেখা যেত ধোপাদের একটা ছেলের হাত ধরে বেড়াতে বেরিয়েছে। অবিশ্যি সে ছেলেটাও ভদ্রলোকের ছেলের মতো স্মার্ট। ওকে জিজ্ঞাসা করুন, তোর নাম কী রে ? ও বলবে, মাই নেম ইস শ্রীহারাধন রজক। হা হা হা। ব্যাটা একদিন করেছে কী আমার ছোট ভাই কান্তির

একটা শার্ট গায়ে দিয়ে টেরি কেটে এসেন্স মেখে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। আট কী দশ তার বয়স, তবু চাল দেয় যেন বিলেত ফেরতের মতো। আমি বললুম, দাঁড়া, আমি বিলেত থেকে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে ফিরি। ব্যাটাকে Reformatoryতে পাঠাব। হা হা হা। আপনি স্মোক করেন না? ধন্য। আমি, মশাই, ঐ ধোপার ছেলের মুখে সিগরেট দেখে অবধি স্মোক করা ছেড়ে দিয়েছি।"

উজ্জয়িনীর পাটনা প্রয়াণের সংবাদ দিয়ে বিভূতি বলল, "আশ্চর্য হবেন, মশাই, শুনে। হাসতে হাসতে শ্বশুরবাড়ী গেল। আর দেখতেন যদি গুপ্ত সাহেবের চেহারা। কী বলে—ইসের মতো। না, মনে পড়ছে না কিসের মতো।"

হেসে উঠে বিভূতি বক্তব্যের জের টেনে চলল। "আর সেই ছোঁড়াটা, যে বলত আই য়্যাম এ ওয়াশারম্যান্, সার্, সেও গেছল স্টেশনে। তার যা কান্না! কিন্তু কাঁদবার সময়ও চাল দিতে ছাড়ে না। বলে, ফরগেট মি-নট্। খুকী বাবা, ফরগেট মি নট্।"

সুধী বলল, "সে এখন কী করে?"

বিভূতি বলল, "যার যা স্বভাব। তেমনি টেরি কাটে, সিগরেট খায়, গাধাগুলোকে পিটাতে পিটাতে মাঠ থেকে বাড়ী নিয়ে যায়। Reformatoryতে না গেলে শোধরাবে না। ইংরেজী যা শিখেছিল বেবাক ভুল বকছে। মাই নেম ইস্ ওয়াশারম্যান, সার্। কখনো কখনো বলে, ওয়াশারওয়্যান, সার্। হা হা হা। কে নাকি তাকে শিখিয়ে দিয়েছে, ম্যান নয়, ওম্যান। মধ্যে মধ্যে বলে, আই য়্যাম এ ডাঙ্কি—আমার একটা গাধা আছে।"

সুধী এই সরল মানুষটির প্রাণ-খোলা কথাবার্তায় বাধা দিতে কুণ্ঠা বোধ করছিল। কিন্তু যা জানতে চাচ্ছিল তা শুনতে পাচ্ছিল না। উজ্জয়িনী কেমন আছে? খুব ভজন পূজন করছে নাকি? পার্থিব ব্যাপারে একান্ত উদাসীন? চিঠির উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করে না? কিন্তু বিভূতি ওদিক দিয়ে যায়ই না। ধোপার ছেলের গল্প শেষ করে সে তার নিজের ছেলের গল্প শুরু করেছে। "বড়টির বয়স সবে তিন বছর। এরি মধ্যে ইংরেজী বলতে পারে, মশাই। দেখবেন ও বড় হলে আই-সি-এস্ হবেই। ছোটটা শয়তান। কথা বলতে পারে না। কিন্তু ফোঁস ফোঁস করে তেড়ে আসে, হাতে ছোবল মারে। বড় হলে স্যাণ্ডহার্স্টে ঢুকে সৈনিক হবে, দেখবেন। আমি এসেছি, সমস্ত খোঁজ খবর না নিয়ে ফিরছিনে।"

এমন সময় বিভূতির একটি জাহাজী বন্ধু এসে সুধীকে অব্যাহতি দিল। সুধী বলল, "আজ তবে উঠি, বিভূতিবাবু। আমার ঠিকানা তো জানেন, কখনো দরকার হলে ফোন করবেন। সে সরকার রইল, কোনো অসুবিধা হবে না। নমস্কার। গুড বাই মিস্টার—"

"ভোজরে!" (মারাঠা যুবক।)

উজ্জয়িনীকে সুধী সেই রাত্রেই চিঠি লিখল। বাদল যে হারিয়ে গেছে সে কথা প্রকাশ

করল না, কিন্তু মিথ্যা কুশলসংবাদও দিল না। চিঠিতে থাকল শুধু উজ্জয়িনীরই কথা। সে তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অংশ সুধীকে কেন দেয় না। তার আভ্যন্তরীণ বিকাশ সম্বন্ধে সুধী সশ্রদ্ধ ও সুকৌতূহলী। তার বাবার সঙ্গে তার মতবিরোধ যেন তাকে নির্মম ও রূঢ় করে না, যুক্তি-মাধুর্যের দ্বারা উক্ত বিরোধ ভঞ্জন করা বিধেয়। সুধী জানতে পেরেছে তিনি অতি মর্মাহতভাবে দিন যাপন করছেন। মতবিরোধ সত্ত্বেও বন্ধুতা সম্ভব তার সাক্ষী সুধী ও বাদল। অল্পবয়স্কদের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটলে অধিকবয়স্করা সেটাকে অকৃতজ্ঞতা জ্ঞান করে ভগ্ন-হৃদয় হন। অতএব মত ভিন্ন হলেও তার সঙ্গে বিনয়, ক্ষমা ও শ্রদ্ধা সংযুক্ত করতে হয়। মতবিরোধ পথবিরোধ উপলব্ধিবিরোধ সত্য। সত্যকে প্রিয় করা আমাদের কর্তব্য। নতুবা চরম অকল্যাণ যে প্রিয়-বিরোধ তাই ঘটে।

৮

ব্যাঙ্কের ঠিকানায় বাদলকে চিঠি লেখবার তিন দিন পরে সুধীর অবর্তমানে সুজেৎ টেলিফোন ধরল। বাদল বলল, "কোনখান থেকে কথা বলছি জিজ্ঞাসা করো না, প্রত্যেক বুধবারে টাইমস কাগজের Personal স্তম্ভ খুঁজলে আমার খবর পাবে।"

সুধী বুধবার অবধি উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করল। বাদলের এক লাইন বিজ্ঞাপন :
"BADAL TO SUDHIDA.--ALL'S WELL."

দেশে চিঠি লেখবার সময় ঐটুকু খবর সুধীর কাজে লাগল। বাদল কোথায় আছে সেটা সুধী চেপে গেল। কেমন আছে সেইটে জানাল। বাদল যে কেন তাকে চিঠি লিখে জবাব দিল না এর কারণ অনুধাবন করতে সুধীর বিলম্ব হল না, পাছে চিঠির পোস্ট মার্ক থেকে তার ঠিকানা ফাঁস হয়ে যায়। কিন্তু কেন এ সতর্কতা? ছেলেমানুষী—বাদলটা চিরকাল ছেলেমানুষ। সুধীর সঙ্গে এই বয়সে লুকোচুরি খেলতে চায়। সুধীর আপত্তি নেই। কিন্তু দেশের লোক ঐ তামাশার মর্ম বুঝবে না। উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করবে, কোথায় আছে সে! তার সঙ্গে দেখাশুনা হয় কি না! দেখা হলে কী বলে! তার পডাশুনা কেমন চলছে ইত্যাদি। মহিম, যোগানন্দ, উজ্জয়িনী তিন জন মানুষ তার দিকে চোখ ফিরিয়ে রয়েছেন, সুধীর চিঠির দূরবীন দিয়ে তার গতিবিধি নিরীক্ষণ করছেন, সুধীর চিঠির যা কিছু মূল্য তা বাদলের খাতিরে। "বাদল ভালো আছে"—কেবলমাত্র এইটুকু শুনে কেউ সন্তুষ্ট হবেন না। মহিমচন্দ্র জানতে চাইবেন কোন কোন সাহেবের সঙ্গে তার আলাপ হল, যোগানন্দ জানতে চাইবেন তার চিন্তার হাওয়া কোন দিকে বইছে, উজ্জয়িনী জানতে চাইবে সে উজ্জয়িনী সম্বন্ধে নতুন কিছু বলে কিনা। বাদল তাঁদের সম্বন্ধে যেমন উদাসীন তাঁরাও বাদল সম্বন্ধে তেমনি সপ্রতীক্ষ।

যা হোক বাদল যখন অজ্ঞাতবাস করতে দৃঢ়সংকল্প তখন সুধী তার সহায়তা করতে

বন্ধুতার খাতিরে বাধ্য। তার খোঁজ করে তার ইচ্ছার প্রতিকূলতা করা সুধীর পক্ষে পীড়াকর। সুধী বাদলকে লিখল, "আচ্ছা। কেবল সপ্তাহে সপ্তাহে কুশলবার্তা চাই।" বাদল এর উত্তরে বিজ্ঞাপন দিল, "SUDHIDA—I AM ALL RIGHT."

সুধী কিংবা বাদল কারুর খেয়াল ছিল না যে টাইম্‌সের বিজ্ঞাপন অন্য কারুর চোখে পড়তে পারে। তারা কেমন করে জানবে যে যোগানন্দ ইতিমধ্যে Quettaয় বদলি হয়েছেন ও সেখানকার ক্লাবে টাইম্‌স্ কাগজের দৈনিক সংস্করণ রে থাকে? কিন্তু সে কথা যথাসময়ে।

বাদলের যাতে ধ্যানভঙ্গ না হয় তাই সুধীর লক্ষ্য। বাদলের আত্মীয়দেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও নিরুৎসুক রাখবার ভার সুধী নিল। লিখল, "বাদল ভালোই আছে। চোখে দেখা না পেলেও লেখায় দেখা পাই।"

এদিকে দে সরকার বিজ্ঞাপনটা পড়ে বিভূতিকে দেখিয়েছে। দুজনেই সুধীকে চেপে ধরল। দে সরকার বলল, "Ariel to Miranda : Take··· । কী হে ব্যাপার কী? খবরের কাগজে তো তারাই বিজ্ঞাপন দেয় জানি যারা ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে কিংবা যাদের চিঠি পরের হাতে পড়বার সম্ভাবনা আছে। যথা অল্পবয়সী আইবুড় মেয়েকে লেখা চিঠি তার মায়ের হাতে।"

বিভূতি বলল, "আই সে চাকরবাটী, হোয়াট্‌স্ দ' ম্যাটার?" এই কদিনে বিভূতি দে সরকারের নকল করতে করতে দারুণ স্মার্ট হয়েছে। ধার করে ম্যানার্স পেয়েছে, ধার করে পেটেন্ট লেদারের জুতো থেকে আরম্ভ করে বোলার হ্যাট পর্যন্ত কিনেছে। নিজের এক ডজন ফোটোগ্রাফ তুলিয়ে দেশে রপ্তানি করতে যাচ্ছে।

সুধী খুলে বলল না। বলল, "ওর সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে সপ্তাহে একবার কুশল সংবাদ জানাবে।"

দে সরকার মাথা হেলিয়ে ভঙ্গী বিস্তার করে বলল, "বুঝেছি। পোস্ট কার্ড লিখলে এক পেনি খরচ হয়, ওটা আমাদের মতো গরীব ছাত্রদের জন্য। টাকা আছে সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো চাই তো।"

বিভূতি বলল, "হায়! আমার যদি টাকা থাকত আমি দিনে একবার cable করতুম।"

দে সরকার তার মাথায় চাঁটি মেরে বলল, "বল ও টাকা যদি আমার হত। ও টাকার উপর বাদলের কী অধিকার আছে? কমিউনিস্‌ম্ চাই।"

বিভূতি অমনি বলল, "কমিউনিস্‌ম্ চাই। গিভ্ মি কমিউনিস্‌ম্ অর গিভ্ মি ডেথ্।"

দে সরকার স্বর নামিয়ে বলল, "চুপ চুপ চুপ। ও ঘরে স্পাই আছে। ঐ যে

আহ্লাদী মেয়েটা—"

বিভূতি তোৎলাতে তোৎলাতে বসে পড়ল। তার কালো মুখ কালি হয়ে গেল। আহ্লাদীর সঙ্গে যে সে আজ সিনেমায় যাবে ঠিক হয়ে গেছে।

মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইটও জিজ্ঞাসা করছিলেন, "সুধী, তোমার বন্ধুর খোঁজ পেলে?"

"না, আণ্ট এলেনর। সে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, ভালো আছে। কিন্তু কোথায় আছে, কী ভাবছে, কবে দেখা হবে, কেন আত্মগোপন করেছে—কিছু জানায় নি।"

আণ্ট এলেনর কিছুমাত্র সংকোচ না বোধ করে বললেন, "এই ব্যাপারের পিছনে কোনো গার্ল নেই তো?"

সুধী মৃদু হেসে বলল, "না। আমার বন্ধুকে আমি ভালো করেই চিনি।"

বাদলের জীবনকাহিনী, তার সাধনমার্গ, তার অসাধারণ মনীষা ও একাগ্র সংকল্প বক্তা ও শ্রোত্রী উভয়কে প্রীতি দিল। আণ্ট এলেনর আবেগের সঙ্গে বললেন, "আমি যদি তোমাদের দুজনের মা হয়ে থাকতুম।" তাঁর বাগ্‌দানের আংটি এক মুহূর্তের জন্যে ঝকমক করে উঠল।

বাদলের গল্প শেষ করে সুধী পাড়ল উজ্জয়িনীর গল্প। সে উজ্জয়িনীকে চাক্ষুষ না চিনলেও আন্তরিক চিনত। প্রতিদিন উজ্জয়িনীর কথা চিন্তা করতে করতে তার চিঠিপত্রের কাঠামোকে ঘিরে সুধী নির্মাণ করেছিল একটি সজীব প্রতিমূর্তি। লোকে তার যে পরিচয় পেয়েছে সেই তার একমাত্র পরিচয় না হলেও সেও তার সত্য পরিচয়। তাতে যদি কিছু বাড়াবাড়ি থাকে তবে সেটুকু সুধীর নিজের স্বভাব কিংবা বয়স-থেকে পক্ক। সাক্ষাৎকার সেই বাহুল্যের প্রতিষেধক কিংবা প্রতিকার নয়।

উজ্জয়িনীর সমস্যা আণ্ট এলেনরকে বিচলিত করল। তিনি অনেকক্ষণ নীরব থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "Men must work and women must weep."

৯

মে মাস এল। মে মাসের মায়ামন্ত্র সুধীকে সব ভোলাল। আকাশ মেঘবর্জিত অনাবৃত গাঢ় নীল। দৃষ্টি সেই গভীর সরোবরে ডুব দিয়ে তলিয়ে গিয়ে আরাম পায়, সাঁতার দিয়ে কূল পায় না, স্নান করে উঠে যাই দেখে তাই সুন্দর। ঘাসের সবুজ মখমলকে পটভূমি করে ফুলের আলপনা আঁকা। মরি মরি কত নক্‌শা, কত রঙ, কত আকার, কত প্রকার! টুলিপ ডাফোডিল প্রিমরোজ ব্লুবেল হায়াসিন্থ সুইট-পী স্ন্যাপড্রাগন ড্যাণ্ডিলায়ন মারগেরিট ডেসি—একশ নাম, হাজার নাম, একশ রূপ, হাজার রূপ। কেউ আপনা

হতেই গজায়, কারুর আবাদ করতে হয়। কিন্তু সকলেই অমূল্য, প্রত্যেকেই বিশিষ্ট। সুধী বিস্মিত হয়ে ভাবে, আকাশের রামধনু কি টুকরা টুকরা হয়ে মিহি গুঁড়া হয়ে বাতাসে উড়ে এসে মাটিতে ছড়িয়ে গেল? প্রতিদিন সূর্যের সাতরঙা আলো বৃষ্টির জলের মতো মৃত্তিকা ভেদ করে পাতালে হারিয়ে যাচ্ছিল, অবশেষে উৎসের মতো উত্থিত হয়ে ভূমিপটে চারিয়ে গেল। আলোর রঙ ভেঙে ও জুড়ে ফুলের রঙ; আলোর রূপের আদল আলোর ছেলে ফুলের মুখে, ফুলের স্বভাবে আলোর মৌন চঞ্চল স্বভাব।

গরম বোধ হয়, নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে বলে এদানীং সুধী টিউবে চড়া ছেড়ে দিয়েছে। সময় যত লাগে লাগুক বাস্‌-এর মাথায় বসে দু ধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে আসা যাওয়া করে। দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যায়, দীর্ঘকাল ধ্যানমগ্ন থাকে। নানা দিগ্‌দেশাগত পাখীর সাময়িক নীড় নির্মাণের ব্যস্ততা তাকে আমোদ দেয়। তাদের একো জনের একো রকম রঙ তাকে মুগ্ধ করে। তাদের বিচিত্র কণ্ঠস্বর শুনে সে আশ্চর্য হয়ে ভাবে, একটি অদৃশ্য অর্গ্যানের সুর কি এগুলি, কার আঙুলের স্পর্শ এদের খেলিয়ে বেড়াচ্ছে, সন্ধ্যার আগে থামতে দেবে না! নাইটিঙ্গেলের গান শোনবার জন্যে সুধী লণ্ডন ছেড়ে দিন কয়েকের জন্যে পাড়াগাঁয়ে যাবে স্থির করেছে। ওরা নিস্তব্ধ রাত্রি ও নির্জন পল্লী না হলে গান করে না। লার্কের ও থ্রাসের গান শুনবে বলে সুধী ভোরে ওঠে। হ্যাম্পস্টেড হীথ কিংবা কেনউড্‌-এ গেলে তার মনে হয় পাখীদের দেশে এসে পৌঁছেছে। মানুষের দিকে ফিরে তাকাবার অবসর নেই তাদের, তারা গলা ছেড়ে তান ধরেছে, লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে, কখনো ঘাসের উপর পায়চারি করছে, কখনো গাছের আগডালে দুই পা জোড়া অবস্থায় চুপটি করে বসে নিচের দিকে তাকাচ্ছে আর মাথা নাড়ছে। সুধী যতক্ষণ তাদের সঙ্গ পাচ্ছে ততক্ষণ যেন কী একটা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করল কিংবা নূতন রাজ্যে পদার্পণ করল এইরূপ বোধ করে উৎফুল্ল হয়।

শাখায় শাখায় অগুনতি মুকুল, চেরীর শাখায় পেয়ারের শাখায় যে-গাছের শাখায়। শীতের দিনের শাদা বরফের কুচি যেন গলে যাবার সুযোগ পায় নি, দানা বেঁধে বোঁটায় বোঁটায় আটকে রয়েছে। ওক পাইন ফার বীচ বার্চ ইত্যাদি বনস্পতির সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয় তখন সুধী যুগপৎ আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। মানুষের চেয়ে এদের আয়ু, এদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ, এদের প্রাণ ও এদের ধৈর্য কত বেশী! আহারের জন্যে ছুটাছুটি করে চোখে আঁধার দেখাটা কিছু নয়, পরকে মেরে নিজের পথ্য করা তো বর্বরতা। দুশ্চিন্তায় বিমর্ষ উদ্বেগে আন্দোলিত সুখে শফরীর মতো ফরফরায়িত, অধিকাংশ মানুষের জীবন তো এই। এই সমস্ত বনস্পতি তাদের তুলনায় সব দিক দিয়ে বৃহৎ। সুধীর মনে হয় এভল্যুশন থিওরীর দ্বারা জীবসৃষ্টির কিনারা হয় না। সুধী ভাবে

মানুষ বানর বিড়াল বাঘ কোকিল কাক তাল তমাল সকলেই সৃষ্টির আদিতে ছিল, আদি থেকে আছে, অবসান পর্যন্ত থাকবে—অবশ্য আদি ও অবসান কেবল কথার কথা, প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকর্তার মতো সৃষ্টিও অনাদ্যন্ত। মানুষের রূপের এভল্যুশন সুধী মানে, মানুষ যুগে যুগে বিভিন্নরূপী। কিন্তু অ-মানুষ বা অবমানুষ থেকে মানুষ ? অসম্ভব।

মে মাস এল। সুধী তার পড়াশুনা কমিয়ে দিল। এমন দিনে ঘরে বন্ধ থাকা মূর্খতা। সুধী মিউজিয়াম থেকে সকাল সকাল ফেরে, সকাল সকাল খেয়ে মার্সেলকে নিয়ে মাঠে বেড়াতে বেরয়। তার বাসার অনতিদূরে মস্ত খোলা মাঠ। মাঠ বেয়ে দুজনে অনেক দূব হাঁটে। যেদিন সুধী একলা বেরয় সেদিন হাঁটতে হাঁটতে গোল্ডার্স গ্রীনের উত্তরাংশ ছাড়িয়ে হাইগেট অবধি চলে যায়। ফেরবার সময় বাস-এ করে হ্যাম্পস্টেড হীথ চিরে স্প্যানিয়ার্ডস্ রোড বেয়ে গোল্ডার্স গ্রীন স্টেশনে বাস বদল করে বাসায় ফিরে আসে। এক একটি সম্পূর্ণ সন্ধ্যা যাপন করে তার যে আনন্দ ও মুক্তি, তাকে বাদল কিংবা উজ্জয়িনীব হাতে চিঠির পাতায় পৌঁছে দিতে পারলে তাকে দ্বিগুণ উপভোগ করত, কিন্তু একজন নিরুদ্দেশ, অপরজন নীরব। হাতের কাছে আছে মার্সেল। ভাবনার ভাগ তাকে দেওয়া চলে না, সেদিক থেকে তার বয়স অল্প, কিন্তু সূর্যাস্তকালীন আভা যখন ঘন সবুজ ঘাসের উপর শেষবার তুলি বুলিয়ে যায় তখন সুধীর চিত্তে যে ভাব জাগে মার্সেলকে সহজেই সেই ভাবের ভাগী করা যায়। উদার উন্মুক্ত আকাশের নিঃসীম নীলিমা উভয়েব দৃষ্টিকে হাতছানি দেয় ; উভয়ের বাহু হঠাৎ ডানা হয়ে ওঠবার তাড়না অনুভব করে, উড়ে যাবার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস ও সেই প্রয়াসের নিশ্চিত নিষ্ফলতা উভয়ের অন্তরকে অবমর্দিত করতে থাকে। মার্সেল মুখ ফুটে বলে, "দাদা, ঐ দেখ, ওরা কেমন উড়ে যাচ্ছে।" সুধী বলে, "তোর বুঝি উড়তে ইচ্ছা করছে রে, মার্সেল ?" মার্সেল উত্তর দেয় না, সোয়ালো বলাকার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

বৃষ্টি কদাচ হয়। ইংলণ্ডের বৃষ্টির যা স্বভাব, হুড়মুড় করে হাজির হয় বিনা খবরেই। মাঠের মধ্যখানে বৃষ্টি নামে। সুধী ও মার্সেল দৌড়াদৌড়ি করে ভিজতে ভিজতে গাছতলায় আশ্রয় নেয়। একদিন এক পথিক মোটরকারে দয়া করে তাদের বাড়ী পৌঁছে দিয়েছিল। তবু তাদের শিক্ষা হয় না, তারা ছাতা না নিয়ে বেরয়। যখন বেরয় তখন তাদের কি কোনো খেয়াল থাকে ? শুনতে পেয়েছে কুকু-পাখীর ডাক। মার্সেল বায়না ধরেছে, "দাদা, চল আমরা কুকু দেখতে যাই।" সুধী বলে, "আচ্ছা। আগে তোর খাওয়া শেষ হোক।" মার্সেলকে একবার নিয়ে চললে ফিরিয়ে আনা শক্ত। সে কুকু দেখতে হয়তো দেখল কাদের কুকুর কিংবা দেখল তার চেয়ে বয়সে কিছু বড় কতকগুলি ছেলে একটা খালের মধ্যে নেমে বাঁধ দেবার উদ্যোগ করছে, অমনি তার চোখ আটকে গেল, চোখের ব্রেক কষা হলে পায়ের গতিরোধ।

যে মাসের মায়াজালে বাঁধা পড়ে আণ্ট এলেনর ও ডক্টর মেলবোর্ন-হোয়াইটকেও সুধী ভুলল। তা বলে তাঁরা তাকে ভুললেন না। কিন্তু তাকে ক্রমাগত অন্যমনস্ক লক্ষ করে ঘন ঘন স্মরণ করলেন না। আর্থারকে এলেনর বলছিলেন, "ওর বন্ধুটি নিরুদ্দেশ হওয়া অবধি ওর মনটা খারাপ হয়ে গেছে?" এলেনরকে আর্থার বলছিলেন, "তা হলে ওকে ও দুঃখ ভোলবার নিরিবিলি দাও।" সুধীর কাছে ওঁরা কোনোদিন বাদলের কথা পাড়েন না। ওকে পরিচিত করে দেবার জন্যে পার্টিতে নিয়ে যাওয়া কিংবা পার্টি দেওয়া আণ্ট এলেনর থামিয়ে দিলেন। তবে প্রতি রবিবারে তাকে চায়ে ডাকেন। তখন তাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্যে তাঁর মন উস্‌খুস্‌ করে, কিন্তু জিভ জড়িয়ে যায়। তিনি আশা করেন হয়তো সুধী নিজেই কথাটা পাড়বে। কিন্তু সুধী সম্প্রতি নক্ষত্রবীক্ষণে বিভোর আছে। সন্ধ্যা হলে কোন তারা কোন দিকে উঠবে সেই তার আপরাহ্নিক ধ্যান। ইংলণ্ডের নৈশ আকাশ এতকাল প্রায়ই মেঘগুণ্ঠিত থাকত। সেই রহস্যময়ী আবরণ উন্মোচন করেছে। তার চোখের তারার সঙ্গে নিজের চোখের তারা মিলিয়ে সুধী কী যে বিস্ময় বোধ করছে, চিরন্তনকে নূতন করে চিনতে পারবার বিস্ময়। দেশ পরের হতে পারে, কিন্তু আকাশ তো সেই আকাশ, সুধীর আশৈশবের তারকাচিহ্নিত নভোমণ্ডল। সে যখন পুরাতন নক্ষত্র-বন্ধুদের পরিচয় নিতে নিতে আনন্দে আপ্লুত হয় তখন তার মনে থাকে না যে সে ইংলণ্ডের মাটিতে বসে আছে।

নক্ষত্র-বন্ধুরা তাকে মনে করিয়ে দেয়, সে গণনাকল্পনাতীত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসী, ভারতবর্ষ তার ঘর, পৃথিবী তার পাড়া। মন তার কাল-পারাবারের পার পায় না। এক একটি নক্ষত্রের আয়ু যদি অমেয় হয়, যদি এক একটি রশ্মির ইতিহাস মানবজাতির ইতিহাসকে লজ্জা দেয়, তবে আমাদের যাহা জীবন তাঁহা মৃত্যু, বাহান্ন আর তিপ্পান্ন। এই জীবন নিয়ে এত ভাবনা! সুধী মাঠের হাওয়া প্রাণ ভরে সেবন করে, ঘ্রাণ ভরে শোষণ করে। আকাশের আলো অন্ধকার দুই চক্ষু ভরে লুট করে নেয়। সে আছে বিশ্বের মধ্যে, বিশ্ব আসুক তার মধ্যে, বিশ্ব হোক তার অধিবাসী। চিরন্তনকে সে স্বীকার করলে চিরন্তন করবে তাকে স্বীকার।

এতদিন রাত্রের মেঘাস্তরণ প্রায়ই সুধীর দৃষ্টিকে ঠুলি পরিয়ে রাখত। দিনের ধূমগুণ্ঠিত মুখ দেখতে পারত না বলে সুধী গ্রন্থ খুলে মনোজগতের রূপ দেখত। যে মাস এসেছে, তাপহীন রৌদ্র দীর্ঘদিনব্যাপী, বায়ু পুষ্পগন্ধমধুর বিহঙ্গগীতিমুখর, রাত্রি শান্ত গম্ভীর দূরাতিদূর। সুধী আজকাল বাগানের দোলনায় ঘুমায়, দুটো গাছের শাখায় দোলনা খাটিয়ে।

১০

দেশ থেকে যেদিন চিঠি আসে, অর্থাৎ শনিবারের রাত্রে, সুধী পিয়নের পদশব্দ গোণে। আশ্চর্যের বিষয় কয়েক সপ্তাহ থেকে বাদলের বাবার চিঠি বন্ধ। বাদলের শ্বশুরের চিঠি তো মার্চের পরে আসেনি, যদিও সুধী প্রত্যেক বার ভেবেছে এইবার আসবে। চিঠি আসুক বা না আসুক চিঠির জবাব দিতে সুধীর কসুর হয়নি, কিন্তু এইবার হল। বাদলের খবর তাঁরা জানতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন, এতদিনে বোধ করি বাদলের বিদায়স্মৃতি তাঁদের মনে ম্লান হয়ে এসেছে কিংবা ম্লান হয়েছে বহুদিন, শুধু অভ্যাসের জের চলছিল। সুধীর দিক থেকেও ওটা ছিল কতক কর্তব্যবোধ কতক অভ্যাস। এক সপ্তাহ কাজে ফাঁকি দিয়ে সুধী দেখল এই ভালো। চিঠি পেলে চিঠির উত্তর লিখব। ওঁরা যে আমার চিঠির প্রত্যাশা করছেন তার প্রমাণ তো আগে পাই।

দিন কয়েক বাদে সুধীর নামে এল এক cable, যোগানন্দ পাঠিয়েছেন কোয়েটা থেকে। “Where is Badal ? Why Times advertisement ?”

সুধী এর কী জবাব দেবে চিন্তা করে স্থির করতে পারল না। অথচ টেলিগ্রামের উত্তর টেলিগ্রামে না দিলে যোগানন্দের প্রতীক্ষা পীড়াবহ হবে। বাদলটা যে মানুষকে এমন বিপদে ফেলবে কে জানত। সুধী বাদলের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাদের ঠিকানা জানত সবাইকে ফোন করল, বাড়ীতে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসা করল। মিসেস উইল্‌স্ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে সুধীকে প্রার্থনা করলেন বাদলের সংবাদ পেলে জানাতে। কলিন্স বলল, “ওর জন্যে একখানা নতুন বই আনিয়ে রেখেছি, ও এসে নিয়ে যায় না কেন তাই দিন কয়েক থেকে ভাবছি।” মিলফোর্ড বললেন, “ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে যাবার পর থেকে ওর খবর রাখিনি। ওকে আমার আফসোস জানাবেন।” মিথিলেশকুমারী বললেন, “কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটেনি তো ?”

অগত্যা সুধী যোগানন্দের টেলিগ্রামখানা একখানা খামে ভর্তি করে বাদলের ব্যাঙ্কের ঠিকানায় রওনা করে দিল। এবং যোগানন্দকে তার করল, “Badal’s private address unknown. Making enquiries.”

ওর চেয়ে ভালো কিছু বলা যায় না। যাই বলুক সন্দেহ তাঁর মনে জন্মাবেই। সন্দেহ জন্মাক ক্ষতি নেই, আশঙ্কা দূর হলে হল। আণ্ট এলেনরের মতো যোগানন্দও বোধ হয় ভাববেন নারীঘটিত কোনো রহস্য আছে। কিন্তু বিদেশে ছেলে পাঠিয়ে কোন গুরুজন ও-বিষয়ে নিঃসংশয়। কিন্তু এমন আশঙ্কা মনে স্থান দেবেন না যে বাদল অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

যোগানন্দ টাইম্‌স্ পড়ে চুপ করে বসে থাকেন নি, নিশ্চয় মহিমচন্দ্রকে তার করেছেন কিংবা চিঠি লিখেছেন। উজ্জয়িনী এ ব্যাপারে জানতে পেরেছে। সুধীর চিঠির

সঙ্গে টাইম্‌সের বিজ্ঞাপন মিলিয়ে পড়লে তাঁরা চিঠিকে অবিশ্বাস করবেন ও বিজ্ঞাপনের নানা অর্থ করবেন। দিন দুই তিন পরে তাঁদের cable উপস্থিত হবে। ততদিনে যদি বাদল যোগানন্দের প্রশ্নের উত্তর দেয় তবে সুধী রক্ষা পায়, নতুবা কৈফিয়ৎ দিতে হবে সুধীকেই।

বাদল যে লণ্ডনেই আছে এ সম্বন্ধে সুধীর সন্দেহ ছিল না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ক'দিন লুকোচুরি খেলতে পারবে, দেখা না করে, কথা না বলে, তর্কে না জিতে ঘরে খিল দিয়ে থাকবে ? পাগলা, কী একটা খেয়াল চেপেছে মাথায়, তার দুর্ভোগ গিয়ে পৌঁছচ্ছে বেলুচিস্থানে ও বিহারে। একজন মানুষ ইচ্ছা করলে কজন মানুষকে কষ্ট দিতে পারে এই বুঝি বাদল পরীক্ষা করছে ?

বাদল বিজ্ঞাপন দিল, “BADAL TO CAPTAIN GUPTA.—CONCENTRATING ON GREAT THOUGHTS IN SECRET RETREAT.”

সুধী বাদলকে মনে মনে বলল, “সারাজীবন তো নিভৃত চিন্তা করে আসছিস, কেই বা তোকে বিক্ষিপ্ত করেছে ! বাড়ীতে তোর পড়ার ঘর গিরিগুহার মতো বিজন ছিল। এদেশে এসে প্রথমটা হৈ হৈ করে বেড়ালি, এখন প্রতিক্রিয়াবশত কোন গৃহকক্ষে বসে আগুন পোহাচ্ছিস, এই যে মাসে !”

বাদলকে সুধী চিনত। ওর যা জেদ তা শেষ পর্যন্ত বজায় রাখবে। ওর যা খেয়াল তা আপনা থেকে না ছুটলে পরের পরামর্শে ফুলতে থাকবে—বাঁধ দিলে পাগলাঝোরার জলের মতো। দিন পনের পরে হয়তো টেলিফোন ঝন্ ঝন্ করে উঠবে কিংবা দরজার বেল ক্রিং ক্রিং ধ্বনি করবে, বাদল ঘরে ঢুকে পায়চারি করতে করতে পরিক্রমা করতে করতে বলবে, "কী বলছিলুম ? সুধীদা, কী বলছিলুম ?"

সেই বাদল। দু'মাস তার সঙ্গে দেখা হয়নি। এক শহরে থেকেও তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার সুযোগ নেই, চিঠি লিখলে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় দু'লাইন। দুঃখের কথা কাকে জানাবে ! সুধী স্বভাবত চাপা। মনের দুঃখ মনে চাপল। আকাশের দিকে চেয়ে ভুলে গেল। দিনের পর দিন বর্ষণবিহীন, নীলোজ্জ্বল, দিগন্তপ্রসারী। দৃষ্টি যত গভীরে নামতে পারে তত গভীর। সুধী কখনো আশা করতে পারেনি, ভাবতে পারেনি, এমন আশ্চর্য ঋতুপরিবর্তন ঘটবে। ঋতু আসে আর যায় কিন্তু টিপ টিপ বৃষ্টির বিরাম হয় না। এই তো লোকে বলত ও সুধী জানত।

দিনগুলি এত রঙিন এত সুগন্ধি এত উজ্জ্বল এত পূর্ণ। সুধী আহারকাল ভুলে যায়। কয়েকবার অপদস্থ হবার পর মাদামকে বলল, “আমার জন্যে কিছু তৈরি রেখো না, আমি যখন ফিরব তখন নিজে তৈরি করে নেব।” রুটি মাখনের স্যাণ্ডউইচ নিয়ে কোনো কোনো দিন বেরয়, যতক্ষণ ও যতদূর পারে হাঁটে, মাঠে কিংবা হ্রদ বা নদীর ধারে

শরীরকে বিশ্রাম ও চক্ষুকে স্বাধীনতা দেয়, তার পরে বাস কিংবা ট্রেন ধরে বাসায় ফেরে। মার্সেলের কাছে গল্প করে, "আজ এতটুকুন একটি পাখী দেখে এসেছি, মার্সেল। ওকে বুঝি Tit বলে।" মার্সেল ঠোঁট ফুলিয়ে চুপ করে থাকে। সুধী তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি বলে তার অভিমান হয়েছে। সুজেৎ তার গালে ঠোনা মেরে মানভঞ্জনের চেষ্টা করে। মার্সেল জানোয়ারের মতো দাঁত খিঁচিয়ে নখ দিয়ে সুজেতের জামা ছিঁড়ে দেয়, তবু কথাটি বলে না। তখন সুধী দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নিবারণ করে। আণ্ট এলেনর খবর পেলে তাকে নোবেল পীস্ প্রাইজ পাইয়ে দিতেন। কিন্তু মাদাম তার অদ্ভুত ইংরেজীতে বলে, "থ্যাঙ্ক্ ইউ, মিস্তার সাক্রাবার্তী।"

১১

ঠিকানা লেখায় ভুলে চিঠিখানা লণ্ডনের দু'তিনটে পাড়া ঘুরে এসেছে। বুধবারে সুধীর হস্তগত হল। সুধী না খুলেই চিনতে পারল উজ্জয়িনীর চিঠি। কী লিখেছে বেচারি উজ্জয়িনী?

লিখেছে,

"সুধীদাদা,

আপনাকে কতকাল লিখিনি। লিখে কী ফল হত বলুন। আপনারা তো কিছুতেই আমাকে বুঝবেন না। আমার প্রাণ কী যে চায় আমি নিজেই বা তার কতটুকু বুঝি! তবু এক কথায় বলি আমি আমার অবস্থাকে লঙ্ঘন করে অতীতকে অতিক্রম করে দেহমনকে পিছনে ফেলে কোথাও এক জায়গায় পালিয়ে যেতে চাই, নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে চাই। ভগবানের সঙ্গে মিশে যাব, তাঁর মধ্যে হারিয়ে যাব, আমার সত্তা থাকবে না, আমার চিহ্ন থাকবে না।

পাগলের প্রলাপ। না?"

এই পর্যন্ত পড়ে সুধীর চোখে জল আসে আর কী। দুই বিভিন্ন স্থানে দুটি বিভিন্ন মানুষ, মাঝে সাত হাজার মাইল ব্যবধান—বাদল ও উজ্জয়িনী একই সময়ে একই কথাই ভাবছিল। ওরা সত্যিকারের স্বামী স্ত্রী। দুজনেই চাইছিল নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে—বাদল তো হয়ে গেলই, এখন উজ্জয়িনী কী করে দেখা যাক।

"পাগলের প্রলাপ। না? আমারও তাই মনে হয়। কাজেই আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা মৌলিক নয়। কিন্তু পাগল মাত্রেই অশ্রদ্ধেয় নয়। এবং চেষ্টা করলে পাগলের প্রলাপেরও অর্থ-বোধ হয়। তারপর পাগলামির দ্বারা এমন অনেক কাজ হাসিল করা যায় ভদ্রতার দ্বারা যা অসাধ্য। এই ধরুন মিসেস স্যামুয়েল্সের বিদায়। মিসেস স্যামুয়েল্সের পরিচয় দিই। মায়ের বন্ধু, মিশনারী, বিধবা। আমাকে সামাজিকতা শিক্ষা দিতে মায়ের

দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন। ভালো মানুষ, আমার প্রতি তাঁর স্নেহ একটা ভান নয়। কিন্তু আমার সাধনার বৈরীকে আমি প্রশ্রয় দেব কেন ? যা আমার ভালো লাগে না তা আমার ভালোই লাগে না। এই চূড়ান্ত। আমি তর্ক না করে এই কথাটা প্রলাপের মতো করে বুঝিয়ে দিলুম। মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ বুদ্ধিমতী। আমার সংসারে আমি মালিক, আমার মা নন। তবে যদি তিনি আমার শাশুড়ীর শূন্য স্থান পূর্ণ করতেন তবে সে হত ভয়ানক ভাবনার কথা। আমার শ্বশুর আকারে ইঙ্গিতে অমন প্রস্তাব করেননি তা নয়। কিন্তু মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ একদিন আমাকে স্পষ্টই বলছিলেন, 'বর্ণভেদ বিধাতার হাতে, ভিন্নবর্ণাকে আমি অনাদর করিনে। কিন্তু ধর্মভেদ ? মানুষের কেবল একটিমাত্র ত্রাণকর্তা, সুতরাং একটি ধর্ম। God so loved the world that He gave His only Son. '

"মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ যেমন অকস্মাৎ এসেছিলেন তেমনি অকস্মাৎ চলে গেলেন। আমার জীবনে তাঁর কী প্রয়োজন ছিল ভাবছি। বোধ করি আমাকে পরীক্ষা করতে ভগবানের দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন। মাঝখান থেকে আমার শ্বশুরের হৃদয়ে আঘাত রেখে গেলেন। প্রথমটা তিনি এখনি বিলেত যাবেন বলে ক্ষেপেছিলেন। (সেখানে বিয়ে করা কি এতই সোজা ?) ছুটি পাওয়া গেল না। এই সময়টাতে সাহেবরা ফার্লো নেয়, বাঙালীকে ছ'মাসের জন্যে মোটা মোটা গদিগুলো ছেড়ে দেয়। কাজেই শ্বশুর মহাশয় ম্যাজিস্ট্রেট হবার আশ্বাস পেয়ে শীতকালের আশায় দিনপাত করছেন।

"আমরা হয়তো পুরী কিংবা পূর্ণিয়া যাচ্ছি। পাটনা ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না। কত স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে।"

সুধী বুঝল কার স্মৃতি। বেচারি উজ্জয়িনী—বাদলের উর্মিলা। সুধী পড়তে লাগল।

"ইতিমধ্যে একটি মেয়ের সঙ্গে বিশেষ আলাপ হয়েছে। তার নাম করুণা। করুণাকে দেখে সত্যিই করুণা হয়। শুধু তার উপর করুণা হয় তাই নয় নিজের উপর করুণা হওয়া কমে। তার স্বামী থাকেন সমস্ত দিন আপিসে, বাড়ী ফিরেই পাড়ায় হাজিরা দিতে যান, অর্ধেক রাত্রি অবধি তাস খেলা চাই। আবার ভোরে উঠে বেরিয়ে যান বড় দেখে মাছ কিনতে, ওটি না হলে তাঁর চলে না। স্ত্রীকে ভালবাসেন না এমন নয়। কিন্তু সে ভালোবাসায় কোথাও এতটুকু রঙ নেই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হয়তো চব্বিশটি কথা বলেন না স্ত্রীকে ; বলার দরকার বোধ করেন না। রাগ করেন না, হাসেন না, অভিমান করেন না, খুবই ভদ্র। কী যে স্ত্রীর অপরাধ তা তো আমরা অর্থাৎ বীণা আর আমি অনুমান করতে পারলুম না। ভদ্রলোকের নামে কোনো অপবাদ শোনা যায় না। চিরকাল পিতৃমাতৃভক্ত। লেখাপড়ায় ভালো। মা বাবা যেখানে পাত্রী স্থির করলেন সেইখানে বিবাহ করলেন। আপত্তির আভাস পর্যন্ত দিলেন না। মেয়েটি সুশ্রী, সরল, সৎ। শাশুড়ীর নির্দেশ অনুসারে সমস্তক্ষণ খাটে। দেওরদের আবদার অত্যাচার বিনা বাক্যে সয়। একটি

ছেলে হয়েছে, সেটির যত্ন নিতে জানে না, কোনোদিন শিক্ষা পায় নি, সেজন্যে দেওরদের কাছে বকুনি খায়। ছেলে যেন ওদেরই, তার নয়। স্বামীর কাছে নালিশ করে না, করলে কোনো প্রতিকার হত না। শ্বশুর তার পক্ষ নিয়ে দুটো শক্ত কথা বলেন, তাইতেই সে খুশি।

"আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার একটা নতুন দিক আমার চোখে পড়েছে। আমরা মেয়েরা স্বভাবত কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে যিনি আমাদের মনোনয়ন করে ঘরে আনেন। স্বামীর চাইতে শ্বশুরকেই আমরা আপনার বলে জানি। তাই স্বামীবিয়োগে পুনর্বার বিবাহ করিনে। স্বামীর স্নেহ না পেলে শ্বশুরের স্নেহ পেয়ে দুঃখ ভুলি। করুণার সঙ্গে পরিচিত হয়ে এই শিক্ষা লাভ করলুম।"

সুধী বুঝল উজ্জয়িনী নিজের দুঃখ ভোলবার এই উপায়টা খুঁজে ব্যর্থ হয়েছে, শ্বশুরের স্নেহ পায়নি বলে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে চায়। কিন্তু উজ্জয়িনী তা স্বীকার করেনি। সে বলে,

"এই মিথ্যা সংসার আমাকে ভুলিয়ে রাখতে পারবে না। এর ছলনা আমি ভেদ করেছি। এর মধ্যে কাণা কড়ির সত্য নেই, শান্তি নেই। সংসারের নিয়মকানুন মেনে ঘোরতর সংসারী হয়ে যারা ধন মান পদমর্যাদায় বড হয়েছে তারা মূর্খ। যারা সংসারের প্রশংসা কুড়িয়ে বাহবা পেয়ে ভালো মানুষ হয়েছে তারা মূঢ়। আমি উল্কার মতো ছুটে বেরিয়ে পুড়ে জুড়িয়ে নিবে হারিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। সংসারের বাইরে আমার জীবন কাটি। না জানি কোন নক্ষত্রে আমার বাসা। তাই তো আমি রাত জেগে তারার দিকে চেয়ে থাকি। আমার ঘরের জানালা দিয়ে অনেকখানি আকাশ ঘরে আসে। জানালা খোলা রেখে মেজেতে গড়িয়ে পড়ি।"

ভাগবত উপলব্ধির কথা উজ্জয়িনী উত্থাপন করেনি। বোধ হয় সুধী পছন্দ করবে না অনুমান করে। বীণার কথাও বিশেষ উল্লেখ করেনি। বোধ হয় সুধী বীণার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বলবে ভেবে। বাদলের কথাও জানতে চায়নি। বোধ হয় না-চাওয়াটাই সুধীর মনে লেগে ফলপ্রদ হবে জেনে। শেষে লিখেছে,

"আপনাকে কত কথা জানিয়ে ফেললুম, ফেলে অনুতাপ হচ্ছে। কিন্তু আপনাকে আমার স্বতঃ বিশ্বাস হয়। আমার বড় ভাই নেই। বড ভাই কেন, কোনো ভাই নেই। আপনাকে ভাই ভেবে আমার খানিকটে ভার নামে।"

১২

বাৎসল্যে সুধীর অন্তঃকরণ আপ্লুত হয়। আহা, ছোট বোনটি! বাপ-মার সঙ্গে ঝগড়া করেছে, স্বামীর প্রেম পায়নি, শ্বশুরকে শ্রদ্ধা করতে পারে না। কী যে তাকে নিয়ে করা

যায়। দূর থেকে উপদেশ দেওয়া সোজা, এর মতো হও, ওর মতো হও বলতে পারা সুলভ, কিন্তু তার অবস্থায় পড়লে নিজে কী করতুম সেইটে বিবেচনা করতে হয়। উজ্জয়িনীর বয়স সতের আঠার, ও-বয়সে কজন পুরুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে, যেখানে ইচ্ছা ভাগ্য পরীক্ষা করে বেড়িয়েছে? ইউরোপেও ওই বয়সের তরুণী মেয়েকে নিরাপদে ও সসম্মানে স্বাবলম্বী হতে সচরাচর দেখা যায় না। সুজেতের মতো যারা দোকানে কাজ করে তাদের উপার্জন এত স্বল্প যে পৈতৃক বাড়ী বা বাসা না থাকলে তারা পথে বসত।

যে নারী ভাগ্যদোষে স্বামী ও শ্বশুরের স্নেহ হারিয়েছে সে নারী পিতামাতার আশ্রয় গ্রহণ করে। যার সে আশ্রয়ও নেই, আমাদের সমাজ তার কোনো ভদ্র আশ্রয় রাখেনি। বয়স একটু বেশী হলে সে রাঁধুনিবৃত্তি করে দাসীবৃত্তি করে কোনো ধনী পরিবারে একটুখানি মাথা গুঁজবার ঠাঁই পেতে পারে; বিদ্যাশিক্ষা বিদ্যালয়সম্মত হলে চাকরি পাওয়াও সম্ভব, কিন্তু উজ্জয়িনী কোনোটাই পাবে না। না-পাবার সব চেয়ে বড় কারণ সে তার বংশপরিচয় গোপন রাখতে পারবে না। অবশেষে তার বাবা কিংবা তার শ্বশুর তাকে পাকড়াও করে বাড়ী ফিরিয়ে আনবেন।

মহিমচন্দ্রের উপর সুধীর ভরসা ছিল। উজ্জয়িনীর এই পত্র পেয়ে কিছু কমল। এই বয়সে তিনি নূতন করে সংসার পাতবার উদ্যোগ করছেন, সেই ঝঞ্ঝাটে ছেলেকে কয়েক সপ্তাহ চিঠি লিখতে পারেন নি, বাদল শুনলে কী মনে করবে। সুধী লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ বোধ করছিল। দূর থেকে এই! নিকট থেকে উজ্জয়িনী যা বোধ করেছে তার সমস্তটা জ্ঞাপন করেনি নিশ্চয়। যে বাঘ একবার মানুষের স্বাদ পেয়েছে সে আবার মানুষ খুঁজতে থাকে। মহিমচন্দ্র মিসেস স্যামুয়েল্‌সের পদ শূন্য রাখবেন না বলে আশঙ্কা হয়। সকলেই কিছু মিসেস স্যামুয়েল্‌সের মতো ভালো হবে না। তা হলে বেচারি উজ্জয়িনীর কী দশা হবে? বৈষ্ণবজনোচিত সহিষ্ণুতা ও সুনীচতা উজ্জয়িনীর স্বভাবে শিকড় গাড়ে নি। সে তেজী মেয়ে। যেটা তার ভালো লাগে না সেটা তার ভালো লাগে না। এই যদি চূড়ান্ত হয় তবে সে হয়তো একটা কাণ্ড করে বসবে। যদি রাগ করে কোথাও চলে টলে যায়—ধর বীণাদের বাড়ীতে—তবে আর কিছু না হোক একটা প্রহসন হবে। যে পাখীর ডানায় জোর নেই কিন্তু প্রাণে আকাশের আকূতি, সে পাখী মাটির উপর ডানা ঝটপট করবে কিছু কাল, তারপর খাঁচায় ঢুকবে, যদি না ইতিমধ্যে বিড়ালের মুখে পড়ে থাকে।

মহিমচন্দ্রকে সুধী চেনে। চিন্তাশীলতা, সৌন্দর্যবোধ, কল্পনাবৃত্তি তাঁর নেই। আইডিয়ালিসম্‌ তাঁর স্বভাবে সয় না। হয় আর্থিক নয় পারমার্থিক লাভ ও লোভ তাঁকে অবিশ্রান্ত খাটায়। খাটুনির জোরে লোকটা সরকারী চাকুরেদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল। অসাধারণ তাঁর য়্যাম্বিশন। একটা উপাধি পেতে না পেতেই আর একটার জন্যে দেহপাত। বছরে বছরে তাঁর পদোন্নতি হওয়া চাই, নতুবা জীবন বৃথা গেল, গবর্নমেন্ট তাঁর যোগ্য-

তার মর্যাদা রাখল না। এক দিক দিয়ে এর ফল ভালো হয়েছে। তিনি দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেননি। স্ত্রী-জাতির প্রতি দৃক্‌পাত করেননি। কেউ ঘুষ দিতে এলে তিনি ঘুষি পাকিয়ে তাড়া করে গেছেন। পানদোষ থেকে মুক্ত। তবু তাঁর সঙ্গে বাস করা উজ্জয়িনীর পক্ষে প্রকৃতিবিরুদ্ধ হবে। শ্বশুরবাড়ীর মোহ যখন অপগত হবে তখন উজ্জয়িনী তাঁকে পরিহার করতে ইচ্ছা করবে। তারপর যদি সত্যই তিনি স্ত্রী গ্রহণ করেন তবে সেই ইচ্ছা ব্যাকুলতায় পরিণত হবে। তখন কী উপায়? বাদলটা তো অবুঝ। যোগানন্দকে বোঝানো যায় না।

উজ্জয়িনীর ভাগবত উপলব্ধির উল্লেখ না থাকায় সুধীর আশা হল হয়তো উজ্জয়িনীর প্রাথমিক উত্তেজনা নিস্তেজ হয়ে এসেছে, অপরকে অংশ দেবার উৎসাহ অস্তমিত হয়েছে। তা যদি হয় তবে যোগানন্দের সঙ্গে তাঁর একটা বোঝাপড়া অনায়াসে ঘটবে। যোগানন্দের প্রাথমিক বিস্ময় ও বিরক্তি এতদিনে পুরাতন হয়ে পূর্বের উগ্রতা হারিয়েছে। তিনি হয়তো বাদলের ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে কন্যার দুর্ভাগ্যের জন্যে নিজেকে অপরাধী করছেন। পিতা-পুত্রীর সন্ধির পক্ষে এই অবস্থা ও এই মুহূর্ত অনুকূল। সুধী যোগানন্দকে চিঠি লিখল।

লিখল, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এমন একটা বয়স আসে যখন আমরা অতিরিক্ত ভক্তিপ্রবণ হয়ে উঠি। আমাদের পাপবোধ প্রবল হয়, আমরা নিজেকে নিপীড়ন করে শান্তি পাই, আহার নিদ্রা কমিয়ে দিই, স্নান করে ধ্যান করতে বসি, শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে সর্বত্র আবর্জনা দেখি, আমিষ ছাড়ি, হবিষ্যান্ন খাই, একাদশী করি। অনেকেই আমাদের গুরু হন, অনেকের অজ্ঞাতে আমরা তাঁদের একলব্য হই, বাঁধানো খাতায় বচন উদ্ধার করি, ডায়েরি রাখি, প্রতিদিন সংকল্প করি মহৎ হব, আক্ষেপ করি মহৎ হতে পারছিনে, ভগবানকে প্রার্থনা করি, ধর্মগ্রন্থ পড়ি, অকারণে চোখের জল ফেলি।

উজ্জয়িনীর এখন সেই বয়স। এ বয়সকে আপনি এতদিন ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। অবস্থা যেই অনুকূল হল বয়োধর্ম অমনি চেপে ধরল। বাদল তার কাছে থাকলে তার ভক্তিবৃত্তি স্বামী অভিমুখে ধাবিত হত। সে স্বামীর পট পূজা করত, স্বামী সেবার নানা ছল খুঁজে স্বামীর পায়ে নিজেকে নিবেদন করে দিত, এমনি আত্মনিগ্রহ করত। বাদল অকালে বিদায় নিল, সকল রকমে বিদায়। স্ত্রীকে সে অস্বীকার করল। দেশকে সে অস্বীকার করল। তার ভাব থেকে মনে হয় বন্ধুকেও সে অস্বীকার করবে। সাতদিনে একদিন তার বিজ্ঞাপন পড়তে পাই। শুধু এইটুকু বার্তা, SUDHIDA—I AM. উজ্জয়িনীর হয়ে তাকে আমি অনেক বলেছি। তার এক কথা, সে কারুর সঙ্গে বাঁধা থাকতে অপারগ। তাতে তার মুক্ত মানসিকতা পীড়া পায়। হয়তো একদিন তার এ পাগলামি সারবে। সৃষ্টির দায়িত্ব স্বীকার না করে মুক্তি কোথায়?

কিন্তু বাদলের জন্যে অপেক্ষা করা উজ্জয়িনীর পক্ষে দুরাশা হবে। সে কেমন করে

একথা বুঝতে পেরেছে বলে হরিভক্ত হয়েছে। হাতের কাছে অন্য কোনো ভক্তির উপকরণ পায়নি, উপলক্ষ পায়নি। ইউরোপে থাকলে বোধ করি কুকুরভক্ত হত।

তার এ বয়স চিরস্থায়ী হবে না। কারুর জীবনে হয় না। এর পরবর্তী বয়স সংশয়ের, অশ্রদ্ধার। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছেই। স্বামী থাকলে স্বামীর উপর দিয়েই শুরু হত। স্বামীর অভাবে দেবতার উপর দিয়ে। উজ্জয়িনী নিজের বানানো মূর্তি নিজের হাতে ভাঙবে। যাদেরকে গুরু করেছে তাদেরকে দূর করে দেবে। এক আতিশয্যের স্থলে আর এক আতিশয্য। তারপরে সংযমের সময় আসবে। কার জীবনে কখন আসে বলা যায় না। কারুর কারুর জীবনে কোনো কালে আসে না। আশা করি উজ্জয়িনীর জীবনে যথাকালে আসবে।

বাদলের অপেক্ষা না রেখে কেমন করে এই সংযম সম্ভব হবে জানিনে। তবে বিধাতা আমাদের একান্ত পরনির্ভর করে গড়েননি। নিজের মধ্যে নিজের পূর্ণতা উহ্য রয়েছে, খুঁজে নিতে হবে। উজ্জয়িনীর উপর আমার ভরসা আছে, সে পরমুখাপেক্ষী হবে না।

ভরসা আছে, সেই সঙ্গে ভাবনা আছে। তার শ্বশুরবাড়ীতে সে তার স্বামীর অধিকারে আছে। স্বামী যদি তাকে অস্বীকার করল তবে সে কার অধিকারে থাকবে? শ্বশুর তাকে অস্বীকার করবেন না বটে, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কিছু না লেখাই ভালো। ধরে নেওয়া যাক শ্বশুরের অধিকার দুর্বল হয়ে আসবে, শ্বশুরের স্নেহ সে এখনকার মতো পাবে না। তা হলে সে দাঁড়ায় কোথায়? ভাত, কাপড়ের জন্যে শ্বশুরের আশ্রয়ে পড়ে থাকা তার পক্ষে মরণাধিক। অথচ স্বাবলম্বী হবার মতো শিক্ষাও সে পায়নি। যার হাতে জোর নেই তার মনে উচ্চ চিন্তা থাকা করুণরসাত্মক। এই জন্যেই আমার ভাবনা। কিন্তু আমি তো তার স্বামীর বন্ধু ও পাতানো ভাই, আপনি তার পিতা ও প্রথম গুরু। আপনার ভাবনা আরও নিত্যকার, আরও সত্যকার। আমি জানি আপনি কেবলমাত্র তার মনের ভবিষ্যৎ ভাবছেন না, তার ভবিষ্যৎ আশ্রয়ের চিন্তাও করছেন।

১৩

চিঠিখানা নিকটতম পিলার বক্স-এ দিয়ে সুধী বহুল পরিমাণে নিশ্চিন্ত হল। যোগানন্দ বুদ্ধিমান ব্যক্তি, ভাব গ্রহণ করবেন।

সুধীর সঙ্গে অনাহূত ছুটে গেছল মার্সেলের কুকুর জ্যাকী। তাকে এদানীং বেঁধে রাখা হয় না, কিন্তু বন্ধ রাখা হয়। দ্বার খোলা পেয়ে সেও সুধীর সঙ্গে চলল; মতলবটা এই যে মার্সেলের কাছে বকুনি খাবার সময় জিভ লক্ লক্ করতে করতে সুধীর দিকে চেয়ে দোষটা সুধীর ঘাড়ে চাপাবে। যেন সুধীই তাকে আদর করে ডেকে সঙ্গী করেছিল।

সুধী ডাকল, "জ্যাকী, আয়, ফিরি।"

জ্যাকী শোনে না। সামনের বাড়ীর সামিল বাগানে ঢুকে একটা বিড়ালকে তাড়া করেছে। বিড়ালটা যেখানে লুকাতে চেষ্টা করে সেখানে জ্যাকী। বিড়ালটা একটু চুপ করে বসলে জ্যাকী একটা থাবা বাড়িয়ে একটু রঙ্গ করে, বিড়ালটা ফুলতে থাকে। সুধী ডাকে, "জ্যাকী !" জ্যাকী না-শোনার ভান করে। সুধী অত্যন্ত লজ্জা বোধ করে। বিড়ালের ও বাগানের মালিক যদি দেখতে পান কী ভাববেন ? সে বিরক্তির স্বরে ডাকে "জ্যাকী !" কুকুরটা ল্যাজ নাড়তে নাড়তে সুধীর দিকে তাকায়, যেন সেও লজ্জিত। কিন্তু বিড়ালকে এক পা এগোতে দেয় না।

অগত্যা সুধীকে অপরিচিতের দরজায় কড়া নাড়তে ও বেল টিপতে হল। দরকারটা জরুরি। একটি খোকা দরজা খুলে সুধীর রঙ ও পাগড়ি দেখে পিটটান দিল। একটি মহিলা হাঁফাতে হাঁফাতে এলেন। এসেই বললেন "No hawkers allowed." অর্থাৎ সুধীকে ঠাওরালেন ফিরিওয়ালা। সুধী মৃদু হেসে বলল, "ফিরি করবার মতো কিছু নেই।" এই বলে দুই হাত ডানার মতো মেলে দেখাল। মহিলাটি তার দিকে কটমট করে তাকালেন। বললেন, "কী জন্যে এসেছেন ?" সুধী আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে বলল, "আমার কুকুর আপনার বিড়ালকে তাড়া করেছে, হুকুম মানছে না। বাগানে প্রবেশ করার অনুমতি পেলে তাকে ধরে আনতে পারি।" একথা শুনে খোকা বাগানের ভিতরে লাফ দিয়ে ছুটল। মহিলাটি বললেন, "আসুন।"

ততক্ষণে বিড়ালটি ভয়েই মরে গেছে। জ্যাকী তার সঙ্গে একটু পরিহাস করছিল। গায়ে আঁচড়টি দেয় নি। সুধীকে দেখে জ্যাকী ল্যাজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল। পরিহাসের পরিণাম বেচারাকে বড় অপদস্থ করেছে।

খোকা বিড়ালটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। শুয়ে পড়ে চোখে চোখ রাখল। বিড়ালটিকে তুলে চার পায়ে খাড়া করবার চেষ্টা করল। অবশেষে কান্নার স্বরে বলল, "O Mummy !" তার মা সুধীর দিকে তাকালেন। সুধী তখন অন্যমনস্ক। জীবনমৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাকে মুগ্ধ করছিল।

মহিলাটি বললেন, "এবার আপনার কুকুরটাকে নিন এবং যান।"

সুধী বলল, "কুকুরটাকে রেখে বিড়ালটিকে দিন।"

মহিলাটি সুধীর দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ ভাবলেন। খোকা লাফিয়ে উঠে মায়ের মুখে চোখ রেখে আব্দারের স্বরে বলল, "Yes, Mummy."

মা কঠিন হয়ে বললেন, "তা হয় না।"

খোকা কুকুরটার দিকে সতৃষ্ণ ভাবে তাকিয়ে রইল, বিড়ালটার কথা ভুলে গেল। কুকুরটা ততক্ষণে আবার খেলা করতে লেগেছে—এবার নিজের ল্যাজের সঙ্গে।

খোকার মা বললেন, "আপনি ওটাকে নিয়ে যান। আমরা আমাদের বিড়ালকে

সুধী অগত্যা তাই করল। জ্যাকী লক্ষ্মী ছেলের মতো ধীরে ধীরে সুধীর সঙ্গ রাখল। সুধী ভাবছিল, ব্যবধান তো নেই। একটা মুহূর্তেরও ব্যবধান তো নেই। জীবনের পিঠ পিঠ মরণ। চক্রবৎ পরিবর্তন্তে। চাকাটাকে ঘুরিয়ে দিল কে? জ্যাকী। দুষ্টু ছেলেতে যা করে থাকে সে তাই করেছে। প্রকৃতি সবাইকে দিয়ে সমস্তক্ষণ চাকাটাকে ঘোরাচ্ছে। জীবনের পিঠ পিঠ মরণ। কিন্তু মরণের পিঠ পিঠ জীবন আছে কি? জীবনের বেলা তো দেখি জীবনের ভিতর থেকে জীবন আসে। তা আসুক। কিন্তু কী করে থাকে? জীবনের ঘড়িতে প্রতিদিন চাবি দেয় কে? মরণ। এই বিড়ালের মৃতদেহ বহু কীট কীটাণুর জীবনকালকে দীর্ঘতর করবে। মরণের পিঠ পিঠ আয়ু। কার মরণে কার আয়ু সে কথা তুচ্ছ। মরণ নামক সত্যের উত্তরাধিকারী আয়ু নামক সত্য।

বাসায় পৌঁছবার মুখে সুধী যাকে দেখল সে একটা টেলিগ্রাফ পিয়ন। ইংলণ্ডে সাধারণত বাচ্চা পিয়ন টেলিগ্রাম বিলি করে। সুধী জিজ্ঞাসা করল, "কার নামে টেলিগ্রাম?"

ছোকরার গাল লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। সে বলল, "মনে পড়ছে না ঠিক। বোধ হয় ক্রিস্টফাবটী।"

সুধীর চোখ ও মুখ মুহুর্মুহু কাঁপল। সে বাড়ীতে ঢুকতেই সুজেৎ অনুযোগ করে বলল, "কোথায় যাওয়া হয়েছিল এতক্ষণ? দশবার উপরতল বার-ভিতর করতে করতে আমার পা যে ভেঙে পড়ল।" সে আজকাল মুখরা হয়েছে। কাকে ভালোবেসেছে বলা যায় না। হয়তো সুধীকেই।

তার হাত থেকে বিনাবাক্যে খামখানা ছিনিয়ে নিয়ে পটাপট ছিঁড়ে টেলিগ্রাম খানার উপর সুধী যেই চোখ বুলিয়ে গেল অমনি ওখানা তার হাত থেকে খসে পড়ল, তেমনি বিনাবাক্যে।

"বাদলের শ্বশুর হার্টফেল করে মারা গেছেন। মহিম।"

মরণ জীবনকে দেয় আয়ু, আগুনকে দেয় ইন্ধন। কিন্তু আত্মাকে দেয় কী? আত্মাকে দেয় এত বিপুল কাল যে তাকে কাল বলা চলে না, এত বৃহৎ দেশ যে তাকে দেশ বলা চলে না। সসীম মানবের ঐতিহাসিক কাল ও আইনস্টাইনীয় বিশ্ব; সীমার মধ্যে সে সোয়াস্তি পায় বলে সীমা খুঁজেই সে নাকাল। তাকে অনন্ত বিরতি ও অপার বিস্মৃতি দিতে পারে কে? দিতে পারে মৃত্যু। হে মৃত্যু, তুমি দেহের সীমা থেকে সীমাহীন দেহে দেহীকে পৌঁছে দিলে মনের সীমা থেকে সীমাহীন মনে মনস্বীকে উপনীত করলে, তুমি আয়াসকে দিলে বিরাম, ব্যস্ততাকে নিরস্ত করলে, উদ্বেগকে দিলে ক্ষান্তি, সঞ্চয়কে ব্যঙ্গ করলে। তোমায় নমস্কার।

(১৯৩০-৩২)

অজ্ঞাতবাস

পরিচ্ছেদসূচী

বন্দী প্রমিথিয়ুস্ ২২৯
স্বপ্নবাণী ২৫১
স্বপ্ন, বাস্তব, স্মৃতি ২৭৯
অনুসন্ধান ৩১২
অশ্বারোহণ পর্ব ৩৪৪
খণ্ড ভারতী ৩৭৩

চরিত্রপরিচিতি

বাদলচন্দ্র সেন	এই উপন্যাসের নায়ক
সুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	বাদলের বন্ধু
উজ্জয়িনী	বাদলের স্ত্রী
মহিমচন্দ্র সেন	বাদলের পিতা
যোগানন্দ গুপ্ত	উজ্জয়িনীর পিতা
সুজাতা গুপ্ত	উজ্জয়িনীর মাতা
কুমারকৃষ্ণ দে সরকার	সুধী ও বাদলের আলাপী
বিভূতিভূষণ নাগ	সুধীর আলাপী
মাদাম দুপোঁ	সুধীর ল্যাণ্ডলেডী
সুজেৎ	মাদামের কন্যা
মার্সেল	মাদামের পালিতা কন্যা
মিস মেলবোর্ন-হোয়াইট	সুধীর আণ্ট এলেনর
ডক্টর মেলবোর্ন-হোয়াইট	সুধীর আঙ্কল আর্থার
অশোকা তালুকদার	সুধীর বান্ধবী

—আরো অনেকে--

বন্দী প্রমিথিয়ুস্

১

পাট্‌নীতে টেম্‌স্ নদীবক্ষে অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বোট রেস হয়ে গেল, বাদল দেখতে পেল না। উইণ্ডহাম্‌স্ থিয়েটারে ইব্‌সেন শতবার্ষিকী উপলক্ষে ইবসেনের নাটকাবলীর অভিনয় হয়ে গেল, বাদল দেখতে পেল না। লণ্ডনের বাইরে এসে লণ্ডনের কত কী বাদল দেখতে পেল না। কাগজে সকলে পড়ে পরের খবর, বাদল পড়ে তার নিজের—সে নিজে কি দেখতে পেল না, কিসে যোগ দিতে পারল না, কার সঙ্গে আলাপ করতে পারল না। তার রোজ আফসোস হয় কেন সে লণ্ডন ছাড়তে গেল—লণ্ডনের সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ তা যে কোন্ সুদূর অতীতের, সে অতীতকে ডিঙিয়ে স্মৃতি তার পশ্চাদ্‌গতি হতে পারে না।

যে বাদল অতীতকে অস্বীকার করত, অতীতের স্মৃতিকে প্রশ্রয় দিত না, সে-ই এখন লণ্ডনের বিগত দিনগুলির উপর স্মৃতির আঙুল বুলিয়ে যায়। মরা হাড়ের স্বরগ্রাম থেকে কড়ি ও কোমল সুর নির্গত হয়। মিসেস্ উইল্‌সের সঙ্গে গল্প ও বাজার করা, তর্ক ও মনোমালিন্য, তাঁর মিষ্টি হাতের কোকো; কলিন্স ও তার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, একত্র আহার, থিয়েটারে যাওয়া; সুধীদার সঙ্গে বিচ্ছেদ; ওয়েলীর কাছে পরাভব। সমস্ত দিন পথে পথে বেড়ানো; দোকানে ঢুকে এটা ওটার ফরমাশ দিয়ে দুদণ্ড কথাবার্তা করে নেওয়া; নাপিত দরজী রুটিওয়ালা কসাই মুদী মনোহারী দোকানী দুধওয়ালা ফলওয়ালা পাহারাওয়ালা—সকলের সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা; কুইন্স হলে কন্সার্ট কিংবা ফিলহারমনিক হলে বক্তৃতা শুনতে গিয়ে দণ্ডায়মান জনতার queue-তে ভিড়ে যাওয়া; পার্কে ঘুরতে ঘুরতে দীঘির ধারে বসে পড়ে ছোটদের নকল বাচখেলা দেখা; আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে নেমে বাইরের দুর্জয় শীতে বায়ুবাণ কিংবা বর্ষার খোঁচা এড়ানো, টিউবট্রেনের যখন দরজা বন্ধ হয়ে যায় তখন গতিহিল্লোলের পুলকাবেশে শিরশিরিয়ে ওঠা; অভীষ্ট স্টেশনে ট্রেন থামলে বোঁ করে ছুটে বেরিয়ে লিফ্‌টওয়ালার হাতে টিকিট গুঁজে দেওয়া ও দীপালোকিত অন্ধকার থেকে অস্পষ্ট সূর্যালোকিত অন্ধকারে উপনীত হওয়া; বাসের মাথায় চড়ে টাটকা বাতাস প্রাণ ভরে ও ঘ্রাণ ভরে পান করা। এই সমস্ত বাদলের মনে পড়ে যায় আর বাদলের উপস্থিত চিন্তা ঘুলিয়ে যায়।

চিন্তার একাগ্রতায় বাধা সইতে পারে না বলে বাদল লণ্ডন ছাড়ল, কিন্তু লণ্ডনের স্মৃতি তাকে ছাড়ে না। লণ্ডনের অভ্যাস ছাড়া শক্ত। এখন যেখানে সে থাকে সেটা একটা সরাই। সেটার বিশেষত্ব এ নয় যে সেটা Ye Olde Englishe Inne—সেটার আশে পাশে জনমনুষ্যের বাস নেই, এই সেটার বিশেষত্ব। দক্ষিণে আটলান্টিক মহাসমুদ্র। মহাসমুদ্রের উপর দিয়ে বাতাস যখন আসে তখন মাটির খবর আনে না, হাজার হাজার

মাইল কেবল জলের গন্ধ বয়ে আনে। উপকূল বন্ধুর বলে কেউ স্নান করতে নামে না। নিকটে জালজীবীদের বসতি নেই। সরাইটাতে বাদলের মতো পর্যটক আশ্রয় নেয়, দু-পাঁচ দিন থাকে। মোটর সাইক্লিস্ট কিংবা মোটরিস্ট সরাইতে পানাহার, সাধারণত পান করে আবার পথ ধরে, দৌড় দেয়। মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে কেউ আসে, আস্তাবলে ঘোড়া বেঁধে সরাইওয়ালার সঙ্গে ভাব জমায়। সরাইতে সমস্তক্ষণ থাকে সরাইওয়ালা নিজে, তার স্ত্রী ও তার মেয়ে। বাদলকে এরা খাতির করে খুবই, বাদল যা চায় তাই সংগ্রহ করবার ভার নেয়, কিন্তু বাদল ঠিক সময়ে পায় না—নিকটতম শহর যে চার-পাঁচ মাইল দূরে। সকালবেলা তাজা খবরের কাগজ না পেলে তার ব্রেকফাস্টের সব কটা কোর্স বিস্বাদ লাগে। রাত্রে প্রশস্ত বাথ টাব্ ও যথেষ্ট গরম জল না পেলে তার স্নান করতে বিশ্রী লাগে। বীফ সম্বন্ধে এখনো তার সংস্কার সম্পূর্ণ দূর হয়নি। এরাও চিকন্ যদি বা দেয় তার সঙ্গে রাঁধতে না জানার পরিচয় দেয়। বাসন তেমন পরিষ্কার হয় না, খাদ্য তেমন পরিপাটি হয় না। উৎকর্ষের অভাব এরা পরিমাণের দ্বারা ঢাকতে চায়। চাষাড়ে ব্যাপার।

তবু বাদলের স্বাস্থ্যের আশ্চর্য উন্নতি দেখা গেল। আটলান্টিকের হাওয়া খেয়ে তার ক্ষুধার বারো আনা মিটল, বাকিটা মিটল প্রচুর খাঁটি দুধ খেয়ে। সরাইওয়ালার নিজের গোরুর দুধ, সে গোরু সরাইওয়ালার নিজের জমিতে চরে। সরাইওয়ালার ডাগর মেয়ে করে গোদোহন। দৃশ্যটি বাদলকে ক্ষুধা পাইয়ে দেয়, তার বহুদিনের অগ্নিমান্দ্য সারিয়ে দেয়। বাঁটের পিচকারি থেকে বাল্‌তিতে সফেন দুধ ছুটে এসে পড়ছে, ফুলে ফুলে উঠছে। টুলের উপর বসেছে সেই ডাগর-মেয়েটি। তার গালের রং টক্‌টকে লাল। তার হৃষ্ট মুখ ও পুষ্ট দেহ দেখে কবি হলে বাদল প্রেমে পড়ে যেত। কিন্তু কবি নয় সে, ভাবুক। মুহূর্তকাল অমনোযোগী হলে সে চিন্তার চাবুক খেয়ে হুঁসিয়ার হয়। তবে কী ভাবছিলুম ? আমি আছি, এর স্বপক্ষে কী যুক্তি দেওয়া যেতে পারে। যতক্ষণ না এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছি ততক্ষণ আমি এই জনহীন সমুদ্রোপকূলে এই প্রাগৈতিহাসিক সরাইতে আবদ্ধ থাকব, উপর তলা থেকে নীচের তলায় নামব না, যদি সম্ভব হয়।

জানালা খোলা রেখে বাদল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে। টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে দুই হাত দিয়ে দুই বাহুকে জড়ায়। সারা অতীতকালটা যেন সে ছুটাছুটি ও পায়চারি করেছে, আজ যেন তার ছুটি ও বিশ্রাম। ঢেউগুলো বাতাসের তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে আছাড় খেয়ে পড়ছে, তাদের আর্তনাদ থেকে স্তব্ধ হয়ে গিয়ে স্তব্ধতাকে আকুল করছে, ক্রন্দননিরতের কণ্ঠরোধের মতো। বাদল কানে তুলো গুঁজে ভাবছে, কী ভাবছিলুম ? আমি আছি কি না এর স্বপক্ষে যুক্তি আছে কি না।

একই চিন্তা বার বার আসে। বাদল কতবার কত যুক্তি আবিষ্কার করে কিন্তু এক-

দিনের যুক্তি তার অন্যদিন মনঃপূত হয় না। একটা চিন্তাকে চিরকালের মতো চুকিয়ে না দিলে অন্য চিন্তাকে সে আমল দেয় না; আমল দেবার অবকাশ পায় না।

২

বাদল ভেবেছিল ইংলণ্ডের দক্ষিণ প্রান্তে এসে সূর্যালোক অধিকাংশ দিন অধিকাংশ সময় পাবে, কিন্তু তেমনি শীত তেমনি স্বল্পবিরাম বৃষ্টি তাকে সেদিক থেকে নিরাশ করল। রক্ষা এই যে, লণ্ডনের ধূমমসীলিপ্ত আকাশ চুঁইয়ে ছাতার কালির মতো জল পড়ে না। হাওয়া তো মুক্তগতি। মাঝে মাঝে সমুদ্রের ফেনা উড়ে এসে বাদলের গায়ে লাগে। তাইতে বাদলের ভারি আমোদ।

সন্ধ্যায় যখন অন্ধকার নামে, অর্থাৎ গাঢ়তর হয়, তখন দূরস্থিত লাইটহাউসের আলোকচক্ষু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পর্যায়ক্রমে চোখের পাতা পড়ে ও সরে। বাদল সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কোনো কোনো দিন দূরগামী জাহাজের আভাস দেখতে পায়। পশ্চিম থেকে পূর্বে কিংবা পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলেছে সেই জাহাজ। হয়তো রণতরী, হয়তো লাইনার। দেখতে দেখতে বাদলের মনে হয়, সে যেন রবিন্‌সন ক্রুসোর মতো নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত হয়েছে। সামনে দিয়ে হুস্‌ হুস্‌ করে ছুটে যেতে যেতে বাস্‌ থামে, আরোহী নামে। তখন বাদলের হুঁশ হয় যে সে লোকালয় থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। নীচের তলায় কারুর মাত্রাধিক্য ঘটেছে, সে প্রাণপণে তান ছেড়েছে; বাদল তখন ভাবে রবিন্‌সন ক্রুসো মানুষটা মন্দ ছিল না।

জীবনে কোনোদিন এত একাকী বোধ করেনি সে। শৈশবাবধি মাতৃহারা, ভাইবোন হয় নি, তবু তার সঙ্গীর অভাব ছিল না; তার ছিল বৃহৎ লাইব্রেরি। চাইলেই বাবা বই কিনে দিতেন, দামের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। আজ সেই বাদলের সঙ্গে মাত্র একটি ছোট বুককেস্‌, তাতে কয়েকখানা বাছা বাছা বই। বাদল সেদিকে দৃক্‌পাত করে না। বই পড়ার দিন গেছে। স্কলার হওয়া আর স্পৃহনীয় নয়। খবরের কাগজের মৌতাত অদম্য বলেই হোক কিংবা বাহ্যজগতের সঙ্গে যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন করা অনুচিত বলেই হোক, বাদল ভেণ্টনর থেকে বহুকষ্টে 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' আনিয়ে পড়ে। কিন্তু তাকে পড়া বলে না। বাদল পড়ার জিনিসের অভাবে নিঃসঙ্গ বোধ করে। তবু পড়ার জিনিস আনতে দেয় না। সমস্তক্ষণ চিন্তা করবার জন্যে তার এখানে আসা। চিন্তার একাগ্রতা যেন হ্রাস না পায়। সমুদ্রটাই যথেষ্ট বিক্ষেপ ঘটাচ্ছে, তার বেশি বিক্ষেপ অনিষ্টকর।

রাত্রে যখন সকলে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে তখনো বাদল জানালা খোলা রেখে লাইট-হাউসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। তার ঘুম আসছে না। সে তার চিন্তিত বিষয়ের শেষখানে পৌঁছতে পারছে না। প্রত্যয় তো সোজা। প্রত্যয়কে যুক্তিতে তর্জমা করে

অপরের গ্রহণযোগ্য করা যে কঠিন। আমি আছি, আমার প্রত্যয় হয়। কিন্তু আমি আছি, তোমার প্রত্যয় যদি না হয়? তারপর আমি না হয় আছি, কিন্তু আত্মা আছে, তার প্রমাণ কী? পশুপাখীর আত্মা আছে কি-না তা নিয়ে বহু মতভেদ আছে। একদা খ্রীষ্টীয় পণ্ডিতদের ধারণা ছিল, স্ত্রীলোকের আত্মা নেই। বিজ্ঞান কারুর আত্মার দিশা না পেয়ে ও সম্বন্ধে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করেছে। বাদলের ও সম্বন্ধে প্রত্যয় বড় দুর্বল। কেবল তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে নিজে নিঃসন্দেহ। নিজের অমরত্ব সম্বন্ধে তার মনে আগে কোনোদিন প্রশ্ন জাগে নি। কারণ মৃত্যুর সঙ্গে আগে কোনো দিন তার মুখোমুখি হয় নি। তার মৃত্যুর সম্ভাবনা যে আছে এমন একটা আশঙ্কা তার সর্বপ্রথম হয় যখন সে জাহাজে করে ইংলণ্ডে আসছিল তখন একদিন হঠাৎ এলার্ম দেয়। যে যার ক্যাবিন থেকে লাইফ বেল্ট নিয়ে উপরের ডেকে দৌড়ে যায় ও রিহার্সল দেয়। চতুর্দিকে সমুদ্র। জাহাজ যদি ডুবত তবে লাইফ বেল্ট কিম্বা লাইফ বোট যে তাকে ভাসিয়ে রাখতে পারত সে আশা তার ছিল না। মৃত্যুর সম্ভাবনা থেকে এক ধাপ উপরে অমরত্বের ভাবনা। আমি আছি, কিন্তু চিরকাল থাকব কি না, এ হল তার তৃতীয় জিজ্ঞাসা। তারপরে আত্মা আছে বলে যদি প্রমাণ পাওয়া যায় তবে তা চিরকাল থাকবে কি না তার প্রমাণ প্রয়োজন হবে। চতুর্থ জিজ্ঞাশা তার ওই।

সরাইয়ের অন্য সকলের প্রতি অনুকম্পা মিশ্রিত অবজ্ঞা হয়। সে ভাবছে কত বড় বড় বিষয়, তার মনের ঘুড়ি উড়ছে কোন আকাশে। আর এরা ভাবছে ঘোড়ার খুরের নাল কিংবা গোরুর গায়ের পোকার কথা। কী সামান্য প্রসঙ্গ নিয়ে এদের গভীর আলোচনা। বাদলের কানে পড়লে বাদল কান ফিরিয়ে নেয়, কানে তুলো গোঁজে। কিন্তু যেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ প্রখর হয় অমনি বাদল সতর্ক ভাবে প্রতীক্ষা করে। হয়তো মিসেস মেলভিল একখানা চিঠি এনে তার ঘরের দরজায় টোকা মারলে, বাদল নিয়ে দেখে সুধীদার চিঠি।

সুধীদাকে বাদলের মনে পড়ে। নিষিদ্ধ স্মৃতিকে প্রশ্রয় দিয়ে বাদল একটু সুখ পায়। কী মজা, সুধীদাকে কী ফাঁকিটাই না দিয়েছে! ব্যাঙ্কের ঠিকানায় না লিখে সে বেচারা লেখে কোথায়। তার জন্যে একটু মমতাও হয়। “For he is a jolly good fellow.” কতখানি ভালোবাসে বাদলকে। ডিয়ার ওল্ড সুধীদা।

চিঠির উত্তরে চিঠি লিখে বাদল নিজের ঠিকানাটি ফাঁস করে দেয় আর কি। তৎক্ষণাৎ ছিঁড়ে ফেলল। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু কোন্ খবরের কাগজে? সুধীদা তো টাইম্‌স নিত বলে বাদলের মনে পড়ে। টাইম্‌সে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখাই যাক। বাদল একখানা টাইম্‌স্ আনতে দিল; বিজ্ঞাপনের হার খুঁটিয়ে দেখে বিজ্ঞাপন ও চেক লিখে টাইম্‌সের ঠিকানায় পাঠাল। আশা করা যাক

সুধীদার চোখে পড়বে। কিন্তু যদি না পড়ে? তার প্রতিকার করতে হয়। একবার করলে অন্যান্য বার করতে হয় না এমন প্রতিকার টেলিফোন করা। ভাগ্যক্রমে বাদলের সরাইতে টেলিফোন ছিল। বাদল লণ্ডনের সংযোগ ঘটিয়ে সুধীদার শাখা ও নম্বর উল্লেখ করল। সুধীদা বাড়ী ছিল না। না থাকাই সম্ভব বলে বাদল জানত। সেই শুনে আশ্বস্ত হল। সুজেৎকে বলল, "কোন্‌খান থেকে কথা বলছি জিজ্ঞাসা কোরো না। প্রত্যেক বুধবারে টাইম্‌স্‌ কাগজের personal-স্তম্ভ খুঁজলে আমার খবর পাবে।"

টাইম্‌সের সঙ্গেও বাদল সেই বন্দোবস্ত করল। বুধবারে বিজ্ঞাপন পড়ে বৃহস্পতিবারে সুধীদা ভারতবর্ষের চিঠি ডাকে দেবে। ভারতবর্ষের ওরা হয়তো বাদলের সংবাদ প্রতি সপ্তাহে চায়। বাদলের উপর ওদের কিছুমাত্র দাবি না থাক, বাদলের সংবাদ চাওয়া এমন কিছু অনধিকার-চর্চা নয়; বাদল একদিন একটা world figure হবে; দুনিয়াশুদ্ধ মানুষ জানতে চাইবে সে কেমন আছে ইত্যাদি। তার অটোগ্রাফ ও ফোটোগ্রাফ নেবার জন্যে প্রতিদিন ভিড় হবে, সেই ভিড় কাটিয়ে সে কোন্ চুলোয় যে লুকোবে তাই এক মস্ত সমস্যা। তবু ভক্তবৃন্দকে রয়টারের মারফৎ মোটামুটি সংবাদটা জানিয়ে রাখতে হবে। তখনকার সেক্রেটারীর কাজ এখন তার নিজেকে করতে হচ্ছে, রয়টারের স্থান নিচ্ছে টাইম্‌স্। এইটুকু যা তফাৎ।

৩

ব্রেকফাস্টের পর মিসেস মেলভিল বিছানা ঝাড়তে ও ঘর সাফ করতে আসে। বাদলের উঠে যাওয়া উচিত, কিন্তু উঠতে গা করে না, সে বলে, "তুমি কিছু মনে করবে না তো, মিসেস মেলভিল। করবে?" মিসেস সরল হাসি হেসে বলে, "না, সার। আমি কেন করব, আপনি যদি না করেন!"

বয়স পঞ্চাশের ওপারে। কোঁকড়া কোঁকড়া কাঁচা পাকা চুল। কাঁকড়ার মতো ফুটে বেরিয়ে পড়তে থাকা চোখ। ফুলকো গাল। চাপা নাক। মোটা ঠোঁট। বাঁধানো দাঁত। গায়ের রং ময়লা। প্রথমটা বাদল অনুমান করেছিল জিপসী-জাতীয়া হবে। কিন্তু আলাপ করে ও বংশ-পরিচয় নিয়ে অনুমানটা ভিত্তিহীন বলে জেনেছে। অন্তত মিসেস মেলভিলের মা-বাবার ফোটো দেখে মনে হয় না যে, ওদের কেউ জিপসী। অবশ্য এমন হতে পারে যে ওদের একজনের পূর্বপুরুষ জিপসী ছিল; বংশের উপর মেণ্ডেলিস্‌মের ক্রিয়া চলেছে।

মিসেস মেলভিল লোক বড় ভালো। অনবরত গৃহকর্ম নিয়ে আছে; গৃহকর্মের মধ্যে গৃহপশুর সেবাও পড়ে। গৃহপশু বলাতে পাঠক হয়তো ভেবে বসবেন তার স্বামীটি পশু। তা নয়। লোকটা মিলিটারী চাল দেয় এবং স্ত্রীকে ধরে মারেও বটে, কিন্তু মদ খেয়ে

মাতলামি করে না, বাদলকে কোনোদিন অপমান করেনি। বাদলকে সে ছাত্র বলেই জানে আর ছাত্রকে ইংরেজমাত্রেই সমীহ করে। দু-একবার ভাব জমাবার চেষ্টা করে সফল হয়নি ; বাদল তার স্থূলত রসিকতার মর্ম বোঝেনি। তারপর থেকে সময়ে অসময়ে তার যুদ্ধের মেডেল ঝুলিয়ে একা একা মার্চ করে বেড়ায়, কদাচ বাদলের সঙ্গে চোখাচোখি হলে হল্ট করে bow করে। ৯১৪ সালে সে "Old Contemptible" দলের একজন হয়ে Mons থেকে পিছু হটেছিল। পিছু হটতে জানাও মস্ত গুণ। তারপরে সে Marne-তে লড়েছে, Ypres-এ লড়েছে। অবশেষে আহত হয়ে অব্যাহতি পায় ও সরাই কেনে। তখন থেকে সে এই নিরস্তপাদপ পল্লীর এরণ্ডরূপে অবস্থান করছে। "Mine host"-কে সম্মান দেখায় তার সকল অতিথিই। কেউ কেউ দাম দিতে না পারলে তাকে ক্যাপটেন বলে ডাকে ও মাফ পায়। ক্যাপটেন মেলভিল ভক্তদের কাছে লম্বা ও চওড়া গল্প ফাঁদে, ওরাও তার পাল্টা যা গায় তা বিশুদ্ধ গাঁজাখুরি। মেলভিলের সামরিক কৃতিত্ব যাই হোক, তার সঙ্গে তার অতিথিদের বচসা কিংবা দ্বন্দ্ব কোনো দিন ঘটে না, তাদের নিজেদের মধ্যে যদি বা ঘটতে যায় মেলভিল টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে বলে, "Now boys, তোমাদের ক্যাপটেন তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এটা গৌরবের আকর সংগ্রামভূমি নয়, এখানে মারামারি করে তোমরা কেউ এখন মেডেল পাবে না। তোমরা সকলেই Englishmen and gentlemen ; তোমাদের কেউ Hun নও। অতএব এস আমরা এই সরাইয়ের স্বাস্থ্য পান করি। Ye olde Englishe Inne !" পরিশেষে God save the King গান করে পানকর্তারা বিদায় নেয়।

মেয়ের নাম মেরিয়ন। নিকটবর্তী শহরের স্কুলে পড়াশুনা করত, ওখানকার পড়া শেষ হয়ে গেছে, এখন বাড়ীতে বসে আছে। পড়াশুনায় তার কতটা মনোযোগ ছিল বোঝবার জো নেই। কেননা, সে সার্টিফিকেট যদিও পেয়েছে এবং সরাইয়ের বসবার ঘরে তার মা তার অসংখ্য বই আলমারিতে করে সাজিয়ে রেখেছে তবু কোনো দিন তাকে একখানা মাসিকপত্র বা উপন্যাস পড়তেও দেখা যায় না। তার সব চেয়ে আনন্দ গোরু, ঘোড়া, কুকুর, ভেড়া, শুয়োর ও মুরগিদের পরিচর্যা। সব রকম পশুই তাদের আছে। প্রধানত মেরিয়নের আগ্রহে তার বাবা ওসব কিনেছেন, পুষেছেন ও জন্মসূত্রে সংখ্যায় বাড়িয়েছেন। মেরিয়নের অভিলাষ আছে, লণ্ডনের পশু-পক্ষী প্রদর্শনীতে কুকুর এবং মুরগি পাঠাবে। সেজন্যে সে অতি যত্নে breed করছে। কুলীন কুকুর বা মোরগ যদি কোথাও পায় তবে দাম দিয়ে কেনে, কিনতে না পারলে অন্য বন্দোবস্ত করে। সে তার মায়ের মতো হাসিখুশি কিংবা তার বাপের মতো সাড়ম্বর নয়। সে কথা বলে এত অল্প যে একদিনের পরিচয়ে তাকে বোবা বলে ভুল হতে পারে। তার মাথায় একরাশ কটা চুল কানের কাছে চাকার মতো বিনুনি করে বাঁধা। তার নাকটা যদি খাঁড়ার মতো নেমে এসে

ঝাঁকশির মতো বাঁকা হয়ে উর্ধ্বগতি না হত তবে তার মতো সুগঠিতা সুন্দরী ষোড়শীকে দশ মাইল দূরের পাণিপ্রার্থীরা রাত্রি দিন উত্ত্যক্ত করত। তাকে তার মা-বাবাও ভাবতে দিত না যে Rhode Island Red-এর সঙ্গে Light Sussex কিংবা Leghorn-এর সঙ্গম রামপক্ষী জগতের যুগান্তরকারী ঘটনা। মেয়েকে মনুষ্য সমাজে ধরে রাখা যায় না, কারুর সঙ্গে পরিচয় কবিয়ে দেবার পাঁচ মিনিট পরে সে ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক পলায়ন করে। তাকে দেখে যতক্ষণ না তার ঘোড়ারা চিঁহি চিঁহি করে ওঠে, কুকুররা চোখ বুজে জিভ লক্ লক্ করতে থাকে এবং মোরগরা কক্ কক্ কক্‌য়ে—এ কক্ রব তোলে ততক্ষণ তার প্রাণে শান্তি আসে না। সে ভাবে, এইবার আমার নেলী বুলডগের উপযুক্ত বর খুঁজতে বেরব। কাল যাব স্যাণ্ডাউনে। একজন বড় লোক এসেছেন, সঙ্গে অনেক রকমের কুকুর নিয়ে।

নেলী প্রভৃতি কুকুর ও অপরাপর জন্তুকে মেরিয়ন ঘুরে বেড়াবার ফাঁক দেয় না, কঠোর শাসনে চোখে চোখে রাখে। পাছে তারা যার তাব সঙ্গে মিশে সন্তানের জাত নষ্ট করে। বাদল তার কেনেল আস্তাবল, ডেয়ারী ও পোলট্রি ফার্ম দেখতে যায় নি। গেলে দেখতে পেত মেরিয়ন একাই এক-শ। অবশ্য চাকর চার্লি তাকে সাহায্য করে, কিন্তু চার্লির বয়স হল গিয়ে সত্তরের কাছাকাছি। সেই চার্লি-ই এখানকার আদিম বাসিন্দা, তারই সরাই কিনে নিয়ে মেলভিলরা তাকে চাকর রেখেছে। বুড়োর কোথাও কেউ নেই, খাওয়া দাওয়া করে সরাইতে, শোয় মেরিয়নের পশুশালায়। মেরিয়নের সঙ্গে তার হৃদ্যতা বাক্যালাপের অপেক্ষা রাখে না, তারা বিনা কথায় কথা বলে। মেরিয়ন না থাকলে মেলভিল কোন্ দিন তাকে ভাগিয়ে দিত, কারণ চার্লিকে দেখলে মনে পড়ে যায় যে একদিন এ সমস্তই চার্লির ছিল ও মেলভিল এখানে আগন্তুক। চার্লিকে সরাতে পারলে কেমন চাল দিয়ে বলতে পারা যেত, Ye Olde Englishe Inne যত দিনের মেলভিলরাও এই অঞ্চলে ততদিনের! এখানকার বনেদি বংশ বলে মেলভিল তার পূর্ব পুরুষের নাম ও জন্ম-মৃত্যুর অব্দ সরাইয়ের গায়ে উৎকীর্ণ করে দিত এবং সমাগত অতিথি-দিগের হাতের পেয়ালা ভরে দিয়ে নিজের বংশের টোস্ট নিজেই প্রস্তাব করত :—To the Melvilles of Niton.

৪

বাদল—বাদল! ঘুম তোমার জন্যে নয়। তুমি চির-জাগ্রত মানব। আরাম তোমার জন্যে নয়, তুমি প্রমিথিয়ুসের দোসর। বাদল—বাদল! মানবমন তোমার মনের নামান্তর। তুমি যা চিন্তা করছ তাই মানবের চিন্তা ও চিন্তনীয়। তুমি যে পথ দিয়ে যে প্রান্তে উপনীত হবে, মানব সেই পথ দিয়ে সেই প্রান্তে। তুমি অগ্রসরদের অগ্রণী। তোমার ক্লেশ

ও ক্লান্তি সকলের। বাদল—বাদল!

বাদলের তন্দ্রা ভেঙে গেল। সে চোখ মেলে কাউকে দেখতে পেল না। কে যে তাকে সম্বোধন করল এত রাত্রে, ভাবতে বাদলের গা ছমছম করল। সে উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু বল পেল না। শয্যা যেন তাকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল।

বাদল—বাদল!

কে?

কেউ না। বাদল খোলা জানালা দিয়ে দেখল, সমুদ্র রাত্রি জাগছে। সারা দিনের অশ্রান্ত বীচিভঙ্গের পরেও তার ছুটি নেই। মানবের আদিম সখী। সেই বুঝি বাদলকে সম্বোধন করল। বাদল মনে মনে তাকে প্রীতি জ্ঞাপন করল। কিন্তু চোখ মেলে রাখতে পারল না।

এখানে এসে অবধি তার ঘুম কিছু কিছু হচ্ছে। সমুদ্র ঘুমতে না পারুক, ঘুম পাড়াতে পারে ভালো। কিন্তু যে বাদল একদিন ঘুমের জন্যে সাধ্য-সাধনার বাকি রাখে নি, সেই বাদলই আজ ঘুমকে তার চিন্তার বিঘ্ন মনে করে। ঘুমকে উপেক্ষা করে চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকা যায় না, অবসাদ আসে, উদ্‌ভ্রান্ত বোধ হয়, হতাশ হয়ে আজকের চিন্তা কাল পর্যন্ত তুলে রাখতে হয়। তার ফলে কাল সব কথা মনে পড়ে না, গোড়া থেকে শুরু করতে হয়, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করতে হয়। তবু কতকগুলো ভাব চিরকালের মতো ফেরার হয়ে যায়, স্মরণের সরণি বেয়ে তাদের নাগাল পাওয়া যায় না। বাদলের বড্ড মন খারাপ হয়ে যায়। এক একটি আইডিয়া এক একটি দুর্লভ রত্ন। একবার হারালে আবার চোখে পড়ে না। কেন যে বাদল নোট বুকে টুকে রাখল না! কিন্তু টুকে রাখবার সময় কোথায়! ভাব যখন আসে তখন ঝাঁকে ঝাঁকে আসে। একটিকে খাঁচায় পুরতে বসলে বাকিগুলি ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়। নোট বুকে না, স্মৃতিপটে টুকে রাখতে পারলে কাজে লাগত। বাদল স্মৃতিলেখনীর মুখে শান দেয়। রাত্রে ঘুম ভাঙলে স্মরণ করতে থাকে ঘুমের আগে কী ভাবছিল। এই ব্যায়ামের ফলে বাদল শ্রুতিধর হয়ে উঠেছে বললে চলে। কিন্তু ঘুম যেটুকু সময় হয় সেটুকু সময় বড় জোর পুরাতন চিন্তাকে টিঁকিয়ে রাখা যায়, নূতন চিন্তা থাকে স্থগিত। নূতনকে পেছিয়ে দেওয়া বাদলের পক্ষে যার-পর-নাই লজ্জাকর। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চারটে ঘণ্টা সে ঘুমিয়ে সুখ পায়, এই সুখের কথা তার যখনি মনে পড়ে সে লুকিয়ে লজ্জা পায়।

আহার সম্বন্ধে সে চিরকাল উদাসীন। গোপালের মতো সুবোধ, যা পায় তাই খায়, পীড়াপীড়ি করলে তার কী খেতে ইচ্ছা করে তা বলে, কিন্তু ঠিক জিনিসটি পায় না। ভদ্রতার অনুরোধে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, হাঁ, চমৎকার হয়েছে খেতে। পরিণামে মিসেস্ মেলভিল বার বার সেই জিনিস রাঁধে।

আহারক্রিয়াও সময়সাপেক্ষ। বাদল খবরের কাগজ পড়তে পড়তে খায়, একসঙ্গে দুই অকাজ সারা করে। ভালো পরিপাক হয় না, বার বার একটি বিশেষ স্থানে ছুটতে হয়। ইংলণ্ডের মফঃস্বলে ওরূপ স্থানে যেমন দুর্গন্ধ তেমনি অপরিচ্ছন্নতা। সুতরাং বাদল রাগ করে খাওয়া দিল কমিয়ে। রাত্রে খায় না, সন্ধ্যার আগে High Tea খেয়ে মনকে বোঝায়, যাবতীয় শারীর ক্রিয়া মানসিক ক্রিয়ার বিক্ষেপ ঘটায়। বৈজ্ঞানিকরা এত কিছু আবিষ্কার করছে ; ইঞ্জেকশন দিয়ে শরীরের মধ্যে আবশ্যক পরিমাণ পুষ্টি প্রবিষ্ট করতে পারে না ? কাজটা পাকস্থলীর সাহায্যে হয় বলেই না উক্ত স্থানবিশেষে দৌড়াদৌড়ি করা ?

সরাইয়ের বাইরে পদক্ষেপ করে না, অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করে না, মেরিয়নের জীবজন্তু দেখতে যায় না ও চায় না, মদ কিংবা সিগ্‌রেট খায় না—এ কেমনধারা মানুষ ? কী এখানে এর কাজ ? শরীর সারাতে যারা আসে তারা সারাদিন ঘরে বসে থাকে না, সরাইওয়ালার ঘোড়া ভাড়া করে সমুদ্রের ধারে বেড়ায়, টেনিস্ কোর্ট ভাড়া করে টেনিস্ খেলে, সন্ধ্যা হলে নিত্য নূতন বোতলের ছিপি খোলায় তাদের সেবার জন্যে গ্রামে দু-একঘর সেবাদাসীও মজুত। মেলভিল শরীর সারানোর কোনো উপকরণ বাদ দেয় নি।

যা হোক, কাঁচা টাকা পকেটে আসছে। ছোকরার মতলব যাই হোক, চোখ বুজে বিল শোধ করে। তাই তাকে চোখ বুজে ঠকানো যায়। ন পেনীর ঘরে ন শিলিং লিখতে মেলভিল সংকোচ বোধ করে না। কেনই বা করবে ? বোতল বলতে গেলে বাদলের হাতের কাছে রয়েছে। ইচ্ছা করলেই খুলিয়ে নিতে পারত। ইচ্ছা করেনি বলে মাফ পাবে না। দাম দিতে হবে। মিসেস্ মেলভিল চোখে ভালো দেখতে পায় না, আঁক কষতে একেবারেই জানে না, স্বামী যে ন পেনীর জায়গায় ন শিলিং লিখছে বেচারি সংখ্যার সঙ্গে সংখ্যা যোগ দেবার সময় টের পায় না। মেয়েকে শিক্ষিতা করবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে সে নিজেকে শিক্ষিতা করবার প্রয়োজন বোধ করেনি।

চার চারটে সপ্তাহ চলে গেল। মেলভিলদের কাছে তার ক্যাপাসি বেশ লাভজনক হয়ে এসেছে। এমন সময় যোগানন্দের টেলিগ্রামখানা স্বধীর খামে ভর্তি হয়ে হাজির হল। কে এক যোগানন্দ বাদলের খবর জানতে চান। বাদলের স্মৃতি পশ্চাদ্গমন করতে করতে অবশেষে হোঁচট খেয়ে থামল। ক্যাপ্‌টেন ওয়াই গুপ্ত, বাদলের শ্বশুর। বাদলের মনে পড়ে গেল, সে এই ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোকের একটি কন্যাকে ভারতবর্ষীয় পদ্ধতিতে বিবাহ করেছে এবং সে বিবাহ অদ্যাপি বলবৎ আছে। কী আপদ। ব্যাঙ্কের লোকগুলো কেন যে এই সব চিঠি বাদলের কাছে আসতে দেয়! ব্যাঙ্কের উপর, সুধীদার উপর, যোগানন্দের উপর সে প্রথমটা খুব চটে গেল। এক ব্যক্তির তথাকথিত বিবাহের অধি-

কারে এক ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তার মতো বিশ্বভাবুকের সম্বন্ধে অশিষ্ট কৌতূহল প্রকাশ করেছেন, এ যে অসহনীয়। কোনো ফিলিপিনো যদি টেলিগ্রাম করে জানতে চায়, "Where is Bernard ! Why Reuter's message ?" তবে কি বার্ণার্ড শ তার উত্তর দিতে বাধ্য হবেন ?

টেলিগ্রামখানা বাদল ছুঁড়ে ফেলে দিল। ফেলে দিয়ে তার মনে হল, এত লোক থাকতে ইনি এত অর্থ ব্যয় করে cable করলেন আমার খোঁজ নিতে। কারণ কী ? তার মনে পড়ল যোগানন্দের বিগত দিনের একটি উক্তি, "চিন্তা-জগতের ঘোড়দৌড়ে তোমার উপর বাজি রেখেছি, বাদল।" আহা, লোকটা বেশ তো। বাদল টেলিগ্রামখানা উঠিয়ে রাখল। অশিষ্ট কৌতূহল নয়, যুক্তিযুক্ত উৎকণ্ঠা। বাদলের মনটা ভিজল। সে টাইম্‌স কাগজে বিজ্ঞাপন দিল, BADAL TO CAPTAIN GUPTA ইত্যাদি।

তার কয়েকদিন পরে আবার এক টেলিগ্রাম। সুধীকে মহিমচন্দ্র জানিয়েছেন, যোগানন্দ হার্ট ফেল করে মারা গেছেন। বাদল কিছুক্ষণ থ হয়ে রইল। তারপর খুশি হয়ে নিজের মনকে বলল, যোগানন্দ নেই। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে, আমি আছি। তারপর উচ্চৈঃস্বরে বলল, থ্রী-চীয়ার্স ফর মাইসেল্‌ফ্‌. হিপ্‌ হিপ্‌ হুরে।...ধন্যবাদ ক্যাপ্‌টেন গুপ্ত। আপনি আমাকে আমার প্রথম জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে গেলেন।

৫

এমন অভাবিত ভাবে তার প্রথম জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়ে বাদল নিজের ঘরে নিজের খেয়াল মতো কিছুক্ষণ নাচল। তার মাথার উপর থেকে কত বড় একটা বোঝা নেমে গেছে।

সে যে আছে এ বিষয়ে তার প্রত্যয় ছিল ; প্রত্যয় না থাকলে সে লিখত না, SUDHIDA, I AM. কিন্তু প্রত্যয় এক কথা, প্রমাণ অন্য কথা। প্রমাণের অভাবে সে দিশাহারা বোধ করছিল। প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রমাণ যোগ দিতেই সে দিশা পেল।

যোগানন্দ নেই, এই থেকে প্রমাণ হচ্ছে বাদল আছে। বাদল না থাকলে বাদলের থাকা যদিও অপ্রমাণ হত না, তবু প্রমাণসাপেক্ষ হত। এখন কেমন অনায়াসে তুলনার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, একজন নেই, অন্যজন আছে।

জীবনের প্রমাণ মরণে। অস্তিত্বের প্রমাণ নাস্তিত্বে। নেতি নেতি করতে করতে ইতি ইতি। এই হল ইনটেলেক্‌টের মার্গ। বাদলের মার্গ। আত্মগরিমায় স্ফীত হয়ে বাদল বিস্মৃত হল যে, যোগানন্দের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জ্ঞাপন করা তার সময়োচিত কর্তব্য। খামকা টাইম্‌স্‌ কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বসল, SUDHIDA, I CERTAINLY AM.

ওঃ কী আরাম! কী স্বস্তি! সমুদ্রে জাহাজ ডুবে গেছে; সাঁতার কাটতে কাটতে একাকী যাত্রী অজ্ঞাত দ্বীপে উত্তীর্ণ হয়েছে; কাল কী খাবে, কোথায় যাবে, তা কালকের ভাবনা; আজ শুধু কী স্বস্তি! কী আরাম!

বাদল দোতলা থেকে নেমে পড়ল। মাটিতে পা ঠেকাতে তার ভারি অদ্ভুত বোধ হচ্ছিল। চলি-চলি পা-পা করতে করতে যেখানটাতে গিয়ে পড়ল সেখানে চার্লি ঘোড়ার পিঠ ডলছে। বাদলকে দেখে টুপি উঠিয়ে বলল, "গুড মর্ণিং, সার।" বাদল আলাপ জমিয়ে তুলল।

তিনটে ঘোড়া এগারটা কুকুর বাহান্নটা শূওর আটটা গোরু বিরাশীটা মুরগি (মায় মুরগির ছানা)—মেরিয়ন মন্দ আয়োজন করেনি। তবে চার্লির বয়সের অনুপাতে খাটুনির বরাদ্দ কিছু কম করলে ভালো করত। মেরিয়নকে এ বিষয়ে বলা দরকার; কিন্তু বলে লাভ নেই, তার বাবা চার্লির বুড়ো হাড় ক'খানা কবরস্থ করবার আগে অন্য লোক বহাল করবে না।

বাদল ঘোড়াগুলোর পিঠ চাপড়াল। কোনোটাকে সোহাগ করে বলল, "Old Dobbin"; কোনোটাকে আদর করে ডাকল, "Jill." শূওরগুলোর কাছে ভিড়ল না। কুকুরদের কোনোটাকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। ছোট বেলায় বাদলকে একবার কুকুরে কামড়ায়, সেই থেকে কুকুরের উপর তার বিষম সন্দেহ। যতক্ষণ শিকলে বাঁধা অবস্থায় বিশ হাত দূরে থাকে ততক্ষণ বাদল তাকে হাসিমুখে সম্বর্ধনা করে, শিস্ দিয়ে ডাকে। কিন্তু বেচারা কুকুর ছুটে আসতে চেয়ে যেই শিকলে আটকা পড়ে এবং একবার উঁ ইঁ ইত্যাদি চন্দ্রবিন্দু-বিশিষ্ট অস্পষ্ট ধ্বনি করে ও একবার ঘেউ ঘেউ করে ওঠে তখন বাদল রীতিমত ভড়কে যায় ও ধীরে ধীরে পিছু হাঁটতে লাগে।

মুরগি দেখে বাদলের জিবে জল আসে আর কি! মেরিয়ন তাদেরকে দানা খাইয়ে মানুষ করছে, অর্থাৎ মুরগিই করছে যদিও মানুষের মতো তাদেরও একজোড়া পা। সরাইয়ের অতিথিদের জন্যে বাজারের মুরগি আমদানি হয়, মেরিয়ন তার মুরগিবংশ ধ্বংস হতে দেয় না। তার অসাক্ষাতে মেলভিল একটাকে জবাই করেছিল, টের পেয়ে মেরিয়ন এমন অনর্থ বাধায় যে, মেলভিলকে সেই জাতের তেমনি একটা মুরগি আনিয়ে দিয়ে শান্তি পেতে হয়। চার্লির কাছে গল্পটা শুনে বাদলকেও লোভ সম্বরণ করতে হল।

বাইসিক্ল থেকে মেরিয়ন নামল। সে কোথায় কী একটা কাজে গেছল, ফিরল ম্লান মুখে, অন্যমনস্ক ভাবে। অনেকক্ষণ যাবৎ বাদলকে লক্ষ্য করল না, যখন করল তখন চমকে উঠল। বাদল তাকে কত কথা বলবে ভাবছিল, কিন্তু হঠাৎ ভুলে গেল। দু পক্ষই নিঃশব্দ, নিশ্চল। চার্লি ইত্যবসরে সরে গেছে বাইসিক্ল তুলে রাখতে। আকাশ সেদিন আলোর ভারে ভেঙে পড়ছিল। সূর্য যেন একটি রঙীন বড় ফল, অদৃশ্য বৃন্তে

জ্বলছে। তার তেজ দগ্ধ করবার মতো নয়। বাদলের মনটা আকাশের মতো পরিষ্কার ছিল। সেখানেও লাল আগুনের উত্তাপহীন দীপ্তি। সে আছে, নিশ্চিতরূপে আছে, কোনোমতে অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সে আছে। নেই যোগানন্দ। তিনি জগতের কোথাও নেই, একথা অবশ্য বলা যায় না—প্রমাণাভাব। কিন্তু তিনি পৃথিবীতে নেই, মানবের মাঝে নেই, বাদলের জ্ঞাতসারে নেই। বাদলের মনটা অস্তিত্বের প্রাধান্যের উপলব্ধিতে ভরে রয়েছিল। তার যে হাসি পাচ্ছিল তা নয়। জ্বর থেকে উঠলে প্রথম প্রথম যেমন লাগে তেমনি। আশ্চর্য লাগছিল, নতুন লাগছিল। মেরিয়নকে তার চোখে অপূর্ব ঠেকছিল। মেরিয়নের দুধের মতো শাদা পশমের ফ্রক তার দুধের মতো শাদা গায়ের রঙের সঙ্গে বেমালুম মিশে গেছল, কেবল তার গাল দুটিতে আলতার আমেজ। রাজহংসীর সঙ্গে তার তুলনা হয়। সে যে বাদলকে দেখে কী ভাবছিল সে-ই জানে। হয়তো ভাবছিল, এই মজার মানুষটিকে কোনোদিন দোতলা থেকে নামতে দেখা যায় নি; আজ এমন কী ঘটল যাতে ইনি সশরীরে আমার রাজ্যে পদার্পণ করলেন। চেহারা থেকে মনে হয়, ভিন্ন দেশের মানুষ; কী জন্যে এত দিন এখানে আছেন বোঝা যায় না, হয়তো খুব পড়াশুনা করেন। ভয়ানক রোগা; পেট ভরে খান না বলে মার কাছে শুনি; খেলাধুলা করেন না; দেখে বড় দয়া হয়।

তাদের দুজনকে তাদের অচল অবস্থা থেকে উদ্ধার করল চার্লি। বলল, "ডাক্তারকে ফোন করতে হবে, মেরিয়ন। 'সেরা'র বাছুরটা কেমন করছে।" মেরিয়ন বাদলকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ছুটে চলে গেল।

৬

পরদিন সূর্য উঠল না। আকাশের মেঘ ছায়ার মিশাল দিয়ে সমুদ্রের জলকে কালো কালির মতো করল। যেখানটাতে আকাশ ও সমুদ্র একাকার হয়েছে কেবল সেই-খানটাতে কালো পাখীর গলায় শাদা রোঁয়ার মতো সঙ্কীর্ণ শ্বেত ব্যবধান।

বাদল সেইদিকে চেয়ে অনেকক্ষণ কাটাল। পূর্ব দিবসের সর্বব্যাপী উজ্জ্বলতার সেইটুকু অবশেষ বাদলের বাইরে ও ভিতরে কেমন এক বিষাদের ভাব সঞ্চার করেছিল। কাল যাকে যুক্তিসহ মনে হয়েছিল আজ তার থেকে সামান্য সান্ত্বনা পাওয়া যাচ্ছে। যোগানন্দ নেই, আমি আছি। কিন্তু ক'দিন আছি? কাল হয়তো দেখা যাবে আমিও নেই, আছে মেরিয়ন, আছে মেলভিল, আছে 'সেরা' নামক একটা গাই। দিগন্তের প্রান্তে ঐ রজত-রেখার মতো থাকবে কেবল আমার ক্ষীণ স্মৃতি। থাকবে, কিন্তু ক'জনের মনে? আমার পরিচয় ক'টা মানুষ পেয়েছে? কই আমার কাব্য নাটক সঙ্গীত দার্শনিক নিবন্ধ রাজনৈতিক বক্তৃতা ঐতিহাসিক কীর্তি? সঙ্কল্প আছে, সিদ্ধি কই, সিদ্ধি সম্বন্ধে রটনা কই?

অন্তত গোটা দশেক বছর আমার দরকার। কিন্তু যদি আজই হার্ট ফেল করে মরি ?

মৃত্যুর সম্ভাবনায় বাদলের চোখে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার নেমে এল। কোথাকার হিমেল বাতাস তার পোশাক ভেদ করে হাড়ে ঠেকতে থাকল। সে আগুন জ্বালিয়ে আগুনের কাছে বসবে ভাবল, কিন্তু তার হাত পা যেন পক্ষাঘাত রোগীর। তার মনে হল যেন তার মস্তিষ্কেরও পক্ষাঘাত হবে। এই কথা মনে হতেই তার বাঁচবার স্পৃহাও লোপ পেল।

এমন অবস্থায় কতক্ষণ কেটে গেল তার খেয়াল ছিল না। হয়তো সারাদিন খেয়াল থাকত না। খেয়াল হল যখন বুড়ী মেলভিল দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, "মিস্টার সেন, আপনার High Tea।" বাদল কোনোমতে বলতে পারল, "আচ্ছা, নিয়ে এস।"

বুড়ী বলল, "এ কি মিস্টার সেন! আপনার কি—আপনার কি—অসুখ করেছে ?"

বাদলের গা তখনো কাঁপছিল ও মুখখানা পাণ্ডুর দেখাচ্ছিল। সে কোনোমতে বলল, "না। বড় ঠাণ্ডা। আগুন।"

বুড়ীর বিশ্বাস হল না। সে টুপ করে নীচে নেমে গিয়ে থার্মোমিটারটা নিয়ে এল। বাদল বাধা দিল না। তাপ পরীক্ষা করে বুড়ী বলল, "এমন কিছু নয়। কিন্তু কাপড়টা ছেড়ে ফেলুন, আমি বাইরে যাচ্ছি।"

দশ মিনিট পরে বুড়ী ফিরে এসে দেখল বাদল তেমনি বসে আছে। সে বুঝতে পারল। আবার ছুটল নীচে। মেলভিল উঠে এল সশব্দ পদক্ষেপে। বাদলকে কিছু বলতে না দিয়ে তার পোশাক ফেলল খুলে। তার গা ভালো করে তোয়ালে দিয়ে মুছে হাত দিয়ে ডলে মিলিটারী কায়দায় তাকে ঘুষি মেরে চিম্‌টি কেটে কাতুকুতু দিয়ে প্রায় কাঁদিয়ে তুলল। এই আসুরিক চিকিৎসার পরে তাকে গরম কাপড়ে মুড়ে হিড় হিড় করে টেনে নীচের তলায় নিয়ে গেল। সেখানে আধ আউন্স ব্রাণ্ডি তার মুখে ঢেলে দিল।

এর পরেও যদি বাদলের অসুখ না সারে তবে অসুখটাকে নেহাৎ বেরসিক বলতে হবে। বাদল ফিক্ করে হেসে উঠল। তারপরে হো হো করে উঠল। বলল, "ওগুলো কি সসেজ্ ? দেখি, দেখি, ভারি মজার জিনিস তো ? বা বেশ লাগছে খেতে।"

খাচ্ছে তো খাচ্ছে। এটা দেখি, ওটা দেখি, স্যাণ্ড্ উইচ্ দেখি, পাই দেখি, য়্যাঙ্কোভি ও চীস্ দেখি। কিন্তু সে-ই একলা দেখবে ? তিনজন পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক সে ঘরে বসেছিল। তাদের একজন বলল, "ব্ল্যাক্‌বার্ড, ডিয়ার ওল্ড ব্ল্যাক্‌বার্ড, আমরা কি একটু আধটু দেখতে পাইনে ?"

অন্য সময় হলে বাদল 'ব্ল্যাক্‌বার্ড' সম্বোধন শুনে ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হত, তখন তাকে 'রেড্ হেরিং' বললে নেহাৎ ভুল বলা হত না। কিন্তু আধ আউন্সের প্রতিক্রিয়া তাকে দিলদরিয়া করে তুলেছিল। সে গলে গিয়ে বললে, "নিশ্চয়। দাও তো গো বার মেড্,—না কী বলে তোমাকে—দাও এঁরা যা খেতে চান। আর আমাকে দাও আর একটু

পারীয়,—না, না, ওটা না, ঐ—ঐ—লাল প্রবালের মতো রঙীন—"

সেদিনকার সভা থেকে মিসেস্ মেলভিল তাকে উদ্ধার না করলে সে হয়তো সত্যিই মারা যেত। স্বামীকে খবর দিয়ে বুড়ী ঝকমারি করেছিল, চার্লিকে খবর দিলে পারত। তখন তো আর জানত না যে স্বামীর একটা স্বকীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি আছে এবং সেই পদ্ধতি সে হতভাগ্য বিদেশী যুবকটির উপর প্রয়োগ করবে। বুড়ী স্থির করল আজ শোবার ঘরে ভীষণ ঝগড়া করবে। নিজের ছেলে না হোক মায়ের ছেলে তো।

বাদলকে ঘরে নিয়ে যাবার সময় তার পদভারে মেদিনী টলমল করছিল। বাদল ভাবছিল, আছি, প্রবলভাবে আছি, কার সাধ্য আমার অস্তিত্ব ঘোচায়? মাটি আমার ভয়ে কাঁপছে, আকাশ আমার ভয়ে ঘুরছে, আমার শরীর যে তাপ বিকীরণ করছে তাতে আগুন লজ্জা পায়। হা হা হা। হা হা হা। মৃতদেহের শীতলতা এই দেহে আসতে অনেক দেরি—হয়তো হাজার বছর। আমি যে মেথুসেলার দোসর হব না তার প্রমাণ কই? হা হা হা—that's the point, প্রমাণ কই? আমার মৃত্যু যে হবে, কিংবা ইতিমধ্যে হয়েছে তার প্রমাণ কেউ আমাকে দিতে পারবে না। বাদল হার্টফেল করে মরেছে বলা বড় সোজা—কিন্তু বাদলের কাছে প্রমাণ করে দাও দেখি যে বাদল মৃত? মৃত্যুর্নাস্তি প্রমাণাভাবাৎ।

৭

তা হলে দাঁড়াল এই যে বাদল নেই, এ কথা অপরে একদিন বলতে পারে, কিন্তু বাদল কস্মিনকালে এর প্রমাণ পাবে না। পৃথিবীর লোকে বলে, সূর্য অস্ত গেল, কিন্তু সূর্য কি জানে সে কখন অস্ত গেল, কেমন করে কবে অস্ত গেল? অস্তগমন নয়, অস্তিত্ব তার পক্ষে সত্য। তেমনি বাদলের পক্ষে সত্য, মরণ নয়, অমরত্ব।

বেশ, তা না হয় হল—বাদল আবার তার ঘরের জানালার ধারে বসে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে টেনিস খেলা দেখতে দেখতে চিন্তা করছিল—বেশ, তা না হয় হল, কিন্তু অমরত্ব বলতে কি এই বোঝায় যে বাদল কোনোদিন হার্ট ফেল করবে না, তার শরীরকে গোর দেওয়া হবে না, পৃথিবীর লোক তার অভাব বোধ করবে না? এ কি বিশ্বাসযোগ্য যে তার চুল পাকবে না, দাঁত পড়বে না, মেরুদণ্ড বাঁকবে না, মস্তিষ্ক বিকৃত হবে না, সে আজ যেমনটি আছে আশী বছর বয়সে তেমনি থাকবে? না, না, আশী বছরের বেশী বাঁচা উচিত নয়, মানুষের যা প্রধান সম্পদ—মস্তিষ্কযন্ত্র—তার কলকব্জা ততদিন মজবুত থাকবে না। মননক্রিয়া পুরানো ঘড়ির চলার মতো মন্থর হবে, অনির্ভরযোগ্য হবে। কল যদি বিকল হয় তবে তার মতো উৎপাত আর নেই।

লোকে যাকে বলে মরণ বাদলের তা চাই-ই। তবু সে যে আছে এ উপলব্ধি তার

মরবার নয়। সে মরবে অথচ তার অস্তিত্বের উপলব্ধি মরবে না, এ কেমনতর হেঁয়ালি ? দেহ যদি যায়, সেই সঙ্গে মস্তিষ্কও যদি যায়, সেই সঙ্গে মননশক্তি যদি যায়, তবে কোনো উপলব্ধি থাকবেই বা কেমন করে আর থাকলেই বা কী ? বাদল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ধর্মগ্রন্থে বলে আত্মা অবিনশ্বর। আত্মা যে কী তা-ই বাদল জানে না। আত্মা যে আছে তা-ই প্রমাণসাপেক্ষ। তবু ধরা যাক আত্মা অবিনশ্বর। কিন্তু আত্মা নিয়ে বাদল করবে কী যদি মন না থাকে, স্মৃতি না থাকে, মেধা না থাকে, বিচার বুদ্ধি না থাকে ? তবে কি ধরে নিতে হবে যে এগুলো আত্মার সামিল ? তাই যদি হয় তবে দেহের বয়স অনুসারে এগুলোর বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটে কেমন করে ? মাথায় চোট লাগলে বুদ্ধি ঘুলিয়ে যায় কেন ?

গত রাত্রের পানভোজন বাদলকে সাময়িক উত্তেজনার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দীর্ঘকালীন বিষণ্ণতায় উত্তীর্ণ করে দিয়ে তার স্মরণ থেকে বিদায় নিয়েছিল। কারণটা দৈহিক, কিন্তু ক্রিয়াটা চলছিল মনের উপর। বাদলের মন সেটা আঁচতে পারছিল না। পারলে বলত, দেখলে তো ? যা বলছিলুম। মন আত্মার অধীন নয়, দেহের অধীন। কিংবা দেহের সঙ্গে তার সোদর সম্পর্ক, ওরা যমজ। মাঝখান থেকে আত্মাকে টেনে আনবার দরকার ছিল না। আমি আছি এই কি যথেষ্ট নয় ? আমার আত্মা যদি নাও থাকে তবে কি আমার অস্তিত্বের কোনো হানি হয় ? সেকালে বলত স্ত্রীলোকের আত্মা নেই। তা সত্ত্বেও স্ত্রীলোকের দ্বারা বংশরক্ষা হয়ে এসেছে, রাজ্যশাসন শিল্পসৃষ্টি লোকসেবা হয়েছে। এখনো বলে পশুপাখীর আত্মা নেই, কিন্তু পশুর মতো স্বভাবত স্বাস্থ্যবান, পাখীর মতো স্বভাবত স্বাধীন হতে কোন মানুষের না সাধ যায় ? আমি যদি ঐ Sea Gull-দের একতম হয়ে থাকতুম তবে মস্তিষ্কের অভাবে আমার মননক্রিয়া বন্ধ হত কিন্তু তা ছাড়া অন্য কোনো ক্ষতি ঘটত কি ? বরঞ্চ যখন যেখানে খুশি উড়ে বেড়ানো যেত, ট্রেন কিংবা বাস্-এর মুখাপেক্ষী হতে হত না, পাথেয় সংগ্রহ না করতে পেরে চারটি বছর ভারতবর্ষে অপচয় হত না, বাধ্য হয়ে একটা অচেনা মেয়েব সঙ্গে বিবাহের অভিনয় করতে হত না।

কে বলবে কোটী কোটী ব্যাকটিরিয়ার আত্মা আছে ? তা হলে তো আমার দেহকে আশ্রয় করে কোটী কোটী আত্মা আছে বলতে হবে। সংখ্যাতীত ব্যাধিবীজ যত্রতত্র বিচরণ করছে। তাদেরও তবে আত্মা আছে ? বাদল বিদ্রূপের হাসি হাসল। টেনিস বলের আত্মা নেই ? যে ঘাসের উপর খেলা হচ্ছে তার আত্মা নেই ?

দেহ হচ্ছে অত্যন্ত ডেমক্রাটিক পদার্থ। সকলের তা আছে। মনও আছে সকলেরই, কিন্তু মস্তিষ্ক যতটুকু মনও ততটুকু, কিংবা মস্তিষ্কের সম্ভাবনা যে পরিমাণ মনেরও সম্ভাবনা সেই পরিমাণ। মানুষ বড় কেন ? কারণ, মানুষের মস্তিষ্ক সর্বাপেক্ষা জটিল। মানুষের আত্মা আছে বলে মানুষ বড় এ যারা বলে তারা মানুষের প্রকৃত গৌরব যে মস্তিষ্ক তার চর্চা করে না, তাই তাদের উক্তি যুক্তি নয়, তা বিচারের অযোগ্য।

কিছুক্ষণের মতো নিশ্চিন্ত হয়ে বাদল খেলা দেখতে থাকল। তার নিজের ইচ্ছা করছিল খেলতে, কিন্তু তার নিজের র‍্যাকেট ছিল না, পরের কাছে চাইতে লজ্জা করছিল। দ্বিতীয়ত, খেলার অভ্যাস নেই, কেন হাস্যাস্পদ হতে যাবে ? এমনিতেই সে বিমর্ষ হয়ে রয়েছে। সে আছে, সে থাকবে, কিন্তু তার দেহ মন যদি না থাকে তবে সে কী নিয়ে থাকবে বুঝতে পারছে না। সে কি দেহ-মন-নিরপেক্ষ হয়ে থাকতে পারে ? যদি পারে তো 'সে' কে ? তার 'আমি' কে ? কোনো প্রকার রহস্য বাদল মানে না, ম্যাজিকের প্রতি তার উৎকট অশ্রদ্ধা। কিন্তু এ এক পরম রহস্য যে আমি আছি ও থাকব, অথচ আমি দেহমন-নিরপেক্ষ কি দেহমনেরই একটা বিশিষ্ট নামরূপ তাই বোধগম্য হচ্ছে না। আমি কি একটা compound—যার সূত্র B^2CS^2 ? অথবা আমি যাবতীয় সংজ্ঞার অতীত ?

এক তরুণীর সঙ্গে এক প্রৌঢ়ের খেলা খেলাছাড়া অন্য কারণে দর্শনযোগ্য হয়েছিল। প্রৌঢ়টি বল সার্ভ করবার সময় ডান হাত উঁচিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গী করছিল, কেবল মুখের নয়, হাতেরও। তার হাত কাঁপছে বলে মনে হচ্ছিল। অথচ তার বল পড়ছিল বেশ জোরের সঙ্গে এবং তরুণীর হাতের কাছ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। তরুণী ফড়িঙের মতো লাফাতে লাফাতে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রৌঢ়ের দিকে কোপদৃষ্টিক্ষেপ করলে প্রৌঢ় দু-একটা পয়েন্ট তাকে দান করে মানভঞ্জন করছিল।

এরা আজ সকালে টু সীটার মোটরগাড়ীতে কোথেকে এসেছে। চা খেয়ে আজকেই কোথায় চলে যাবে। হয়তো লণ্ডনের লোক। বাদলের ইচ্ছে করে জিজ্ঞাসা করতে, "কেমন আছে লণ্ডন ? গুড ওল্ড লণ্ডন ? কাগজে দেখছিলুম মস্কো আর্ট থিয়েটার লণ্ডনে এসেছে। কেমন অভিনয় করছে তারা ? চমৎকার। না ? মেরিলবোনে কন্‌সারভেটিভরাই জিতল ? অবশ্য ওখানে ওরা সনাতন। তারপর ? বাজেট নিয়ে পার্লামেণ্টে খুব তামাশা হচ্ছে ? চার্চিল কেরোসিন ট্যাক্সের প্রস্তাব প্রত্যাহার করেছেন ? চার্চিলের দোষ কি, আমিই জানতুম না যে আমাদের দেশে কেরোসিনের বাতি জ্বলে ও সে বাতি গরীবরাই জ্বালায়।"

কিন্তু না। নীচের তলায় নামা হবে না। মনটাকে বিক্ষিপ্ত করা হবে না। আগে এই কুটিল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাক—কী নিয়ে চিরকাল থাকব ?

৮

দিন দশেক পরে বাদল দিশা পেল। মেঘলা রাত্রের শেষে সূর্য উঠল না, কিন্তু মেঘের ওপারের আলো এ পারে বিচ্ছুরিত হল। চোখ ঝলসে দেবার মতো নয়, অথচ পথ দেখিয়ে দেবার মতো।

বাদল উপলব্ধি করল দুটো সত্য আছে। একটা to be ; অন্যটা to have। একটার কথা 'আমি আছি', অন্যটার কথা 'আমার আছে'। প্রথমটাকে নিয়ে কোনো গোলমাল নেই, আমি আছি, আমি থাকব। গোলমাল দ্বিতীয়টাকে নিয়ে। আমার দেহ আছে, মন আছে, স্মৃতি আছে, চেতনা আছে। আমার নাম আছে, রূপ আছে, বংশ আছে, বংশপরম্পরা আছে। এতগুলো কি থাকবে? যতদূর চোখ যায় একমাত্র বংশপরম্পরা হয়তো থাকবে। কিন্তু বাকি সমস্ত যাবে। খ্যাতিও। এক কোটি বৎসর পরে হয়তো রক্ত চিহ্নও মুছে যাবে। মানবজাতি যে নির্বংশ হবে না—ডাইনোসরের মতো—তার নিশ্চয়তা কই? পৃথিবীর তাপহানির সঙ্গে প্রাণীমাত্রের প্রাণহানি ঘটা বিচিত্র নয়। পৃথিবীর বাইরে কোথাও প্রাণ আছে কি না জ্যোতির্বিদগণ এই ধাঁধার জবাব দিচ্ছেন একো জনা একো রকম। বাদলের বিশ্বাস একমাত্র পৃথিবীতেই প্রাণের অনুকূল শীতাতপ কয়েক কোটী বছর সম্ভব হয়েছে। যদি প্রাণীদের মধ্যে এ প্রকার বুদ্ধি ও উদ্যম অভিব্যক্ত হয় যে পৃথিবীর টেম্পারেচারকে তারা স্ব ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত করতে পারে অথবা নিজেরা এ প্রকার বিবর্তিত হয় যে, নিরুত্তাপ পৃথিবীর সঙ্গে খাপ খেতে পারে, তবে সৌরজগতে যতকাল মাধ্যাকর্ষণ থাকবে পৃথিবীতে ততদিন প্রাণী থাকবে। কে জানে হয়তো প্রাণ নিজের পক্ষে অনুকূল অপর কোনো গ্রহে উপনিবেশ করবে। মর, ভীনাসের তাপ যদি কালক্রমে জুড়ায় ও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া যদি সাধ্য হয় তবে প্রাণের জয়জয়কার।

প্রাণের প্রতি—প্রাণী সমাজের প্রতি—বাদলের মমতা থাকলেও সে এইবার জেনেছে, প্রাণই অস্তিত্বের শেষ কথা নয়, সব কথা নয়। পৃথিবী যেমন জগৎ পারাবারের একটি তরঙ্গ মাত্র, প্রাণও তেমনি অস্তিত্বের মহাকাশে একটি পারাবত। একটি বিশেষ টেম্পারেচার—একটি নাতিশীতোষ্ণ কুলায়—না পেলে সেই আরাম-লালিত পক্ষিস্থত পিতৃগণকে পিণ্ডদান করতে জীবিত থাকত না। অস্তিত্বের কত শত রূপ, কত সহস্র প্রকাশ। প্রাণ তাদের অন্যতম এবং বোধ করি শৌখীনতম। এই কথা মেনে নিতে বাদলের মন বিষম বিমুখ হয়েছে ও চিত্তবৃত্তি একান্ত পীড়াবোধ করেছে। মাথার শিরা-প্রশিরাগুলো অতিরিক্ত মোচড় খাওয়া সেতারের মতো চিড় চিড় করতে করতে হঠাৎ ছিঁড়ে যাবার মতো হয়েছে। কিন্তু মেনে নিতেই হল।

বাদলের দেহ-মন স্মৃতি-সংজ্ঞা জীবনের সঙ্গে যাবে। অবচেতনা পর্যন্ত পিছনে পড়ে থাকবে না। মস্তিষ্কের অভাবে তার মনন হবে না, এইটে সবার বড় খেদ। মৃত্যু তার মনীষা হরণ করবে। বাদল একবার মৃত্যুর নির্বর্ণ নিস্পন্দ নিঃসীম শূন্যতা অন্তরে অনুভব করে নিল। তার শারীরক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে বন্ধ হয়ে এল। তার বোধ হল সে যেন টাইটানিক

জাহাজের সঙ্গে অকূল সমুদ্রে ডুবছে ডুবছে ডুবছে। যেন উপরে উঠবার আশা ছেড়ে দিয়ে অনিবার্য ভাবে তলিয়ে যাচ্ছে, ধীরে, ধীরে, ধীরে। মন পেছিয়ে পড়ল, চেতনা কিছু দূর এগিয়ে দিল, ফুস্‌ফুস্‌ স্থগিত, গতি মোটর এঞ্জিনের মতো ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ করতে করতে অবশেষে—চুপ।

মৃত্যুর অনুভূতি হচ্ছে বিশুদ্ধ অস্তিত্বের অনুভূতি। অতি প্রবল উদ্যমে সবেগে নিঃশ্বাস টেনে বাদল প্রাণলোকে উত্তীর্ণ হল। প্রায় মৃত্যু সম্বন্ধে তার লেশমাত্র বিতৃষ্ণা জাগল না। মৃত্যু তো তার মৃত্যু নয়, being-এর মৃত্যু নয়, মৃত্যু তার সম্পত্তির মৃত্যু, having-এর মৃত্যু। মৃত্যু তার পক্ষে নির্জলা অস্তিত্ব। তার সম্পত্তির পক্ষে নিছক নাস্তিত্ব।

দশটা দিন বাদলের মাথার চুলকে বাতাসের মুখে ধোনা তুলোর মতো উড়িয়ে নিয়ে গেল। উটের স্বদেহে সঞ্চিত মাংস যেমন অনশনের দিনে পাকস্থলীর প্রয়োজনে অন্তর্হিত হয় তেমনই বাদলের গায়ে ও গালে সমুদ্রের হাওয়ার যোগে যেটুকু মাংস লেগেছিল সেটুকু গেল মিলিয়ে। চোখের কোলে কালো দাগ তো দেখা দিলই, চোখ দিয়ে হু হু করে জল উথলে পড়তে থাকল। মাথা ব্যথা মাঝে একদিন এসে সেই যে সাথী হল আর যাবার নাম করে না। আহারে রুচি হয় না, মিসেস্‌ মেলভিল যে খাবার দিয়ে যায় তার সিকিও বাদল মুখ দেয় না। দেখে শুনে মিসেস মেলভিল স্বামীকে কিছু বলল না। স্বামীর আসুরিক চিকিৎসা-পদ্ধতিকে সে ভয় করত। সোজা টেলিফোন করল ভেণ্টনরের এক ডাক্তারকে। ডাক্তার এসে বাদলের জিব দেখল, দাঁত দেখল, নাড়ী টিপল, বুকের শব্দ শুনল, পিঠের শব্দ শুনল, টেম্পারেচার নিল, নিঃশ্বাস পরীক্ষা করল। সবজান্তা ডাক্তার। বাদলকে জেরা করল।

বাদল বলল, “আমার অসুখ আর কিছু নয়। একটা প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ।”

ডাক্তার তার দিকে এমন ভাবে তাকাল যে, সে পাগলা গারদ থেকে ফেরার হয়ে এখানে এসে গা ঢাকা দিয়েছে। বুড়ীর কানে কানে বলল “কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করুন।” বাকিটুকু ইঙ্গিতে বোঝাল। কী একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখে বুড়ীর হাতে দিয়ে বাদলের দিকে আর একবার কটাক্ষপাত করতে করতে ও মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ডাক্তার-পুঙ্গব মিসেস মেলভিলকে বাও করে বেরিয়ে গেলেন ও নীচে নেমে গিয়ে সশব্দে মোটর গাড়ীর দরজা বন্ধ করলেন।

বাদল ভাবল, দেহটা থেকে আপদ তো কম নয়। এই সব প্যারাসাইট্‌কে কী জোগায় কে? আমাদেরই দেহ। আমার মুখের উপর প্রকারান্তরে আমাকে পাগল বলে গেল কী দেখে? আমার দেহ। কাজেই দেহটা থাকা খুব একটা সৌভাগ্য নয়। এটা গেলেও আমি থাকব। দেহের সঙ্গে মনও যাবে। তবু আমি থাকব। বিশুদ্ধ অস্তিত্ব—

তার মতো মুক্তি কিছুতে নেই। What a relief! মাথাও থাকবে না, মাথাব্যথাও না, চোখও থাকবে না, চোখ দিয়ে জল ঝরাও না।

৯

পাছে বিক্ষেপ ঘটে তাই জানালার উপর পর্দা টেনে দিয়ে বাদল বহির্জগৎ সম্বন্ধে অন্ধ হয়েছিল। তার নিজের চোখ খোলা, তার ঘরের চোখ বন্ধ।

ডাক্তার এসে টান মেরে পর্দাটাকে সরিয়ে দিয়ে গেলে বাঁধ-ভাঙা বেনো জলের প্লাবনের মতো আকাশ-ভাঙা আলোর প্রবাহ তার চক্ষুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে আঘাত পেয়ে চোখ বুজল, পরে চোখ মেলে দেখল — আলোর আর-এক রং। বসন্ত কোন কালে চলে গেছে, গ্রীষ্ম এসেছে তার স্থানে। পাখীর কলরব কান ঝালাপালা করে দেয়। যেদিকে দৃষ্টি ফেরানো যায় সেদিকে এক ঝাঁক পাখী আছেই। চেরী ফুল ঝরে গেছে কিন্তু গাছ তা বলে নেড়া হয়নি, নতুন পাতায় ভরে গেছে। বাদলের মতো দৃশ্য-কানা মানুষও লক্ষ্য না করে পারল না যে, মাঠের কোল জুড়েছে লক্ষ লক্ষ ব্লুবেল প্রিমরোজ মার্গেরিট ফুল।

এর মধ্যে কখন ভ্রমণের হিড়িক আরম্ভ হয়ে গেছে। কাতারে কাতারে স্ত্রী-পুরুষ সরাইয়ের সামনের রাস্তা ধরে মোটরে কিংবা পদব্রজে চলেছে। তারা সকলে সরাইয়ের দিকে তাকায়, কেউ কেউ সরাইয়ের বাগানের চা খাবার জন্যে থামে। তাদের জন্যে মেলভিল Ye Olde Tea Garden খুলেছে। সেখানে বেচারি মিসেস মেলভিল হাজিরা দিতে দিতে হাঁপিয়ে ওঠে।

এতদিন পৃথিবী থেকে অনুপস্থিত থাকার ফলে মানুষ দেখে বাদলের উত্তেজনার সঞ্চার হল। বিদেশ থেকে দেশে ফিরলে যেমন হয়। তার জিজীবিষা গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। সে যে বেঁচে আছে এই তার শ্রেষ্ঠ সুখ। সে বেঁচে থাকতেই চায়, মরতে চায় না। ওদেরই মতো সে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে মোটর হাঁকাবে, চা বাগানে আসন নিয়ে লেমন স্কোয়াসের নল মুখে পুরে আধ ঘণ্টা কাটাবে, সমুদ্রের ধারে পায়চারি করতে করতে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে দিগবলয়ের সীমা নিরীক্ষণ করবে।

জীবনের প্রতি বাদলের প্রাক্তন অনুরাগ বহুগুণিত হয়ে ফিরল। বসতে হবে ঐ চা বাগানে, ঐ মুক্ত গগনের তলে, ঐ স্নিগ্ধ রৌদ্রে। বহুদিন মিসেস্ মেলভিল ভিন্ন অন্য মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়নি। ওখানে গিয়ে বসলে আলাপ অমনি জমবে। বাদল জিজ্ঞাসা করবে, "এ অঞ্চলটা লাগছে কেমন?" ওরা বলবে, "চমৎকার।" ওরা পাল্টা প্রশ্ন করবে, "আপনি এখানে কদিন আছেন?" বাদল বলবে, "মনে হচ্ছে যেন চিরকাল আছি। প্রকৃতপক্ষে দেড়মাস হবে।" তারপর বাদল ওদের খোঁজ খবর নেবে। ওরা

কেউ লণ্ডন থেকে, কেউ বার্মিংহাম থেকে এসেছে। কেউ ভেন্ট্‌নর দিয়ে এসেছে, কেউ ফ্রেস্‌ওয়াটার দিয়ে! কেউ রাইড, কাউএস্‌ নিউপোর্ট ঘুরে এসেছে, ক্যা র‍্যাবী দেখেছে, কেউ স্যানডাউন ও শ্যাঙ্কলিন হয়ে এসেছে, শ্যাঙ্কলিনের Chine দেখেছে। বাদল এতদিন আছে, কিন্তু Carisbrooke-এর দুর্গ দেখেনি, সেখানে যে গাধাটি আজ তিনশো বছর কূয়া থেকে জল তুলছে তার গল্প শুনেছে কিন্তু তাকে প্রত্যক্ষ করেনি।

সাধারণ মানুষের মতো সামান্য বিষয়ে কৌতূহলী হতে বাদলের লজ্জা বোধ হল না। বরঞ্চ উৎসাহ বোধ হল। সে তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নীচে নেমে যাবার জন্যে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। কিন্তু এতদিনের অনিদ্রা ও অনাহার। তার মনে হল সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। তার পা টলছিল, গা কাঁপছিল, চোখে আঁধার ঘনিয়ে আসছিল। সে বুদ্ধি খাটিয়ে ধপ্‌ করে বসে পড়ল। বহুক্ষণ সেই অবস্থায় থাকবার পরে যখন চোখে আলোর আমেজ পেল ততক্ষণে তার ঔৎসুক্য অন্তর্হিত হয়েছে। সে হামাগুড়ি দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল।

শরীরকে নাই দিলে পেয়ে বসে। তার নালিশ অনন্ত। আবদার অজস্র। বাদল চুপ করে বিছানায় শুয়ে থেকে তার শরীরের উক্তির প্রতি কর্ণপাত করল। শরীর বলছে, তুমি তো ভারি মজার মানুষ হে। আমি যে আছি আর আমি যে তোমার, এ দুটি সরল সত্য তোমাকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দিলেও তোমার বোধগম্য হয় না। এমনি স্থূল তোমার বুদ্ধি। দুনিয়ার ভাবনা ভেবে মরছ, ঘরের চুলায় হাঁড়ি উঠছে না সে খবর রাখ? তোমার হাতে পড়ে আমার অকাল বৈধব্য অনিবার্য। হায় হায়, না পেলুম ঘুমিয়ে আরাম, না করলুম খেলাধুলা। রয়ে সয়ে চিবিয়ে খাব তার সময় নেই, কোন্‌টা সারবান খাদ্য কোন্‌টা কেবলমাত্র মুখরোচক তার বিচার নেই! ওই একঘেয়ে সমুদ্র দেখতে দেখতে ও তার তুমুল কোলাহল শুনতে শুনতে চোখে ও কানে মরচে ধ'রে গেল। আহা, অন্যের হাতে পড়ে থাকলে কী আনন্দেই না দিন কাটাতুম! আকাশে এরোপ্লেন, মাটিতে মোটর, নদীতে বাচ—speed is the word. মনের পক্ষে যেমন চিন্তা, দেহের পক্ষে তেমনি গতি—উভয়ের চাই speed; উভয়েই হবে ধাবমান। এ কেমনতর মানুষ যে দেহে উদ্ভিদ থেকে মনের দ্বারা জগৎ পরিক্রমা করতে যায়। হয়েছেও তাই, ঘানিগাছের চারদিকে ঘুরে মরছেন, একটা সত্য থেকে আর একটা সত্যে পাড়ি দিতে পারছেন না।

বাদল ভেবে দেখল, কথাটা খাঁটি। দেহটা হয়েছে মনের ঘানিগাছ। তাই চিন্তা কেবল একস্থানে ঘুরপাক খাচ্ছে। যারা তীরের মতো সরল রেখায় ছুটতে পারে, যারা Speed King, তারাই জীবন মৃত্যুর লক্ষ্যভেদ করতে পারে। তারাই জানে প্রাণের পরে কী আছে, অস্তিত্ব কি নাস্তিত্ব। তাদের জ্ঞান তাদের সাক্ষাৎ উপলব্ধি থেকে। আমার জ্ঞান আনুমানিক। ওরা সত্যিই মরণের সঙ্গে মুখোমুখি হবার সুযোগ পায়, মরতে মরতে

বেঁচে আসে। আর আমি যে এই কয়েকদিন মৃত্যুর আস্বাদ নিলুম এটা কৃত্রিম। বিশুদ্ধ অস্তিত্ব আমার পক্ষে থিওরী ; ওদের পক্ষে প্র্যাকৃটিস্‌।

বাদলের ইচ্ছা করল, ডাইনামাইট দিয়ে ঘর দ্বার গ্রাম নগর বিচূর্ণ করে বিকীর্ণ করে দিতে। ওরা তাকে রুদ্ধগতি করেছে। ইচ্ছা করল ডাইনামাইটের দ্বারা নিজেই খণ্ড বিখণ্ড হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে যেতে। হাওয়ায় উড়তে উড়তে বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে যেতে। হয়তো গ্রহান্তরের মাধ্যাকর্ষণ তার একাংশ অপহরণ করবে, সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ করবে অপর একাংশকে ভস্ম, তবু তার বিক্ষিপ্ত শরীর জগৎ আচ্ছন্ন করবার মতো বৃহৎ এবং সূক্ষ্ম। সে যেন একখানা অদৃশ্য জাল, আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি ব্যাপ্ত। তার শরীরে যত সেল, যত মোলিকিউল, যত এটম্‌, যত ইলেকট্রন আছে তাদের সংখ্যা হয়, কিন্তু কে জানে হয়তো ইলেকট্রনকেও ভাগ করা যায়, তাই তার ভাজক সংখ্যা অগণ্য। এই ভাজকগুলি যদি একবার ছাড়া পায় তবে হয়তো মাধ্যাকর্ষণের পক্ষে যার-পর-নাই লঘু হবে, অতএব জগতের সীমা যতদূর, উড়তে উড়তে ততদূর যাবে।

অথবা যদি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তি সহসা নিষ্ক্রিয় হত। যদি দোতলা থেকে লাফ দিয়ে বাদল নীচের জমিতে পড়ত না, পড়ত ঊর্ধ্বে, পড়তে পড়তে চলত শূন্যে। তার সঙ্গে চলত বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে উড়ন্ত পাখী, ঝরন্ত পাতা, খসে পড়ন্ত ফুল। পৃথিবীর টান এক মুহূর্তের জন্য শিথিল হলে পৃথিবীর কোল খালি হয়ে যেত।

১০

বাদলের বন্ধনবোধ কোনোদিন এমন তীব্র হয়নি। সে শুধু শয্যাশায়ী নয়, সে বন্দী। মাধ্যাকর্ষণের শৃঙ্খলভার তার সর্বাঙ্গে। সে আহার নিদ্রার দাস, শীতাতপের অধীন, ব্যাধিবীজের কৃপাপাত্র। Free will? কোথায় তার ইচ্ছার স্বাধীনতা? এই তো আজ সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতে পারল না, চা বাগানে বসে লেমনেড খেতে খেতে আলাপ জুড়তে বাধা পেল। কে মালিক? সে, না, তার না-খাওয়া খাদ্য, না-হওয়া ঘুম, না-করা কসরৎ? সে, না, তার দুব্‌লা গড়ন, সরু সরু হাড়, বিশীর্ণ মাংসপেশী? কতক আবেষ্টন, কতক বংশানুক্রম, দুই মিলে বাদলের ইচ্ছার স্বাধীনতার পথ রাখেনি। Environment ও heredity, এরাই মালিক, বাদল নয়। ইংলণ্ডে এসে প্রথমটাকে এড়াতে পারেনি —এখানেও সেই মাধ্যাকর্ষণ মাটির সঙ্গে পা'কে রেখেছে এঁটে, বাতাসের সঙ্গে ফুসফুসের সম্বন্ধ সেই একই, দেহের ইঞ্জিন ইন্ধনের অভাবে তেমনি বিকল। আর দ্বিতীয়টা? বাদল প্রাণপণে অস্বীকার করতে চায় এর অমোঘ অবিচল প্রভাব। কিন্তু ইংরেজের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার সে সর্বায়বে অনুভব করতে পারে কই। ভাষায় ইংরেজ হতে পারে, চিন্তাপ্রণালীতেও ইংরেজ হওয়া যায়, কিন্তু অস্থি মাংস স্নায়ু শিরার

আভ্যন্তরিক সংস্থান সঞ্চালন ও বৃদ্ধি মহিমচন্দ্র সেন ও শৈলবালা দেবী এবং তাঁদের পিতা পিতামহ প্রপিতামহ এবং মাতা মাতামহী প্রমাতামহী চিরকালের মতো অদৃশ্য শৃঙ্খলে বেঁধে দিয়ে গেছেন। মাধ্যাকর্ষণের শৃঙ্খলতার তার তুলনায় কী! সেই সকল পরিত্যক্ত বিস্মৃত অজ্ঞাত পূর্বপুরুষ—যাদেরকে সে সর্বান্তঃকরণে প্রত্যাখ্যান করেছে—তারাই তার শরীরক্রিয়ার নিয়ন্তা। তার পূর্বপুরুষ যদি জন্ স্মিথ্ ও মেরী জোন্স্ এবং তাঁদের পিতৃ-মাতৃকুল হতেন তবে সে এই ক'দিনের মধ্যে এতটা দুর্বল হয়ে পড়ত না, তার মাথা ঘুরত না, পা কাঁপত না, গা বমি বমি করত না, সে শিশুর মতো হামাগুড়ি দিত না, রোগীর মতো দিনে দুপুরে বিছানায় পড়ে থাকত না।

কিন্তু সে যে বাদল, সে যে অতুলনীয়, সে যে নিখিল বিশ্বে এক এবং অদ্বিতীয়, তার এ অনুভূতি কে ঘোচাবে ? হতে পারে সে হেরিডিটির স্রোতোমুখে ভাসমান তৃণ, আবেষ্টনের অনুকূল ও প্রতিকূল বায়ু কর্তৃক ক্রীড়াতাড়িত, আন্দোলিত ও মুক্তিভ্রমে ভ্রান্ত। হোক না সে নিরস্ত্র নিরন্ন ভাগ্যপীড়িত বন্দী, না-ই থাক তার ইচ্ছার স্বাধীনতা, পড়েই থাক সে অনীপ্সিত শয্যায়। অবান্তর ও তুচ্ছ তার ইংরেজ হওয়া না হওয়া, সে যে বাদল এই তার সত্য উপলব্ধি। তার সত্যকার প্রতিষ্ঠা তার ব্যক্তিত্বে। হাজার পরাধীন হোক, সে আর কেউ নয়, সে সে। সমস্ত কাট ছাঁট দিলে যা অবশিষ্ট থাকে, যা irreducible, যা অক্ষয়, তা হচ্ছে, তার স্বকীয়তা। সেই তার চিতোর দুর্গ, সেই দুর্গে সে স্বাধীন নরপতি। তার ইচ্ছা যখন আবেষ্টন ও বংশানুক্রমের রাজ্যে পা বাড়ায় তখন তার পাস্‌পোর্টের দরকার হয়, তখন সে অসহায় ও অবমানিত। কিন্তু তার আপন দুর্গে সে অপরাজেয়। যেখানে সে ব্যক্তি সেখানে তার মুক্তি।

আমি আছি ও আমি আমি। রোগ-শয্যায় এর অন্যথা হয়নি, মরণে এর অন্যথা হবে না। মনে মনে এই তত্ত্ব জপ করতে করতে বাদল কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে দেখল সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। নিকটে কোন গাছে ব্ল্যাক্‌বার্ডেরা তখনো ডাকাডাকি করছে। সমুদ্রের কলরোল সারাদিন অন্য সহস্র ধ্বনির নীচে চাপা পড়ে ফোঁসফোঁসাচ্ছিল, এইবার স্ফীত হয়ে মাটির উপর ছোবল মারছে। মোটরকারের হর্ন দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। নীচের তলায় অট্টহাসির হট্টগোল বাদলকে স্মরণ করিয়ে দিল যে বেঁচে থাকার ষোল আনা আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত। বেড্ স্যুইচ্ টিপে আলো জেলে সে দেখল টেবিলের উপর গোটা দুই তিন ওষুধের শিশি।

ইস্। ওষুধ! জীবনে অন্য কোনো জিনিসকে সে এত ঘৃণা করে না। মিষ্টি হোক তিক্ত হোক ওষুধ হচ্ছে এমন এক জাতের খাদ্য যার স্বাদ নিতে জিভে জল সঞ্চার হয় না, যার ঘ্রাণ পেলে ক্ষুধা এগিয়ে আসে না, যা গ্রহণ করে তৃপ্তি নেই। সাধ গেলে লোকে সন্দেশ বা চকোলেট খায়, কিন্তু বাধ্য না হলে কেউ ওষুধ খায় না। বাধ্যতাকেই বাদল

ঘৃণা করে, ওষুধের উপকরণকে না, ওষুধ তার বন্দীদশার স্মারক, তার স্বাধীনতার প্রমাণ নয়। এই ওষুধ সকাল বেলার সেই অশ্রদ্ধাবান ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন যে বলেছিল বাদলের জন্যে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করতে। কাজেই বাদল এর প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা বোধ করল না। অমন ডাক্তারের উপর তার আস্থা নেই। সে হাত বাড়িয়ে শিশিগুলোর গলা টিপে ধরল। তারপর রোগা হাতে যতটুকু জোর ততটুকু খাটিয়ে জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

তার মনে পড়ল মেলভিলের আশুরিক চিকিৎসা। আহা, মেলভিল লোকটা বড় ভালো। সেদিন যা পান করিয়েছিল স্বাধীন অনুভূতি জাগাতে অমন পদার্থ আর নেই। ওর এক আউন্স পেটে পড়লে পৃথিবী বুড়ীর শিকল গলা থেকে খসে পড়ে, প্রাণটা বাচ্চা কুকুরের মতো একবার নাচতে নাচতে ছুটে যায়, লাফাতে লাফাতে ফিরে আসে, দুই পা সামনে মেলে দিয়ে ধরা দেবার ভান করে, কাছে গেলে অমনি পালায়। কেমন তামাসা। বাদলের হাসি পায়। মনে করতেই মনটা হালকা হয়ে আসে। গায়ে যেন খানিকটা জোরও জোটে। বাদল উঠে গিয়ে বেল টেপে।

যাকে চেয়েছিল ঠিক সে-ই। মেলভিল স্বয়ং। বাদল বলল, "বড্ড কাহিল বোধ করছি। একটু ব্রান্ডি কিংবা—।" মেলভিল সকালবেলা ডাক্তার দেখে টের পেয়েছিল ব্যাপার সরল নয়। গম্ভীরমুখে বলল, "আপনি তো এখন আমার চিকিৎসাধীন নন।" বাদল ক্ষ্যাপার মতো হেসে উঠে বলল, "ঐ ডাক্তারটার চেয়ে আপনার চিকিৎসার উপর আমার ঢের বেশি আস্থা, মিস্টার মেলভিল।"

স্বাধীন অনুভূতির চোটে বাদল সে রাত্রে মিসেস মেলভিল বুড়ীকে ঘুমতে দিল না। থাকে থাকে সশব্দে জিজ্ঞাসা করে ওঠে—"Free will or Determinism ?"

স্বপ্নবাণী

১

লণ্ডন স্কুল অফ্ ইকনমিকসের প্রশস্ত ভোজনাগারে দে সরকার সুধীকে ও মৃণালকে নিমন্ত্রণ করে এনেছে। অতি সাদাসিধে ব্যাপার। যে আসছে সে একগ্লাস দুধ কিংবা একটা আপেল কিনে একটু জায়গা করে কোথাও বসে যাচ্ছে। টেবিল ক্লথ বিহীন লম্বা সরু টেবিল। চেয়ারও তেমনি রুক্ষ। হৈ হৈ করে কত ছেলে ও কত মেয়ে খাচ্ছে এবং আড্ডা দিচ্ছে। কারুর কারুর খাওয়া সারা হয়ে গেছে। একটি খাটো সবুজ ফ্রক পরা, ছেলেদের মতো করে চুল-ছাঁটা, রোগা ছিপছিপে গড়ন, সুশ্রী মেয়ে একটা খালি টেবিলের উপর পা ঝুলিয়ে বসেছে। তাকে ঘিরে বসেছে ও দাঁড়িয়েছে গুটি ছয়-সাত নানান্ রঙের সুটপরা, নানা আকার ও আকৃতির তরুণ। প্রায় সকলেই সিগ্রেট

টানছে, মেয়েটিও।

দে সরকার দুই হাতে করে খাবার বয়ে নিয়ে এল। সুধীকে বলল, "নিন্ আপনার হরলিক্স্ ও মধু।" মৃণালকে বলল, "আপনি অবশ্য শাক্ত।"

মৃণালই কথাটা পাড়ল। বলল, "এমন জানলে আমি অন্য কোথাও ভর্তি হতুম না, অন্য বিদ্যা শিখতুম না। দে সরকার, আপনাকে সাবাস।"

দে সরকারের পরিপাটিরূপে কামানো মসৃণ গাল বুদ্বুদের মতো গোল হয়ে চকচক করতে লাগল। তার রিমলেস্ চশমা ঝকঝক করে উঠল। সে হৃষ্ট হয়ে বলল, "তবে? আমার স্কুল কি যেমন-তেমন প্রতিষ্ঠান? এই বা দেখলেন কী? চলুন আপনাকে আমার প্রিয় অধ্যাপিকার ক্লাসে নিয়ে যাই। বক্তৃতা শুনবেন, না, প্রেমে পড়বেন, তাই বসে বসে নিরীক্ষণ করব " তৎক্ষণাৎ নিজের উক্তিকে সংশোধন করে বলল, "হয়তো অধ্যাপিকার প্রতি অবিচার করলুম। তিনি বাস্তবিকই বিবেকী। সমস্ত মনোযোগ দিয়ে পড়ান। তবে আমাদের স্কুলের ট্রাডিশন হল আলাদা। আমরা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নই, আমরা সকলে সহাধ্যায়ী। আমাদের চিন্তা ও বাক্য স্বাধীন, আমাদের কার্যের উপর কেউ পাহারা বসায় না। কার চরিত্র কেমন তা নিয়ে কারুর মাথা ব্যথা নেই। আমাদের একমাত্র দায়িত্ব আমরা মানুষের সমাজ রাষ্ট্র ও আর্থিক ব্যবস্থা (economic system) সম্বন্ধে কোনো প্রকার পোষা ধারণা কিংবা বাঁধা বুলি নিয়ে অগ্রসর হব না; বৈজ্ঞানিকের মতো মনটাকে নিরাসক্ত ও নির্দয় করে কঠোর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হব।"

সুধী বলল, "সামাজিক ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি কার্যকরী হবে? ইকনমিকস বলে একটা শাস্ত্র বানিয়েছেন আপনারা, কিন্তু ও কি কখনো গণিতের মতো বিশুদ্ধ এবং নির্ভুল হতে পারবে? ধরুন; আজ থেকে বিশ বছর পরে সূর্যগ্রহণ হবে বলতে পারা যেমন জ্যোতির্বিদের পক্ষে সম্ভবপর, তেমনি দুবছর পরে বাজার দর কী রকম হবে বলতে পারা কি অর্থনীতি-নিপুণের পক্ষে সম্ভবপর হবে মনে করেন?"

দে সরকার পকেট থেকে সিগ্রেটের কেস্ বার করে সুধী ও মৃণালের সামনে ধরল। মৃণাল একটি নিল।

দে সরকার ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সুধীর প্রশ্নের জবাব দিল। বলল, "পঞ্চাশ বছর পরে সম্ভবপর হওয়া সম্ভবপর। এই তো সবে আমাদের শাস্ত্রের উদ্ভব। এর সঙ্গে যে সকল শাস্ত্রের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ সেগুলিও সদ্যোজাত। মানুষের মন, মনের নিমগ্ন প্রদেশ, যূথ মনের ব্যবহার, পৃথিবীর ধন-সম্পদ, উর্বরতা, কয়লা গ্যাস তড়িৎ ইত্যাদি শক্তি, এমনি কত বিষয়ে এখনো গবেষণার চূড়ান্ত হয় নি। হয়তো সূচনা হয় নি। পৃথিবীর সব দেশে ভালো রকম সেন্সাস নেওয়া হয় না, সে সব দেশের তথ্যতালিকায় গলদ যতদিন থাকবে ততদিন বাণিজ্যসংক্রান্ত কোনো ব্যাধির ডায়গনসিস হবে না,

দাওয়াইয়ের যা ব্যবস্থা হবে তা হাতুড়ের মতো। তা বলে আমরা আপনার যোগী ঋষির মতো ধ্যানাসনে বসে শিবনেত্র হব নাকি ?" দে সরকার হেসে পাল্টা প্রশ্ন করল।

সুধী তর্ক করতে আসেনি। আধুনিকতার এই প্রখ্যাত পীঠ সম্বন্ধে সে দূরে থেকে অনেক শুনেছিল। গত শতাব্দীর শেষভাগে সিড্‌নি ও বিয়াট্রিস ওয়েব প্রভৃতি ফেবিয়ান (Fabian) সোশ্যালিস্টগণের উদ্যোগে এর প্রতিষ্ঠা হয়। ফেবিয়ানগণ স্বদেশের যন্ত্র কর্তৃক বিশৃঙ্খলিত অথচ চির-অভ্যস্ত চিন্তা ও চির-প্রচলিত বিশ্বাস কর্তৃক শৃঙ্খলিত সমাজকে ধীরে ধীরে পুনর্গঠিত করে তোলবার আয়োজন করেন। তাঁদের আয়োজনের এটিও একটি অঙ্গ। সমাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফল এই বৃক্ষের বিশেষত্ব। আধুনিক আদম এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করছেন।

সুধীকে নিরুত্তর দেখে দে সরকার আর কিছু বলবে এমন সময় তার দুজন সহপাঠী তার পাশে এসে দাঁড়াল। জান জাওর্‌স্কি, জাতে পোল্‌। যাকোব হোলস্টাইন, জাতে জার্মান ইহুদি। প্রথম জন শালপ্রাংশু, বিশালকায়, হ্রস্বদৃষ্টি, তাম্রাভ-কেশ। দ্বিতীয় জন 'প্রমাণ-সাইজ', উন্নতনাসিক, প্রশস্তললাট. কৃষ্ণকেশ। দে সরকার চেয়ার ছেড়ে উঠে বলল. "তোমরা দাঁড়িয়ে থাকলে যে। বস. বস। পরিচয় করিয়ে দিই। এঁর পিতৃদত্ত নাম দুরুচ্চারণীয়, আমরা এঁকে ডাকি নর্থ পোল বলে। আর ইনি আমাদের ভাবী-যুগের সুপার-ব্যাঙ্কার। সারা পৃথিবীর ব্যাঙ্কগুলোকে ইনি একসূত্রে গাঁথবেন ও সেই মালা নিজের গলায় পরবেন। দেখ হোলস্টাইন, যতবার তোমার দর্শনলাভ করি ততবার অনুপ্রাণিত হই। আর কিছু না হয়ে উঠতে পারি তো তোমার বসওয়েল হব।"

হোলস্টাইন সুধীর দিকে চেয়ে বলল, "মসিয়ো দ্য সারকারের মস্ত গুণ তিনি নিজের পরিকল্পনাকে পরের বলে চালাতে সিদ্ধহস্ত। কোনো দিন যা আমি ভাবতে পারিনি ও বিশ্বাস করতে পারিনে তাই উনি আমাকে দিয়ে করাবেন, আমাকে দিয়ে হওয়াবেন। সেইজন্তে আমার মনে হয় দ্য সারকারের মুখে আপনার পরিচয় না নিয়ে আপনার নিজ মুখেই নেওয়া সমীচীন।"

সুধী হেসে বলল, "দে সরকারের উপর নির্ভর করলে আপনি আমাকে মিষ্টিক বলে জানতেন। আমি বিশেষ কিছু নই, তবে একটা অভিধা না হলে যদি পরিচয়ের অসুবিধা হয়, আমি দ্রষ্টা।"

মৃণালের প্রতি লক্ষ্য করে নর্থ পোল বলল, "আর আপনি ?"

মৃণাল সলজ্জভাবে বলল, "আমার মতো নগণ্য মানুষের পরিচয় ? শিখছি রেলওয়ে এঞ্জিনিয়ারিং। দেশে একটা মোটা মাইনের চাকরি পাবার আশা নিয়ে এদেশে আসা। দে সরকার আমার এর বেশি কী পরিচয় দেবে জানতে ইচ্ছা করে।"

দে সরকার এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, "তুমি মার্টিন কোম্পানীর রেল লাইনে

পাঞ্জাব মেল চালাবে।"

মৃণাল ও সুধীকে হেসে উঠতে দেখে নর্থ পোল ও হোল্‌স্টাইন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। দে সরকার যখন তাদের খাতিরে ইঙ্গিতটাকে পরিস্ফুট করল তখন তারাও হাসিতে যোগ দিল।

২

ভিড় দেখলে ভিড় বাড়ে। দে সরকারকে ঘিরে চারজন যুবক খুব হাসছে। ব্যাপার কী? সেই যে টেবিলের উপর সমাসীন তরুণীটি সে তার দলবল নিয়ে উপস্থিত হল। স্কুলের এমন কোনো ছাত্রছাত্রী নেই যাদের সঙ্গে তার যাকে বলে মাথা-নোয়ানো পরিচয় নেই। নাম হয়তো জানে না অধিকাংশের, কিন্তু মেশে সকলের সঙ্গে স্বচ্ছন্দভাবে। সুকুমার বালকের মতো চেহারা ও চাল; গোপালের মতো যার কাছে যা পায় তা খায়; অচেনা মানুষকে বলে গুড মর্নিং। সরলতা তার স্বভাবসিদ্ধ, কি, একটা ভান, তা বলবার উপায় নেই; কারণ সে কথা বলে অতি অল্প। তার প্রধান গুণ সে অপরকে কথা বলায়। সে যখনি যেখানে বসে সেখানটা হয়ে ওঠে তার সালোঁ। এক এক করে কত ছেলে জড় হয়; যে কয় জন মেয়ের স্বভাবে ঈর্ষা নেই তারাও। অনর জন্‌সন্ (Honor Johnson) ওরফে জনি কাউকে ডাকে না; কারুর দিকে চেয়ে চোখ ঠারে না, আঙুল দিয়ে ইসারা করে না—কিছু না। তার যে চেয়ারটায় বা যে টেবিলটাতে বসবার খেয়াল হল সেটাতে সে যেই বসেছে অমনি একটি না একটি ছেলে ওইখান দিয়ে যেতে যেতে তার মাথা নোয়ানো দেখে ও গুড্ মর্নিং শুনে একটু আলাপ করবে ভেবে এক মিনিটের জন্যে থামল। অমনি আরো তিনদিক থেকে তিনজন এসে হাজির। প্রথম জনের মুখের কথা থাকল মুখে। অনর ওরফে জনি বলল, গুড্ মর্নিং। এবং কেমন নম্র মধুর ভাবে মাথা নোয়াল। সকলে করে হৈ হৈ; সে থাকে স্থির অচপল। কেউ সিগ্রেট বাড়িয়ে দেয়, সে কোমলকণ্ঠে বিনীতভাবে বলে, থ্যাঙ্কস্ ভেরি মাচ্। অমনি পাঁচজন একসঙ্গে দেশলাই জ্বালায়। সে যার প্রতি প্রসন্ন হয় সে-ই মনে মনে বলে, থ্যাঙ্কস ভেরি মাচ্।

পর্বত মহম্মদের কাছে উপস্থিত হবে দে সরকার কল্পনা করতে পারে নি। স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, সত্যি সত্যি অনর। দে সরকার লাফ দিয়ে উঠল। অনর ডান হাতটি তুলে হাতের ভাষায় বলল, থাক। পাত্রগুলো ঈষৎ সরিয়ে দিয়ে টেবিলের একধারে আসন নিল। দে সরকার তবু দাঁড়িয়েই থাকল। বসবার কথা তার মনে হল না। ওদিকে তার চেয়ারখানা কে বাজেয়াপ্ত করল, সে টেরই পেল না। আর একজন বলল, সিট্ ডাউন, ওল্ড চ্যাপ্, সি-ট্ ডাউন। তার কথা শুনে দে সরকারের যে দশা হল তা লিখে কাজ নেই। সুধী ও অনর ছাড়া সকলেই তাকে গড়াগড়ি যেতে দেখে পাঁচ মিনিট ধরে

হাততালি দিল। কেউ কেউ হাসতে হাসতে গড়াগড়ি যাবে মনে হল। ইংরেজের ছেলে rag যখন করে তখন একেবারে নিষ্ঠুর। কেউ শিস দেয়, কেউ শেয়াল ডাকে, কেউ চায়ের পেয়ালা ছুঁড়ে মারে। তবে যাকে rag করা হল সে যদি বীরের মতো সহিষ্ণু হয় তবে তার জয়ধ্বনিও করে। ছেলেদের rag এর চোটে কত দোকানদারের কপাট ভেঙেছে, কত পাহারাওয়ালার মাথা ফেটেছে। পুসিফুট জনসন বেচারার তো একটা চোখই গেল লণ্ডনের ছেলেদের ঢিল লেগে।

যা হোক, দে সরকার তার চোখ কান হাত-পাগুলো আস্ত আছে দেখে আশ্বস্ত হল এবং চোখের জল মোছবার চেষ্টা না করে দাঁত বার করে হাসি ফোটাল। সুধী তাকে জোর করে নিজের আসনে বসালে সে ক্রমে নিঃশ্বাস ফিরে পেল।

দে সরকারের পার্টি আর জমল না। মার্টিন কোম্পানীর মজা ভুলে হোল্স্টাইন ও নর্থ পোল সমাগত জনতার সঙ্গে খেলাধুলার প্রসঙ্গে মজে গেল। সকার (ফুটবল) খেলায় স্কটলণ্ড ইংলণ্ডকে চার গোলে হারিয়ে "কাঠের চামচ" নিয়ে গেছে। চল্লিশ বছর পরে স্কটলণ্ড এতগুলি গোল শোধ দিয়ে ইংলণ্ডের উপর শোধ তুলল। উপস্থিত মণ্ডলীর মধ্যে স্কচ্ যারা ছিল তারা তুড়ি দিল। তখন ইংরেজ যারা ছিল তারা শ্লেষাত্মক সুরে স্কটলণ্ডের প্রিয় সঙ্গীত Annie Laurie গেয়ে উঠল :

"And for bonnie Annie Laurie
I d lay me doon and dee "

এতে স্কচ্‌রা কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে সমানে যোগ দিল।

"Like dew on the gowan lying
Is the fa'o'the fairy feet,
And like winds in summer sighing
Her voice is soft and sweet,
Her voice is soft and sweet,
And dark blue is her e'e,
And for bonnie Annie Laurie
I'd lay me doon and dee."

৬

নিজের পার্টিতে পরের হাস্যাস্পদ হয়ে উপেক্ষিত ভাবে বসে থাকা দে সরকারের অসহ্য বোধ হল। সে অনরকে উদ্দেশ করে 'এক্স্‌কিউস্ আস' বলে সুধী ও মৃণালকে নিয়ে প্রস্থান করল। পাছে তার মনে আঘাত লাগে ভেবে সুধী বা মৃণাল তাকে তার লাঞ্ছনার

সমব্যথা জানাল না। ঘটনাটা চাপা দেবার জন্যে মৃণাল বলল, "কো-এডুকেশনের আনন্দ অন্য কিছুতে নেই।"

দে সরকার উৎসাহিত হয়ে সমর্থনসূচক প্রশ্ন করল, "নেই তো? কেমন?"

সুধী মৃদু হেসে বলল, "তার চেয়ে বড় আনন্দ সেল্ফ এডুকেশনের।" রঙ্গ করে বলল, "লোকে কি 'এডুকেশন' চায় হে। লোকে চায় 'কো'।" তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, "ব্যাপকভাবে বলতে গেলে দল বেঁধে পড়তে বসাটাই অদ্ভুত, সেটা স্ত্রী-পুরুষেই হোক আর পুরুষে পুরুষেই হোক। কবিরা এক জোট হয়ে কবিতা লেখে না, চিত্রীরা ছবি আঁকে একা একা, গান যদিও অনেকে মিলে হয় তবু উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত নিঃসঙ্গ সাধনা-সাপেক্ষ। শিক্ষার জন্যে ক্লাস-ঘরে দল পাকানো তাই আমি অতি ক্লেশে স্বীকার করেছি—স্কুল-জীবনে গুরুজনের নির্বন্ধে, কলেজ-জীবনে বাদলের আগ্রহে।"

দে সরকার বাদলের নাম শুনে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "বাদলের কী খবর?"

সুধী বিষণ্ণ স্বরে বলল, "বেঁচে আছে, ওর বেশি তো জানিনে।"

"কোথায় আছে, কী করছে, কবে দেখা হবে এ সব?"

"ঐ যে বললুম।"

দে সরকার ব্যঙ্গ করে বলল, "ডুবে ডুবে জল খাবার খবর বন্ধুকে জানায় না? বিলেত দেশটা এমনি, মশাই, কা তব কান্তা কস্তে বন্ধুঃ। সেদিন বিভূতি নাগের সঙ্গে শ্যাফ্‌টস্‌বেরী য়্যাভিনিউতে দেখা। বন্ধুনী সমভিব্যাহারে ম্যাটিনিতে যাচ্ছে। একজন কালো মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় আছে, এটা জানলে পাছে তার বন্ধুনী তাকে অবজ্ঞা করে কিংবা অন্যমনস্ক পথিকদের দৃষ্টি তার রঙের প্রতি একটু বেশি রকম আকৃষ্ট হয়, সেই ভয়ে সে আমার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল।"

সুধী দৃঢ়তার সহিত বলল, "কিন্তু বাদল অমন নয়।"

এর পরে অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা কইল না। স্কুল অফ্ ইকনমিক্সের নানা তল পরিক্রম করে ছাত্রছাত্রীর ভিড় কাটিয়ে তারা রাস্তার দিকে পা বাড়াবে এমন সময় বিপরীত অভিমুখ থেকে যাকে আসতে দেখা গেল তার নাম নাটালী। জাতিতে রাশিয়ান। রুশবিপ্লবের সময় তার পিতামাতা ইংলণ্ডে পালিয়ে আসেন। বছর দশেক ইংলণ্ডে বাস করে সে প্রায় ইংরেজ হয়ে গেছে। তার ঢেউ খেলানো চুল মাথার পিছনে ঝুঁটি করে বাঁধা, ছোট্ট ঝুঁটি। তার চোখের পাতা স্বভাবত স্ফীত। তার চিবুকের নীচে আর এক প্রস্থ চিবুক (double chin)। সে স্থূলকায়া হলেও তার মুখের লাবণ্য ও তার ব্যবহারের সৌজন্য চোখ ও মন কাড়ে। সে একটু গম্ভীর প্রকৃতির এবং তার বয়সও পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর হবে। অনরের মতো জনপ্রিয় নয়, কিন্তু একটি ছোট সীমার মধ্যে মিশতে ত্রুটি করে না। তার মণ্ডলীর মানুষ তারই মতো সীরিয়াস।

নাটালীকে লক্ষ্য করে দে সরকার দু পা পিছিয়ে গেল এবং চক্ষু নত করল। নাটালী এক সেকেণ্ড থেমে তাকে পর্যবেক্ষণ করল। তারপর ঈষৎ দ্রুত পদে স্কুলের পর্চ্-এ উঠে লিফ্‌টের অপেক্ষা করল। ঘটনাটা এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেল যে মৃণাল একেবারেই টের পেল না। কিন্তু সুধীর নজর এড়াল না। মৃণালকে কিংস্‌ ওয়ের বাসে তুলে দিয়ে অল্ড্‌উইচ টিউব স্টেশনে সুধীকে তুলে দিতে যাবার সময় দে সরকার নিজের থেকে সুধীকে বলল, "বাদলকে সঙ্গে করে খিচুড়ি খাওয়ার গল্প মনে পড়ে ?"

"পড়ে।" সুধী বাদলের কথা স্মরণ করতে করতে গাঢ়স্বরে বলল।

"পদ্মর কাহিনী বলে যার কাহিনী বলবার সময় হল না, এ-ই সেই নাটালী। বড্ড মন কেমন করছে, ভাই চক্রবর্তী।"

সুধী সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "মন কেমন করবার চিকিৎসা নেই। দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির মতো সহ্য করতে হবে, ভাই দে সরকার।"

এই বলে সুধী নিজেকেও সান্ত্বনা দিল।

দে সরকার বলল, "একজন মানুষ আর একজন মানুষের জীবনটাকেই একটা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে পরিণত করতে পারে কেমন করে ? বায়োলজি বা সাইকোলজিতে এর উত্তর নেই। অনেক খুঁজেছি। আধুনিক মানবের পক্ষে এ এক অমীমাংসিত রহস্য। এবং যা অমীমাংসিত তা পরাভবকর। ভগবানের কাছে পরাজিত হয়েছি, প্রেমের কাছেও। উভয়কেই মেনে নিতে হচ্ছে অবোধের মতো।"

সুধী নরম স্বরে বলল, "মানুষকে অপরাজেয় হতেই হবে এমন কোনো কথা আছে কি ? আর পরাজয়ে কি কেবলই গ্লানি ? আত্মসমর্পণের পরমা তৃপ্তি যে মানব-অভিজ্ঞতার একটা বড় উপাদান, ভাই দে সরকার।"

দে সরকার কৌতুকের হাসি হেসে উঠল। "আবার মিস্টিসিসম্‌ ? মিস্টিক সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। আমি চাই ব্যাধির চিকিৎসা। সর্বপ্রকার ব্যাধির—সামাজিক মানসিক কায়িক। ক্যান্‌সার রিসার্চ চলেছে, প্রেমের রিসার্চও চলুক।"

তারা হাসতে হাসতে লিফ্‌ট্‌ দিয়ে মাটির নীচের সুড়ঙ্গে নেমে গেল।

৪

যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদ সুধীর চিত্তকে সংকটারূঢ় করে রেখেছিল। প্রত্যুষে ঘুম ভেঙে যায়, দেখে সূর্যের আলো সূর্যোদয়ের অপেক্ষা রাখেনি, জানালার কাচ ঝকঝক করছে সূর্যালোকিত গ্রহের মতো ; সেই কাচের তেজ সদ্য উন্মীলিত চক্ষুর পক্ষে যথেষ্ট তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। সেই যে মনটা শ্বাসের সঙ্গে গান করতে শুরু করে দেয়, তারপর বেলা হলেও বিরতি মানে না। সুধী কোনোদিন পড়ায় মগ্ন থাকে, কোনোদিন পদচারণে,

কিন্তু প্রতিদিন সেই একই প্রভাতানুভূতি তার সমস্ত দিনটাকে প্রভাত করে রাখে। দ্যুলোক ভূলোক ব্যাপী আলোকের ক্রিয়া মনের মণিকোঠায় প্রবেশ পূর্বক মনটাকে এমন ঝলমল করে দেয় যে জগতের কোথাও কিছু অস্পষ্ট থাকে না। জগৎ যেন নখদর্পণে। তার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত অবধি অনায়াসে দৃষ্টিগম্য হয়। যেন সুধী রয়েছে বিশ্ব-শতদলের কেন্দ্রে। পাপড়িগুলি তাকেই ঢেকে রেখেছিল, সেই সঙ্গে নিজেদেরকেও। অন্ধকারে যার কার্যপদ্ধতি অজ্ঞেয় ছিল বলে যাকে Destiny-র মতো মনে হত, আলোকে তার কার্যাবলী সুসম্বদ্ধ প্রতিভাত হল, সে নিয়তি নয়, সে লীলা।

ব্রহ্মাণ্ড নামক বস্তুপিণ্ডটা তো স্বচ্ছ হয়ে গেল একটা স্ফটিক গোলকের মতো। তার কোথাও দৃষ্টি বাধা পায় না। দেহের ভিতর দিয়ে যেতে X-Ray যতখানি বাধা পায় ততখানিও না। সুধীকে কষ্ট স্বীকার করে বাইরে তাকাতে হয় না। মনের পর্দাটা এত সূক্ষ্ম যে একটুখানি সরালে ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ হয়। অগণিত সৌরলোক ঘর্ঘর রবে ঘূর্ণিত হচ্ছে। অপরিমিত আলোক দিকে দিকে ঠিকরে পড়ছে। ধ্বনির টুকরা পাখীর কলকণ্ঠে। রং-এর ফাগ ফুলে ফুলে বিকীর্ণ হল। গতিহিল্লোল জড়কে করল সচল ; ধূলি মুষ্টির উপর কী মন্ত্র পড়ে দিল এক নিমেষকালের ব্যবধানে—সেই হয়ে উঠল মানুষ।

এ গেল সুধীর আনন্দ। তার বিষাদ তাকে আনন্দের প্রতি বিমুখ করতে চায়। সে আলোক বর্জন করে সুড়ঙ্গে বেড়ায়। অবিক্ষিপ্ত অন্তঃকরণে জাগে উজ্জয়িনীর ধ্যানমূর্তি। কয়েক মাস যাবৎ উজ্জয়িনীর চিঠি আসা বন্ধ। মহিমও লেখেন না। দেশের জন দুই-তিন বন্ধু নিজেদের খবর দেন, আর দেন দেশের ভাবধারার আভাস। কিন্তু তাঁরা হয়তো উজ্জয়িনীকেই জানেন না, নয়তো জানেন না যে উজ্জয়িনীর কুশলবার্তায় সুধীর প্রয়োজন আছে। Cable করে সংবাদ নেবার মতো ছেলেমানুষী সুধীর সাজে না, উদ্বেগরাহিত্য তার সাধনার অঙ্গ। যে যেখানে আছে যথাস্থানেই আছে, যেখানে যাবে যথাস্থানেই যাবে। স্বয়ং বিধাতা নিয়েছেন সকলের ভার, ভাবনাটা একা তাঁরই। আমরা কেন হস্তক্ষেপ কিংবা চিত্তক্ষেপ করতে যাই ? এ হল উদ্বেগের বিরুদ্ধে যুক্তি। কিন্তু বিষাদের বিরুদ্ধে যুক্তি খাটে না। বিষাদ যে অন্তরতম অনুভূতি, উদ্বেগের মতো মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। সভ্য মানবের বোঝা (white man's burden ?) হচ্ছে উদ্বেগ। আর বিষাদ হচ্ছে পশুপক্ষী ওষধি বনস্পতিরও। বিধাতা ও-জিনিসকে কী যে মূল্যবান মনে করেন, ওর অংশ তাঁর সকল সন্তানকে দিয়েছেন।

কেন সুধীর এ বিষাদ ? সে হেতু অন্বেষণ করে সন্তোষ পায় না। উজ্জয়িনী তার কেউ নয়। কোনোদিন উজ্জয়িনীকে সে চাক্ষুষ দেখেনি। উজ্জয়িনীর জন্যে উদ্বেগও তার নেই বলা চলে। বাদল যদি নিতান্তই পরাঙ্মুখ হয় তবে উজ্জয়িনী বোধ করবে বৈধব্যের অনুরূপ বেদনা। তার বেশি নয়। খ্রীস্টান কিংবা মুসলমান হয়ে থাকলেও এ অবস্থায়

বিবাহবিচ্ছেদ দাবি করতে পারত না. হিন্দু হয়েছে বলেই ও-দাবি হারিয়েছে এমন নয়। বাদলকে সুধী মর্মে মর্মে চেনে। বাদল না করবে স্ত্রীর উপর অত্যাচার, না করবে স্ত্রী বিদ্যমানে অপরা-সঙ্গ। মুখে অবশ্য সে অনেক কথাই আওড়াবে। যখন যেটা তার সত্য মনে হয় তখন সেইটেই তার মুখে ফুলঝুরির মতো ঝরে এবং ঝরতে ঝরতে নিঃশেষ হয়। দু'দিন পরে ঠিক বিপরীতটা তার মনে ও মুখে। অন্য কেউ হলে বলত বাদল ভণ্ড। কিন্তু সুধী জানে বাদলের মন ও মুখ এক। তবে ভণ্ডতার অর্থ যদি হয় চিন্তার, বাক্যের ও কর্মের অসামঞ্জস্য তবে বাদল সম্ভবত ভণ্ড। সুধী এখনও বুঝতে পারল না কেন বাদল ইংলণ্ডকে নিজের দেশ করবার খেয়ালে ইনটেলেকটের মার্গ থেকে প্রথম কয়েক মাস বিচ্যুত হয়েছিল। বাদলের মতো মনীষীর পক্ষে ওটা কি ছেলেমানুষী হয়নি? বাদল নিজেই একদিন ভ্রম স্বীকার করবে। ভণ্ডতা নয়, ভ্রম। না, বাদল কখনো ভণ্ড হতে পারে না। ভণ্ডতার কোনো অর্থেই না। তার মনের টান বিশুদ্ধ চিন্তার দিকে। বাক্য ঐ চিন্তার নাগাল পায় না। কাজ যে পেছিয়ে পড়বে এর আর সন্দেহ কি? পেছিয়ে পড়া কাজ দেখে এগিয়ে চলা চিন্তার বিচার করা অন্যায়। ছোট বেলায় বাদলের শখ ছিল ইংরেজের দেশে ইংরেজ হয়ে বাস করতে। প্রথম কয়েক মাস সেই প্রাচীন শখের সঙ্গে তার পেছিয়ে পড়া কাজের সামঞ্জস্য ঘটল। ম্যাট্রিকের পরে বিলাতে আসা হয়ে ওঠেনি বলেই এই আপদ। কিন্তু কই কোনোদিন তো বাদল সম্ভোগের সাধ পোষণ করেনি। সম্ভোগ কি কোনোদিন তার পেছিয়ে পড়া কাজ হবে? যদি হয় তবে হয়তো তা উজ্জয়িনীকে অবলম্বন করে। না হয় ধরে নেওয়া যাক বাদল অন্যানুরক্ত হল। উজ্জয়িনীর তাতে সত্যিকার কিছু আসে যায় না। ঈর্ষা উজ্জয়িনীর স্বভাবে নেই; সে মহীয়সী।

একটা অহেতুক বিষাদ সুধীর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছিল। যেন তাব নিজের নয়, উজ্জয়িনীরই বিষাদ দেশান্তরিত হয়ে পাত্রান্তরিত হয়েছে। কেন সুধীর এ বিষাদ এই প্রশ্নের উত্তরে বোধ হয় প্রশ্ন করতে হয়, কেন উজ্জয়িনার ঐ বিষাদ? উজ্জয়িনীর কোনো বিষাদ উপস্থিত হয়েছে কিনা সুধী সে বিষয়ে লিখিত কিংবা মৌখিক সমাচার পায়নি, তবু তার প্রত্যয় হয়েছে উজ্জয়িনী বিষাদ-বিমোনা। সে আর চিঠি লিখবে না। সুধী বুঝেছে, চিঠি সে লিখছিল সুধীর উদ্দেশে নয়, বাদলের উদ্দেশে। চিঠি সে পাচ্ছিল— সুধী সংক্রান্ত নয়, বাদল সংক্রান্ত। হয় বাদল সম্বন্ধে তার কৌতূহল তথা উৎকণ্ঠা অন্তর্হিত হয়েছে, নয় সুধী যখন বাদলের খোঁজ খবর নিজেই রাখে না তখন সুধীর সঙ্গে পত্র ব্যবহার করে ফল কী হবে।

কিংবা হয়তো যোগানন্দের মৃত্যু করেছে উজ্জয়িনীর লেখনীকে মূক। যে আঘাত সে পেল তা কেবল আকস্মিক হলে রক্ষা ছিল, তার আংশিক দায়িত্ব উজ্জয়িনীর। সে তার বাবাকে অন্তরের দিক থেকে নিঃসঙ্গ করে দিল। বৃদ্ধ বয়সে হঠাৎ নিঃসঙ্গ হলে কি কেউ

বাঁচে ? ভদ্রলোকের একমাত্র কীর্তি ছিল তাঁর এই কন্যাটি । বিয়ে সকলের হয়, এরও হল । কিন্তু সত্য সত্য পর হয় কয়টা মেয়ে ? যোগানন্দেরও দোষ ছিল । তিনি মেয়েকে চলাফেরার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, যা দিতে পিতৃসাধারণ ভয় পান । কিন্তু বিশ্বাসের স্বাধীনতা দেবার কথা মনে আনেন নি, যে বিষয়ে পিতৃসাধারণ সম্পূর্ণ বেপরোয়া । মেয়ে স্বর্গে যাবে কি নরকে যাবে কোন্ বাপ ভাবেন ? সে শ্বশুরবাড়ী পর্যন্ত পৌঁছোতে পারলেই তাঁরা কৃতার্থ । যোগানন্দ কেন ধৈর্য ধরলেন না ? উজ্জয়িনীর বিশ্বাস যে তাঁর ইচ্ছানুরূপ একদিন হত এ আশা কেন হারালেন ?

মৃতকে প্রশ্ন করা বৃথা । সুধী তাঁর অমর আত্মাকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করল । সামান্য পৃথিবী, সামান্যতর আয়ু, সামান্যতম ভ্রান্তি—এ সকলের তুলনায় যোগানন্দ অনেক, অনেক বড় । পার্থিব ও সাময়িক তুলাদণ্ড তাঁর জন্যে নয় । মানব-বিচারকের ন্যায়দণ্ড মানব-সমাজের নিয়মনের জন্যে । তিনি মানব-সমাজ থেকে বিদায় নিয়েছেন ।

৫

দে সরকার বলেছিল, "আবার কবে দেখা হবে ?"

সুধী আন্দাজে বুঝেছিল ওর একটা দীর্ঘ বক্তব্য আছে । সম্ভবত নাটালী সম্বন্ধে । বেচারা দে সরকার । একটা না একটা affair না হলে তার চলবে না , এবং প্রত্যেকটির বিবরণ তাকে অপরের কর্ণগোচর করতেও হবে ।

সুধী বলেছিল, "যেদিন আপনার খুশি ।"

দে সরকার উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কাল মিসেস্ তালুকদারের পার্টিতে আসছেন তো ? নিমন্ত্রণ পাননি ? পাননি । রাইট্ ও । আমি এখুনি ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি ।"

সুধীর কোনো পার্টিতে যাবার আগ্রহও ছিল না, উদ্যোগও ছিল না । তা বলে সামাজিক আমোদ প্রমোদকে অসার বলে উপেক্ষা করবার মতো পণ্ডিত কিংবা মূর্খ সে নয় । সুবেশা নারী ও শৌখিন সুপুরুষ, রসনারোচন ভোজ্য পানীয়, অবিশ্বাস্য অথচ শ্রবণ সুখদ খোসগল্প, ব্রিজ খেলার ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা—এরই নাম যদি পার্টি হয় তবে মধ্যে মধ্যে এতে নিমন্ত্রিত হওয়া কঠিন পরিশ্রমের পরে ছুটি পাওয়ার মতো । তবু তার উদ্যম কিংবা আগ্রহ ছিল না, কারণ সারাদিনের অধ্যয়নের পর মার্সেলের মুখাবলোকন করে তার মনে হত স্বর্গ তার কত কাছে । দুটি ক্ষুদ্র বাহু দিয়ে সুধীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে মার্সেল যখন জিজ্ঞাসা করে, "দা-দা । আজ এত দেরি হল যে ।" সুধী উত্তর দেয়, "এই ঢ্যাখ, চৌদ্দ মিনিট আগে এসেছি ।" ঘড়ি দেখতে মার্সেল এখনো শেখেনি । তবু বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করে । মার্সেলের চেয়ে মার্সেলের কুকুর জ্যাকির আদর দুঃসংবরণীয় । সেও

তেমনি নিজের ছ'খানা পা দিয়ে সুধীর ছুটি পা জড়িয়ে ধরে ; কিন্তু কাপড়ে দেয় এমন কামড় যে থাপ্পড় মেরেও ছাড়ানো যায় না। এদের ছেড়ে কিসের আকর্ষণে সুধী আর একদফা পায়ে হাঁটবে বাসে উঠবে টিউবে নামবে। অত ছুটোছুটি ছুটির মতো লাগবে না।

সুধী নাচার ভাবে বলেছিল, "যেতেই হবে পার্টিতে ?"

"আপনি না এলে আমি নিরাশ হব।" দে সরকার তার পক্ষে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের সহিত বলেছিল। তাই থেকে মালুম হয়েছিল গরজটা কার।

সুধী মুচ্কি হেসে বলেছিল, "আচ্ছা।"

নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ রাত্রি আটটায়, বেল্সাইজ পার্কের নিকটবর্তী এক বাড়ীতে সুধী যখন উপস্থিত হল, দে সরকার তখনো পৌঁছোয়নি। চেনা মুখ একটিও চোখে না পড়ায় সুধী একটু অপ্রস্তুত বোধ করছিল, এমন সময় তার পিঠে হাত রাখলে—কে ? না, বিভূতি নাগ।

"হস্টেসের সঙ্গে দেখা হয়েছে ?"—অথ বিভূতি নাগোবাচ।

"তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্যই ঘটেনি।" ইতি সুধী।

বিভূতি সুধীকে টেনে নিয়ে গেল, তার পায়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে পা ফেলে। মিসেস তালুকদার জন পাঁচেক নানা বয়সের স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আলাপ করছিলেন। বিভূতির সঙ্গে সুধীকে লক্ষ্য করে ভ্রূ কপালে তুললেন। তার পরে তাঁর গণ্ডদ্বয় ঈষৎ স্ফীত হল এবং অধরোষ্ঠের সংযোগস্থল সেই পরিমাণে ভিন্ন হল।

বিভূতি একটা অনভ্যস্ত bow করে সোজা তাঁর দিকে তাকিয়ে শেখানো ভাষায় জিজ্ঞাসা করল, "আপনাকে মুহূর্তের জন্ত বিরক্ত করতে পারি কি, মিসেস তালুকদার ?"

"অবশ্য, মিস্টার—মিস্টার—"

"ন্যাগ।"

বিভূতি গড় গড় করে আওড়ে গেল, "মিস্টার চাকারবার্টী, মিসেস তালুকদার।"

তখন মিসেস তালুকদার সুধীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কপট উৎসাহের সুরে শুধালেন, "হাউড্ইউডু।" তারপরে একান্ত অনুকম্পার সহিত বললেন, "ওঃ আপনাকে তো আমি চিনি। আই মীন্, আপনার নাম আমি শুনেছি। আই-সি-এস্এ সেবার কেমন করলেন ?"

সুধী বুঝতে পারল মহিলাটি উদোকে বুধো ঠাওরেছেন। ধীরভাবে বলল, "আমার নাম সুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।"

মহিলাটি সামান্ত অপ্রস্তুত হয়ে অথচ সপ্রতিভ ভঙ্গীতে বললেন, "O ! How silly of me ! আচ্ছা, make yourself at home." এই বলে তিনি স-নাগ সুধীকে ফেলে

কয়েকজন নবাগত ও নবাগতাকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে গেলেন।

ড্রইং রুমের একান্তে আসন নিয়ে সুধী দে সরকারের প্রতীক্ষা করল। নাগ কিন্তু তাকে ছাড়ল না। হতাশ স্বরে বলল, "দেখলেন ত ব্যবহারখানা? আমার নামটা শুদ্ধ ভুলে গেছেন, আর আমি তাঁর ছেলের ক্লাসফ্রেণ্ড হিসাবে সেদিন তাঁর এখানে কল্ করে গেছি।"

উৎসব সভায় নিরানন্দ সুধী পছন্দ করে না। রেডিওর রিসিভার কানে তুলে নিয়ে সে কিছুক্ষণ নিবিষ্ট রইল। বিভূতি অভিমানে গজরাতে থাকল। "টাকা, টাকা, টাকা, যার টাকা নেই তার নাম নেই, তার নাম মনে পড়বে কী করে। কবি সত্যই বলেছেন, দারিদ্র্যদোষো গুণরাশি নাশী। বেঁচে থেকে কোনো সুখ নেই মশাই, যদি না আপনার—অন্তত আপনার বাবার কিংবা শ্বশুরের—টাকা থাকে।"

নাগের স্বগতোক্তি বোধ হয় সে রাত্রে শেষ হত না, কিন্তু কাকে লক্ষ্য করে সে হঠাৎ স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতো লাফ দিয়ে উঠল। সুধী ভাবল দে সরকার এল বুঝি। না, দে সরকার নয়। একটি অসাধারণ ফরসা প্রচণ্ড টাকওয়ালা প্রৌঢ় ভদ্রলোক ও তাঁর অসাধারণ সুন্দরী তন্বী তরুণী ভার্যা মিসেস তালুকদার কর্তৃক নির্দিষ্ট আসনে সমাসীন হলেন। তরুণীটি দরজা থেকে সোফা পর্যন্ত যেটুকু পথ পায়ে হাঁটলেন সেটুকু দেখে মনে হল, তিনি হাঁটার চেয়ে নাচা পছন্দ করেন। পা ফেলছিলেন কোমর উঁচিয়ে ও নামিয়ে এবং হাই হীল্ জুতা পায়ে দিয়ে। তাঁর পরনের শাড়ীখানি স্কার্টের মতো খাটো। তাঁর মাথায় যদিও কাপড় ছিল তবু তাঁর বব্ করা চুল ঠিক বিজ্ঞাপিত হচ্ছিল। তিনি যখন মিসেস তালুকদারের সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন তাঁর মাথাটা ঘন ঘন নানা ভঙ্গীতে দুলছিল এবং চাউনি একবার মেজের উপর পড়ছিল, একবার ছাতের উপর চড়ছিল, একবার মিসেস তালুকদারের মুখের উপর থামছিল। মিসেস তালুকদার যেই সরে গেছেন অমনি বিভূতি আকর্ণ বিস্তৃত হাসি নিয়ে তরুণীটির অদূরে দাঁড়িয়ে অসম্ভব নুয়ে একটি bow করল।

"O my sacred aunt! Now tell me if you are not Shyama Charan Babu's son," এই বলে তরুণীটি উঠে গিয়ে ডান হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন। এক সঙ্গে তাঁর ব্রেসলেট ও বিভূতির মুখ ঝক্ঝক্ করে উঠল। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কট্মট্ দৃষ্টিতে বিভূতিকে জেরা করতে লাগলেন। তরুণীটি তাঁর সঙ্গে বিভূতির পরিচয় ঘটিয়ে দিলে তিনি পৃষ্ঠপোষকের মতো তর্জনী সংকেত পূর্বক বললেন, "Sit down." বিভূতি কৃতার্থ হয়ে গেল। সে যতই বাংলা বলতে যায় ওঁরা বলেন ইংরেজী, অগত্যা বিভূতিও বলে বৈভূতিক ইংরেজী। বেশিক্ষণ এ সৌভাগ্য সইল না। কে এক খাস বিলিতী ইংরেজ ঘরের মধ্যে ঢুকে পরিচিত কাউকে দেখতে না পেয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে একটা গুড

ইভনিং ঠুকে দিলেন। তরুণী ভাবলেন সেটা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি বিভূতির বক্তব্য আধখানা শুনে তার দিকে পিছন ফিরে নবাগতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। নবাগত কোন্ আসনে বসবেন তা নিয়ে ইতস্তত করছিলেন। তা দেখে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি তাকে গম্ভীরভাবে বললেন, "Can't you make room ?"

বিভূতি মুখ কাঁচুমাচু করে গোটা তিনেক bow করল, সুধীর কাছে ফিরে গিয়ে পুনর্মূষিক হল। তারপর সেই একই আক্ষেপ, "টাকা টাকা টাকা।"

সুধী পরিহাস করে বলল, "এবার তো টাকা নয়, এবার রং।"

বিভূতি বিস্ফোরকের মতো শব্দ করে বলল, "সেই জন্তেই তো আমি কমিউনিস্ট।"

"চুপ চুপ চুপ।"—সুধী ও বিভূতি সচকিতভাবে চেয়ে দেখল পেছনে দে সরকার দাঁড়িয়ে। সে বলছে, "আস্তে। ফুটা মোটর টায়ারের মতো আওয়াজ করবার জন্তে রাস্তা রয়েছে, এটা বৈঠকখানা।"

বিভূতি গলা নামিয়ে কাঁদোকাঁদো স্বরে নালিশ করে বলল, "অনেক দুঃখে ও কথা বলেছি, ভাই। পুলিশে ধরে নিয়ে যায় তো কী করব বল ? ডলি গুপ্ত তো একদিন আমাকেই বিয়ে করবার জন্তে ক্ষেপেছিল। আজ না হয় সে ডলি মিটার।"

দে সরকার বিভূতিকে ধাক্কা দিয়ে একটুখানি হটিয়ে দিয়ে সুধী ও বিভূতির মাঝখানে জায়গা করে নিল। বলল, "শুনে তোমার পরে কিছু শ্রদ্ধা হল নাগ। যদিও তোমার গল্পটা গাঁজাখুরি, তবু নিজেকে ঐ মেয়ের নায়ক কল্পনা করাতেও বাহাদুরি আছে।"

বিভূতি ফস্ করে এক হাত মেলে ধরে হুঙ্কার দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "বাথ বাজি। যদি সত্যি হয় কয় গিনি হারবে ? মিথ্যা হলে আমি ছাড়ব পাঁচ গিনি !"

দে সরকার নাসিকা কুঞ্চিত করে বলল, "মোটে ?"

বিভূতি লজ্জিত হয়ে বললে, "বেশ, দশ গিনি।"

দে সরকার ক্ষ্যাপাতে ভালোবাসে। বলল, "যার যত দূর দৌড় !" কিন্তু নিজে কত হারবে জানাবার নাম করল না। বিভূতি মরীয়া হয়ে বলল, "আচ্ছা, পঞ্চাশ গিনি।"

দে সরকার তামাসা করে বলল, "নীলাম ডাকছ নাকি ?"

বিভূতি নিষ্ফল আক্রোশে সুধীর দিকে চেয়ে বলল, "দেখলেন তো কাণ্ডখানা ? ওঁর ধারণা উনি একাই একজন Don Juan, ওঁর প্রণয়িনীর সংখ্যা হয় না, আর আমরা—"

সুধী হাসতে হাসতে বাধা দিয়ে বলল, "বহুবচন ব্যবহার করেন কেন ?"

দে সরকার বিভূতিকে জবাব দিতে দিল না। বলল, "যার একটি স্ত্রী ও দুটি সন্তান বিদ্যমান ডন জুয়ানী করা তার পক্ষে বেমানান।" মুখে মুখে একটা ছড়া কাটা হয়ে গেল শুনে নিজের কবি-প্রতিভায় তার আর সন্দেহ রইল না।

দগ্ধ অঙ্গারের সঙ্গে তখন বিভূতির মুখের তুলনা করলে অসঙ্গত হত না। সে যেন

আকাশকে উদ্দেশ করে বলতে থাকল, “দেখলেন তো, দেখলেন তো। আমাকে বলে বেইমান।”

সে সরকার তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে বলল, “বেইমান বলিনি, বলেছি বেমানান। দূর হোক গে, কেন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে মরি। কফির কত দেরি বলতে পার হে, শুন বিভূতি।”

বিভূতি সত্যই ভালোমানুষ। হি হি করে একবার হেসে নিল। তারপর করল হো হো করে একটু হাস্য। শেষে কৃতনিশ্চয় হয়ে বলল, “আমি জানি তুমি আমাকে নিয়ে একটু রঙ্গ করছিলে। ইংরেজীতে যাকে বলে পা ধরে টানা। কেমন ঠিক ধরেছি কি না।”

সে সরকার তার পিঠে চাপড় মেরে বলল, “সাধে কি ডলি তোমাকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপেছিল। আমি মেয়ে মানুষ হয়ে থাকলে আমিই তোমার প্রেমে পাগলিনী হয়ে সুন্দরবনে চলে গিয়ে থাকতুম।”

একথা শুনে বিভূতির মুখের রক্তিমা তপ্ত অঙ্গারের সঙ্গে তুলনীয় না হয়ে পোড়া ইটের সঙ্গে হল। সে ফিক করে হেসে বলল, “কী যে বল তার মানে হয় না।” তারপরে কী মনে করে সে সুধীকে সম্বোধন করে বলল, “ভালো কথা, আপনাকে বলতে ভুলে গেছলুম। ডলি মিটার কে জানেন? জানেন না? আন্দাজ করুন। পারলেন না? বলব? ওয়াই গুপ্তের মেজ মেয়ে কৌশাম্বী।…হা হা হা।”

৬

বিভূতি কেন যে হা-হা-হা করে হাসল বোঝা গেল না, কিন্তু সুধীর হৃদয়ে ওটা বাজের মত বিঁধল। যোগানন্দ গেলেন মারা; কৌশাম্বীর আচরণে রইল না শোকের অভিব্যক্তি। ওটা কি তার মুখ, না মুখোস? ওই কি তার স্বাভাবিক হাবভাব, পার্টি উপলক্ষ্যে? যোগানন্দের কন্যা, উজ্জয়িনীর দিদি, বাদলের শ্যালিকা—কই, তার দিকে তাকালে তো ও কথা মনে হয় না? কুলপরিচয় তো তার শীলে নেই।

তবু কী রূপ। সে যেন মানবী নয়, যেন একটি চিত্র পতঙ্গ, একটি moth. কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষা ধার করে ওর সম্বন্ধে বলতে হয়, “She is a phantom of delight.” কেন ওর আচরণ শোকাকুলার মতো হবে? শোক তাকে দেখলে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে পাশ কাটিয়ে পালায়।

সে যে উজ্জয়িনীর দিদি তাইতে তাকে সুধীর আত্মীয়ার পর্যায়ে উন্নীত করল। নাই বা চিনল সে সুধীকে, নাই বা হল তার সঙ্গে সুধীর আলাপ, তবু সে তো উজ্জয়িনীর দিদি, বাদলের শ্যালিকা। বাদল এঁকে দেখলে এঁদের পরিবারে বিয়ে করেছে বলে হয়তো গৌরব বোধ করত এবং উজ্জয়িনীর প্রতি অনুকূল হত। ইনি যখন এমন রূপসী

তখন উজ্জয়িনীও নিশ্চয়ই উপযুক্ত বয়সে এমনি রূপবতী হবে। এ বয়সে যদি না হয়ে থাকে তবে সেটা বয়সের দোষ। আর সুধী তো বাদলকে এত কাল ধরে দেখল। বাদলটার সৌন্দর্যবোধ এখনো বিকশিত হয়নি। সত্যি বলতে কি,—প্রকৃতির স্তরে স্তরে যে নিবিড় সৌন্দর্য প্রতিনিয়ত আপনার অস্তিত্ব ঘোষণা করছে, মুখর সূর্যাস্ত ও বাঙ্ময় মেঘ-বলাকা যে বাণী শোনবার জন্যে বিবর্তিত করতে পৃথিবীকে কোটী বছর সময় দিয়েছে, অরণ্যে কান্তারে সাগরে ভূধরে যে রসসৃষ্টি অজ্ঞাতে অগোচরে অকীর্তিতরূপে থেকেও কোনোদিন ক্ষান্তি দেয়নি, বাদল এ সম্বন্ধে নিশ্চেতন। তার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এক আছে মন। তাই দিয়ে সে যা গ্রহণ করে তাই তার জগৎ। উজ্জয়িনীতে হয়তো সে মনের গ্রহণযোগ্য কিছু পায়নি। কৌশাম্বীতেও হয়তো মনীষীভোগ্য কিছু নেই। তা বলে এরা নিঃস্ব নয়। কৌশাম্বী যদি উজ্জয়িনীর সদৃশ হয় তবে উজ্জয়িনীর অন্য এক নাম নয়নজ্যোৎস্না।

কৌশাম্বীর সদৃশ, কিন্তু স্বভাবে নয়। স্বভাবে উজ্জয়িনী মীরার মতো। কিন্তু উজ্জয়িনীর অবস্থায় পড়লে কৌশাম্বীর স্বভাব যে মীরার মতো হত না কোন্ প্রমাণে সুধী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে?

সুধীর মতো স্থিতধী ব্যক্তিও অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে উজ্জয়িনীর দিদিকে প্রত্যক্ষ করে অন্তরে যে চমক বোধ করল সে চমক তার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হওয়ায় তীক্ষ্ণদৃষ্টি দে সরকারের চোখ এড়াল না। সুধীর মতো সংযতচেতার সমাহিত মুখভাবে এই প্রথম সে চাঞ্চল্যের আভাস পেল এবং পেয়ে হৃষ্ট হল। বলল, "কি মশাই, প্রেমে পড়ে গেলেন?"

সুধী সতর্ক হয়ে মৃদু হেসে উত্তর দিল, "প্রেম ছাড়া কি অন্য অনুভূতি সম্ভব নয়?"

"কী জানি। মিষ্টান্ন দেখলেই যেমন শিশুরা লোভে পড়ে, সুন্দরী দেখলেই তেমনি মুনিরাও love-এ পড়েন।"

বিভূতি ইতিমধ্যে কফি পরিবেশন করতে লেগে গেছে। মিসেস তালুকদারের কাছে ঐ ভার পেয়ে সে নিজেকে একটা কেষ্ট-বিষ্টু ঠাওরাচ্ছে ও আড়চোখে ডলির দিকে চেয়ে ভাবছে, ডলিও বোধ করি বুঝেছে যে বহরমপুরে যাই হোক, লণ্ডনে বিভূতি নেহাৎ যে সে লোক নয়। দে সরকারকে দেখে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে চাপা চীৎকারে বলল, "Coming."

অন্ততপক্ষে পঞ্চাশজন অভ্যাগত মিলে পাশাপাশি দু'খানা বড় ড্রইং রুম সরগরম করে তুলেছে। বাঙালী মাদ্রাজী হিন্দুস্থানী সিংহলী ইংরেজ দিনেমার ইহুদী ইত্যাদি নানা জাতির মানুষ জমায়েৎ হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি স্বামীজীও আছেন। তাঁর গেরুয়া আলখেল্লা যেমন আগুল্‌ফলম্বিত, গাঢ় কৃষ্ণ কেশও তেমনি পৃষ্ঠদেশে লুণ্ঠিত। একটি মাদ্রাজী

যুবক কেবলই মহিলাদের চারপাশে লাটিমের মতো ঘুরঘুর করছে। কেউ এক জায়গায় থেকে আর এক জায়গায় যাবেন, যুবকটি তার জন্য রাস্তা করে দিচ্ছে। কারুর জন্যে দরজা খুলে ধরে দাঁড়াচ্ছে, কারুর কোট খুলে নিয়ে ঝুলিয়ে রাখছে। অসম্ভব গ্যালান্ট। একটি বাঙালী যুবক নাকটা উঁচু করে ট্রাউজার্সের পকেটে হাত পুরে পায়চারি করছে। তার চশমা পোষাক ও টেরি তার বাবুয়ানার তিনটি ধ্বজা। তার ধারণা তার মতো সুপুরুষ আর নেই।

ওদিকে ব্রিজ খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। মিস্টার ও মিসেস তালুকদার সার ফ্রেডুনজী বিলিমোরিয়া ও তস্য দুহিতার সঙ্গে একটি টেবিল নিয়েছেন। ডলি মিটার, তাঁর স্বামী, সেই ইংরেজটি—পরে জানা গেছে তিনি একজন কিফিজ্যোলজিস্ট অর্থাৎ রিজেন্টস পার্ক চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষের সামিল—এবং একটি বৃদ্ধা ইংরেজ মহিলা—মহিলাদের বয়সের খোঁজ করা যদিও অভদ্রতা তবু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে, তিনি রাজা এড্‌ওয়ার্ডের সমবয়সিনী আর লম্বায় চৌড়ায় উচ্চতায় একটি কিউব আর তাঁর মাথায় সামান্য যে কয়টি চুল অবশিষ্ট আছে তাদের নিয়ে তিনি একটি ফুটকি রচনা করেছেন—এই চারজনে মিলে আর একটি টেবিল দখল করেছেন। তৃতীয় একটি টেবিলে খেলা করছেন একটি বর্ষীয়সী বাঙালী বিধবা (এঁর শরীরের বাঁধুনি শক্ত, সমস্ত চুল কাঁচা, রং ময়লা কিন্তু মুখে চোখে অনির্বচনীয় লাবণ্য, গলার স্বর মোলায়েম, আয়তন বৃহৎ), তাঁর তরুণ বন্ধু এক হিন্দুস্থানী গাইয়ে, একটি মধ্যবয়সিনী পোলাণ্ড দেশীয়া ইহুদী মহিলা (বোধ হয় হলিউডের বাতিল ফিল্‌ম্ অভিনেত্রী, পোশাক ও হাবভাব সম্বন্ধে টীকা নিষ্প্রয়োজন) এবং আমাদের পূর্বোল্লিখিত স্বামীজী (ইনিও সম্ভবত হলিউড ফেরৎ)।

দে সরকার কী যে উন্মাদনা অনুভব করল, বলল, "প্রতিজ্ঞা করেছিলুম গল্প বলব, খেলব না, কিন্তু চুলোয় যাক গল্প, আসুন এক হাত খেলি।"

সুধীও কেমন শৈথিল্য বোধ করছিল। এইটুকু সীমার মধ্যে সবাই উৎসবমত্ত, সে-ই শুধু নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে বসে রইবে? বিশাল আকাশের তলে বিজনে বিরলে বসে থাকা এক কথা, এ অন্য কথা। সুতরাং সে দে সরকারের প্রস্তাবে সায় দিল। আর কোনো টেবিল খালি ছিল না, তারা একটা অব্যবহৃত পিআনোকে টেবিল কল্পনা করল। জন দুই পার্টনার পাওয়া কঠিন হল না। সেই নাক উঁচু করা সুপুরুষ তখনো পায়চারি করছিলেন। দে সরকার তাঁকে পাকড়াও করে সুধীর কাছে এনে বলল, "এর নাম নার্সিসাস।" তারপর আর একটি বাঙালী যুবক এক কোণে এক মনে ইউরোপীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি পড়ছিলেন, তাঁকে পিআনোর কাছে টেনে এনে বলল, "আগে একটু খেলুন, তারপর বাজাবেন।" তাঁর নাম নীলমাধব চন্দ।

খেলতে বসল না কেবল বিভূতি নাগ ও সেই মাদ্রাজী টহলদার। এদের একজন

করতে থাকল কেক্ স্যাণ্ডউইচ বিলি, অন্তজন এক টেবিল থেকে আর এক টেবিলে বহন করতে থাকল। সকলে যখন খেলার মত্ততায় এদের উপস্থিতি বিস্মৃত হল তখনো এরা অদম্য উৎসাহে ফরফরায়মান।

আধঘণ্টা না যেতেই সার ক্রেডুনজী গাত্রোত্থান করলেন। তিনি যে দয়া করে এসেছিলেন ও এতক্ষণ ছিলেন এজন্ত তালুকদার সাহেব জানালেন কৃতজ্ঞতা ; আর তিনি যে আরো কিছুকাল থাকতে পারলেন না এজন্তে তালুকদার গৃহিণী খেদ প্রকাশ করলেন। উভয়ে যেটা ব্যক্ত করলেন না সেটা হচ্ছে তাঁদের এই আশঙ্কা যে সার ক্রেডুনের অনুসরণে পাছে একে একে সকল অভ্যাগত অকালে প্রস্থান করেন, এবং অকালে প্রস্থান করাকে মনে করেন ইদানীন্তন চাল।

তালুকদারেরা পরস্পরের খুঁটিনাটি জানতেন। স্বামী গেলেন সকন্তা সার ক্রেডুনকে মোটর পর্যন্ত প্রত্যুদ্‌গমন করতে, স্ত্রী চললেন ড্রয়িং রুমে অবশিষ্ট অতিথিগণকে উপবিষ্ট রাখতে। তিনি প্রত্যেককে মনে মনে বলতে লাগলেন, "না, না, না, না। ওঠবার নাম মুখে আনবেন না।" হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল তাঁর কন্তা অশোকার টেবিলে সকলেই মেয়ে, ছেলে একটিও নয়। দেখ দেখি কী আপদ। যেদিকে তাঁর দৃষ্টি নেই, সেই দিকে বিশৃঙ্খলা। এত বড় মেয়ে, নিজের স্বার্থ নিজে বোঝে না। তবু যদি ছেলের অকুলান থাকত। মেয়ের চেয়ে ছেলেরা আহূত হয়েছিল অধিক সংখ্যায়, সমাগতও হয়েছে। জন দুয়েক রয়েছে রিজার্ভে। ওই তো ওখানে চারজন ছেলে এক টেবিলে। দেখ দেখি কী অনাচার ! কী স্বার্থপরতা !

তালুকদার-জায়া ভূতলিঙ্গমকে ইশারায় ডাকলেন। মাদ্রাজী টহলদার ছুটে এসে আদেশের প্রতীক্ষা করল। "মিস্টার ভূতলিঙ্গম্, আপনি কি আমাকে এতটা অনুগ্রহ করবেন যে, ওই যে ওখানে ওই কালো পোশাক-পরা চশমা চোখে ভদ্রযুবক বসে আছেন ওঁকে—ওঁর নাম মিস্টার রায়চৌধুরী—সার বি, এল, রায়চৌধুরীর মেজ ছেলে স্নেহময়—ওঁকে…"

ভূতলিঙ্গম্ কথাটা শেষ হতে দিল না। অনুগ্রহ করবে কি না তার মস্তকভঙ্গী থেকে অনুমান করা কঠিন হলেও তার ধাবমান অবস্থা থেকে সপ্রমাণ হল। ফলে স্নেহময় পরিমিত পদক্ষেপে স্বীয় মর্যাদা প্রকট করতে করতে মিসেস তালুকদারের সম্মুখীন হল। নাকটা তার বাস্তবিক উঁচু নয়। এই সভায় কেউ তাকে সম্যক সম্মান দেখাল না দেখে সেও তার অবজ্ঞাজ্ঞাপন করছিল ভাষাযোগে নয়, নাসাযোগে। গৃহকর্ত্রীর বিশিষ্ট আহ্বানে তার নাসিকা নিম্নগতি হল, কিন্তু সে তাঁকে ক্ষমা করল না।

মিসেস তালুকদার বানিয়ে বললেন, "তুমি কখন এলে স্নেহময় ? অশোকা তোমার কথা কতবার জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার খোঁজ না পেয়ে অন্ত কোনো ছেলেকেই তার

পার্টনার করতে চাইল না। শেষকালে ওই দেখ ব্যাপার! দেখলে তো? এখন লক্ষ্মী ছেলেটির মতো তোমার কোনো সঙ্গীকে ডেকে নিয়ে এস দেখি।"

স্নেহময় এবার কিছু চঞ্চল চলনে স্বস্থানে ফিরল এবং অপরিচিত হলেও সুধীকেই মনোনয়ন করল। সুধী হঠাৎ কোন পুণ্যফলে মিসেস তালুকদার কর্তৃক স্মৃত হল তা বুঝে উঠতে পারল না। যন্ত্রচালিতের মতো স্নেহময়ের অনুসরণ করল। মিসেস তালুকদার ইতিমধ্যে অশোকার সঙ্গিনীদের মধ্যে দু'জনকে স্থানান্তরিত করবার দায়িত্ব নিজের উপর নিয়েছেন। পুরুষ মানুষের খেলার সাথী হবার প্রস্তাবে তারা তৎক্ষণাৎ সায় দিয়েছে, উল্লাস গোপন করতে পারে নি। অবশ্য মুখে বলেছে, "ওঃ, খেলাটা চমৎকার জমেছিল, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আর একটা রাবার হত।"

মিস অম্মল ও মিস খান্নাকে অপ্রার্থিত রূপে পেয়ে দে সরকার ও চন্দ কৃতজ্ঞ হল কি না বলা যায় না, কিন্তু সুধী ও স্নেহময় যে অশোকা ও কুন্তলার জন্ত নির্বাচিত হল এতে দে সরকার হল কুপিত এবং চন্দ হল দুঃখিত। সুধীকে তার ভালো লেগেছিল। প্রথম দর্শনে তার মনে হয়েছিল এই মানুষটি তার সমধর্মা। সুধীর সান্নিধ্য তাকে পরিতোষ দিচ্ছিল।

কুমারী অশোকা তালুকদার সুধীকে প্রতি-নমস্কার করে তার পার্টনার হতে অনুরোধ জানালেন, কিন্তু স্নেহময়ের ইংরেজী অভিবাদনের প্রত্যভিবাদন করতে ভুলে গেলেন। এতে স্নেহময়ের প্রতি অভিমান প্রকাশিত হল কি সুধীর প্রতি সম্মানাধিক্য, স্নেহময় ও সুধী তাই নিয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। স্নেহময় বোধ করি ভাবছিল, সুধীকে মনোনয়ন করে সুবুদ্ধির কাজ করেনি। প্রথম দর্শনে সুধীকে সে সাধু সন্ন্যাসী জাতীয় বলে সাব্যস্ত করেছিল। যেন সুধী মেয়েমহলে অতীব কৃপার পাত্র।

সুধী একটু ইতস্তত করল। বলল, "আপনার আদেশ অমান্য করব না, কিন্তু যদি বলে না রাখি যে আমি ব্রিজ খেলায় অনভ্যস্ত তবে হয়তো প্রবঞ্চনা করা হবে।"

একথা শুনে কুমারী কুন্তলা দত্ত—ইনি অশোকার থেকে বয়েসে বড়, সুধীর থেকেও—রঙ্গ করে বললেন, "প্রবঞ্চনাটা আমার প্রতি না হয়ে অশোকার প্রতি হলেই আমি খুশি হই।"

অশোকা সুধীকে অভয় দিল। আর সেই সঙ্গে স্নেহময়ের নাসিকার ভাব পরিবর্তিত হল। তা দেখে কুন্তলার মনে যেটুকু আশার সঞ্চার হয়েছিল সেটুকুও হল অন্তর্হিত। কিন্তু তাতে তার মৌখিক উল্লাসের ব্যতিক্রম হল না। সে তাসগুলোকে বিলাতী হাতপাখার মতো সাজিয়ে চোখের সমুখে ধরে ডাক দিল থ্রী নো ট্রাম্পস্। স্নেহময়ের চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

অশোকার যাতে হার না হয় এজন্তে সুধী সাতিশয় অভিনিবেশ এবং চিন্তাকুলতার সহিত খেলতে লাগল। যেন খেলা নয়, সংগ্রাম। কাজ কিংবা খেলা যেটাই হোক যেটা

করতে হবে সেটা নিষ্ঠার সঙ্গে করতে হবে। এমনিতেই সুধীর এই বিশ্বাস। তার উপর অশোকার প্রতি দায়িত্ব। সুধীর পরাজয়ের ভরসায় স্নেহময়ও খেলায় মন দিয়েছিল। ধরে নিয়েছিল যে জয়লক্ষ্মী ও অশোকা একসঙ্গে দু'জনেই তার পক্ষপাতী হবেন। কুন্তলার নিপুণতায় তার আস্থা ছিল না বলে তাকে সে ক্রমাগত ডামি করতে থাকল।

ওদিকে দে সরকারদের দল পিআনো পরিত্যাগ করে একটা টেবিল দখল করেছে। ওদের খেলা আদৌ জমছিল না। ওরা বার বার জোড় বদলাচ্ছিল। একবার মিস খান্না ও দে সরকার। একবার মিস অম্মল ও দে সরকার। দু'জনের একজনকেও দে সরকারের মনে ধরছিল না। ওরা যে সুন্দরী নয়, এই এক অপরাধে ওদের সঙ্গে খেলতে দে সরকারের প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। চুরি করে দেখছিল সুধীর কী হাল। দেখছিল সুধীর সমস্ত মন খেলায়, কিন্তু অশোকার অর্ধেকটা মন সুধীর মুখমণ্ডলে। সুধী স্নেহময়ের মতো সুপুরুষ নয়, সমাজেও মেশে না। তার অপরূপ পরিচ্ছদ তাকে অপাংক্তেয় করে রাখে। তবু তার ললাটের আভা, দৃষ্টির সৌম্যতা ও মুখের মৌনভাব অশোকাকে তার প্রতি সভয়ে আকৃষ্ট করছিল।

দে সরকার একচক্ষু মুদ্রিত করে অন্য চোখে দুষ্টু হাসি হাসল। মুনিবরের তপোভঙ্গ আসন্নপ্রায়।

৮

বারংবার পরাজিত হয়ে স্নেহময় হঠাৎ এক সময় "Bad Luck" বলে আসন ছেড়ে উঠল ও অশোকার প্রতি ভঙ্গীপূর্বক bow করে সুধীর দিকে অনুকম্পার ডান হাত বাড়িয়ে দিল। উভয়কে একত্রে বলল, "কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স। May your partnership prosper!" উত্তরের জন্যে সে অপেক্ষা করল না।

"বাবু যত বলে পারিষদ্‌দল কহে তার শত গুণ!" কুন্তলা দত্তও গাত্রোত্তোলন করলেন। ঐ কার্য কিঞ্চিৎ শ্রমসাপেক্ষ। শ্রান্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তিনি সুধী ও অশোকাকে একসঙ্গে বললেন, "বাস্তবিক আপনারা অসাধারণ কো-অপারেশন দেখিয়েছেন। যেন দুই জনের এক মন এক হাত। প্রশংসা না করে পারা যায় না, মিস্টার চাকারবাটি ও মিস টালুকডার।" তাঁর গতি স্নেহময়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করল।

সুধী অবাক। অশোকা অশোকা পুষ্পের মতো আরক্ত। সুধীর মনে হল যেন তার বিদায়ক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অতিথির দীর্ঘীকৃত উপস্থিতি গৃহস্থের হর্ষবর্ধন করবে না। সে অশোকাকে একটি নীরব নমস্কার করে ধীরে ধীরে সরে গেল।

তার মনের মধ্যে স্নেহময়ের উক্তি ফিরে ফিরে পুনরুক্তি হচ্ছিল। কী অর্থে ও কেন স্নেহময় অমন উক্তি করল? বক্রোক্তি নয় তো? অশোকা দেবী কী ভাবলেন? অশোকার

সঙ্গে স্নেহময়ের প্রাক্তন সম্বন্ধ সুধীর জানা ছিল না, থাকবার কথা নয়। স্নেহময় যে মিসেস তালুকদারের অভীষ্ট জামাতা ও অশোকা যে স্নেহময়ের প্রতি কিছু দিন পূর্বে ঠিক অপ্রসন্ন ছিল না সুধী কেমন করে তা জানবে? একদিন অশোকা দেখতে পেল স্নেহময় একটি ইংরেজ তরুণীর সঙ্গে একটু মিঠে ইয়ার্কি করছে। অশোকা জিজ্ঞাসা করল, "মেয়েটি কে?" স্নেহময় বলল, "A flame of mine." ভেবেছিল, অশোকা ওটাকে পরিহাস বলেই গ্রহণ করবে। ভেবেছিল, অশোকা যখন কয়েক বছর থেকে ইংলণ্ডে আছে তখন সে দস্তুরমতো modern girl. কিন্তু দেশ পরিবর্তনে সংস্কারের পরিবর্তন হয় না। অশোকা সেই দিন থেকে স্নেহময়ের প্রতি বিরূপ। স্নেহময় সে জন্যে কেয়ার করে বলে তার ব্যবহারের দ্বারা ব্যক্ত করল না। মিসেস তালুকদার উৎকণ্ঠিত হয়ে কতবার নিজের পার্টিতে তাকে ডাকলেন ও পরের পার্টিতে তাকে ডাকালেন। তার নাসিকা ক্রমশ হিমালয়ের মতো উচ্চ হল। কিন্তু অশোকার হৃদয় থাকল চাঁদের মতো সুদূর।

চিন্তান্বিত ভাবে সুধী কখন গিয়ে ওভারকোট গায়ে দিল ও সদর দরজা খুলতে হাত বাড়াল। এমন সময় পিছু ডাকল দে সরকার। "হে যোগীবর! একটু দাঁড়ান।" কাছে এসে পিঠে হাত রাখল। "যোগীদের তৃতীয় নেত্রটা সামনের দিকে না হয়ে পশ্চাদ্‌ভাগে হলে মহাভারত অশুদ্ধ হত না। যাকে পিছনে রেখে চললেন তার হৃদয়টা যে মট্ করে ভেঙে গেল সেটা চোখে পড়লে একাগ্রতার ব্যাঘাত হত, কিন্তু একেবারে যোগী না হয়ে একটু মানুষের মতো হতেন।"

হাসির কথা এমন গম্ভীর ভাবে বলতে দে সরকারের জুড়ি নেই। সুধীর প্রাণেও তার হাসির হাওয়া লাগল। সে জিজ্ঞাসা করল, "কার হৃদয় ফট করে ফেটে গেল?" দে সরকার রাস্তায় পা বাড়িয়ে উত্তরে বলল, "দিন, দিন, আপনার তেসরা চোখটা আমাকেই দিন।" মুক্ত হাওয়া ও ক্ষীণালোকিত অন্ধকার তাদেরকে আর এক লোকে উপনীত করল। একটা ভিখারী একলা অন্তরীক্ষকে গান শোনাবার বায়না নিয়েছে। গানের ভাষা পরিস্ফুট নয়, কিন্তু সুর সুধীকে ও দে সরকারকে ছুঁয়ে গেল। পরস্পরকে তারা বিনা কথায় বলল, "চুপ চুপ চুপ। চুপ চুপ চুপ।"

আণ্ডার গ্রাউণ্ড স্টেশনে এসে সুধীর মনে পড়ল দে সরকারের প্রেমোপখ্যান শুনতে হবে। বাসায় ফেরবার ত্বরা ছিল না। বলল, "যদি কোনো অসুবিধা না বোধ করেন, আসুন আমাকে পায়ে হেঁটে এগিয়ে দিন। হীথের ধার ধরে Spaniards ছাড়িয়ে গোল্ডার্স গ্রীনে গিয়ে আপনাকে ট্রেনে তুলে দেব ও আমি বাস নেব।"

দে সরকার খুশি হয়ে সুধীর সাথী হল। দুজনেই ভুলে গেল ব্রিজ পার্টির কাহিনী। দে সরকার তার স্মৃতির মন্দিরে আবাহন করল তার নাটালীকে। সুধী অবগাহন করল উজ্জয়িনীর ভাবনায়। নিঃশব্দে চড়াইয়ের উপর দিয়ে অগ্রসর হতে থাকল উভয়ে। অনেক

ক্ষণ পরে সুধীর চেতনা ফিরল । সে হেসে বলল, "পথ যে শেষ হতে চলল, দে সরকার । আর দেরি করবেন না, কাহিনী শুরু করুন ।"

দে সরকার জোর করে সংকোচ কাটাল । বলল, "নাটালীরা রাশিয়া ছাড়ে রুশ-বিপ্লবের সময় । ওদের আশা ছিল, বছর না ঘুরতেই কোল্‌চাক ডেনিকিন দেশ দখল করবে আর লেনিন-ট্রটস্কি প্রাণত্যাগ করবে । এই শেষেরটা সম্বন্ধে নাটালীর মা-বাবার গবেষণার অন্ত ছিল না । ওরা কোনো দিন ট্রটস্কিকে দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়ানো অবস্থায় গুলি করত, যেহেতু ট্রটস্কি হচ্ছে কাপুরুষ । আবার কোনো দিন লেনিনকে ফাঁসি কাঠে ঝোলাত, যেহেতু লেনিন হচ্ছে কাপুরুষ । বছরের পর বছর যায়, নাটালীদের প্রত্যাবর্তন আর ঘটে না । ওর মা এক বোর্ডিং হাউস খুলে বসলেন আর ওর বাবা ফেঁদে বসলেন এক রাশিয়ান ikon-এর ব্যবসা । পলায়নের সময় যেটুকু স্বর্ণ সঙ্গে এনেছিলেন রাশিয়ান প্রিন্স ও প্রিন্সেসরূপে ঐ দিয়ে বেশিদিন চলল না । অবস্থার সঙ্গে যাতে বেমানান না হয় সে জন্যে ইতর লোকের মতো মঁসিয়ে মাদাম স্টানিস্‌লাভ্‌স্কি নামে পরিচয় দিলেন । শুনছেন তো, চক্রবর্তী ?"

সুধী সত্যই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল । লজ্জিত হয়ে বলল, "Ikon-এর ব্যবসা করেন নাটালীর বাবা । তারপর ?"

"তারপর থেকে মঁসিয়ে স্টানিস্‌লাভ্‌স্কি এই তাঁর পরিচয় । লেনিন মারা গেলেন, স্টালিন হলেন ছত্রপতি । কিন্তু মঁসিয়ে রাত্রে যখন নিজের মতো অন্যান্য রাশিয়ান পলাতকদের সঙ্গে সামোভার নিয়ে বসেন তখন নিত্যকার নিরাশার পাত্রে পুরাতন আশাকে অভিষিক্ত করেন । স্টালিন রাইকভ জিনোভিয়েফ একে একে নিবিবে দেউটি । এই উদ্দেশ্যে প্রকাণ্ড এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ikon-এর ব্যবসার তলে তলে চলেছে । আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে আমাদের কাজ কী ? তাই আপনাকে জন-কয়েক প্রসিদ্ধ ইংরেজ সম্পাদক ও ক্যাপিটালিস্টের নাম করা নিষ্প্রয়োজন বোধ করলুম । এঁদেরকে সম্পাদক পাড়া ও ব্যাঙ্ক পাড়ার মধ্যবর্তী লাডগেট সারকাসে স্টানিস্‌লাভ্‌স্কির ikon-এর দোকানে মূর্তি পরীক্ষা করতে নিযুক্ত দেখে কেউ কখনো সন্দেহ করতে পারে না যে ওটা এঁদের rendezvous ।"

সুধী আবার অন্যমনস্ক হয়েছিল । বলল, "ঠিকই বলেছেন । জাহাজের খবরে আমাদের কাজ কী ? আমরা শুধু জানতে চাই, জাহাজের ব্যাপারীর মেয়ে আদার ব্যাপারীর সঙ্গে কোন সূত্রে গ্রথিত ।"

৯

গৌরচন্দ্রিকাটা সংক্ষিপ্ত করে দে সরকার বলল, "তবে শুনুন । আমার এক বন্ধু সেই

বোর্ডিং হাউসে থাকবার সময় আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছলুম। জানতুম না যে আমারই ক্লাসের একটি অপরিচিত মেয়েরও বাড়ী সেটা। নাটালীকে সেখানে দেখে পাঁচ মিনিটে আলাপ হয়ে গেল। ওঃ আপনি এখানে থাকেন? ওঃ আপনি। বন্ধুর দৌত্যের প্রয়োজন হল না। তাতে তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। আরো ক্ষুণ্ণ হলেন নাটালী যখন তার মায়ের সঙ্গে চা খাবার জন্তে আমাকে উপরে নিয়ে গেল—এবং আমার খাতিরে আমার বন্ধুকেও। মাদামের সঙ্গে সেদিন ফরাসীতে কথা কয়ে তাঁর প্রিয় পাত্র হয়ে পড়লুম। ইংরেজী তিনি মাত্র কয়েকটি কথা শিখেছেন সাত আট বছরে। Stalin die. I go. Again princess."

সুধী মন দিয়ে শুনছিল। হেসে উঠল। গল্পটা জমে আসছে জেনে দে সরকার পুলকিত হল। কেউ তার বক্তব্য এক মনে শুনছে জানলে সে কৃতার্থ হয়ে যায়। অন্তরে উৎসাহ পেয়ে সে গল্পের খেই যেখানে ছেড়েছিল সেইখান থেকে ধরল।

"রাগ করে দত্ত মজুমদার ও বাড়ী থেকে উঠে গেল। অথচ ওর স্থান পূরণ করবার মত ধনবল আমার ছিল না। মাদামের অনুরোধ আমি রাখতে পারলুম না। নাটালী বুঝল, তার মা বুঝলেন না। তাঁর ধারণা, ভারতীয় হলেই ধনী হয়। সেই যে তাঁর শ্রদ্ধা প্রীতি হারালুম তারপরে তাঁর বাড়ী যাওয়া পীড়াকর বোধ হল। নাটালীকে বললুম। সে বলল, পর্বত এখন থেকে মহম্মদের ওখানে যাবে।

"নাটালী তার মায়ের শ্রমনির্ভর ছিল না। কয়েক বছর একটা পশুলোমের দোকান একলা চালিয়ে অবশেষে সে তার এক সখীকে পার্টনার করে আধুনিক ব্যবসায়-পদ্ধতি শিক্ষা করবার সময় পেয়েছিল। নিজেকে এফিসিয়েণ্ট করা ছাড়া তার অন্ত চিন্তা ছিল না। নিজে যে পরিমাণে তৈরি হবে জীবনের প্রত্যেক কাজে সেই অনুপাতে সফল হবে এই ছিল তার সুদৃঢ় বিশ্বাস। নারী ও পুরুষের কর্মগত পার্থক্য সে মানত না। আজকালকার কয়জন মেয়ে মানে? সে বলত, কোনো কাজের গায়ে এমন কোনো ছাপ মারা নেই যে এটা মেয়ের কাজ, ওটা পুরুষের কাজ। মেয়ের মধ্যে জননী হবার সম্ভাব্যতা ও পুরুষের মধ্যে জনক হবার সম্ভাব্যতা রয়েছে—তাই বলে সব মেয়েকেই মা হতে হবে, আর বাপ হতে হবে সব পুরুষকেই, এটা হল বর্বর মনের যুক্তি—সেই যুগের যুক্তি যে যুগে লাখ লাখ শিশু অযত্নে ও অনাহারে মরত বলে সমাজ লাখ লাখ শিশুকে জীবনক্ষেত্রে নামাত। এখনকার দিনে মা হতে যারা চায়, বাপ হতে যারা চায়, তারা নিজেদের কাজ আপোসে ভাগ করে নিক, কিন্তু এই কাজটা মেয়েলি, ঐ কাজটা পুরুষোচিত, এরূপ ফতোয়া কেউ জারি করতে পারবে না।"

সুধী ও দে সরকার এতক্ষণে Spaniards Road-এ এসে পড়েছিল। একটা বেঞ্চিতে উপবিষ্ট হয়ে ছুটন্ত মোটরকার ও দুধারের আলোকমালার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। রাস্তার

দু দিকের হীথ উপত্যকার মতো নিম্নগামী ও অরণ্যভূষিত। দিনের বেলা হলে ওরা বনপথ দিয়ে যেত। এখন যাবে নর্থ-এণ্ড রোড দিয়ে।

“অথচ,” দে সরকার পূর্বানুবৃত্তি করল, “ওর মধ্যে মেয়েলিয়ানা ছিল ষোল আনা। সে যখনই আমার গ্যারেটে পা দিত তখন শিউরে উঠে বলত, আ-হা-হা-হা। ওটা অমন হবে না, এমন হবে। সেটা ওখানে থাকবে না, এখানে থাকবে। আমি চাই একটু সঙ্গসুখ, একটু আদর করতে ও পেতে। কিন্তু তার সমস্ত মন আমার ঘরের আসবাব বই বাসন ও বসনের উপরে। এটা ঝাড়ে, ওটা ভাঁজ করে, সেটা জল দিয়ে ধুয়ে ন্যাকড়া দিয়ে মোছে। আমি ওর সাহায্য করতে চাইলে ভাগিয়ে দেয়। বলে, ঘরখানাকে যা করে রেখেছ তা থেকে তোমার সাহায্যকারিতা সম্বন্ধে আমার ভ্রান্তি নেই। আমি ওকে ক্ষ্যাপাবার জন্য বলি, এসব মেয়েলি কাজে আমার সাহায্যকারিতা সম্বন্ধে ভ্রান্তি কি আমারই আছে? তবে শিভ্যালরী আমাদের ধর্ম—! সে এমন ভাবে চোখ পাকায় যে আমার মুখের কথা মুখে থেকে যায়। উষ্মার সঙ্গে বলে, অনেক পুরুষ যা পারে তুমি তা পার না। অনেক মেয়ে যা পারে না, আমি তা পারি। ক্ষমতা অক্ষমতার লিঙ্গভেদ নেই, মঁসিয়ে দ্য সারকার।

“যাক, আসল কথা, সে যতক্ষণ আমাকে সঙ্গদান করত, ততক্ষণ আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মতো নিষ্ক্রিয় করে রাখত। দংশন করতে দিত না। আমার হৃদয়ের মধ্যে কত কামনা জাগত; কিন্তু ওর হৃদয়ে তার রং লাগত না। আমি ইঙ্গিতে যা বলতুম ওর কাছে তার সাড়া পেতুম না। যে সব ভিক্ষা খুব স্পষ্ট ভাষায় চাওয়া যায় না তাদের সম্বন্ধে আমি সিম্বলিস্ট। আমি তার চোখের সুমুখে চোখ নিয়ে যাই, এই পর্যন্ত আমার overture, উৎসাহ না পেলে আমি হাত দিয়ে স্পর্শ করতেও লজ্জা বোধ করি। এক শ্রেণীর পুরুষ আছে—”

দে সরকার একটা সিগারেট ধরাল। নিজের খরচে সিগারেট খাওয়া তার নীতি-বিরুদ্ধ। মূলধন স্বরূপ গুটি কয়েক রাখে, যার কাছে একটা দিলে পাঁচটা পাওয়া যায় তেমন লোকের দিকে বাড়িয়ে দেয়। সুধীর সঙ্গে পড়লে বহু কুণ্ঠার সহিত মূলধন ভাঙাতে হয়।

“এক শ্রেণীর পুরুষ আছে—যারা রসের উপর জুলুম খাটায়। তারা প্রার্থী নয়, তারা প্রভু। এক শ্রেণীর মেয়ে আছে তারা এদের sadism-কে পছন্দ করে ও প্রশ্রয় করে। উভয় পক্ষই হাতে হাতে কামনার চরিতার্থতা পায়। পশুর মধ্যেও যেটুকু প্রার্থনার ভাব লক্ষ করি সেটুকু এদের মধ্যে নেই। থাকলে কি মানুষের সমাজে গণিকাবৃত্তি সনাতন ও সাধারণ হত?”

সুধী বলল, “আসুন এবার উঠি।”

"হাঁ, ওঠা যাক। আর অল্প বাকি।"

চলতে চলতে দে সরকার বলল, "নাটালী যে কোন্ শ্রেণীর মেয়ে তাই অধ্যয়ন করতে আমার অনেক দিন গেল। আগেই বলেছি, সে ষোল আনা মেয়ে। অর্থাৎ তার স্বভাবে পুরুষভোগ্য সমস্তই আছে। অধ্যয়নের ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলুম যে, সে আমার বর্ণিত শ্রেণীর। রুশ ভালুকের মেয়ে, আর কত হবে। Ivan the Terrible তার পূর্বপুরুষ। তাঁর সঙ্গে তার কয় পুরুষের ব্যবধান? আর আমি বাঙালী। আমার পূর্বপুরুষ ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধ, সহজিয়া, চৈতন্যপন্থী। আমরা যাকে চূড়ান্ত মূল্য দিয়ে এসেছি সে হচ্ছে রস। আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে আমরা ষণ্ড নই।"

সুধী হেসে বলল, "কে যেন বলেছে আমরা চড়াই পাখী।"

ও কথা কানে না তুলে দে সরকার বলে গেল, "কিন্তু আমি অন্যায় করছি। ব্যক্তিগত দুর্বলতাকে জাতির ঘাড়ে চাপালে সান্ত্বনা পেতে পারি, কিন্তু শক্তি পাইনে। সোজাসুজি স্বীকার করলে শক্তি পাই। মোট কথা, যাকে বলে virile. আমি তা নই। আর নাটালী তাই। আমি যদি দুবেলা মিষ্ট কথা ও শিষ্ট আচরণের সাধনা না করে বক্সিং শিখতুম ও কাঠখোট্টার মতো ব্যবহার করতুম তবে বোধ হয় এই কাহিনী অন্য রকম করে বলতে পারতুম। কিন্তু তখনকার দিনে আমি ছিলুম পুরুষমানুষের পক্ষে অতিরিক্ত vain, আমি ভাবলুম, নাটালী আমার প্রতি আকৃষ্ট হল আমার কী দেখে? বাহুবল নয়। যার দ্বারা তাকে পেয়েছি তারই দ্বারা তাকে রাখব। পরধর্ম ভয়াবহ। এই ভেবে আমি লেগে গেলুম আমার মতে আমার যা শ্রেষ্ঠ গুণ তারই চর্চায়। তা হচ্ছে আমার স্টাইল। আমি স্টাইলিস্ট।"

সুধী বাধা দিয়ে বলল, "তার মানে?"

"তার মানে?" দে সরকার সুধীর অজ্ঞতায় আশ্চর্য হয়ে বলল, "তার মানে আমি কায়দামাফিক হাসি ও কাঁদি, কথা বলি ও পোশাক পরি, হাঁটি ও দাঁড়াই। আমি কেবল অঙ্গের প্রসাধন করিনে, প্রসাধন করি অঙ্গভঙ্গীরও। শেষে এমন হল যে ট্রেনে যেতে স্থানকালপাত্র বিস্মৃত হয়ে নাটালীর সাক্ষাতে যে অভিনয় করতুম তার মহড়া দিই। ফলে কয়েকবার নাকাল হতে হল। কিন্তু নাকাল হলেই যথেষ্ট ছিল।"—দে সরকার গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, "ঐ বুঝি গোল্ডার্স গ্রীন হিপোড্রোমের আলো দেখা যাচ্ছে। এবার সংক্ষেপ করি।

"নাটালীর আসা-যাওয়া বিরল হয়ে এল। জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয় না। এদিকে আমিও তাকে সত্যিই ভালোবেসেছি। অর্থাৎ তাকে না দেখলে আমার দিনটা ব্যর্থ যায়, সঙ্গে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ আমার মনটা পায়রার মতো বকম বকম করতে থাকে। সে আমার এত কাছে—আমরা দুজনে এত নির্জন যে ভাবতে বুকের ভিতর হাডুড়ির

প্রহার চলে। আহা, আমি যদি পাগল হয়ে থাকতুম তা হলে আমার সাবধানী প্রকৃতির শাসন উপেক্ষা করতুম। কিন্তু সাহস—বুঝলেন চক্রবর্তী—সাহস আমার নেই। বাহুবলের অভাব একটা মিথ্যা ওজর। পৌরুষের প্রথম কথা হচ্ছে সাহস। নাটালী আমার চরিত্রে এই সাহস জিনিসটি বিকশিত করবার জন্যে আমাকে দিনের পর দিন স্বর্ণ সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু এমনি নির্বোধ আমি, নারীকে আমি বাকচাতুরী ও নাটকীয় অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা জয় করবার আশা পুষেছি।

“অবশেষে একদিন—সে দিনটি আমার চিরকাল স্মরণ থাকবে—নাটালী আমাকে নিমন্ত্রণ করে মারগেটের সন্নিকটবর্তী সমুদ্রতটে নিয়ে গেল। জনমানবের অগম্য একটি গুহা, এক দিকে তরঙ্গের লম্ফ, অন্য দিকে সমুচ্চ তটপ্রাচীর। তটপ্রাচীর যেন দুই বাহু তুলে আমাদের অভয় দিয়ে বলছিল, আমি পাহারা আছি; মাভৈঃ। নীলাকাশ ছাড়া কৌতূহলী দৃষ্টি কারো ছিল না। চক্রবর্তী, আপনি কি অন্তরে গ্লানি বোধ করছেন?”

সুধী ঘাড় নেড়ে জানাল, না।

“দেখুন,” দে সরকার কৈফিয়তের সুরে বলল, “আমার মরাল ফিলসফির প্রথম সূত্র হচ্ছে. দুইপক্ষের যদি সম্মতি থাকে তবে তৃতীয় পক্ষের অর্থাৎ সমাজের আপত্তি থাকা অনুচিত।”

সুধী বলল, “তৃতীয় পক্ষের স্বপক্ষে যুক্তি আছে, কিন্তু আজ আমি বক্তা নই, শ্রোতা। নির্বিঘ্নে বলে যান।”

দে সরকার আর একটা সিগরেট ধরাল। বলতে তার দ্বিধা বোধ হচ্ছিল। বাহ্য বস্তুর সাহায্যে যদি দ্বিধা দূর হয়।

“সেদিন আকাশে একখানিও মেঘ ছিল না। সূর্যের আলোতে আর ঢেউয়ের ফেনাতে মিলে রামধনু রচনা করছিল। মৃদুল বায়ু সৈকতে শীকর ছিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। নাটালীর দিকে চেয়ে দেখলুম, সে আমারই দিকে চেয়ে কী চিন্তা করছে। তার চিন্তা যে কী হতে পারে যেই ওকথা কল্পনা করলুম অমনি আমারও যেন কম্প দিয়ে জ্বর এল। কেবল হৃৎকম্প নয়, দেহের যতগুলো য়্যাটম্ ছিল এক সঙ্গে ক্ষেপে গিয়ে লাফাতে শুরু করে দিল।”

এতক্ষণে তারা স্টেশনের খুব কাছে এসেছিল। এগারোটা বাজে। সুধীর ঘুম পেয়েছিল, কিন্তু দে সরকারের ভাব থেকে মনে হচ্ছিল না যে সুধীকে সে সকালে ছুটি দেবে। দে সরকার সামনে একটা রেস্তোরাঁ দেখে সুধীর জামায় টান দিয়ে বলল, “আসুন, একটু পান করা যাক। না, না, ভয় নেই আপনার। আমার ইচ্ছে থাকলেও অর্থ নেই। গান্ধী-অনুমোদিত পানীয় ফরমাস্ করব।” গরম দুধ, তাতে এক কৌটা কোকো। ঘ্রাণ বিনোদনের জন্যে। সুধী আপত্তি করল না।

"তারপর," দে সরকার এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে বাঙালীর মতো দেখতে কেউ নেই সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার বলতে আরম্ভ করল, "তারপর কী বলছিলুম ? বৈষ্ণব গোস্বামীদের মতো আমার মুহুর্মুহু স্বেদ আর কম্প হতে লাগল। কিন্তু মূর্ছা হল না। খুব শীত করলে যেমন বাচাল হয়ে কতকটা আরাম বোধ করা যায় এই দশায় আমি তেমনি বক্ বক্ করতে লাগলুম। নাটালীকে আপনি দেখেছেন। তার রূপ বর্ণনার প্রয়োজন নেই। তবে সে কয়েক মাসের মধ্যে অস্বাভাবিক মোটা হয়েছে। তন্বী সে কোনো দিন ছিল না, কিন্তু তার শরীরে পুষ্টির অতিরিক্ত মাংস ছিল বলে মনে হয় না। তার মাংসপেশীগুলি বেশ আঁটসাঁট ছিল আর তার চিবুক ছিল এক থাক্। আমি তার কী দেখে ভালোবেসেছিলুম ? তার আকৃতির সর্বত্র সঞ্চারিত দীপ্তি। সে যেন একটি নক্ষত্র। আর তার আকারের শক্তিশালিতা। সে যেন রোমানদের কোনো দেবী। দৈহিক বল ওর থেকে আমার বেশি। বোধ করি যে-কোনো মেয়ের থেকে বেশি। কিন্তু বল ও শক্তি এক জিনিস নয়। নইলে শাক্তরা স্ত্রীদেবতার উপাসনা করতে লজ্জা বোধ করতেন।

"আমি বক্ বক্ করতে লাগলুম। করতে করতে লগ্ন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। হঠাৎ সে কলের বাঁশীর মতো চীৎকার করে দুই হাতে মুখ ঢাকল। আমি হতভম্ব ভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকলুম। আমার চোখে পড়ল দূরে একটি মানুষ পায়চারি করতে করতে সমুদ্রের শোভা সন্দর্শন করছে। আমি যদি আর্য ঋষি হতুম তবে ঐ হতভাগ্যকে ভস্ম করে ফেলতুম। খণ্ডিত কামনা আমাকে উদ্দাম করে তুলল, আর নাটালীকে করল মোহগ্রস্ত। নৈরাশ্য যেন বিষধর সাপের কামড়। নাটালীর মুখে সে কালি মাখিয়ে দিল। আমার দৃষ্টির সম্মুখে তার ঘনসংবদ্ধ গঠন জীর্ণ ও লোল হয়ে গেল। যেন কোন দেবতার বর জরতীকে যুবতী করেছিল ; কাল নিঃশেষ হয়েছে। ঐ মানুষটা যেন তার যৌবনের যমদূত। বুড়ো মানুষ ; হয়তো পেনসন নিয়ে কাছেই বসত করেছে। সঙ্গে শিকল বাঁধা এক কুকুর। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ও অনিচ্ছাক্রমে এত বড় শত্রুতা করল।

"পাছে একটা খুনখারাবি করে বসি সেজন্তে ভগবানকে বলতে থাকলুম, Father, Father, forgive him. He knows not what he does. লোকটা কি ছাই সরবার নাম করে! পুরো এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে ফল হল এই যে, আগুন জল হয়ে গেল। দুজনেই উঠলুম। কিন্তু নাটালী আমার মুখ দেখল না। তখন থেকে বাইরের দেখাশুনা বন্ধ। ক্লাসে অন্যত্র বসে, চোখাচোখি হলে ভ্রূ-ধনুকে অবজ্ঞার বাণ যোজনা করে। কিন্তু আমি"—দে সরকার প্রস্থানের উদ্যোগ করে বলল,—"ইদানীং অনর (Honor)-কে হৃদয় দিয়েছি।"

সুধী উঠল। একটা অসামাজিক ব্যাপার সংঘটিত হয়নি, এজন্তে তার প্রফুল্ল হবার

কথা। কিন্তু কী জানি কেন সে ক্ষুব্ধ হল। হয়তো সমাজনীতির চেয়ে সত্যকার বড়।

১০

দে সরকার যাবার সময় বলে গেল, “একজন গেলে আর একজন আসে। তাই পৃথিবী মধুময়। একদণ্ড বসে শোক করব, আসা-যাওয়ার মাঝখানে সেইটুকুও ব্যবধান নেই। শোক নেই বলে যে জ্ঞানে, অজ্ঞানে, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, ভ্রান্তিতে, কুযুক্তিতে, হিংসাবশে, মূর্খতায়, ভালো মনে করে, একেবারে না ভেবে—কত রকমে দুই পক্ষের আনন্দ তৃতীয় পক্ষ হরণ করেছে তার বিবরণ আমি একদা লিপিবদ্ধ করব ও গ্রন্থের নাম দেব, My Experiments With Love.”

সুধী যখন বাসায় পৌঁছল তখন তার কানে বাজছিল, “আনন্দ মাত্রেই নির্দোষ, চক্রবর্তী। দোষ যদি কোথাও থাকে তবে সে মানবের সমাজ-ব্যবস্থায়।”

কথাটা সুধী মেনে নিতে পারছিল না। প্রেমের মৃত্যু প্রেমিকের নিজেরই মধ্যে—প্রেমের অমরত্বও অপরানপেক্ষ। এই হল সুধীর স্থির বিশ্বাস। আগের গল্পের শেষ অমন হত না যদি দে সরকার সময় থাকতে দ্বিধাহীন হত। এই যে মেয়েটি দিনের পর দিন সেবাচ্ছলে ওকে পরীক্ষা করে গেল ও পরিশেষে পরীক্ষায় ওর অযোগ্যতার পরিচয় পেল, এর মধ্যে তৃতীয় মানুষটির অপরাধ কোথায়?

দে সরকারের হৃদয়ভাবে যথেষ্ট নিষ্ঠা নেই। তাই লোকটা কোনো পরীক্ষায় পাশ হতে পারল না। ব্যর্থতাকে ওর নিজের পৌনঃপুনিক অভিজ্ঞতা করল। অনাবশ্যক দুঃখ ওর স্বভাবকে করছে বক্র, বিকল ও সন্দিগ্ধ। সুধী ছাড়া অন্যের সঙ্গে কথা বলে ভেংচিয়ে। বাদলকে ক্ষেপায়, বিভূতিকে ব্যঙ্গ করে।

পরের ভাবনা স্থগিত রেখে সুধী নিজের ভাবনায় মন দিল। মেয়েদের সম্বন্ধে সে কোনোদিন চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করেনি। এর কারণ এ নয় যে, সে কামিনীকাঞ্চনে বিরাগী। এও নয় যে তার ভোগ-ক্ষমতা দুর্বল। যথার্থ কারণ, সে ভালোবাসার মতো কাউকে দেখেনি। তার ভালোবাসা তার সমগ্র সত্তা জুড়বে, তার জীবনের সবটাকে জড়াবে। জীবনশিল্পে পুনরুক্তির স্থান নেই। তাই সুধীর অনুরাগ হবে একানুগ। সেই এক যে কেমন সুন্দরী হবে, কেমন গুণবতী, বিদুষী হবে কি বিদ্যাধরী, সুধীর দিক থেকে এ রূপ কোনো প্রত্যাশা ছিল না। দেশপ্রথা অনুসারে গুরুজনের মনোনীতা পাত্রীকে বিবাহ করতে হবে, এই সম্ভাবনায় সুধী আপত্তিযোগ্য কিছু পেত না। স্ত্রী-রূপে লাভ করলে যে-কোনো নারীকে সে তার সাধ্যানুসারে সুখী করতে প্রস্তুত ছিল।

আজকের সন্ধ্যার সম্মিলনীতে সে চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করেনি, কিন্তু, তার স্মৃতি পুনঃপুনঃ কৌশাম্বীর অনুসরণ করছিল, কৌশাম্বীর মধ্যে সে কি কেবল উজ্জয়িনীকে

অন্বেষণ করছিল, না, কৌশাম্বীর সত্যস্বরূপকে ? কিছু চাল ও জাল বাদ দিলে কৌশাম্বী কি বিশুদ্ধ আনন্দের লীলাপ্রতিমা নয় ? অথবা শাপভ্রষ্টা অপ্সররমণী ? সংসারের সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে করতে আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির যে আকৃতি দাঁড়ায় ওর কতকটা অনুকৃতি ও কতকটা বিকৃতি। সত্যসন্ধানীর কাছে তাই ও বর্তব্য নয়।

অশোকাকেও তার মনে পড়ছিল। তার মতো মানুষের প্রতি অশোকার মতো মেয়ের হৃদয়ে কোনো ভাব উপজাত হওয়া সম্ভব নয়। আকস্মিকতার তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে তারা পরস্পরের পার্শ্বলগ্ন হয়েছিল। জীবনে অন্য কোনোদিন তাদের সাক্ষাৎ হবে কিনা সন্দেহ। সুধীর বিদায়ে অশোকার ব্যাকুলতা দে সরকারের রঙ্গপ্রিয় মনের রসোক্তি ছাড়া আর কী—তবে খেলার সময় সুধীর প্রতি অশোকার পক্ষপাতিত্ব নানা আকারে ও ইঙ্গিতে ব্যক্ত হতে সুধীও লক্ষ করেছে। ওটা সাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত। খেলার সাথী যদি খেলা জিতিয়ে দিতে থাকে তবে কে না হৃষ্ট হয়! কার না মুখ খুলে যায়।

তবু স্নেহময় ও কুন্তলা যে-ভাষায় অভিনন্দন করে গেল তার মর্ম সুধী বুঝতে পারল না। খেলার পার্টনারশিপ বিভিন্ন বার বদলায়। আবার যখন অশোকা ব্রিজ খেলবে তখন অন্য কেউ তার পার্টনার হবে। খেলাঘরের সম্বন্ধ যদি বাসরঘর পর্যন্ত গড়াত তবে তো খেলার সাথী নির্বাচন নিয়ে হুলুস্থুল বেধে যেত।

শুতে যাবার আগে সুধী স্নান করে। স্নান করে উঠতে একটা বাজল। তার শয়নকাল তিন ঘণ্টা বিলম্বিত হয়েছে। আর বিলম্ব নয়। ভোর না হতেই মার্সেল তার ঘুম ভাঙিয়ে দিতে আসবে। রোজ ভোরে দুজনের খানিকটে বেড়িয়ে আসা চাই। সুধী ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ার মুখে যার কথা তার মনে জাগল সে উজ্জয়িনী—বিষাদিনী।

সুধী স্বপ্ন দেখল, গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, হাতে একতারা, মাথার চুল কটা হয়ে জটায় পরিণত হতে চলেছে—উজ্জয়িনী কৌতূহলী জনতার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আপন মনে গান করছে, তার মুখে হাসি, চোখে জল। গানের কথা বোঝা যাচ্ছে না, সুর শুনে প্রাণ উদাস হচ্ছে। জনতার চোখে ক্রমশ বাষ্প ঘনিয়ে এল। ওরা মিনতি করে বলল, "মা, যদি ফিরে না যাও তবে আমরাও তোমার সঙ্গ নেব।" উজ্জয়িনী ও কথা কানে তুলল না। ওরা বলতে থাকল, "তোমার এত অল্প বয়স, তোমার এমন প্রতিভা, তুমি গৃহশ্রী হতে, তুমি হতে সমাজের রানী। মা, তুমি আমাদের ত্যাগ করে যেতে পারবে না।" উজ্জয়িনীর গান তবু থামে না। তখন জনতাকে দুই হাতে ঠেলে সুধী এগিয়ে গেল। উজ্জয়িনীর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "উজ্জয়িনী, তুমি আমাকে তোমার বৈরাগ্য দাও, দাও।" উজ্জয়িনী সুধীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে [illegible] থাকল। তার গানের সুরের রেশ জনতার বেষ্টনী ভেদ করে শূন্যে মিলিয়ে গেল। তার একতারার গুঞ্জন স্তব্ধ হল।

সে বলল, "সুধীদা, তোমার সত্যবশর পত্নীকে বঞ্চিত করবার অধিকার তোমার

নেই।"

সুধী বলল, "সমাজের জন্তে তোমাকে আমি ফিরিয়ে নিলে যদি তেমন কোনো নারীর অস্তিত্ব থাকে তবে তিনিও উপকৃত হবেন। তা ছাড়া, বৈরাগ্য বহনের যোগ্যতা একমাত্র আমারই আছে, কারণ এই দ্যুলোক ভূলোকের অধিষ্ঠাত্রী প্রকৃতিদেবীর আমার মতো অনুরাগী আর নেই। উজ্জয়িনী, তোমার বৈরাগ্য আমাকে দান কর।"

উজ্জয়িনী কিয়ৎকাল চিন্তা করল। জিজ্ঞাসা করল, "বিনিময়ে তুমি আমাকে কী দেবে ?"

"আমি দেব তোমাকে কল্যাণী হবার দীক্ষা।" সুধী উত্তর দিল।

উজ্জয়িনী সুধীকে তার বৈরাগ্য দান করল। সুধীর কণ্ঠে এল গান, হাতে এল একতারা, গাত্রে এল বহির্বাস। উজ্জয়িনী যখন তাকে বিদায়-প্রণাম করল তখন সে আশীর্বাদের সঙ্গে নিজের ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ পাত্রান্তরিত করে দিল। জনতা উজ্জয়িনীকে নিয়ে হর্ষধ্বনি করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্বপ্ন, বাস্তব, স্মৃতি

১

সুধীর মুখে তার স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে মিস মেলবোর্ন-হোয়াইট তর্জনী চালনা করে বললেন, "নিশ্চয় এর কোনো অর্থ আছে, সুধী। আমার এক বন্ধু স্বপ্নতত্ত্ববিদ্, তাঁকে তোমার হয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারি, যদি চাও।"

"না, আণ্ট এলেনর," সুধী স্মিত হেসে বলল, "চাইনে। ওসব ফ্রয়ডীয় কেঁচো খোঁড়া আমার জুগুপ্সা উদ্রেক করে।"

আণ্ট এলেনর তাকে অভয় দিলেন। ফ্রয়ডীয় বিশ্লেষণ নয়, মেটারলিঙ্কীয় মর্মোদ্‌ঘাটন। তবু সুধী সম্মতি দিল না। দৃঢ়ভাবে বলল, "কী দরকার!"

তখন মিস মেলবোর্ন-হোয়াইট উদ্দীপ্তকণ্ঠে বললেন, "স্বপ্নকে তুমি উপেক্ষণীয় ভেবো না, সুধী। স্বপ্নের মূল্য আছে। আমরা যাকে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান বলি সেটা আমাদের মনগড়া কাল-বিভাগ। ইকুয়েটর বলে বাস্তবিক কোনো ভূপৃষ্ঠরেখা আছে কি? নেই, কিন্তু থাকা উচিত, সেইজন্তে ইকুয়েটর আমরা এঁকে দেখাই। যখন ইংলণ্ড থেকে নিউ-জীলণ্ডে যাই তখন আমাদেরই কপোলকল্পিত ইকুয়েটরকে চাক্ষুষ না করতে পেয়ে কেমন নিরাশ হই, তা আমার প্রথম যৌবনের দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখতে পাই।" তিনি বোধ করি তাঁর প্রথম যৌবনের স্মৃতিতে অবগাহন করলেন। কিছুক্ষণ আনমনা থেকে সুধীর পাতে আর এক টুকরো কেক তুলে দিলেন (সুধী দুই হাত উঠিয়ে আপত্তি খণ্ডন করল, তিনি তর্জনী উঁচিয়ে প্রতিরোধ করলেন) ও বললেন, "আমার প্রথম

যৌবন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে বটে, কিন্তু খুব শক্তিশালী দূরবীণ দিয়ে সুদূর নক্ষত্রবিশেষ থেকে সেদিনকার পৃথিবীর দৃশ্য যাঁরা দেখছেন তাঁরা আমার প্রথম যৌবনকে লক্ষ্য করছেন সন্দেহ নেই। কোনো মন্ত্রবলে আমি যদি সেই নক্ষত্রলোকে আজ উপস্থিত থাকতুম তবে আমিও এই চর্মচক্ষুতে যন্ত্র লাগিয়ে আমার পার্থিব অতীতকে প্রত্যক্ষ করতুম।"

সুধী চুপ করে শুনছিল। চায়ের পেয়ালা পিরিচ ঘাসের উপর রেখে বলল, "প্রত্যক্ষ করলে তো আর ফিরে পেতেন না। ফিরে পাওয়া যায় না বলেই তা অতীত।"

"ফিরে পেতে চায় কে? পুনরাবৃত্তিতে কিই-বা সুখ? কিন্তু আয়নায় নিজেকে দেখা কি কোনো দিন ফুরাবার? আয়নায় যে দেখা দেয় না তাকে আর একবার মাত্র দেখতে নক্ষত্রযাত্রা করতে পারতুম তো বেশ হত—কিন্তু যে মোটা হয়ে পড়েছি, বাপ! এ পৃথিবীর মাটি থেকে কার সাধ্য আমাকে নড়ায়।"—তিনি শব্দ করে হাসলেন। সুধীও। তারপর—

"জাপানীদের একটি উপকথায় এক আয়নার বর্ণনা আছে, শিশু তার মধ্যে মৃত জননীর ছায়া নিরীক্ষণ করত। তেমন আয়না আছে আমারও। তার নাম স্মৃতি। জাগ্রতাবস্থায় আমাদের চৈতন্য আমাদের স্মৃতিকে যথেচ্ছা নিয়ন্ত্রিত করে। সেই জিনিসই যখন নিদ্রিতাবস্থায় উচ্ছৃঙ্খল হয় তখন তাকে বলি স্বপ্ন।"

একথা শুনে সুধী লজ্জায় সংকুচিত হল। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "না, না, না, না, না।"

আর্ট এলেনর মুচকি হেসে বললেন, "আগে ভালো করে বলতে দাও আমাকে। সমস্তটা না শুনেই না, না, না। Guilty mind।"

"আমার আসল বক্তব্য হচ্ছে এই," তিনি বলতে লাগলেন, "যে, স্বপ্ন যদিও স্মৃতিরই নামান্তর, তবু স্মৃতির মতো সদা সর্বদা বিষুবরেখা বাঁচিয়ে চলা তার ধর্ম নয়। উচ্ছৃঙ্খল অশ্বের মতো লাফাতে লাফাতে সে বিষুবরেখা ডিঙিয়ে যায়। অতীত ও ভবিষ্যতের ব্যবধান মানে না। হাজার হোক, কাল তো এক ও অবিভাজ্য। উদারা মুদারা তারা তিন স্বরগ্রামের উপরই স্বপ্নের আঙুল খেলে, তবে সমানে নয়। তোমার স্বপ্ন সম্ভবত ভবিতব্যের। মিস্টার রেবীকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখতে দোষ কী?"

"না, না, না।" সুধী তথাপি অস্বীকৃত হল। বলল, "ভবিতব্য অজ্ঞাত থাকাই ভাল। যার উপর কর্তৃত্ব খাটবে না, তার কথা দুদিন আগে জেনে কোন্ পরমার্থ পাব? মরতে একদিন হবে। কোন্ দিন, তার খবর নিয়ে কেন স্বস্তি ও স্বাস্থ্য বিসর্জন দেব?"

সুধীর মুখশ্রী মলিন দেখাচ্ছিল, সুনিদ্রার অভাবে। তার কণ্ঠস্বর ফাটা কাঁসির মতো খন খন শোনাচ্ছিল। সুধীর মতো প্রশান্ত সৌম্য পুরুষ—মানব বনস্পতি—সামান্য

আঘাতে বিচলিত হয় না, হলে কিন্তু কারুণ্য সঞ্চার করে। আণ্ট এলেনরের চক্ষু সমবেদনায় সজল হল। জল-কজ্জল তাঁর নয়নপত্রে অঙ্কিত হল। সুধী যে মনে মনে ঐ স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা করেছে তা তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন ও সুধী যে ঐ স্বপ্নের ঘটনাকে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিয়েছে তাও তিনি আন্দাজে বুঝেছিলেন। শেষেরটাতে তাঁর আপত্তি ছিল। তিনি সুধীর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "যা ঘটতে পারে অথচ ঘটা উচিত নয় তাকে ঘটতে দিও না। ব্যস, ফুরিয়ে গেল।"

সুধী তাঁর প্রতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে তিনি স্নেহার্দ্রস্বরে বলতে লাগলেন, "যে ত্যাগ তোমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, যাকে স্বীকার করতে তুমি স্বাভাবিক আনন্দ বোধ করছ না, তেমন ত্যাগ নাই বা করলে। কোন্ সার্থকতার জন্যে তুমি বৈরাগ্য বহন করবে? উজ্জয়িনী তোমার কেউ নয়।"

"উঁহু," সুধী ঘাড় নাড়ল। বলল, "উজ্জয়িনী আমার আত্মীয়া। কেমন আত্মীয়া তা অন্তর্যামী জানেন। সে যদি বিবাগিনী হয়ে যায় তা হলেও আমি অসার্থক হব, আণ্ট এলেনর। পৃথিবীতে এত মেয়ে আছে, এত সম্ভাবনা সত্ত্বে কে তার মতো হতভাগিনী। তার ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে পারি যদি, তবে আমার বঞ্চিত জীবন মাধুরী-বর্জিত হবে না।"

মিস্ ডব্‌সন চায়ের সরঞ্জাম স্থানান্তরিত করলে আণ্ট্ এলেনর আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিন্তু গোড়ায় গলদ, উজ্জয়িনী যে বিবাগিনী হবেই এই ধারণার ভিত্তি কোথায়?"

"বাদলের ব্যবহারে।"

"বাদলের ব্যবহার পরিবর্তনসাধ্য নয় কি?"

"না। আর আমার সে ভরসা নেই। তা ছাড়া বাদল তো নিরুদ্দেশ।" সুধী দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

আণ্ট্ এলেনর সোজা হয়ে উঠে বসলেন। বললেন, "ওর খোঁজ কর। অমন করে হাল ছেড়ে দিও না। আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করব। স্ত্রীর প্রতি বিমুখ হতে পারে, কিন্তু বন্ধুর প্রতি মুখ তুলবে।"

"বাদল যদি আমার উপর অনুগ্রহ করে উজ্জয়িনীকে গ্রহণ করে তবে উজ্জয়িনীর প্রতি করবে অন্যায়, আমাকেও ক্ষমা করবে না। তা ছাড়া, আমি তো বাদলের বন্ধু— আর সে তো আমার বন্ধুর অধিক। আমি এত দিনে নিঃসন্দেহে জেনেছি যে উজ্জয়িনীর সঙ্গে ওর আন্তরিক সামঞ্জস্য হবার নয়। বোধ হয় কোনো মেয়ের সঙ্গে ওর সাবর্ণ্য হবে না। নারীর সান্নিধ্য ওর অনুপভোগ্য নয়, নারীর রূপশ্রী ওকে চঞ্চল করতে পারে। কিন্তু নারীর অস্তিত্বের অর্থ সম্বন্ধে ওর না আছে অন্তর্দৃষ্টি, না আছে জিজ্ঞাসা। পুরুষ হিসাবে

ও যদি শিশুপ্রকৃতি হয়, তবে ব্যক্তিহিসাবে সে বে-দরদী।" কথাটা উচ্চারণ করে সুধী জিব কাটল। অবিচার করল না তো? তাড়াতাড়ি শুধরে নেবার জন্যে বলল, "না, না, স্বার্থপর নয়। সজ্ঞানে নিষ্ঠুর নয়। অনুভূতির ক্ষমতা ওর মধ্যে বিকশিত হয় নি। আমি যদি ওর জীবনে কিছু আগে আসতুম তবে হয়তো ওর গায়ে চিমটি কেটে ওর অসাড়তা ধ্বংস করতুম। এসে দেখি গণ্ডারের মতো পুরু চামড়ায় বর্শার প্রহারও ব্যর্থ। তবে আমার আসা একেবারে নিরর্থক হয়নি। কেউ যে কিছু জানে কিংবা বোঝে কিংবা ভাবতে পারে বাদল সেকথা বিশ্বাস করত না। শিক্ষকদের প্রতি অবজ্ঞা ও সহপাঠীদের প্রতি অনুকম্পা—এই নিয়ে তার সতের বছর বয়স হয়। বাপের সঙ্গে কথা বলে না, পাছে তর্কে জিতে তাঁকে গোরু কি গাধা বলে বসে। বাড়ীতে বইয়ের মৌচাক তৈরী করে ভায়া তারই মধ্যে বুঁদ হয়ে রয়েছে। আমি এসে তার চরিত্রে বিশ্বাসের বীজ বপন করলুম। সে মনে মনে মানল যে ভারতবর্ষে একটি মানুষ একটু বোঝে।"

মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইটের হাসিতে সুধীও যোগ দিল। সে সব দিনের স্মৃতি সুধীর অন্তঃকরণকে আলোড়িত করছিল। স্মৃতিমাত্রেরই একটি স্বকীয় রস আছে—কেমন এক উদাস করুণ রস। পিছু হটবার হুকুম নেই, পিছু ফিরে দেখছি কী যেন জামা থেকে খসে মাটিতে পড়ল। হয়তো প্রিয়ার পরিয়ে দেওয়া ফুল, হয়তো বোনের হাতের ফুলতোলা রুমাল। পশ্চাদ্‌বর্তী সৈনিকেরা মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। মার্চ!

২

"না, আণ্ট" সুধী সামলে নিয়ে বলতে লাগল, "বাদলকে আমি স্বমার্গচ্যুত হতে পরামর্শ দেব না। প্রত্যেক নক্ষত্রের স্বতন্ত্র কক্ষ, নিজস্ব লক্ষ্য। মানুষের ঘরে জন্ম নিয়েছে বলে মানবীকে নিয়ে ঘর করতে বাধ্য নয় সে। তার বিয়ের সময় আমিই তাকে যুক্তি দিয়ে প্রবর্তিত করেছিলুম। ভালো করিনি। আমার বোঝা উচিত ছিল।"

"বেশ, না হয় তোমারই দোষ। কিন্তু বাদলের অনাদরে উজ্জয়িনীর যে বৈরাগ্য তোমার বৈরাগ্যের দ্বারা তার প্রতিকার হবে কী করে?"

আণ্ট এলেনর এই প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে একটু রসিকতার আশ্রয় নিলেন। বললেন, "যদি তুমি বৈরাগী না হয়ে অনুরাগী হতে তবে তোমার চিকিৎসায় ফল হত, সুধী!"

সুধীও রসিকতায় অপ্রস্তুত হবার পাত্র নয়। বলল, "আপনার মতে সেইটে হত বন্ধুকৃত্য। না, আণ্টি?"

"বন্ধুকৃত্যই বটে। বাদল তোমার প্রতি ঈর্ষাসম্পন্ন হয়ে স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হত

আর এত বড় একটা সমস্যা সাধারণ একটা তামাশায় পর্যবসিত হত। তুমি বলবে বাদল ঈর্ষালু হতে পারে না। কিন্তু আমি কি ও কথা বিশ্বাস করব ভাবছ?" মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট তাঁর বাগানে সমাগত ষ্টার্লিং পাখীদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। সুধী লজ্জিত হয়ে মৌনতার দ্বারা স্বীকার করল যে, ওকথা সে নিজেও বিশ্বাস করে না। কিন্তু উক্ত প্রকার বন্ধুকৃত্য তার পক্ষে অসাধ্য।

দুজনে অনেকক্ষণ নীরব থাকবার পর মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট আবার সেই কথা পাড়লেন। বললেন, "তোমাকে বৈরাগী হতে দেখে উজ্জয়িনীর কী লাভ, কেন সে গৃহস্থাশ্রমে ফিরবে, ফিরলেও কাকে নিয়ে ঘর করবে?"

"এক নিঃশ্বাসে তিন তিনটে প্রশ্ন?" সুধী হাসল। "আমি যদি বৈরাগী হই—না, না, যদি বৈরাগ্য সাধন করি—তবে উজ্জয়িনী জানবে যে পৃথিবীতে তার একজন যথার্থ ব্যথী আছে, তার জন্যে একটা ত্যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সে নিতান্ত সামান্য প্রাণী নয়, তার জীবনের মূল্য আছে। জীবনের মূল্যবোধ থেকে একে একে গৃহস্থোচিত যাবতীয় গুণ উপজাত হবে। আপনি যেমন আপনার ভাইকে নিয়ে ঘর করছেন, তেমনি ঘর করবে—হয়তো আমাকে নিয়ে।"

আন্ট এলেনর হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়লেন। "হো হো হো হো হো। এই তোমার স্বপ্নের অর্থ? ··হো হো হো। কিন্তু তোমার নিজের বৈরাগ্যের স্বরূপ কী শুনি?"

সুধী এতক্ষণে সত্যিই অপ্রস্তুত হয়েছিল। সে আমতা আমতা করে যা বলল তার মর্ম এই যে, বৈরাগ্যের আদর্শ সকলের পক্ষে এক নয়। সুধী সাধনা করবে নিষ্ক্রিয় নিরাসক্ত দৃষ্টির। নিষ্ক্রিয় কেন? কারণ কর্ম হচ্ছে গৃহস্থের ধর্ম। পরধর্মে হস্তক্ষেপ অনুচিত। তাতে প্রতিযোগিতার আশঙ্কা আছে। প্রতিযোগিতাকে প্রাচ্য সমাজ ভয়াবহ জ্ঞান করেছেন বলে চতুর্বর্ণের ব্যবস্থা করেছেন। নিরাসক্ত কেন? যেহেতু আসক্তি থেকে আসে একদেশদর্শিতা। সেটাতে কর্মীর ক্ষতি করে না; বরঞ্চ কর্মীমাত্রেই একদেশদর্শী। কিন্তু দ্রষ্টার পক্ষে সেটা মারাত্মক। সে চায় ভাগবত দৃষ্টি। ভগবানের চোখে এ বিশ্ব কেমন দেখায় তাই তার জ্ঞেয়। গৃহস্থের মুক্তি কর্মে, বৈরাগীর মুক্তি বিশ্বরূপ দর্শনে।

"নিষ্ক্রিয় নিরাসক্ত দৃষ্টি।" আন্ট এলেনর গোটা গোটা করে উচ্চারণ করলেন। "তার সাধনা বোধ করি আমার অজানা নয়। তোমার আর্থার খুড়োর কল্যাণে হাড়ে হাড়ে জানি। তুমি যেন অতটা নিষ্ক্রিয় হোয়ো না বাপু—উজ্জয়িনী তো তোমার বোন নয় যে পড়ে পড়ে সহ্য করবে সারা জীবন।"

শেষের কথাটায় একটু আহত হয়ে সুধী বুড়ীকে ক্ষেপিয়ে দেবার জন্যে বলল, "আর্থার খুড়ো তো বলেন তিনি ইচ্ছা করে নিষ্ক্রিয় হননি, হয়েছেন কর্মৈষণায় ক্রমাগত

ঘাবা পেয়ে।"

বুড়ীর কানে ওকথা পড়া যেন বোমার রঞ্জকে আগুন ধরা। দপ্ করে উঠল তাঁর চোখ, ফট করে ফাটল তাঁর মুখ। "বটে? বলেছে আর্থার ও কথা?" বাষ্পাকুল কণ্ঠে বললেন, "অকৃতজ্ঞ। ···না, না, আমি কী বল্ছি! I am sorry! Oh, I am sorry!" তিনি এলিয়ে পড়লেন। সুধী ক্ষমা প্রার্থনা করতেই তিনি আবার উঠে বসলেন। "না, না, তোমার কী দোষ!"

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর তিনি ধীরে ধীরে শুরু করলেন, "খানিকটা যখন শুনেছ এক পক্ষের, অপর পক্ষের বাকিটা শোন।···আমরা দুই ভাই-বোন শৈশবে মাতৃহারা হই। শোক ভোলবার জন্যে বাবা নিউ-জীলণ্ডে চলে যান। সেখানে তিনি প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে যখন দেশে ফিরলেন সে শুধু দ্বিতীয় বার বিবাহের জন্যে। আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু দিদিমার অনুরোধে নিবৃত্ত হলেন। দিদিমা আর্থারকে পাবলিক স্কুলে পাঠালেন না; তিনি শুনেছিলেন পাবলিক স্কুলে রোগা ছেলেদের উপর ষণ্ডা ছেলেরা নির্বিঘ্নে অত্যাচার করতে পায়। ফলে খেলাধুলার দিকে আর্থার একেবারেই মন দিল না। রাত জেগে পড়ল, স্কলারশিপ পেল ও স্বাস্থ্যের মাথাটি খেল। আর্থার যখন ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হয়েছে তখন দিদিমার কাল হল। আমি নিলুম আর্থারকে দেখাশুনার ভার। পড়াশুনায় নিবিষ্ট থেকে সে সংসার সম্বন্ধে একেবারে অচেতন ছিল। অথচ আমি ছিলুম রঙিন প্রজাপতি। ওর উপর এমন রাগ হত; কিন্তু ওকে ওর নিজের হাতে কিংবা কোনো ল্যাণ্ডলেডীর কোলে ছেড়ে দিতে প্রবৃত্তি হত না। ওর মনীষায় আমার বিশ্বাস ছিল, সে বিশ্বাস অপাত্রে ন্যস্ত হয়নি তা তো দেখতেই পাচ্ছ। ওর কর্মপটুতায় আমার সন্দেহ ছিল, সে সন্দেহ কি মিথ্যা বলতে চাও?" (সুধী উত্তর করল না।) "মাঝে মাঝে ওকে ছেলে-মানুষীতে পেত। বলত, সিংহ শিকার করতে আফ্রিকায় যাব। যে মানুষ একটা খরগোস কিংবা খ্যাকশিয়ালী মারে নি, মারতে চায়নি, যে মানুষকে লণ্ডনের বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতে হলে মালগাড়ীতে তুলে দেওয়াই নিরাপদ, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগলে যার হাঁকডাকে পাড়াশুদ্ধ হাজির হয়—তার আফ্রিকা যাত্রায় সম্মতি দিলে সে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পৌঁছে ভুল গাড়ীতে উঠত ও ফোকস্টোনে ভুল জাহাজে চড়ে বুলোনে উপনীত হত। এই তো?"

সুধী মনোযোগপূর্বক শুনছিল। হাঁ, কিংবা না বলল না।

"নিউ-জীলণ্ডে যাবার জন্যে বহুদিন থেকে বাবার আমন্ত্রণ ছিল। আর্থারকে সঙ্গে করে পাড়ি দিলুম। না-মরা সিংহের শোকে সমস্ত পথ তার বাক্স্ফূর্তি হল না। আমি কিন্তু নাচি, খেলা করি, রাক্ষসের মতো খাই। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দর্শন করা আমার

নিত্যকর্ম। ডেকের উপর অবাধ হাওয়ায় আমি হরিণীর মতো চঞ্চলচরণে দিশাহারা হয়ে ছুটি। আহা, প্রথম যৌবনের সেই প্রাজাপত্য জীবন কী অনাবিল আনন্দের আকর ছিল।

"জাহাজের আলাপ আদবকায়দার অপেক্ষা রাখে না। আমার প্রতি অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন ; তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে তাঁদের একজনের প্রতি আমিও আকৃষ্ট হলুম। নিউ-জীলণ্ড দেশটি ছোট। সেখানে যে কয়মাস ছিলুম, তাঁর সঙ্গে নানা ছলে সাক্ষাৎ ঘটত। একদিন বাবার অনুমতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে বাগ্‌দানও হয়ে গেল। ইংলণ্ডে ফিরে আর্থারের গৃহস্থালীর পাকারকম বন্দোবস্ত করে বছর দুই-তিন বাদে নিউ-জীলণ্ডে বিয়ে করব এই স্থির হল। আর্থার মুখ ভার করে থাকল, বোধ হয় সিংহের শোকে। অভিমত জানাল না। ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করলুম।

"ইংলণ্ডের বাইরে মাত্র একটি ইংলণ্ড আছে। সেটি নিউ-জীলণ্ড। সে দেশের প্রশস্ত নিভৃত পল্লীতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিচিত্র মালঞ্চে যার সঙ্গে আমার এন্‌গেজমেণ্ট্‌ তিনি অপেক্ষা করতে থাকলেন আমার আশায়। আর আমি অপেক্ষা করতে থাকলুম আর্থারের যদি কারুর সঙ্গে বিবাহ হয় তার আশায়। আর্থারকে কত মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলুম ; একলা ছেড়ে দিলুম ; নাচের আসরে পাঠালুম। কিছুতেই সে কারুর কাছে ঘেঁষল না। কথাবার্তার মাঝখানে অন্যমনস্ক হল। চায়ের টেবিল থেকে পালিয়ে গিয়ে বই খুলে বসল। নাচের মজলিশের এক কোণে পেচার মতো মুখ ভার করে চিন্তামৌন রইল। বছরের পর বছর যায়। ওর বিয়ে হয় না। আমারও হয় না! আর্থার বোঝেও না যে ওর জন্যে আমার কতটা আসে যায়। ও ধরে নিয়েছে যে, আমি সারাজীবন ওর রক্ষণাবেক্ষণ করব।"

সুধী তাঁর ক্ষণবিরামের অবকাশে জিজ্ঞাসা করল, "ওকে খুলে বললেন না কেন?"

"যতবার ভাবি খুলে বলব ততবার ভয় হয় পাছে সে আফ্রিকায় কি উত্তর মেরুতে কি কোথাও চলে যায়। মনটাকে শক্ত করতে পারলে উভয়ের শেষ পর্যন্ত কল্যাণ হত, কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটি করা কয়জনের দ্বারা ঘটে ওঠে? তাঁরাই বিজ্ঞ যাঁরা এর সূত্র জানেন। হয়তো তুমি তাঁদের একজন, একটা স্বপ্ন দেখে কর্তব্য স্থির করে ফেলেছ। আমি গড়িমসি করতে থাকলুম। ইংলণ্ড থেকে নড়তে আলস্য বোধ হচ্ছিল। অকস্মাৎ একদিন সংবাদ এল তিনি মোটর উলটে মারা গেছেন।"

মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন। মুছতে মুছতে লাল করে ফেললেন। তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায় হল।

৩

আণ্ট এলেনর প্রকৃতিস্থ হয়ে সুধীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন,' “দেখলে তো তোমার নিষ্ক্রিয় নিরাসক্ত দৃষ্টির উৎপাত! তার সাধনা যে করে সে হয় পরাসক্ত জীবের মতো আশ্রয়দাতার অহিতকারী। তবে উজ্জয়িনীর ক্ষতি যা হবার তা হয়েই গেছে, তুমি আর বেশি কী করবে?”

সুধী প্রতিবাদ করতে পারত, বলতে পারত যে দোষটা আপনার নিজের, আপনি আর্থার খুড়োকে তৈজস পত্রের মতো অথর্ব জ্ঞান না করলে তিনি হয়তো নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখতেন। কিন্তু দোষ যারই হোক দুঃখ তো তাঁর। সুধী সান্ত্বনাচ্ছলে বলল, “কত বড় একটা জিনিস এই নিষ্ক্রিয় নিরাসক্ত দৃষ্টি। এর জন্যে এমনি বড় ত্যাগের দরকার ছিল। আপনি না করলে আর্থার খুড়োকে যিনি বিয়ে করতেন তিনি করতেন।”

আণ্ট ঘাড় নেড়ে বললেন, “কেউ করত না কেউ করত না, নিজের বোনের মতো নিঃস্বার্থ কোনো মেয়ে নয়। আর্থারকে ওরা কেউ বুঝল না, তার সাধনায় ওদের কারুর বিশ্বাস জন্মাল না! আর্থার যে ওদের একজনকে মনোনয়ন করেনি এতে ওর আত্মরক্ষণেচ্ছার প্রমাণ পাই।” কথাগুলোতে অসূয়ার গন্ধ ছিল।

সুধী উঠবার উদযোগ করল। “সে কী! এরই মধ্যে উঠবে? বস। কী যেন বলব ভাবছিলুম।···না, মনে পড়ছে না। আবার কবে আসছ?”

“বলতে পারলুম না। লণ্ডনের বাইরে ঘুরে আসবার ইচ্ছা আছে।” আণ্টকে জিজ্ঞাসু দেখে সুধী বলল, “বাদল লণ্ডনে নেই।”

“লণ্ডনে নেই? কোথায় আছে তা হলে?”

“আইল্ অব্ ওয়াইটে—আজও আছে কি না বলতে পারিনে, কিছুদিন আগে ছিল।”

“কী করে জানলে?”

“ফাঁদ পেতে। উজ্জয়িনীর একখানি চিঠি ওর ব্যাঙ্কের ঠিকানায় পাঠিয়ে পড়া হয়ে গেলে ফেরত দিতে লিখেছিলুম। ফাঁদে পা দিয়েছে। ডাকঘরের মোহর থেকে বোঝা গেল ভেণ্টনরে সে ছিল এবং হয়তো আছে। ভেণ্ট্নর কি খুব বড় শহর?”

“না। যদি সেখানে থাকে তবে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে বেরুবে, তখন পাকড়াও কোরো।”

“এইবার শার্লক হোম্‌স্ হয়ে দাঁড়ালুম, আণ্ট। মোটেই নিষ্ক্রিয় বোধ করছিনে, যাই বলি না কেন।” সুধী হাসিমুখে আসন থেকে উঠল।

আণ্ট এলেনর তাকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে চললেন। চলতে চলতে বললেন, “আমরা মেয়েরা বড় অবুঝ। উজ্জয়িনীর উপর আমার রাগ করাটা অবুঝের মতো

হচ্ছে। তবু রাগ না করে পারছিনে। কোন অধিকারে সে তোমার সর্বস্ব দাবি করল—তোমার স্ত্রীর ভাগ্য, তোমার বংশধর, তোমার সপরিবারে ধর্মাচরণ, তোমার হিন্দু গার্হস্থ্য আশ্রম, তোমার পিতৃপিতামহ অনুসৃত কৌলিক আদর্শ—এক কথায় তোমার ভারতবর্ষ?"

সুধী লঘুতার ছলনা করে বলল, "গোড়াতে ভুল করছেন, আণ্ট, যে, উজ্জয়িনীর সঙ্গে আমার চোখের দেখাই ঘটেনি, মুখে বা চিঠিতে বা টেলিগ্রামে বা টেলিফোনে সে আমার কাছে অমন প্রস্তাব করেনি এবং করবে বলে আমার মনে হয় না। আমার ঘরে আমার ঘুমের ঘোরে আমার স্বপ্নে সে যা বলেছে তাও আমার যাচ্ঞার উত্তরে। ভারতবর্ষ? আধুনিক ভারতবর্ষ তো সে-ই। যার হাত ধরেছিল তার মন পায়নি, অভিমানে কটিবস্ত্র পরছে। আমার দেশপ্রতিমাকে আমি অভিমানের মূঢ়তা থেকে মুক্ত দেখলে সুখী হব। বিধাতা আমাদের এতটা পরনির্ভর করে সৃষ্টি করেননি যে অপরের দ্বারে ধরনা দিয়ে উপবাসে শীর্ণ ও শ্রীহীন হতে হবে। নিজের গৃহে গৃহলক্ষ্মী হবার সংকল্প যদি থাকে তবে সিদ্ধির উপায়ও নিশ্চিত আছে।"

গেট খুলে যখন সুধী রাস্তায় পড়ল তখনও সন্ধ্যার আলো জ্বলে ওঠেনি। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা দেরিতে। আণ্ট এলেনর বললেন, "কিন্তু ভারতবর্ষের চেয়ে তুমি বড়, তোমাকে আমরাও নিজের বলে দাবি করি, তুমি যুগোত্তর জীবনশিল্পীদের দলে। আধুনিক ভারতবর্ষের দুর্দশার অনলে আত্মাহুতি দিও না, সুধী। কথা রাখবে?"

সুধী উত্তর দিল না। তার নিজেরই কত প্রশ্ন ছিল। সে কি উজ্জয়িনীর জন্যে স্বমার্গত্যাগী হচ্ছে? বিশ্বের চিরকালের জীবনশিল্পীদের কাছে কি তাকে জবাবদিহি করতে হবে? বৈরাগ্যের ব্যাখ্যা সে যাই করুক না কেন, বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্রতা কি তা দিয়ে চাপা পড়ে? দৃষ্টি? দৃষ্টি নিয়ে সে করবে কী, যদি সৃষ্টি না করতে হয়? সৃষ্টিকার্যে যোগ না দিলে সৃষ্টির আভ্যন্তরিক রহস্য দৃষ্টিগম্য হবে কেমন করে? বিধাতার trade secret নেই কি?

প্রশ্ন করতে হচ্ছে বলে সুধী নিরতিশয় লজ্জিত হল। প্রশ্ন করে কি সত্যের পাত্তা পাওয়া যায়? যে জানে সে আপনি জানে। চিত্তকে যে মুকুরের মতো মার্জিত রেখেছে সত্য তার চিত্তে বিনা আহ্বানে প্রতিফলিত হয়। নিরাময় ও নিয়মানুবর্তী যার দেহ, দর্শন-শ্রবণ-মননাদি ইন্দ্রিয় যার সুতীক্ষ্ণ ও সতর্ক, সত্য তার দ্বারে প্রবেশপ্রার্থী হলে সংশয়ের "হুকুমদার" শুনে থতমত খাবে না, "ফ্রেণ্ড্" না বলতে পারলে গুলির চোটে পঞ্চত্ব পাবে না। কাল রাত্রের চিত্তবিক্ষেপ, দৈহিক অস্বস্তি, সুষুপ্তির অভাব সুধীর প্রত্যক্ষ সত্যানুভবকে প্রশ্নসাপেক্ষ, পরোক্ষ করেছিল। তার ইনটুইশন্, তার সহজাতবোধ, পথিকহীন পথের মতো আকাশের দিকে চেয়ে চিৎ হয়ে চুপ করে পড়ে রয়েছিল।

তার মানসিক প্রদাহ প্রশমিত হবে না, যদি সে উজ্জয়িনী সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ না পায়। উজ্জয়িনীর দিদি কৌশাম্বী এসেছেন লণ্ডনে, বিভূতি নাগ দিতে পারবে ওঁর ঠিকানা, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয় না ? বিভূতিকে সুধী ফোন করল। বিভূতি বলল, "রোস। আমি ফোন করে খবর নিই।" বিভূতি জেনে জানাল কাল দুপুরে হোটেল রাসেলে গেলে দেখা হতে পারে।

শরীরকে প্রসন্ন করবার জন্যে সুধী সে রাত্রে যথাসময়ের আগে ঘুমতে গেল। স্বপ্ন দেখলে অগণন। কিন্তু সকল স্বপ্নই উজ্জয়িনী-বিরহিত। একটি স্বপ্নে মার্সেল হয়েছে তার মেয়ে, অশোকা হয়েছে তার স্ত্রী, মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট হয়েছেন তার শাশুড়ী।

৪

কৌশাম্বী তার শাড়ীর আঁচলটিকে বিদেশিনীদের বেরে (beret)-র অনুকরণে মাথার উপর কোণাকুণি ভাবে সংলগ্ন করেছিল, আর শাড়ীর নিম্নাংশকে স্কার্টের অনুকরণে হ্রস্ব করে পরেছিল। সুধীর দিকে এগিয়ে গিয়ে আসন নেবার সময় ডান হাত তুলে মধুর হেসে বলল, "না, না, দাঁড়াতে হবে না। আপনি মিস্টার চক্রবর্তী ?" (ইংরেজীতে) সোফার উপর সমাসীন হয়ে রানীর মতো গৌরবে সুধীর মুখে তাকিয়ে ডান হাতের উপর মাথাটিকে কাত করে রাখল। এর ফলে তার শাড়ীর বেরে (beret) সুধীর চোখে অপূর্ব রমণীয় লাগল। তারপর শাড়ীর স্কার্টটাকে চোখের নিমেষে গুছিয়ে নিল, নামিয়ে দিল। তার বাঁ হাত সুধীর দৃষ্টির কাছে ধরা পড়ে গিয়ে নিরীহ ভালোমানুষটির মতন যেখানে ধরা পড়ল সেইখানে অর্থাৎ বাম উরুর উপর অনড় ভাবে ন্যস্ত রইল।

সুধী উত্তর করল, "আজ্ঞে হাঁ, আমিই।" (বাংলাতে)

যথাসম্ভব গাম্ভীর্যের সহিত কৌশাম্বী যত রাজ্যের মামুলী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয় সমস্তই করে গেল। যথা, "ইংলণ্ডে আপনি কতকাল আছেন ?" "ইংলণ্ড কেমন লাগছে ?" "কী পড়ছেন ?" সবই রাজভাষায়। সুধী ভুলেও ইংরেজী বলল না। তখন কৌশাম্বী ইংরেজীভাঙা বাংলাতে জিজ্ঞাসা করল, "আমার সঙ্গে কি বিশেষ কোনো কাজ ছিল ?" অত্যন্ত মোলায়েম ভাবে।

"আজ্ঞে হাঁ।" সুধী নিঃসঙ্কোচে বলল, "আপনি উজ্জয়িনীর দিদি। আমি তার স্বামীর বন্ধু। উজ্জয়িনীর খবর অনেক দিন পাইনি। আশা করি আপনার কাছে পাব।"

কৌশাম্বী সহসা কঠিন হয়ে বলল, "আমাকে মাফ করবেন, মিস্টার চক্রবর্তী। আপনাকে পর মনে করছি বলে নয় ; আপনার অধিকার অস্বীকার করছি বলে নয় ; কিন্তু আমার মায়ের ও উজ্জয়িনীর শ্বশুরের নিষেধ আছে বলে আমি উজ্জয়িনীর সম্বন্ধে যা জানি তা তার স্বামীর কাছেও প্রকাশ করব না।" সুধীর হতাশা লক্ষ করে একটু নরম

হয়ে বলল, "Dear Mr. Chakravarti, please don't be cross !"

কাষ্ঠহাসি হেসে সুধী বলল, "আপনার অপরাধ কী ? গুরুজনের নিষেধ ।" নিজের মনে কী ভাবল ।

"আচ্ছা আপনাকে কী দিতে পারি বলুন তো ? আপনি অবশ্যই স্মোক করেন ।" সুধীর মাথা নাড়ার দিকে নজর না দিয়ে নিজের পার্স খুলল । তাতে তার সোনার পাতে মোড়া রূপোর সিগ্‌রেট কেস্ ছিল । মিষ্টি হেসে সুধীর সামনে মেলে ধরল ।

সুধী বলল, "দয়া করে ক্ষমা করবেন । আমি খাইনে ।"

ভুরু কপালে তুলে চক্ষু বিস্ফারিত করে কৌশাম্বী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল । তারপর নিজেই একটি তুলে নিয়ে ঠোঁট দিয়ে চাপল । সুধী তৎক্ষণাৎ দেশলাই জালিয়ে সন্তর্পণে তার সিগারেট ধরিয়ে দিল । টান না দিয়ে কৌশাম্বী সেটাকে দুই আঙুলের মাঝখানে তর্জনীর সহিত লটকে রাখল এত আলগোছে যে সুধীর আশঙ্কা হল পাছে কখন গিয়ে কার্পেটে অগ্নিসংযোগ করে ।

কৌশাম্বী সুধীর সৌজন্যে প্রসন্ন হয়েছিল । বলল, "মিস্টার চক্রবর্তী, আপনি যদি প্রতিশ্রুতি দেন যে কথাটা বাদলের কানে তুলবেন না তবে আমি নিষেধ অমান্য করলেও আমাদের বংশমর্যাদা হানি হবে না ।"

"আপনি বোধ করি জানেন না, মিসেস মিত্র," সুধী করুণ হেসে বলল, "যে, বাদল আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু । ইচ্ছা করে তার কাছে কোনো কথা গোপন করতে পারিনে । তবে ঘটনাচক্রে এমন হতে পারে যে বাদল এই ব্যাপারের কিছুই আমার কাছ থেকে জানবে না । আপনি ভাবছেন, সে কেমন ? আপনাকে বলতে আপত্তি নেই যে, বাদল কয়েক মাস থেকে নিরুদ্দেশ এবং যদিও আমি এবার শখের ডিটেকটিভ সেজে অনুসন্ধানে বেরব তবু আমার ভরসা হচ্ছে না যে তার নিভৃত চিন্তানিবাসের ঠিকানা পাব ।"

কৌশাম্বী বিস্ময় দমন না করতে পেরে বলল, "বাদল লণ্ডনে নেই ? আপনি ঠিক জানেন ?"

"না, ঠিক জানিনে, মিসেস মিত্র । আমি তো বলিনি যে সে লণ্ডনে নেই । তবে আমার অনুমান সে লণ্ডনে নেই । সেইজন্য 'বেরব' শব্দটি ব্যবহার করেছি ।"

"তবে আপনি উজ্জয়িনীর সংবাদ কেন চান, কার জন্যে ?" কৌশাম্বী এই প্রশ্নের রূঢ়তাকে ঢাকবার জন্যে গলার স্বরে মাধুরী ঢেলে দিল ।

"এমনি । উজ্জয়িনী আমার স্নেহের পাত্রী । তার সঙ্গে আমার পত্র-বিনিময় হয়ে থাকে ।"

কৌশাম্বী চমকে উঠল । থর্ থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার আসল নামটি কি আমাকে বলতে বাধা আছে ?"

"কিছুমাত্র না। সুধীন্দ্রনাথ।"

"সুধীন্দ্রনাথ!" কৌশাম্বী উচ্ছ্বসিত স্বরে বলল, "তা হলে আপনি—পৃথিবীতে একমাত্র আপনি—জানেন কী ঘটেছে!" কৌশাম্বীর 'বেরে' খসে পড়েছিল, সে নিজেই সোফার উপর থেকে খসে পড়ে আর কি!

"দোহাই আপনার মিস্টার চক্রবর্তী, আর পরীক্ষা করবেন না আমাকে। আমি শুধু এইটুকু জানি যে উজ্জয়িনীর কাগজপত্রের ভিতর যতগুলি চিঠি পাওয়া গেছে বাবার খানকয়েক ছাড়া বাকী সমস্ত আপনার। বলুন, বলুন, শেষ চিঠিতে কী লিখেছে সে—আত্মহত্যা না, ইলোপ্‌মেন্ট?"

সুধী চমৎকৃত বোধ করল। উজ্জয়িনীও নিরুদ্দেশ। তবে তার সেটা আত্মহত্যা কিংবা ইলোপ্‌মেন্ট নয়—বৈরাগ্যবরণ। সুধীর স্বপ্নলব্ধ ইঙ্গিত সত্যেরই ইঙ্গিত। আর কী জানবার আছে? খবর তো সুধীর কাছে, কৌশাম্বীর কাছে নয়। সুধী উঠল। বলল, "আপনি যা অনুমান করেছেন তা নিতান্ত ভুল নয়। তবে চিঠিতে জানায়নি, জানিয়েছে স্বপ্নে। আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছিলুম স্বপ্নের সত্যতা পরীক্ষা করতে। আর আমার সন্দেহ নেই যে উজ্জয়িনী বৈষ্ণবী হয়ে তীর্থযাত্রা করেছে। তার গৃহত্যাগে কোনো কলুষ নেই।"

সুধী লক্ষ্য করল যে কৌশাম্বী তার কথা বিশ্বাস করল না। বলল, "উজ্জয়িনীর বোন হয়ে জন্মেছেন এই তো আপনার অধিকার! এই অধিকারে তাকে বিচার করবেন? ওকে আমি ফিরিয়ে আনব গৃহস্থাশ্রমে। জানিনে এতদূর থেকে তা কেমন করে সম্ভব!" এই বলে সুধী অত্যন্ত চিন্তাকুল ভাবে কৌশাম্বীকে বিদায় সম্ভাষণ করে নিষ্ক্রান্ত হল।

৫

উজ্জয়িনী তীর্থযাত্রী হয়েছে কল্পনা করতেই সুধীর স্মৃতি নব জীবন লাভ করল। সেও একদিন ভারতবর্ষের প্রতি পল্লীকে তীর্থ জ্ঞান করে পদব্রজে পরিক্রমা করেছে।

উনিশ শ' কুড়ি সাল। গান্ধীর মধ্যে ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছেন আপন আত্মা, তাই তাঁকে নাম দিয়েছেন মহাত্মা। একটা বিপুল আনন্দপ্রবাহ সমগ্র দেশের অন্তরের কন্দরে আকাশগঙ্গার মতো অদৃশ্য বেগে সঞ্চারিত হচ্ছে। সুধী থাকে একটি ক্ষুদ্র শহরে, পড়ে সেখানকার অখ্যাত হাইস্কুলের ফার্স্ট ক্লাসে। বৃহৎ সংসারের বিচিত্র ধ্বনির অতি মৃদু প্রতিধ্বনিও সেখানকার লোকের কানে পৌঁছত না। কিন্তু এই মহাবার্তা তাদের নিস্তব্ধ জীবনযাত্রার অজ্ঞতা ভেদ করল। তারা উন্মনা হয়ে পরস্পরকে প্রশ্ন করতে লাগল, "কে এই মহাত্মা?"

সুধীর বন্ধু বাবাজী লছমন দাস সংস্কৃত টোলের ছাত্র। বয়সে সুধীর দুইগুণ বড়,

আকারেও। প্রকাণ্ড এক আলখাল্লাই বোধকরি তার একমাত্র পরিধান। মাথায় তার জটা নেই, পাগড়িও নেই। রুক্ষ চুল, রুক্ষ দাড়ি একাকার হয়ে গেছে।

লছমন দাস সুধীকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল, "তুই তো ইংরেজী খবরের কাগজ পড়িস। মহাত্মা গান্ধারী কে রে? পুরাণে তো ওঁর নাম নেই।"

"জ্যান্ত মানুষের নাম পুরাণে কী করে থাকবে, বাবাজী?" সুধী হেসে জবাব দিল।

"যাঃ। আবার শাস্ত্রে সন্দেহ। তোরা বাঙালীরা কোন্ নরকে যে জায়গা পাবি তাই কেবল ভাবছি আমি। কেন, হনুমান কি জ্যান্ত নয়, বিভীষণ কি এখনও রাজত্ব করছে না—"

"হনুমান যে জ্যান্ত ওকথা কার সাধ্য অস্বীকার করে। গাছে গাছে লাফ দিয়ে বেড়াচ্ছে যত ভক্ত।"

"ছি! ঠাকুর-দেবতা নিয়ে ইয়ার্কি ভালো নয়। বিশেষত তোর মতো সোনার ছেলের মুখে। তুই হলি আমাদেরই একজন। বল না আমাকে গান্ধারীর কথা। কলি যুগে কল্কী ছাড়া অন্য অবতার হতে পারে না। তবে যে লোকে বলছে রামজীর অবতার —পূর্ণাবতার না অংশাবতার?"

সুধী গুরুত্বের সহিত বলল, "দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি যে নির্যাতন সয়ে অহিংসা ব্রতে নিষ্ঠাপর থেকেছেন, উৎপীড়িতদের প্রতি তাঁর যে মমতা ও উৎপীড়কদের প্রতি তাঁর যে করুণা তাতে তাঁকে মহাত্মা আখ্যায় অভিহিত করা দেশের কোনো একজন মানুষের কিংবা কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ঘটেনি। সারা দেশ ঐ উপাধি ঘোষণা করেছে আপন আত্মার মহিমা তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু গান্ধারী নয়, বাবাজী। গান্ধী। গন্ধবণিক।"

বাবাজী তার থাঁদা নাক কুঁচকে বলল, "ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয় নয়, বৈশ্য! রামজীর অবতার বলে প্রত্যয় হচ্ছে না। তারপর তাঁর অহিংসানীতি যদি মানতে হয় তবে আমার সেই তেল চুকচুকে ডাণ্ডাটিকে পূজা না দিয়ে নিজের সর্বদেহে চর্বি লেপতে হয়। ধ্যেৎ! রাখ্ তোর গান্ধী।"—বাবাজী হন হন করে চলে গেল। সেদিন আখড়ায় গান্ধীকে ব্যঙ্গ করে সে একশ' চৌষট্টি বার ডন ফেলল, দুশ' নিরানব্বুই বার বৈঠক করল, মুগুর ভাঁজল বিরাশী বার ও আড়াই ঘণ্টা কাল মাটি মাখল।

গান্ধী সম্বন্ধীয় কৌতূহল নিরাকরণ মানসে বাবাজী কলকাতা গেল। তখন কলকাতায় কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশন। লালা লাজপত রায় সভাপতি। বাবাজী যখন ফিরল তখন সে যেন অন্য মানুষ। সুধীকে বলল, "ও কি মানুষ রে! রামজী বুদ্ধাবতারে কিছু কাজ বাকী রেখে গেছলেন, তাই কল্কীর আগে এসে শেষ করে যাচ্ছেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যদি কলি যুগে থাকত তবে কি তিনি বৈশ্য বংশে জন্মগ্রহণ করতেন? আর জানিস, কলকাতায়

ওরা আমাকে শাস্ত্র খুলে দেখিয়ে দিল ছাপার হরফে লেখা আছে অহিংসা পরমো ধর্মঃ। বুদ্ধাবতারে রামজী নাকি সেই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবতারভেদে তত্ত্বও ভিন্ন হয়ে থাকে, যে যুগের যা ধর্ম।”

বাবাজী আখড়া ছেড়ে দিল। লাঠিখানা কাকে বিলিয়ে দিল। ছেলেদের খেলার মাঠে মঞ্চ বেঁধে অসহযোগ প্রচার করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হল। তারই মতো কত মানুষ দেশের নানা স্থানে নিজেরা ক্ষেপল ও অপরকে ক্ষেপাল। বয়কট—বয়কট—বয়কট। ইস্কুল বয়কট, আদালত বয়কট, কাউন্সিল বয়কট, বিদেশী কাপড় বয়কট। বুড়োরাও মাথা ঠিক রাখতে পারল না, ছেলেরা তো চিরকাল মাথাপাগলা।

পড়াশুনায় সুধীর মন লাগছিল না। দেশময় কী যেন একটা ঘটছে—“Swaraj within a year.” ভারতবর্ষের ইতিহাসে এটি একটি চিরস্মরণীয় বর্ষ। বছরে যেমন একটা দিন আসে, সেদিন অনধ্যায়, বহু শতাব্দীতে এও তেমনি একটা বছর। অসহযোগ নীতিতে সন্দিগ্ধ সুধী পড়াশুনায় অমনোযোগী হল। পরীক্ষা দিতে গিয়ে আশা করতে থাকল যে কেউ না কেউ তার পায়ে পড়বে, হাত ধরবে, তাকে বলবে, ‘আমার বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যান, যদি গোলামখানা এতই ভাল লেগে থাকে।’ সে-জাতীয় কোনো বিঘ্ন না ঘটায় সুধীর পরীক্ষায় সিদ্ধি তার সাধনার সদৃশ হল। অর্থাৎ টায়টোয় পাস।

এমন সময় লছমন দাস এল জেল থেকে ঘুরে। “সুধী, তুই এখনো বিজাতীয় শিক্ষার মোহ কাটাতে পারিসনি? চিত্তরঞ্জন, মতিলাল বছরে তিন লাখ টাকার পসার ছাড়লেন। তোর পড়াশুনা কি তোকে ওদের চেয়ে বেশি টাকা রোজগার করাতে পারবে? হবি তো কেরানী! ছাড় তোর ভবিষ্যৎ কেরানীগিরি। আয় আমার আশ্রমে।”

সুধীর অভিভাবক ছিলেন তার মামা। সুধীর নাবালক অবস্থায় তার পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি তিনিই দেখাশুনা করতেন। তিনি সুধীকে নিষেধ করলেন নিজে সরকারী চাকুরে বলে। নইলে তাঁর নিষেধ করবার কোনো নিঃস্বার্থ হেতু ছিল না। তাই সুধী ঐ নিষেধ লঙ্ঘন করল ও লছমন দাসের স্বরাজ আশ্রমে ভরতি হল। সেখানে তারই মতো অনেকগুলি বালক, কয়েকজন পসারত্যাগী উকীল-মোক্তার, একজন কি দুজন চাকুরীত্যাগী মাস্টার। কাজের মধ্যে দুই, চরকা কাটা ও ভিক্ষা করা। ভিক্ষার চাল চুলোয় চড়াবার জন্যে মাইনে দিয়ে বামুন রাখা হয়েছে।

সুধী বলল, “ভিক্ষার চাল ফুটাবার জন্যে ভাড়াটে বামুনের দরকার নেই। আমি রাঁধব।”

আশ্রম-সচিব চোখ কপালে তুলে বললেন, “বাঙালী ব্রাহ্মণের রান্না বেহারের লোক খাবে!”

৬

ভিক্ষাবৃত্তির সাহায্যে একটি বড় দোতলা বাড়ী, একটি রাঁধুনি বামুন, রাশি রাশি চাল ডাল তরকারী, নেতাদের খাট পালঙ্ক, কাঁসার বাসন ও নীরমানদের কলাপাতা, প্রত্যেকের একটা করে চরকা ও সর্বমোট তিনটে তাঁত, কাপড় রং করার সরঞ্জাম, গণেশন ও নটেশন প্রকাশিত পুস্তকাবলী, ইংরেজী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' ও হিন্দী 'নবজীবন'— এরই নাম স্বরাজ-আশ্রম । তার সঙ্গে একটি বিদ্যাপীঠ জুড়ে দিতে আশ্রমিকদের একটি দলের আগ্রহ। অপর দল বলেন, ঘরে যখন আগুন লেগেছে তখন একমাত্র কর্তব্য অগ্নিনির্বাপণ । Education can wait, Swaraj cannot. যারা নিয়মনিষ্ঠ ভাবে চরকা কাটে ও রীতিমতো খাটে তারা লেখাপড়ার একটু সুযোগ পেলে বর্তে যায়, শুধু গণেশন ও নটেশন পড়ে কতটুকু মস্তিষ্কচর্চা হয় ? যারা ভিক্ষা করতে যায়, বক্তৃতা করে আসে, সাধারণের কাছে তাদেরই খাতির বেশি, কাগজে তাদেরই নাম ওঠে। তারা দেশোদ্ধার ব্রতে এতটুকু শৈথিল্য সহ্য করতে পারে না। পূর্বোক্ত দলে সুধী, শেষোক্ত দলে বাবাজী। দুই দলের দলাদলিই হল আশ্রমের আভ্যন্তরিক পলিটিক্স। সুধীর দল শাসিয়ে বলে, আমরা পৃথক হয়ে যাব। বাবাজীর দল বিদ্রূপ করে বলে, সেই সঙ্গে আহার্যটা আদায় কোরো।

খোরাকের জন্যে দ্বারে দ্বারে ঘোরা সুধীর দল, অর্থাৎ সুধী যে দলের একজন অপ্রধান সদস্য, আদৌ পছন্দ করে না। তারা জোট বেঁধে ধরল গিয়ে দেশের এক প্রসিদ্ধ দাতাকে। তিনি তাদের জন্যে একটি বাগান বাড়ী ও কয়েক বিঘা জমি উৎসর্গ করে তা তাদের দিয়ে এই অঙ্গীকার করিয়ে নিলেন যে, কংগ্রেস যে দিন আদেশ করবে সেদিন জেলের দিকে পা বাড়িয়ে দিতে হবে, সেই তাদের গুরু-দক্ষিণা।

জাতীয় শিক্ষার নামে দেশের দিকে দিকে তামাশা চলছিল। সরকারী ইস্কুলের কাঠামোর সঙ্গে সুধীদের বিদ্যাপীঠের কাঠামোর এমন কোনো প্রভেদ ছিল না। শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকায় হিন্দী ও চরকা জুড়ে দিয়ে, পাঠ্য পুস্তকের বেলায় ভিনসেন্ট্ স্মিথের স্থলে ডিগবী নৌরোজী ও রমেশ দত্ত ধার্য করে সরকারী ইস্কুলের শিক্ষায় ও সংস্কারে লালিত অসহযোগী মাস্টারগণ স্বজন পরিত্যাগী ও স্বজন-পরিত্যক্ত উচ্চাশী বালকদের সন্তুষ্ট করতে পারছিলেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি ইংরেজ গবর্নমেণ্ট কর্তৃক যে আকারে এদেশে প্রবর্তিত হয়েছে তাতে কোনো সরলমতি বালকের আন্তরিক অনুমোদন থাকতে পারে না। ডিগ্রীর মোহে, লেটারের লোভে, জীবিকার সম্ভাবনায় এদের তীব্র নিরানন্দ সহনীয় হয়েছিল। যেই জাতীয় শিক্ষার কথা উঠল, দেশোদ্ধারের গৌরব তার সঙ্গে যুক্ত হল, অমনি এরা ধরে নিল যে এদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটবে ; জ্ঞান পরিবেশন যাঁরা করবেন তাঁরা হবেন জ্ঞানান্বেষণে নিত্যরত ; গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ অকৃত্রিম ও অব্যাহত হবে ; শিষ্য

যখন খুশি জিজ্ঞাসা করবে, "এটা জানতে চাই।" গুরু অযাচিত ভাবে কোনো কিছু চাপাবেন না, যাচিত হলে ফাঁকি দিয়ে বাসায় গিয়ে পাশা খেলবেন না। উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে জাতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। অর্থাৎ ছাত্রের অনুরাগ রক্ষা করতে পারল না। দ্বিতীয়ত, বছর পুরল, কিন্তু স্বরাজ মিলল না। স্বরাজ বলতে যে কে কী বুঝেছিল তার হিসাব নিকাশের সময় এল। যারা একটা ধরাবাঁধা সংজ্ঞা চাইল নেতারা তাদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, স্বরাজ! স্বরাজের কোনো সংজ্ঞা হয়? জাতির ভাবগত সত্তার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি ইত্যাদি ছেলে ভুলানো বচন সুধীর কানে বিশ্রী বাজল। স্বরাজ বলতে গান্ধীজী যে ঠিক কোন জিনিসটি বোঝেন তাঁর তৎকালীন বক্তৃতা ও প্রবন্ধ থেকে তা প্রতীয়মান হল না। সুধী পড়ল তার পুরাতন রচনা 'হিন্দ্ স্বরাজ'। গান্ধীজীর পরিকল্পনা তার কাছে স্পষ্ট হল। গান্ধীজীর ভারত ইংলণ্ডের রূপান্তর ব্ল্যাক্ ইংলণ্ড হবে না। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টকে পৃথিবীর সব দেশে প্রতিমান বলে গণ্য করা হয়েছে, গান্ধীজী করেছেন তাকে বেশ্যার সঙ্গে তুলনা।

বিদ্যাপীঠ ধীরে ধীরে শূন্য হতে লাগল। বেশির ভাগ ছেলে ফিরে গেল 'গোলামখানায়'। অন্যেরা গেল জেলে। সুধীর কর্তব্য স্থির করতে সময় লাগে, সে চিন্তা করছিল। এমন সময় এল বাবাজী। বলল, "বিলাতী কাপড় পোড়াতে হবে। স্বদেশের গাঁজাও শ্রেয়, পর বস্ত্র ভয়াবহ।"

সুধী বলল, "যা নিজে তৈরি করতে পারিনে তাকে পোড়ানো হচ্ছে পরের প্রতি ঈর্ষা-প্রণোদিত দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বীর কাপুরুষতা।"

বাবাজী চটে গিয়ে বলল, "মহাত্মাজীর চেয়ে তুই ভালো বুঝিস। না? সি-আর-দাশের চেয়ে তোর বুদ্ধি বেশি। না? তোর মতো দো-মনা কর্মীদের জন্যই তো স্বরাজটা ঘরে তুলতে পারা যাচ্ছে না, মাঠে মারা যাচ্ছে। কই তোর সেই বিলিতী কাপড়ের পুঁটলি, যা পরে তুই আশ্রমে প্রথম আসিস। আমি নিজের হাতে পোড়াব।"

"সে আমি ম্যাঞ্চেস্টারে ফেরত পাঠাব বলে রেখে দিয়েছি। হয়তো একদিন সাথে করে নিয়ে যাব। ওরাই যা হয় করবে।" সুধী বলল হেসে।

সুধীর হাসি বাবাজীর বরদাস্ত হল না। অহিংস ক্রোধে সে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করছিল। ইংরেজকে ডাণ্ডা দিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারছে না। ইংরেজের তৈরি কাপড় পুড়িয়ে যদি শান্তি পায়। সুধীর ঘর খানাতল্লাস করে সে ঐ কাপড়ের পুঁটলি উদ্ধার করল। তারপর শয়তানী হাসি হেসে একটি দেশলাইয়ের কাটি জ্বালাল। হঠাৎ কী ভেবে বলল, "না, এখানে পোড়ালে কে দেখবে? বাজারের চৌরাস্তায় আজ লঙ্কাকাণ্ড বাধাব!"

হনুমান!

৭

শ্রীরতন ছিল সুধীর প্রিয় সতীর্থ। সুধীর সঙ্গে তার মত মিলল। এই আন্দোলনের একমাত্র সত্য হচ্ছে চরকা। চরকায় পার্লামেন্টারী স্বরাজ হোক বা নাই হোক, দেশের শতকরা আশীজন—দেশের কৃষককুল—যদি পরমুখাপেক্ষী হয় তবে সেই হবে গান্ধীজীর স্বপ্নের স্বরাজ। ভারতবর্ষের আত্মা চায় অন্নবস্ত্রে আত্মবশ হয়ে, দেহ-ধারণে নিশ্চিন্ত হয়ে পরমার্থের অনুসন্ধান করতে, মুক্তিতত্ত্বের অনুশীলন করতে। রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে উকীল ব্যারিস্টার যেমন স্বরাজ চান তাঁদেরকে তেমনি স্বরাজের, অর্থাৎ স্বপ্রভুত্বের, আশা দিয়ে গান্ধীজী কী ভুল করলেন! সত্যিকারের স্বরাজ যাদের জন্যে ও যাদেরকে নিয়ে সেই জনগণ গান্ধীজীর অনুগামী হতে পারছে কই।

সুধী বলল, "এস চরকা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। পল্লীর লোককে সুতা কাটা শেখাতে হবে।"

শ্রীরতন বলল, "চরকাটা গান্ধীজীর পক্ষে নূতন, 'হিন্দ্ স্বরাজে' তার উল্লেখ আছে বলে মনে পড়ছে না, আফ্রিকা থেকে ফিরে এই সেদিন ওর আর্থিক ও নৈতিক উপযোগিতা তিনি উপলব্ধি করলেন। কিন্তু এই প্রাচীন দেশে চরকা হচ্ছে গোরুর গাড়ীর মতো প্রাচীন ও সার্বত্রিক। যারা চরকায় সুতা কাটতে কাটতে অশোক চন্দ্রগুপ্ত ও আকবর আওরংজীবের যুগ অতিক্রম করল তাদেরকে তুমি আমি যাব শেখাতে!"

সুধী বলল, "তবে কেন তারা চরকায় সুতা কাটে না এই হবে আমাদের শিক্ষণীয়। এই উপলক্ষ্যে আমাদের সনাতন স্বদেশের বিচিত্র জনমন অধ্যয়ন করব। পায়ে হেঁটে গ্রাম থেকে গ্রামান্তর যাব, রাত কাটাব গাছতলায়, যে যা দেবে তাই খাব, জাতের বিচার করব না। হাজার হাজার বছর তাদের কি ভাবে কেটেছে ইতিহাসে তার বিবরণ নেই। ভূগোলে কেবল নদী পর্বতের বর্ণনা থাকে, নগরের লোকসংখ্যা থাকে, আমরা পর্যটন করে পর্যবেক্ষণ করব কোথায় কাদের কী বৃত্তি, কী প্রথা, কী পার্বণ।"

শ্রীরতন রাজী হল, কিন্তু বলল, "নিষ্কর্মা পর্যটককে লোকে সন্দেহ করে। হয় সাধু সেজে তীর্থযাত্রা করতে হবে, নয় ব্যাপারী সেজে কেনাবেচা করতে করতে চলা যাবে। কোন্‌টা তোমার পছন্দ হয়, সুধীজী।"

"সাধু সাজলে," সুধী ভেবে বলল, "কত লোক হাত দেখাবে, মাদুলী মাগবে, পায়ে পড়বে। জটা বানিয়ে ভস্ম মেখে গাঁজার ছিলিমে টান দিয়ে ভয়ানক ভণ্ডামি করব। আসল সাধুরা আমাদের দেখতে পেলে রক্ষা থাকবে না, শ্রীরতনজী।"

"কিন্তু ব্যাপারী সাজলেও ঠেকা কম নয়। পায়ে পায়ে ঠকতে হবে সেয়ানা পাইকারদের কাছে। গাছতলায় রাত কাটাতে গিয়ে ডাকাতের হাতে কাটা পড়তে না হয়।" শ্রীরতন কথার সঙ্গে ভ্রূভঙ্গীর অনুপান দিল।

অবশেষে ওরা খদ্দরের দালাল হয়ে চরকার সুতার বাণ্ডিল মাথায় গ্রামে গ্রামে তাঁতীর বাড়ী খুঁজল। মজুরী দিয়ে ধুতী ও শাড়ী তৈরি করিয়ে নেয়। নিয়ে পথে যে শহর পড়ে সেই শহরে ফিরি করে।

তাঁতীরা বলে, "মিহি বিলিতী সুতা দিন বাবু ; এমন উমদা চীজ বানাব যা দেখে আপনাদেরও আনন্দ হবে, আমাদেরও। এগুলো কি সুতা!"

কী অবজ্ঞা তাদের! কী আপত্তি! তারা এক শতাব্দী আগে চরকার সুতায় কাপড় বুনত কেমন করে, এ প্রশ্নের উত্তরে বলে, সে সব দিন গেছে। এখন ঘোর কলিযুগ।

তবু চরকার সুতায় খাদি বোনে ও সেই খাদি গ্রামের লোককে পরায় এমন তাঁতীরও সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। মোটা লাল পাড়, সরল সতেজ নক্সা, গাছগাছড়ার রং —আভ্যন্তরীণ গ্রামের মেয়েরা এখনো এইরূপ শাড়ী পছন্দ করে। চরকাও তারা চালায়। সে সব চরকা কত কালের, হয়তো ইংরেজ আমলেরই নয়।

একে ব্রাহ্মণ, তার উপর অতিথি—সুধী ও শ্রীরতন প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই প্রচুর সিধা ও শোবার ঘর পেল। ব্রাহ্মণ হয়ে কাপড়ের ব্যবসা করে কেন, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নাজেহাল হয়। বলে, আজকাল জাতধর্ম কি রাখবার জো আছে রে ভাই। তোমাদেরই কত বামুন সিপাহী হয়েছে, কত ছত্রী কায়েতের কাজ করছে।—শ্রীরতন আড়াই ঘণ্টাব্যাপী আহ্নিকের দ্বারা সকলের তাক লাগিয়ে দিত। ব্যবসা যাই হোক, গায়ত্রীতে অধিকার তো আছে। সুধী ওসব মানে না, তাই সন্দিগ্ধদের কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তুলসীদাসখানা সুর করে পড়তে লেগে যেত। এ স্থানে উল্লেখ করতে হয় যে, হিন্দী লিখতে পড়তে ও বলতে সুধী হিন্দুস্থানীদের সমান পারত।

ইতিমধ্যে গ্রামে গ্রামে গান্ধীর নাম রাষ্ট্র হয়েছিল। কেউ হাটে গিয়ে শুনে এসে সবাইকে শুনিয়েছে, কেউ আদালতে গিয়ে। গান্ধী যে মানুষ নন, মানুষের বেশে নারায়ণ, এ নিয়ে তাদের কল্পনার অন্ত ছিল না। তিনি যেবার নিকটস্থ শহর দিয়ে রেলপথে যাচ্ছিলেন সেবার রেলগাড়ীর প্রত্যেক কামরায় কেবল তিনি, তিনি, তিনি। তাঁকে ধরবার জন্যে সরকার বাহাদুর কত চেষ্টা করছেন, কিন্তু সর্বত্রই তো তিনি, কাকে ছেড়ে কাকে ধরবেন।

কিন্তু গান্ধী যে ছত্রিশ জাতের লোককে জোলা হতে বলছেন এই অভিযোগ শ্রীরতন ও সুধী অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও সুচতুর গ্রামিকদের মুখে শুনল। তবে তো সব একাকার হয়ে যাবে। তিনি মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, এতেও অনেকে আতঙ্কিত। ওদের জাত নেই, এ ওদের এক অমার্জনীয় অপরাধ। কেউ কেউ শ্রীরতনকে ও সুধীকে জিজ্ঞাসা করেছে আপনারা একই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তো? এক পাকে খান যে! শ্রীরতন ভেবে জবাব দেয়, আমি হলুম কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ, আমার পাকে ভূভারতের যাবতীয়

ব্রাহ্মণের চলে।

৮

সেই দিনগুলি মনে পড়লে সুধীর বয়সের ভার নিঃশব্দে নেমে যায়। সে তখন বাঁশী বাজাতে ভালবাসত। শুনেছিল একমাত্র ছেলের মায়েরা সাঁঝের বেলা বাঁশী শুনলে রাত্রে অভুক্ত থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা প্রয়াণের সঙ্গে এর কী একটা কল্পিত সম্বন্ধ আছে। সেইজন্যে তার বাঁশী বাজানোর সময় ছিল শেষরাত্রি। যে রাত্রে যে গ্রামেই থাকুক সে শেষরাত্রে উঠে বাঁশীর সুরে আপনাকে নিঃসীম শূন্যে প্রসারিত করে দিত; চিত্ত তার বিশ্বের ওপার স্পর্শ করে আসত। কখন এক সময় কোকিলের ঘুম ভেঙে যেত, সে দ্রুতকণ্ঠে ডেকে উঠত, একটানা কুবু কুবু কুবু কুবু। যেন কী একটা স্মার্ট পাখী, আমাদের চির-চেনা কোকিলই নয়। অমনি অন্যান্য পাখীরা নিজ নিজ ভাষায় কলরব করে উঠত। মিনিট পাঁচেক ধরে এই শব্দ-সঙ্গত অবিরাম চলে। তারপর মন্থর হয়ে মিলিয়ে যায়। পাখীরা ঘুমিয়ে পড়ে। মনে হয় না যে একটু পূর্বে এই নিঃসাড় রাত্রে স্বপ্নে কথা কয়ে উঠেছিল। সুধীর বাঁশীর সুর নিদ্রিতার নিবিড় কেশে মৃদুল ভাবে অঙ্গুলি চালনা করে।

এক ঘণ্টা পরে আবার সেই শব্দসঙ্গত। এবারেও প্রথম স্বর কোকিলের। সেই ধাবমান একটানা কুবু কুবু কুবু কুবু। পূর্বের সেই পাখীরা মুহূর্তকাল অপেক্ষা করে ঝড়ের মতো গর্জে ওঠে। তাদের সঙ্গে জুটে যায় অপরাপর দীর্ঘসূত্রী পাখী। পূর্বাশার সীমন্ত সিন্দুরাক্ত হয়। নক্ষত্রদের স্বর্গ হতে বিদায়ের ক্ষণে দেহদ্যুতি ম্লান হয়ে আসে। শুকতারা অরুণের ললাটে রূপালী টিপের মতো দীপ্যমান দেখায়। বাঁশীখানি কোলে রেখে সুধী একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করে। করতে করতে ধ্যানমগ্ন হয়। নহবৎ তখনও বাজতে থাকে।

কাকের কর্কশ আহ্বানে ধ্যানভঙ্গ হয়। মেয়েরা ওঠে। বাসি কাজ সারে। জল আনতে যায়। পুরুষরা ওঠে। হুঁকোয় টান দেয়। হাল বলদ নিয়ে ক্ষেতে রওয়ানা হয়। সূর্যের তেজ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে। গ্রামের পশুরা ও শিশুরা পাখীদের স্থান নিয়ে আসর সরগরম করে রেখেছে। মেয়েলি কোন্দল থেকে থেকে রসভঙ্গ করছে। মেয়েলি কান্না কিন্তু বিশুদ্ধ সঙ্গীত।

মেয়েদের বর্ণাঢ্য সজ্জা, ললিত গমন, নিত্যকর্মের অবলীলা, অকপট আতিথ্য; পুরুষদের দাম্ভিক পাগড়ী, গম্ভীর মুখমণ্ডল, স্বল্পবাক্ শ্রম, ঈশ্বরনিষ্ঠ নির্ভাবনা সুধীকে প্রতিদিন নূতন বিস্ময়, অননুভূত আনন্দ যোগাত। এদের জন্যে তার করবার কী আছে, এদেরকে তার শেখাবার কী আছে? তবে তাদের নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে জমিদারের অত্যাচার, তাদের অদূরদর্শিতার সুযোগ নিয়ে মহাজনের মৃগয়া, তাদের কূপমণ্ডুকতার

সুযোগ নিয়ে সরকারী আমলা ও পেয়াদাদের ঔদ্ধত্য—এসব সুধীর কানে শ্রীরতনের কানে পৌঁছলে তারা নিজেদের মধ্যে তর্ক করে শ্রান্ত হত, কার্যত কোনো সাহায্য করতে প্রস্তুত হত না! সুধী বলত, "ওরা যা করবে ওদের নিজেদের দায়িত্বে করবে। আমরা সে কাজ ওদের জন্যে করে দিলে ওরা কোনো দিন আত্ম-দায়িত্ব-সচেতন হবে না; আমাদের তল্লাস করে যখন আমাদের পাবে না তখন কোনো টাউটের পাল্লায় পড়ে উকীলের কবলসাৎ হবে।" শ্রীরতন বলত, "ওদের আতিথেয়তায় পুষ্ট হয়ে ওদের জন্যে যদি কিছু করে না যেতে পারি তবে উকীলের চেয়ে আমরা কম কিসে?"

এমনি একটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে শ্রীরতন একসঙ্গে নায়েব দারোগা ও গ্রাম্য প্রধানকে প্রকুপিত করল। ঘটনাটা এই: কলুর ছেলে বাবুলাল বামুনের ছেলে রাধোশরণকে শা—বলে সম্বোধন করল। রাধোশরণ লাঠির চোটে বাবুলালের মাথা ফাঁক করে দিল। কলু চলল দারোগার কাছে দরবার করতে। যে সে কলু নয়। বঙ্গাল মুল্লুকে গিয়ে লাল হয়ে এসেছে, গ্রামে দালান দিচ্ছে। বামুন শ্রীরতনের কাছে নিবেদন করল, আপনি এর একটা শালিস বিচার করুন। নইলে কলুর সঙ্গে আদালতে আমি লড়তে পারব না। শ্রীরতন বিচার করল বটে, কিন্তু বামুনের ছেলেকে বলল, তুমি বাবুলালের পায়ে ধরে ক্ষমা চাও। বামুন তাতে এমন অপমান বোধ করল যে সোজা চলল জমিদারের নায়েবের দরবারে। নায়েব দারোগা একে অপরের মাসতুত ভাই। নিজেদের মধ্যে একটা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়ে দুজনেই তলব দিল শ্রীরতনকে ও তার সঙ্গী সুধীকে। খদ্দর দেখে দারোগার চক্ষু স্থির। প্রধানকে হাঁক দিয়ে বলল, "কি রে বুদ্ধু, গান্ধীর লোককে এ গ্রামে ঠাঁই দেয় কেটা?" দারোগা যত বলে নায়েব বলে তার সাত গুণ। আকাশের দিকে চেয়ে বলল, "ঘুঘু তো দেখছিনে? ভিটেতে চরাব কী?"

শ্রীরতন ও সুধী দুজনেই রাজদ্বারে চালান গেল। ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোডের একশ' নয় ধারার আসামী। ওরা কে, ওদের ঘর-বাড়ী কোথায়, কী ওদের পেশা? শ্রীরতন বলল, "বলতে বাধ্য নই। ইংরেজের আদালতের সঙ্গে আমার অসহযোগ।" সুধী অমন দৃঢ়তার পরিচয় দিল না। সমস্ত খুলে বলল। বণ্ড দিতে অস্বীকৃত হয়ে শ্রীরতন গেল জেলে। বেকসুর খালাস হয়ে সুধী পড়ল একলা।

তার বিচারক ছিলেন রায় বাহাদুর মহিমচন্দ্র সেন। তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। বললেন, "তুমি কিসের অসহযোগী হে? স্বরাজ মন্দিরে যেতে পেছপাও হলে। এসো আমার ছেলের সঙ্গে তোমার ভাব করিয়ে দিই।" খালাসের যথার্থ হেতু সুধী পরে জেনেছিল। তার পরলোকগত পিতা শম্ভুনাথ মহিমচন্দ্রের এক ক্লাস উপরে পড়তেন ও মহিমচন্দ্রকে সংস্কৃত পড়া বলে দিতেন। "সংস্কৃতে আমি ছিলুম যাকে বলে গো-মূর্খ। আমার বিশ্বাস ছিল না যে 'ব্যাকরণ কৌমুদী'র একটা বর্ণ

আমার মস্তিকে প্রবেশ পাবে। শম্ভু আমার ভুল ভাঙিয়ে দিল। বলল, 'যে মন্ত্রা সন্দেশের ভিয়ান জানে তার হাতে কাঁচাগোল্লাও ওৎরায়। তোর আসল ভয়টা কী তা আমি জানি। পাছে সংস্কৃত ভালো শিখলে ইংরেজী মন্দ শেখা হয়। অরে মূর্খ। যে মগজে বিধাতা স্বয়ং শান দিয়েছেন তার দ্বারা ইংরেজীও যেমন কাটে সংস্কৃতও তেমনি।' তারপর থেকে আমি ইংরেজীতেও ফার্স্ট, সংস্কৃততেও ফার্স্ট। কিন্তু আমার ছেলেটাকে দেখছ ত? সংস্কৃতে প্রায় পাস মার্ক, ইংরেজীতে প্রায় ফুল মার্ক। হরে দরে সেই একই ফল—ম্যাট্রিকে ফার্স্ট।" গর্বে তাঁর অশ্রুক্ষরণ হচ্ছিল।

প্রথম দর্শনে বাদল যেমন মুখচোরা তেমনি লাজুক। সুধীর সঙ্গে কথা বলল না। আনমনে জানালার বাইরে চেয়ে রইল। মহিমচন্দ্রই solo আলাপ করলেন। পরিশেষে সুধীকে অনুরোধ করলেন তাঁর ওখানে দিন কয়েক থেকে যেতে। "আর অসহযোগ চালিয়ে কী হবে। তোমাদের মহাত্মা তো কারাগারে। দাশ যাচ্ছেন কাউন্সিলে, নেহরু যাচ্ছেন অ্যাসেম্বলীতে। উকীলরা সুড় সুড় করে গর্তে ঢুকছে খদ্দরের ভেক ধরে। ছাত্ররা পিল পিল করে গর্ত পানে ফিরছে। জুলাইতে কলেজ খুললে দেখবে কেমন ভিড়। আমি বলি কি, সুধী, আমি তোমাকে রেকমেণ্ড করতে প্রস্তুত আছি, তুমিও বাদলের সঙ্গে পাটনা কলেজে নাম লেখাও।"

বাদলের সঙ্গে সুধীর প্রথম কথোপকথন এইরূপ :—

সুধী। আপনার বাবা বলছিলেন আপনি এখনই বিলেতে যেতে চান।

বাদল। আমি তো এখনই যেতে চাই। কিন্তু বাবা বলছেন সবুর করতে।

সুধী। স্বদেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়া বয়ঃসাপেক্ষ। তারপর বিদেশ—

বাদল। স্বদেশ আপনি কাকে বলেন? অনিবার্য কারণে যে দেশে ভূমিষ্ঠ হয়েছি সেই যদি আমার স্বদেশ হয় তবে কিপলিং-এর স্বদেশ এই ভারতবর্ষ।

সুধী। কিন্তু কিপলিং-এর বংশ যে বৈদেশিক।

বাদল। দেশের কথা থেকে বংশের কথা উঠল। তর্কশাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন হল না কি?

সুধী। লজিক আপনি এরই মধ্যে পড়েছেন?

বাদল। শুধু কি লজিক। কিন্তু যাক্ ওকথা।

সুধী। দেখুন, আমার মনে হয় স্বদেশের শিক্ষা বেশ করে অন্তরে ধারণ করে তারপরে বিদেশের শিক্ষা বরণ করতে ইচ্ছা থাকে তো পারেন। বিলেতে একদিন আমিও হয়তো যাব, কিন্তু দূর থেকে আপনার দেশকে আরো আপনার বলে জানতে।

বাদল। আমার স্বদেশ আমার স্বমনোনীত দেশ, আর আমার শিক্ষা আমার স্বভাব-সম্মত শিক্ষা। তেমন দেশ ইংলণ্ড আর তেমন শিক্ষা হিউম্যানিষ্টিক। যাকে বাজে লোকে বলে মডার্ন।

৯

ডেস্‌ডিমনা যেমন ওথেলোর মুখে তার বিচিত্র জীবন-কাহিনী শুনতে শুনতে কখন এক সময় তার প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন বাদলও তেমনি সুধীর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে তার প্রতি অনুকূল হল। ভারত সম্বন্ধে তার অনুসন্ধিৎসা কিপলিং-এর চেয়েও কম ছিল, কিন্তু কাহিনী শুনতে সে ভালোবাসত ঠিক ছোট ছেলের মতো। মাতৃবিয়োগের পর এই একটি দিকে তার বৃদ্ধি হয়নি, সে শিশু থেকে গেছে। কারুর কারুর মাথার চুল পাকলেও ভুরুর চুল থাকে কাঁচা।

বাদল বলে, "আমি তো পারতুম না। কজন পারে! অন্ধকার রাত্রে অচেনা গ্রামের পথে বিদ্যুতের আলোয় সামনের জিনিস দেখতে দেখতে আট-দশ মাইল হাঁটা! শ্রীরতন একমাত্র সহচর। পোড়ো বাড়ীতে ফুটো ছাতের নীচে ছাতা খুলে রেখে শোওয়া। পাশের ঘরে মেয়েলোকের কাঁকন কেঁপে উঠছে থেকে থেকে। বাইরে জনমনুষ্য নেই। দুরে মক্ মক্ করছে ব্যাং আর ঝিঁঝিঁ ডাকছে ঝিঁ—ই ঝিঁ—ই। ওঃ! আপনার বর্ণিত অবস্থান যেন কল্পনেত্রে দেখতে পাচ্ছি, সুধীন বাবু।"

সুধী বলে, "চরের গল্পটা যদি শুনতেন।"

বাদল বলে, "নিশ্চয়! এখনি।"

সুধী বলে, "চরে গিয়ে দেখলুম নদী যার চতুর্দিকে তাতে পানীয় জল নেই, কুয়ো খুঁড়লে ধ্বসে যায়। মেয়েরা যায় অনেকটা পথ বালুর উপর দিয়ে হেঁটে কলসী ভরে জল আনতে, কিন্তু জলও তাদের ছলতে চায় রোদ্দ শুকতে শুকতে হটতে হটতে। চরের মানুষ হাসতে হাসতে বলে, চরে থাকার অনেক সুখ। ভাদ্রে ভাসি, জ্যৈষ্ঠে পুড়ি, শীতে আগুন করবার জ্বাল পাইনে। একটা বড় গাছ নেই যার ছায়ায় বসে রৌদ্র থেকে নিস্তার মেলে। বানের ভয়ে লোক মাচানের উপর শ্রাবণ ভাদ্র মাসে শোয়। গরুগুলোকে চর থেকে সরিয়ে রাখে। কিন্তু হিসাবের ভুলে বান যদি আগে এসে পড়ে তবে মাচানশুদ্ধ মানুষ গোরু বাছুর সমেত ভাসমান। বান ছাড়লে জ্যান্ত যদি থাকে তবে বাড়ী ফিরে এসে দেখে জমিই নেই, তার বাড়ী।"

বাদল বলে, "য়্যাঁ!"

সুধী বলে, "জমিটুকু নদী চেটে খেয়েছে। তবে নদীর দয়ার শরীর। এক জায়গায় খায়, আর এক জায়গায় ফেলে। যেখানে খেয়েছিল আবার হয়তো সেইখানেই পরের বছর সুদে আসলে ফেরত দেয়। নদীকে চরের লোক প্রাণহীন মনে করতে পারে না, তাদেরই মতো সে প্রাণী-ই। তার অশেষ রকম রঙ্গ দেখতে দেখতে যারা বংশানুক্রমে চরে ঘর করেছে তাদের কাছে সে তো দেবতা। নদীর কথা ওদের জিজ্ঞাসা করুন। ওরা মন খুলে রসিকতা করবে। কিন্তু পাড়ুন দেখি জমিদারের কথা। অমনি ওদের

নালিশ শুরু। যে জমির উপর পাঁচ বছর আগে আপনার বাড়ী ছিল সে জমিও নেই সে বাড়ীও নেই, কিন্তু খাতায় লেখা আছে আপনি ঐ জমির প্রজা।"

"কি অন্যায়!" বাদল ক্ষেপে যায়।

সুধী হেসে বলে, "ক্রোধের দ্বারা কোনো অন্যায়ের প্রতিকার হতে পারে না, বাদলবাবু। আর অন্যায় কি এই একটা, না, অন্যায় কেবল জমিদারেই করে!"

"হতভাগারা মামলা করে না কেন?"

"মামলা বুঝি নিখরচায় হয়!"

"হুঁ।" বাদল ভেবে বলল, "গবর্নমেন্টের কাছে আবেদন করলেই পারে।"

"করে না আবার। লাখে লাখে স্বনামী ও বেনামী আবেদন পড়ে লাট দরবারে, জেলা হাকিমের কাছে। কিন্তু ওঁদের কি সময় আছে? আর আইন যেখানে বিরূপ সেখানে ওঁরাই বা কী করতে পারেন।"

বাদল কিছুমাত্র চিন্তিত না হয়ে বললে, "সেইজন্যে তো ডেমক্রেসীর আবশ্যকতা। ভোট যখন অত্যাচারিতদের হাতে আসবে, তাদের প্রতিনিধিরা আইন-সভায় গিয়ে আইন বদলে দেবে।"

"কিন্তু আইন সভায় তো শুধু এক পক্ষের প্রতিনিধি যাবে না, অপর পক্ষেরও। আর অপর পক্ষের প্রতিনিধিরা যে এ পক্ষের প্রতিনিধিদের আদৌ যেতে দেবে তাই বা ধরে নেব কেন? ফন্দী ফিকির ঘুষ ইত্যাদি প্রবলেরই অস্ত্র; এ ক্ষেত্রে প্রবল হচ্ছে সে-ই যার মগজে বুদ্ধি পকেটে টাকা।"

"না, না। ডেমক্রেসী শেষ পর্যন্ত এত কাঁচা থাকবে না, সুধীনবাবু। দুর্বলরাও প্রবল হবে, যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়, যদি একাগ্র হয়, যদি রাজনীতি বোঝে।"

"অর্থাৎ যদি তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন চব্বিশ ঘণ্টা বক্তৃতা শোনে, চাঁদা দেয়, সমিতি করে, কার্যনির্বাহক হয়, ক্যানভাস করে, নিজে দাঁড়ায়, অন্যকে দাঁড় করায়, হেরে গেলে আবার কোমর বাঁধে, জিতলে আবার বক্তৃতা শোনে, লবিতে যায়, হাঁ কিংবা না জানায়। দলগত পাশার দান যদি সুবিধামতো পড়ে তবে প্রতিপক্ষ শাসিয়ে যায়, সোয়াস্তি নেই, যদি না পড়ে তবে তো His Majesty's opposition হয়ে পরম কৃতার্থতা। এই আপনার ডেমক্রেসী। এর বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া। ফল যা হয় তা দু দিনেই পচে। তবু নতুন ফলের জন্যে হৈ হৈ রৈ রৈ করে আরো তিন শ' পঁয়ষট্টি দিন কাটে।"

"এই তো চাই। Eternal vigilance is the price of Liberty—of Justice —of Progress."

"রক্ষে করুন, বাদলবাবু। এ দেশের গরীবরাও সকলের চেয়ে বড় বলে জেনেছে

আত্মার মুক্তিকে ; অধ্যাত্ম চর্চার পরে রাজনীতি চর্চার সময় করতে পারে নি। এদের রক্ষণের ভার চিরকাল রাজার উপর ছিল ; শক্তিকে সমাজ রাজার উপর ন্যস্ত করেছিল প্রজাকে দিতে মুক্তির অবকাশ। আজ যদি রাজা নিজের কাজে ইস্তফা দেন, যদি অন্যায়ের প্রতিকার না করেন, যদি রাজার আমলারা যে ব্যবস্থা করেছেন তার দ্বারা এর সুরাহা না হয়, তবে আপনার নির্দেশ অনুসারে প্রজাই না হয় রাজা হলো, এবং তাতে তার সাংসারিক খেদও ঘুচল, কিন্তু তার আত্মার মুক্তি কি সপ্তাহে একদিন গির্জায় বসে উপদেশ শুনলে হবে ?"

বাদল এর উত্তরে বলল, "আত্মা মানি বটে, কিন্তু তার মুক্তির কথা কোনোদিন ভাবিনি। আর ও জিনিস যে সকলের বড় তা বিচারসাপেক্ষ। ধীরে ধীরে এ সব বিষয়ে আলোচনা করা যাবে, সুধীনবাবু। আপনি যে ডেমক্রেসীর বিরুদ্ধে খেলো যুক্তি না দিয়ে একেবারে অপ্রত্যাশিত প্রসঙ্গ তুললেন এর জন্যে আপনাকে অভিনন্দন করতে অনুমতি দিন।"

১০

বাদলের আগ্রহাতিশয্যে পাটনায় সুধী তার সহপাঠী হল। সঙ্গী মাত্রহীন ভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে সুধীর প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। আশ্রম উঠে গেছে জেল-এ। বিদ্যাপীঠ একেবারেই উঠে গেছে। লছমন দাস এখন লছমন কোলায়। সে ভেবেছিল রামজীর অবতার নিশ্চয়ই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, কারাগার থেকে অনায়াসেই অন্তর্হিত হতে পারেন। তার কোনো লক্ষণ না দেখে গান্ধীর উপর তার অবিশ্বাস জাত হল। কাজেই সে স্বরাজের অর্থাৎ রামরাজ্যের ভাবনা বিসর্জন দিল।

নাছোড়বান্দা চিন্তার দল রাত্রে বাদলকে ঘুমতে দেয় না। সুধীর কাছে সে রোজ আক্ষেপ জানায়, নালিশ করে, কিন্তু সুধীর পরামর্শ শোনে না—ঘুমতে যাবার আগে মনের মন্দির থেকে প্রত্যেক চিন্তাকে বহিষ্কৃত করে না, দেবমন্দিরে যেমন দর্শনপ্রার্থীমাত্রকে করে।

বলে, "কাল রাত্রে ঘড়িতে যতবার যতটা বাজল সমস্ত শুনেছি। ঘুম কিন্তু কিছুতেই আসে না। শুয়ে শুয়ে এত বিশ্রী লাগল যে ভাবলুম গলায় দড়ি দিলে কেমন হয়। উঠে বসতেই ও ভাবনা দৌড় দিয়ে পালাল। বাতি জ্বালিয়ে অঙ্ক কষলুম, যাতে মাথাটা পরিষ্কার হয়। তখন মনে হল, আমার জীবনের উপর কী আমার অধিকার ! আমাকে এরা ডেকে এনেছে বিংশ শতাব্দীর বিবর্তনের নায়ক হতে। আমি গেলে এদের কী দশা হবে।"

সুধী জিজ্ঞাসা করে, "কাদের কথা বলছ ?"

"মানব জাতির। পৃথিবী শুদ্ধ মানুষের। এরা একদা পশুর সঙ্গে পশু ছিল। কোনো নামহীন বাদল এদের শেখাল কেমন করে আগুন জ্বালাতে হয়। অন্য এক বাদল জংলা ঘাসের বীজ বুনে শস্য উৎপাদন করে এদের খাওয়াল। কোনো বাদল গোরুকে ধরে এনে চাষের কাজে বহাল করল। কোনো বাদল ভেড়ার লোম কেটে নিয়ে শীত নিবারক পোশাক তৈরি করল। কোনো বাদল ঘোড়ার পিঠে চড়ে দেশ দেখতে চলল। কোনো বাদল ঘর বেঁধে রৌদ্র জল এড়াল। কে একজন বাদল অর্থহীন শব্দকে এমন করে সাজিয়ে উচ্চারণ করল যে সকলে বুঝল কী ওর অর্থ।

"যুগের পর যুগ সুদীর্ঘ অধ্যবসায়ের দ্বারা বাদলরাই পশুকে মানুষ, মানুষকে সভ্য, সভ্য মানুষকে যন্ত্রবিধাতা করেছে। বিংশ শতাব্দীর বাদল বিশ্বমানবের বিবর্তনকে কোন দিকে আগ বাড়িয়ে দেবে জানে না; শুধু জানে যে মানব-সংসারে তাকে বিনা শর্তে আনা হয়নি; মস্ত একটা দায়িত্ব নিয়ে তার আসা। ভারত গবর্নমেণ্ট যেমন বাইরে থেকে এক্স্‌পার্ট আনিয়ে থাকেন মানব-সংসারে বাদলরা তেমনিতর এক্স্‌পার্ট। আমি কিসের এক্স্‌পার্ট তা আজও জানলুম না, সুধীদা, তবু আমার কেবলমাত্র বেঁচে থাকাটারও নিশ্চয় কোনো catalytic effect আছে।"

এই উত্তরে সুধী কী বলতে পারে? বাদলের মাথায় জবাকুসুম মালিশ করে দেয়। আশীর্বাদ করে, "সুনিদ্রা হোক।"

সুনিদ্রা হয় না। সুধীকে শুনতে হয়, "সকলেই একে একে ঘুমে অচেতন হল, আমি কিন্তু বার বার পাশ ফিরতে লেগেছি। ঈর্ষায় ভাবলুম চীৎকার করে ওদের জাগিয়ে তুলি। কিন্তু ওরা তো বাদল নয়, ওদের কিসের দায়, ওরা কেন আমার সঙ্গে জাগরূক থাকবে? অনিদ্রা মানুষকে এত দুর্বল করে। দুর্বলের সৃষ্টি ভগবান। সেই ভগবানকে ডেকে বললুম, আজকের মতো ঘুম দাও, কাল দেখা যাবে তোমাকে মানি কি না মানি।"

সুধী হেসে উঠল। নিজের রসিকতায় প্রীত হয়ে বাদলও। বাদল বলল, "এক শিশি অ্যাস্পিরিন কিনে এনে বালিশের নীচে রাখব। নইলে ঘোর ভগবদ্ভক্ত হয়ে হয়তো স্বর্গেই চলে যাব।"

সুধী তাকে অ্যাস্পিরিন খেতে নিষেধ করল। বলল, "ভগবানের কাছে অনেকে অনেক কিছু চায়, কিন্তু ঘুম চাইবার দৃষ্টান্ত এই প্রথম। যদি চাইতেই হয় কোনো জিনিস, তবে ঘুম না চেয়ে মুক্তি চেয়ো, দায়িত্ব থেকে মুক্তি, দাম্ভিকতা থেকে মুক্তি। বোলো, বিশ্বের ভাবনা বিশ্বস্রষ্টার নিজের ও একার। আমি আর অনধিকার চর্চা করব না।"

বাদল রেগে বলল, "ভগবান না হাতী! আমি মানব ভগবান! প্রার্থনা করব ভগবানকে! শরীর যতই দুর্বল হোক না কেন, মন আমার সতেজ, প্রাণ আমার প্রবল, আত্মা আমার স্বরাট্‌। বাইরের কোনো শক্তির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা আমার দ্বারা নৈব

নৈব চ। কিন্তু একটা বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হতে পারছিনে, সুধীদা। মানব আর মানবীর মধ্য থেকে যা আসে তা তো মানবশিশুর দেহ মন প্রাণ। বায়োলজিতে তার তথ্যাদি আছে। কিন্তু আত্মা তার মধ্যে কখন আবির্ভূত হয় ও কোথা থেকে? আত্মা তাকে আপনার বলে স্বীকার করে কী কারণে? কেন তার সঙ্গে অভিন্ন হয় তার জীবনান্তকাল অবধি?"

সুধী কতক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে বলল, "এর উত্তর কেউ কাউকে দিতে পারে না, বাদল। নিজের কাছে বহু সাধনায় মেলে। ধর্মগ্রন্থে এর দিগদর্শন আছে। কিন্তু তাতে তোমার সন্তোষ হবে না। আমারও হয় না। নিজের উপলব্ধিই আসল। অপরাপরদের উপলব্ধির সঙ্গে তুলনা করবার জন্যে শাস্ত্র পাঠ করি। মিল দেখলে আনন্দ পাই, না দেখলে অন্তরের দিকে চোখ ফেরাই। শঙ্করভাষ্য অগ্রাহ্য করে আমার আপন ভাষ্য রচনা করি। আমার অপরোক্ষ অনুভূতি আমার আদিম প্রমাণ; গীতা উপনিষদ্ আমার মধ্যবর্তী প্রমাণ; আমার স্বকীয় ভাষ্য আমার অন্তিম প্রমাণ।" —সুধী অন্তরের অতলে তলিয়ে গেল ও অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাদলের কথা কানে তুলল না। হঠাৎ অবহিত হয়ে বলল, "কী বলছিলে?"

বাদল পুনর্বার বলল, "আমার আদিম, মধ্যবর্তী ও অন্তিম প্রমাণ - আমার একমাত্র প্রমাণ—আমার বুদ্ধি। যাকে আমি প্রাণপণ চিন্তা করেও বুঝতে পারিনে তাকে আমি অস্বীকার করি। যেমন ভগবানকে। যাকে কতক বুঝি কতক বুঝিনে তাকে অবসর সময়ে পুরো বুঝব বলে আপাতত স্বীকার করে নিই ও পরে রোমন্থন করি। যেমন দেহ-মন-প্রাণ থেকে বিচ্ছেদ্য আত্মা।"

১১

একদিন হরিহর ক্ষেত্রে মেলা দেখতে পদব্রজে সোনপুর যাওয়া হয়েছিল। গঙ্গার একটি অংশ পার হয়ে চরের উপর দিয়ে চলতে চলতে শুরুতে বাদল বলল, "তুমি চোখ বুজে পাঁচ মিনিট কি পাঁচ ঘণ্টা বসলে, তারপর অম্লান বদনে ঘোষণা করলে, জানামি অহং তং পুরুষং মহান্তং—সন্ধির নিয়ম লঙ্ঘন করছি, মাফ কর। ডাক্তারীর বেলা তুমি যদি এরকম করতে তোমাকে বলতুম হাতুড়ে। কিন্তু যেহেতু এটা ডাক্তারী নয়, মেটাফিজিক্স, সেহেতু তোমার উপলব্ধি অর্থাৎ guess work আমার জিজ্ঞাসা-ব্যাধি নিরাময় করবে! অবশ্য তুমি যদি তোমার জম্বুদ্বীপের ভূগোলকে তোমার সোনপুর যাত্রার মধ্যবর্তী প্রমাণ বলে গণ্য কর ও তার স্বকৃত ভাষ্যকে অন্তিম প্রমাণ বলে, তবে তোমার সঙ্গে তর্ক করে ফুস্‌ফুসের রোগ ডেকে আনব না।"

সুধী বলল, "তোমার ফুস্‌ফুস্ অকাট্য হোক। কিন্তু অত বড় একটা অপবাদ আমাকে

দিলে, বাদল ? আমি হাতুড়ে ? সেবার যে তোমার ফোঁড়া হয়েছিল, ডাক্তারের নজরে পড়লে বরফির মতো কাটত। আমি ওটাকে পুঁইপাতা আর গরম ঘি দিয়ে সারালুম। মনে পড়ে ? ···থাক্ থাক্, কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে না। পাগল !"

"আমি যখন অম্লানবদনে বলি," সুধী চলতে চলতে বলতে থাকল, "যে, বাদল আমার বন্ধু তখন আমি কাগজ-পেন্‌সিল নিয়ে হিসাব করে দেখিনে কত বার তুমি আমার কী উপকার করেছ, তোমার সান্নিধ্য আমাকে কয় মণ ওজনের আনন্দ দিয়েছে, তোমার ব্যবহার আমার ক'গজ ক'ফুট ক'ইঞ্চি ভালো লেগেছে। আমি অনুভব করি তোমার প্রতি গাঢ় স্নেহ। তাই ঘোষণা করি বাদল আমার বন্ধু, আমার ভাই।"

বাদল বাধা দিয়ে বলল, "কিন্তু এর জন্যে তোমাকে শাস্ত্র ওল্টাতে হয় কি ?"

সুধী বলল, "আমাকে বলতে দাও। তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুতা আর ভগবানের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ গুরুতায় সমান নয়। পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার সম্বন্ধ এতই দায়িত্বপূর্ণ যে বালিকা বধূর মতো পদে পদে গুরুজনের পরামর্শ নিতে হয়। কিন্তু দায়িত্বটা তো গুরুজনের নয়, বধূর নিজের। আর দায়িত্বই কি সব কথা ? মাধুর্য কি কিছুই নয় ? মাধুর্যের ক্ষেত্রে গুরুজন যে বাইরের লোক। বধূর অন্তরঙ্গ সখীরাও পর। বধূ একাকিনী। নিজেই নিজের একমাত্র প্রমাণ।"

"তবে ?" বাদল তুড়ি দিয়ে বলল, "ঘুরে ফিরে পৌঁছতে হলো আমারই দরজায় !"

"ভালো করে শোনই না।" সুধী কৌতুক-ধমক সহকারে বলল, "বধূ তো সত্যি আর এক্‌লা নয়। ওর স্বামী রয়েছে শয্যায়। ও যাকে অনুভব করে সে যে ওর অর্ধাঙ্গ। না, পরম মুহূর্তে সে যে ওর থেকে অভিন্ন। তাই তখন প্রমাণের প্রশ্নই ওঠে না। অপরোক্ষ অনুভূতির এইখানে শ্রেষ্ঠতা। ঐ আকাশ, এই আমি—দৃশ্য ও দর্শক—পরস্পরের মধ্যে তন্ময় হলে পরে প্রমাণ হয় নিষ্প্রয়োজন।"

"তোমার অর্ধেক কথা আমি বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করতে পারলুম না, সুতরাং গ্রহণের প্রবণতা সত্ত্বেও আদৌ গ্রহণ করলুম না, সুধীদা। যদি বিষয়ভ্রষ্ট হবার অনুমতি দাও তবে বাল্যবিবাহের তীব্র নিন্দা করে একবার রসনাবিনোদন করি।"

সুধী হাত যোড় করল। বলল, "আমি বালিকাও নই, বধূও নই, বালিকাকে বধূ করবার জন্যে ব্যগ্র হইনি, যারা করে তাদের প্রশংসাও করিনে, তবে কেন আমার কর্ণে সুধাবর্ষণ করবে ? এটা ডিবেটিং ক্লাবও নয়।"

বাদল রাস্তা থেকে সরে গিয়ে এক জায়গায় পা ছড়িয়ে দিল। সুধী একটু ফাঁকে বসল। বলল, "তুমি বৌদ্ধ, আমি ব্রাহ্মণ।"

"কী !" বাদল চম্‌কে উঠে সুধীর দিকে কটমট করে তাকাল।—সুধী আত্মস্থ ভাবে বলল, "তুমি বৌদ্ধ—তুমি ভারতবর্ষের সেই পুত্র যে বুদ্ধির মার্গ ধরে একাকী পথ

চলল, পথের শেষে পেল আপনার নির্বাণ। পরমাত্মা আছেন কি নেই অন্বেষণও করল না। আর আমি ব্রাহ্মণ—আমি ভারতবর্ষের অপর পুত্র, আমার মার্গ অন্তর্দীপ্তির। আমি সকলের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে বদ্ধ হলুম। যিনি সকলকে নিয়ে ও সকলের উর্ধ্বে, তাঁর সঙ্গে চির-সম্বন্ধ যেই পাতালুম অমনি হলো আমার মুক্তি।"

বাদল অসহিষ্ণুভাবে বলল, "বেশ, আমি বৌদ্ধ। আমি মানিনে তোমার বর্ণাশ্রম, মানিনে তোমার বেদবেদান্ত, মানিনে শ্রুতি মানিনে স্মৃতি, মানিনে তোমাদের সৃষ্ট ভগবানের তেত্রিশ কোটী মূর্তি, দশ অবতার, অষ্টাদশ পুরাণ, যাগযজ্ঞ, বলিদান। ভারতবর্ষ তাঁর যে পুত্রকে ত্যাজ্য পুত্র করেছিলেন, সে-ই একদিন বহির্ভারতে গিয়ে দিগ্বিজয়ী হয়েছিল, গড়েছিল উপনিবেশ। তার অভিশাপে ভারত লাভ করলেন মুসলমানের পদাঘাত।" বাদল ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, "কিন্তু সোনপুর মেলায় বৌদ্ধের স্থান কোথায়? যাও তুমি একাকী ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ।"

সুধীও রাগ করতে জানে। বলল, "যাও তবে তুমি একলা পাঁচ মাইল হেঁটে। রাস্তায় লোক কমে এসেছে। পড়বে বাট-পাড়ের হাতে।"

কথাটা বাদলের হৃদয়ঙ্গম হয়ে মুখমণ্ডলে আত্মপ্রকাশ করল। বাদল চুপ করে থাকল সুধীর পক্ষ থেকে অনুনয়ের প্রত্যাশায়। সুধী মনে মনে হাসল। বলল, "ভারতবর্ষ যে পরাজিত হলেন তার মূল কারণ বৈদিক ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের বিরোধ, একদিকে দেবদ্বিজ ও অপর দিকে সবার উপরে মানুষ বড়। আরো তলিয়ে দেখলে, ছন্দোবদ্ধ সমাজের সহিত সঙ্ঘ-স্বাতন্ত্র্যের সংঘর্ষ জনিত তালকর্তন। আরো তলিয়ে দেখলে, দেশকালপাত্রোচিতের সঙ্গে দেশকালপাত্রাতীতের অসামঞ্জস্য। অতল পর্যন্ত গেলে, একই আত্মার অন্তর্বিগ্রহ—অন্তর্দীপ্তি বনাম বুদ্ধি। এস বাদল, আমরা সন্ধির সন্ধান করি। তোমার শর্ত কী কী?"

বাদল উৎফুল্ল হয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, "রোস। ভাবতে দাও।" ভেবে বলল, "বাদীপক্ষের উকীল আসামীপক্ষের বক্তৃতা আরম্ভ হবার আগে সেই বক্তৃতার একটা কল্পিত প্রতিরূপ নির্মাণ করেন ও সেটাকে তাসের কেল্লার মতো ধরাশায়ী করে আদালতের মনে ধাঁধা লাগিয়ে দেন। আমার প্রথম শর্ত এই যে তুমি আমাকে আমার কথা আমার মতো করে বলতে দেবে ও তার কোনোরূপ অপব্যাখ্যা করবে না। রাগ করো না সুধীদা। তোমরা ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধদের 'নির্বাণ', 'শূন্য' ইত্যাদি শব্দগুলির কদর্থ করেছিল, পরমাত্মা সম্বন্ধে যারা নাস্তিকও নয় আস্তিকও নয়, তাদেরকে নাস্তিক্যের দাগে দাগী করেছিল এবং কতগুলো কাল্পনিক premise-কে খণ্ডন করে বৌদ্ধ মতবাদকে পরাস্ত করণ বলে ঢাক পিটিয়েছিল।"

সুধী বাধা দিয়ে বলল, "শঙ্কর প্রভৃতি বর্ণাশ্রম-ত্যাগীকে আমি ব্রাহ্মণ বলিনে। তাঁরা আমাদের সন্ন্যাসীদের মতো বর্ণচোরা ছিলেন।"

বাদল ওকথা কানে তুলল না। নিজের বক্তব্য শেষ করল। "সন্ধি বলতে যদি এক-তরফা একটা ব্যাপার বোঝায় তবে তেমন সন্ধিপত্রে আমি সই করব না, সুধীদা।"

সুধী গম্ভীর হয়ে বলল, "বেশ তো। তুমি তোমার পক্ষের মামলা যেমন খুশি সাজিয়ে গুছিয়ে বল।"

১২

"আমার মার্গকে", বাদল গলা পরিষ্কার করে বলল, "বুদ্ধিমার্গ আখ্যা দিয়ে মোটের উপর তুমি বেঠিক করনি। কিন্তু আমার বুদ্ধি বৈয়াকরণিকের নয়, বিচারকের। ভাষান্তরে, Scholastic নয়, humanistic. আমি মানবের প্রতিভূ হিসাবে বিশ্বতথ্য পর্যবেক্ষণ করি; তথ্যের তলে কোন্ তত্ত্ব ক্রিয়াপর। তার সম্বন্ধে একটা আপাত সিদ্ধান্ত খাড়া করি। সেই আপাত সিদ্ধান্তের দীর্ঘকাল পরীক্ষা চলে। পরীক্ষাফলে তার হয়তো আমূল পরিবর্তন ঘটে। সেইখানে আমি থামিনে। গোড়া থেকেই আমি মানব-প্রতিভূ। শেষ পর্যন্ত আমি তাই। আমার বিশ্বচর্চা আমার মনোবিলাসের জন্যে নয়। আমার principle-এর জন্যে—মানব মহাজাতির জন্যে। যেদিন জানব যে আমি মানব কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, কিংবা আমি মানব-ই নই, আমি শুধুমাত্র আমি, a free and unattached entity, সেদিন আমি বুদ্ধিমার্গ পরিত্যাগ করব। বিশুদ্ধ বিশ্বচর্চা আমার পক্ষে পরচর্চার মতো পরিহার্য। আর বুদ্ধিমার্গেও এমন কোনো সম্মোহন নেই যে আমাকে পথের নেশায় পথ চলাবে।"

সুধী মন দিয়ে শুনছিল। বলল, "বলে যাও।"

"তারপর," বাদল একটানা বলে চলল, "আমাকে তুমি বৌদ্ধ বলে বুদ্ধের সঙ্গে উপমেয় করেছ। দুটি বিষয়ে এ উপমা ন্যায্য। প্রথমত আমি মানবের জন্যে সাধনায় রত, আমারও সাধ্য মানবহিত। দ্বিতীয়ত আমারও মার্গ বুদ্ধিমার্গ, মানবের এভোল্যুশন ঐ মার্গ ধরে হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধকে সাধনার প্রেরণা দিয়েছিল মানবের দুঃখ। আমাকে প্রবর্তনা দিয়েছে মানবের বিবর্তন। মানুষ যদি ধাপে ধাপে তার বর্তমান অবস্থায় পৌঁছে থাকে তবে সামনের ধাপে কার হাত ধরে উঠবে? এই বাদলের। বিবর্তন যে স্বতঃসম্ভব অর্থাৎ automatic, তা আমি বিশ্বাস করিনে। গণমানব চিরকাল বাদলগণের দ্বারা নীয়মান হয়ে এসেছে ও হতে থাকবে। তারপর সিদ্ধার্থের সিদ্ধি ও বাদলের সিদ্ধি এক নয়। তিনি পেলেন ও দিলেন নির্বাণের সন্ধান। নির্বাণের প্রকৃত অর্থ ভাবাত্মকই হোক আর অভাবাত্মকই হোক, নির্বাণের পরে আর কিছু নেই। নির্বাণই চরম। আমি কিন্তু কোথাও দাঁড়ি টানবার কথা মনে আনতে পারিনে। আমার সিদ্ধি হচ্ছে বৃদ্ধিতে। বৃদ্ধির সম্ভাবনা অনন্ত। আমার মতো বাদলদের সাধনা ও সিদ্ধি পৌনঃ-পুনিক।"

বাদল শেষ করলে সুধী [illegible] করে বলল, "ঐ দেখ মানবজাতির প্রায় সকলেই

সমুপস্থিত। প্রাতভৃকে চিনতে পারে কি না দেখা যাক।"

অত বড় মেলা নাকি এক রাশিয়ার Nijni Novgorod-এ বসে। কেবল মানবজাতি কেন, গৃহপালিত ও অরণ্যজাত প্রায় সকল জাতির অধিকাংশ সভ্যই সমবেত।

সুধী বলল, "ভালো করে আমার হাতটা ধরে থাক। একবার সঙ্গছাড়া হলে এক সপ্তাহ খোঁজ করতে হবে।"

অস্তুদের বন্ধু একমাত্র নন্তবাবুই নন, বাদলবাবুও। একেবারে ছেলেমানুষের মতো তার পশু সম্বন্ধীয় কৌতূহল। হাতী কেমন করে খায় ও কী খায় সেটা নিরীক্ষণ করতে ঘণ্টাখানেক হস্তীসভায় কাটল। তারপর তার শখ হল পাখী কিনবে। ময়না চন্দনা বুলবুল ইত্যাদি নাম ধাম গণ গোত্র আকৃতি প্রকৃতি কিছুই যখন তার মনঃপূত হল না তখন দোকানদার দিল তাকে এক শালিকছানা গছিয়ে। বলল; "এ খুব পোষ মানবে, কাপুজী। কথাও বলবে যদি তালিম দেন। দেখুন ভুলবেন না যেন একে জ্যান্ত ফড়িং খাওয়াতে।" এই বলে সে শালিকছানার সঙ্গে এক ঝাঁক আস্ত ফড়িং ফাউ দিল। দাম যা হাঁকল তাতে সুধীর চক্ষু স্থির, কিন্তু বাদল সাহ্লাদে বলল, "লোকটা বোকা-সোকা গোছের। নইলে মোটে একটি টাকা নিয়ে এই রত্ন বিলিয়ে দেয়।"

"লোকটা," সুধী পরিহাস করে বলল, "চালাক যে নয় তা মানছি। চালাক হলে বলত, এই পাখী খাঁটি বিলিতী নাইটিঙ্গেলের নাতি। এর দাম পুরো একটি পাউণ্ড, কিন্তু গুদাম খালি করবার জন্যে নয় টাকা পনের আনায় বিতরণ করছি। আর তুমিও দশ টাকার নোট ফেলে দিয়ে গদগদভাবে রেজকি ছেড়ে দিতে।"

পাখীটার জন্যে একটা খাঁচা কিনতে হল। খাঁচাটা বইবার জন্যে একটা কুলী করতে হল। সেই অমূল্য নিধি নিয়ে পাছে সে বেটা ফেরার হয় এইজন্যে তাকে নজরবন্দী রাখবার ভার বাদল স্বয়ং নিল। বাদলের মুখে অন্য কথা নেই—"পাখীটার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়। নইলে এতবার খাঁচার শিকে ঠোক্কর মারে কেন?" কিংবা "দাঁড়া। দাঁড়া। পাখীটা যে মুখ থুবড়ে মরল।" কিংবা, "সুধীদা, এ পাখী মায়ের দুধ না খেতে পেলে রোগা হয়ে যাবে না তো? এর মা-কে এখন পাই কোথায়!" সুধীর পক্ষে অট্টহাস্য সংবরণ করা কঠিন হয়।

পক্ষীসন্তানের মন্দভাগ্যের ভাবনা বাদলকে বিমনা করায় সে দিন ব্রাহ্মণ বৌদ্ধের সন্ধি স্থাপিত হল না, সুধীও প্রসঙ্গটা চেপে গেল। পরে যখন একদিন পাখীটি অকালে দেহত্যাগ করল বাদল সুধীকে বলল, "এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, বেঁচে থাকলে ঐ পাখী শালিক জাতির এভোল্যুশন কোন দিকে এগিয়ে দিতে পারত।"

সুধী কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সহিত বলল, "এবং প্রশ্ন হচ্ছে আরো যে, ঐ পাখীর মৃত্যুফলে ১৯৩১ সালের সেনসাসে ফড়িং সংখ্যা কী পরিমাণে বাড়বে।"

বাদল রাগ করে বললে, “যাও। তোমার সঙ্গে আড়ি।”

সুধী বলল, “তা হলে সন্ধি কোনোকালে হবে না? ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চিরশত্রু?”

“তাই তো,” বাদলের মনে পড়ে গেল, সেদিনকার মামলায় আপোসের কথা উঠেছিল। “আমার শর্ত কী কী জানতে চাও? আমার প্রথম শর্ত তো জানিয়েছি। দ্বিতীয় শর্ত এই যে, আমাকে জড়বাদী বলতে পারবে না। আমি আত্মা মানি, যদিচ পরমাত্মা সম্বন্ধে কিছু জানিনে। ঐ পাখীটার আত্মা আমার কাছে পরমাত্মার চেয়ে সত্য, কারণ, পাখী ও মানুষ বিবর্তনের পথ বেয়ে এক সঙ্গে অনেকখানি এসেছে, তারপর ওরা ধরল একটি শাখা পথ, আমরা ও অপরাপর পশুরা ধরলুম অন্য শাখা পথ।”

সুধী হেসে বাধা দিয়ে বলল, “অপরাপর পশুদের মধ্যে আমি নেই কিন্তু।”

বাদল কর্ণপাত করল না। বলে চলল, “যাক, আত্মা যে মানি এখানে তো তোমার সঙ্গে মিল। সন্ধি এর দ্বারা কতখানি সুগম হলো ভেবে দেখ।”

সুধী বলল, “আত্মা বলতে তুমি যা বোঝ আমি হয়তো ঠিক সেই জিনিস বুঝিনে। পরমাত্মার থেকে স্বতন্ত্ররূপে আত্মার অস্তিত্ব যে কেমনতর তা আমি অনুমান করতে পারিনে, অনুভব করতে তো পারিইনে। পৃথিবী ছাড়া কাশী আছে রাজা হরিশ্চন্দ্রকে কে যেন অমন যুক্তি দিয়েছিল।”

বাদল মাথায় হাত দিয়ে গঙ্গার বাঁধের উপর বসে পড়ল। বলল, “তা হলে সন্ধির প্রতিষ্ঠাভূমি থাকে না, তুমি আকাশে আমি জলে। আমাকে ছেড়ে খ্রীস্টান মুসলমানের কাছে যাও, শর্তে বনবে।”

১৩

“আমার আত্মা,” সুধী বাদলের পাশে আসীন হয়ে গঙ্গার কূল ধরে চলতে থাকা গুন টানা নৌকার পিছন পিছন উঠতে থাকা ঢেউয়ের দিকে চেয়ে বলল, “নদীজলের ঢেউ। নদীজল থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে তার অস্তিত্ব সম্ভব নয়।”

“আর আমার আত্মা,” বাদল নিজের মনের ভিতর অনুসন্ধান করে বলল, “বিশুদ্ধ ঢেউ। জলের নয়, বায়ুর নয়, ঈথরের নয়, বিদ্যুতের নয়, কোনো প্রকার জড়বস্তুর নয়। এক, অদ্বিতীয়, স্বয়ম্ভূ, স্বয়ংসম্পূর্ণ, পর-সম্বন্ধ-বিহীন।”

“কিন্তু,” সুধী বলল, “পরমাত্মা তো আমার আত্মার পর নন। তার থেকে অভিন্ন। অথচ দৃশ্যত ভিন্ন। নদীজল ও নদীজলের ঢেউ যেমন একই জিনিস, অথচ ধরতে গেলে দুই।”

বাদল এর উত্তরে বলল, “এর নাম sophistry. সোজাসুজি বল, এক না দুই।”

সুধী তবু বলল, “এক অথচ দুই।”

বাদল যে তাকে বুঝতে পারছে না এর জন্যে সুধী দুঃখিত হল। কিন্তু এমন তো হতে পারে যে সুধীও বাদলকে বুঝতে পারছে না। সুধী বাদলের পদতলভূমির উপর দাঁড়িয়ে বাদলের দৃষ্টিতে আত্মরূপ অবলোকন করল। তারপর বলে উঠল, "তোমার উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করলুম।"

বাদল বিদ্রূপের সুরে বলল, "বটেক।"—বিদ্রূপকালে ওর মুখে 'বটে' হয় 'বটেক'।

সুধী তার বিদ্রূপ গায়ে মাখল না। বলে গেল, "নিজের নির্দিষ্ট কক্ষে আত্মা যেন একটি স্বাধীন নক্ষত্র, স্বীয় গতিবেগে দীপ্যমান। চতুর্দিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার, অন্ধকারপূর্ণ ব্যবধানে অন্য যে সকল নক্ষত্র দীপ্যমান তারাই কতকটা নিকট আত্মীয়ের মতো। নিজেকে অখণ্ড জ্যোতিঃপিণ্ডের অবিচ্ছিন্ন খণ্ড বলে বিশ্বাস হয় না।"

বাদল তখন সহজ সুরে বলল, "হয়েছে। কিন্তু উপমা বাদ দিয়ে কথা বলতে পার না? অলঙ্কারভূষিত বাক্য অলঙ্কারেরই বাহন, সত্যের নয়।"

সুধী বলল, "কিন্তু সত্য যে সালঙ্কারা কন্যা।"

বাদল উষ্মার সহিত বলল, "তোমার সঙ্গে সন্ধি নৈব নৈব চ। আমার সত্য সালঙ্কারা কন্যা নয়, নীরস নিরেট নির্বর্ণ। আমার সত্য ক্লীবলিঙ্গ।"

সুধী বেচারা করে কী! পুনর্বার বাদলের স্থানে নিজেকে নিবেশ করল। বাদলের দৃষ্টিভঙ্গীর অনুকরণ করল। বলল, "তাই তো।"

বাদল সগর্বে বলল, "কেমন?"

সুধী সবিনয়ে বলল, "নির্গুণ ঋজু প্রসাদশূন্য।"

"ঠিক বলেছ। প্রসাদশূন্য।" যেন বাক্যযোগে সুধীর পিঠ চাপড়ে দিল।

এর পরে আলাপ জমে না। গঙ্গার ধারে বসে সুধী দেখতে থাকে নদীজলে প্রতিফলিত অস্তাকাশ। মেঘগুলি যেন বহুরূপী—এই গৈরিক তো এই জর্দা, এই লোহিত তো এই পাটল। কখন এক সময় তারা ছায়ার মতো কালো হয়ে অন্ধকারের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। তারপর যখন তারা আকাশ পারাপার করে তখন মনে হয় তারা যেন অন্ধকারের নিঃশ্বাস বায়ু।

সুধী বাদলকে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, "কী ভাবছ? চল, যাই।"

বাদল স্বপ্নোত্থিতের মতো বলে, "গেল, গেল, হারিয়ে গেল চিন্তাটা। আর কি তার সন্ধান পাব?" এই বলে মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে।

"সন্ধিপত্র লেখা হয়েছে," সুধী ঘোষণা করে, "এবার কেবল তোমার আর আমার স্বাক্ষর করা বাকী।"

"সত্যি?" বাদল খুশি হয়ে যায়, "কী কী শর্ত?"

"মোটে একটি।" সুধী মৃদু হাসে।

“মোটে একটি।” বাদল নিরাশ হয়। “আমাকে তো জানতে দিলে আমার তিনটি শর্তেই তুমি এক এক করে একমত। মানববুদ্ধি, স্বাধীন আত্মা ও নিরলঙ্কার সত্য।”

“না।” সুধী দৃঢ় কোমল ভাবে বলল, “নিজের উপর জুলুম না করে তোমার ও-সব শর্তে রাজী হওয়া যায় না। আমাদের পরিভাষা হয়তো এক, কিন্তু মার্গ অনুসারে অর্থবোধ বিভিন্ন। সন্ধি হতে পারে একটি ক্ষেত্রে—স্বমার্গনিষ্ঠায়। স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দু ও স্বধর্মনিষ্ঠ মুসলমান যে কত বড় বন্ধু হতে পারে তা আমার শোনা কথা নয়, চোখে দেখা। ব্রাহ্মণ বৌদ্ধে নিশ্চয়ই অমনি সৌহার্দ্য ছিল। ভারতবর্ষের পরাভবের মূল কারণ আমি ঠিক আঁচতে পারিনি। আবার চেষ্টা করব।”

সুধীদা একমত হয়েও হল না, বাক্য প্রত্যাহার করল প্রকারান্তরে। এতে বাদল ক্ষুব্ধ হল। বলল, “মার্গ তো সব মানুষের একই। আর আমি সেই মার্গের অধিনায়ক। তুমি renegade হতে চাও তো আমরা তোমার উপর জুলুম করব না। কিন্তু মার্গ কখনো দুই হতে পারে না, সুধীদা।”

তাহার ভারে আকাশ যেন ঝুঁকে পড়ল, ফলভারাবনত শাখার মতো। সুধীর মনে হতে লাগল হাত বাড়িয়ে দিলে নাগাল পাওয়া যায়। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থেকে সে বলল, “মানবজাতি কোনদিন সরল রেখার মতো কালের খাতার পাতায় টানা হয়নি। কোনো একজন মানুষ কোনদিন সর্ব মানবের সর্বময় নেতা হতে পারেন নি। তুমি আগে বাদল, তারপরে মানুষ। আগে খাঁটি বাদল হও, তার ফলে যদি মানুষের সভায় অগ্রাসন লাভ কর তবে সেটা হবে তোমার বৃহৎ ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি। নেতৃত্ব তোমার লক্ষ্য নয়, তোমার লক্ষ্যবেধের পুরস্কার। তোমার লক্ষ্য স্বপ্রকৃতির সীমার মধ্য থেকে সত্যকে পাওয়া ও সত্য হওয়া। আমারও লক্ষ্য তাই। তবে আমার পুরস্কার মানুষের হাতে নেই, আমার পুরস্কার হাতে হাতে।” এই বলে সুধী বিশ্ব-সৌন্দর্য ধ্যান করল।

তার ধ্যানের ছোঁওয়া বাদলের মনে লাগল। সে অভূতপূর্বভাবে বলল, “তোমার কথা শিরোধার্য করব, সুধীদা। বাদল হিসাবে খাঁটি হব। মানুষ যদি আমাকে অস্বীকারও করে তবু আমি মানবের দায়িত্ব বাদলের মতো বহন করব।”

সুধী সহাস্যে বলল, “আমার দায়িত্বটাও ?”

বাদল সভয়ে বলল, “তোমার দায়িত্ব কিসের ?”

“সৌন্দর্য উপাসনার। ছন্দ বর প্রার্থনার।”

“হেঁয়ালি রেখে সোজা কথায় বল।”

“আমার উপলব্ধির ভাষাই ভঙ্গীময়।”,

“তবে আমি তোমার দায়িত্ব নেব না।”

“নেবে না তো ? তা হলে যা তুমি বহন করবে তা মানব সকলের নয়, ইন্‌টেলেক্‌-

চুয়াল সম্প্রদায়ের। এই কথাটি মনে রেখ যে, একজনকেও যদি ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবে কোটীজন ফিরে চলে।”

একটি শিকার হাতছাড়া হলে মিশনারীর যেরূপ সন্তাপ উপস্থিত হয়, বাদলেরও হল সেইরূপ। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, “আচ্ছা।”

“তার মানে,” সুধী সকৌতুকে বলল, “সেই একজন বা এক কোটীজন renegade নয়। তাদের মার্গই স্বতন্ত্র। তোমার মার্গ ইন্‌টেলেক্‌টের। আমার মার্গ ইন্‌টুইশনের। এখন কেবল স্ব স্ব মার্গে নিষ্ঠাপর থাকতে হবে। এরই নাম সন্ধি।”

“তথাস্তু।”—বলে বাদল সুধীর ডান হাতটাতে ডানহাত মিলাল।

অনুসন্ধান

১

বিভূতি নাগের নিদ্রাভঙ্গ।

বেলা তখন প্রায় সাড়ে নয়টা। ইংলণ্ডের গ্রীষ্মকাল। সূর্যের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে রাত থাকতে। কাজের লোক কাজে লেগেছে। নিষ্কর্মারা টেনিস্ খেলছে। বিভূতিও কী একটা স্বপ্ন দেখতে ব্যস্ত ছিল, দরজার বাইরে বুড়ী বাড়ীওয়ালীর টোকা—এই নিয়ে তিনবার—তাকে হঠাৎ মনে করিয়ে দিল যে আজ নয়টার সময় একটা ক্লাস ছিল। সে চোখ বুজে কিছুক্ষণ হাতঘড়িটার উদ্দেশে বালিশের কাছটা হাতড়াল। তারপর চোখ মিটমিট করে দেখে নিল যে ইতিমধ্যেই ক্লাস বসে অর্ধেক পড়া সারা হয়েছে, বিভূতি যতক্ষণ কাপড় ছাড়বে ততক্ষণে বাকীটুকু-সারা হয়ে যাবে।

“হায়! স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে ছয় হাজার মাইল দূরে এসেও আমার পড়াশুনায় হেলা ঘটছে। অহো আপাতরমণীয় স্বপ্নমোদিত তন্দ্রা! অরে কপটমিত্রপ্রতিম ছদ্মবেশী আলস্য!” ইত্যাদি বহুবিধ আলাপ পূর্বক বিভূতি নাগ কিয়ৎকাল মুহুর্মুহু হাই তুলতে থাকল।

“সাড়ে নয়টা! দেরিতে ওঠার একটা সুবিধে এই যে, লাঞ্চ না খেলেও ভুঁড়ি ফাঁকা ঠেকে না। দেড় শিলিং বাঁচে। ছয় দিনে নয় শিলিং। ছেলে দুটোর জন্যে একবাক্স চকোলেট পাঠানো যায়। কিংবা রেখার জন্যে একটা কাপড়ের গোলাপ। অথবা মার্জরীর জন্যে—”

বিভূতির মনে পড়ল যে পুরুষমানুষ হয়েও সে মার্জরীর টাকা ধারে। অহো লজ্জা! দেশ থেকে যা আসে তাতে নিজের খাওয়া পরা কলেজের মাইনে পোষায় না। তাই মার্জরীকে সিনেমায় নিয়ে যাওয়া মার্জরীর কাছে ধার করে চালাতে হয়। টিকিট কেনবার সময় বিভূতি পার্সটা খুলে প্রত্যহ কাতরায়। বলে, “দুজনের পক্ষে যথেষ্ট আনতে ভুলে গেছি, মিস্ ব্যাড্‌টন্।” মার্জরী প্রবোধ দিয়ে বলে, “তাতে কী, মিস্টার ন্যাগ্। আমার

কাছে আছে।" বিভূতি তখন বাস্তববাদীর মতো বলে "উপায়ান্তর না দেখে ধারই করলুম, মিস্ ম্যাম্বটন।"

তারপর প্রোগ্রাম কেনা, চকোলেট কেনা, আইস্ কেনা—সবই ঋণং কৃত্বা। এমনি করে আড়াই পাউণ্ড আড়াই মাসে মার্জরীর কাছে দেনা। এছাড়া স্যুট কিনেছে ডোজ্‌রের কাছ থেকে পাঁচ গিনি পাঁচ সপ্তাহের কড়ারে কর্জ করে। ডোজ্‌রে চায়নি বলে প্রায় আট সপ্তাহ আটকে রেখেছে। ভূস্তলিকমের কাছ থেকে cash নয়, kind—অর্থাৎ টাকা নয়, চার টিন মাদ্রাজী সিগার। এ ছাড়া বাড়ীওয়ালীর চার সপ্তাহের বকেয়া দশ পাউণ্ড। এর জন্যে বাড়ীওয়ালীকে রোজ একবার বলতে হয়, "বাবা তার করেছেন টাকা জাহাজে করে পাঠিয়েছেন। রোস না, সব পাওনা এক সঙ্গে চুকিয়ে দেব, মিসেস রসেলি।" (ইটালিয়ান) সেই ময়লা কাপড় পরা বেঁটে থোঁড়া মূর্খ বুড়ী খাওয়ায় ভালো। খেয়ে ভারতবাসীর তৃপ্তি হয়।

স্বদেশী খাদ্য সুলভে খাবার শর্ত যে সরকারের রান্নার যোগান দেওয়া। অলস-কুঁড়ে বিভূতি উক্ত শর্তে সম্মত হয়নি। ফলে এখন মিসেস রসেলির দাক্ষিণ্যে ও কুঁড়েমির অব্যাহত অবকাশে দিন দিন বিভূতির নধরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেন এক হৃষ্টপুষ্ট পাঁঠা।

বিভূতি হাই তুলতে তুলতে ঘড়িতে দম দিল। ওয়ান, টু, থ্রি বলে বিছানার উপর উঠে বসল। কালীঘাটের কালীর একখানি পটকে তার সেই বেড-সিটিং রুমের পড়ার টেবিলের উপর দাঁড় করানো হয়েছিল। বিভূতি চোখ বুজে হাত জোড় করল, সেই সুযোগে আর একবার ঝিমিয়ে নিল। অবশেষে ঘুমের ঘোর কাটিয়ে সে যখন মেঝের উপর সত্যি সত্যি খাড়া হলো তখন তার প্রথম কর্তব্য হলো আয়নায় নিজের মুখ দেখা। বিভূতি বিশ্বাস করত যে ঘুম থেকে উঠে সর্বপ্রথম যার মুখ দেখবে তারই গুণাগুণ অনুসারে বিভূতিব সেদিনকার শুভাশুভ নির্ধারিত হবে। এই বিদেশে পরের বাড়ীতে কাকেই বা ভালো করে চেনে, কার গুণাগুণ সে ভালো করে জানে? অতএব ঘুম থেকে উঠে নিজের মুখখানি আয়নার সাহায্যে দেখে নেয়।

অন্যান্য দিন এটা শুধু একটা কর্তব্য পালন ছিল, কিন্তু আজ বিভূতি স্বগত ভাবে বলল, "কেন? আমি কি রূপে গুণে মন্মথ মিত্তিরের থেকে কম যাই? কালো? কালো তো ভালো। কৃষ্ণ কালো, কালী কালো, কোকিল কালো, তমাল কালো, আকাশ কালো, সাগর কালো। কালো জগতের আলো। হা হন্ত! মন্মথ না হয়ে আমি যদি ডলির স্বামী হতুম তবে আমারই তো হোটেল রাসেলে থাকবার কথা। আমাকে কেন ডলির বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে ঢুকতে হয়! বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে এত সমাদর, এত সেলাম, এতবার 'সার' সম্বোধন। স্বামী হয়ে থাকলে ঐ সজ্জিতদীপমালা সুচিত্রিতপ্রাচীর পুষ্পশোভিত প্রশস্ত প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট হয়ে অর্কেস্ট্রা কর্তৃক পরিবেশিত খাদ্যসুধা

ও সম্রান্ত ভৃত্যগণ কর্তৃক পরিবেশিত ভোজ্যপানীয় যুগপৎ আস্বাদন করে মানবজন্ম সার্থক করা যেত। যাক, ভলি যে আমাকে চা খেতে ডেকেছে এই আমার সান্ত্বনা।"

কিন্তু ভলিকে প্রতি-নিমন্ত্রণ করা যে অতীব অর্থসাপেক্ষ। মন্মথকেও বাদ দেওয়া যায় না। তিনি মন্দ ব্যারিস্টার না। আকবরের যেমন পাঁচ হাজারী দশ হাজারী মনসবদার ছিল, মন্মথও তেমনি ক্যালকাটা বার-এর তিন হাজারী। "Criterion"-এ চা খেতে ডাকলে যত খরচ হবে বিভূতি তা আন্দাজে হিসাব করে কার কাছে গোটা দুই পাউণ্ড ধার করবে সেই হতভাগ্যের নাম স্মরণ করতে লাগল। ইতিমধ্যেই সে লণ্ডনের বাঙালী মহলে সুপরিচিত হতে পেরেছে নিজগুণে; কোথাও কোনো পার্টির গন্ধ পেলে বিভূতি সেখানে যেমন করে হোক প্রবেশ লাভ করবেই এবং নিজের প্রলোভন দমন করে পরকে পরিবেশন করবার ভার নেবেই। অরবিন্দ পাকড়াশী, নবেন্দু সান্যাল, সিতাংশু বক্সী, অলীন্দ্র চন্দ ইত্যাদি বহু যুবকের সঙ্গে তার বেশ একটু অন্তরঙ্গতা হয়েছে বলতে হবে—অন্তরঙ্গতার অর্থ আড্ডায় বসে ওঁরা যদি মারেন রাজা ইনি মারেন উজীর। লেবার দল যদি জয়ী হয় তবে র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ড প্রধান মন্ত্রী হবেন কি হবেন জর্জ ল্যান্সবেরী, আইরিশ সুইপস্টেকের চেয়ে ক্যালকাটা সুইপস্টেকের সমাদর কম না বেশী, কে বড় অভিনেত্রী—সিবিল থর্নডাইক, না ইডিথ ইভান্স, এসব বিষয়ে বিভূতিরও নিজস্ব মতামত ছিল। ওরা যদি বলে, 'এসেছ তো এদেশে সবে সেদিন', বিভূতি পাল্টা শুনিয়ে দেয়, 'কই, এতদিন থেকেও তো তোমাদের বুদ্ধি-শুদ্ধি বিশেষ বাড়েনি, ল্যান্সবেরী কে বল লঅনসবেরী—মরি মরি কিবা উচ্চারণ।'

অন্তরঙ্গ সুহৃদদের নামগুলি নিয়ে স্মৃতির জপমালা গড়ায়, আর একে একে খারিজ করে। 'পাল বেটা ভয়ানক কৃপণ।'…'পাকড়াশীটা আমাকে গরীব বলে উপহাস করে।' …'দে সরকার সমস্ত কথা পেট থেকে বের করে নেবে।'…'চন্দটা এমনিতেই আমাকে দেখতে পারে না, উত্তমর্ণ হলে তো রাস্তার মাঝখানে অপমান করবে।'

শেষ থাকল চক্রবর্তী। হাঁ, চক্রবর্তীর কাছে চাইলে পাওয়া যাবে ঠিক। চক্রবর্তীর কাছেই যেতে হবে দেখছি। আর ভারি তো দুটো পাউণ্ড। দেশে খুব বেশী মনে হয়, এ দেশে কেউ গ্রাহ্যই করে না। পেনীগুলো তো পয়সার মতো অস্পৃশ্য তাম্রখণ্ড।

২

বিভূতিকে চায়ে ডাকার মধ্যে কৌশাম্বীর নিগূঢ় উদ্দেশ্য কী ছিল তার স্বামীর পক্ষে সেটা অনুমান করা সম্ভব ছিল না। তিনি বিভূতিকে চিনতেন না ও তার ইতিহাসও জানতেন না। তবু তাঁর মতো উঁচু দরের লোক বিভূতির মতো অজ্ঞাতকুলশীল ছাত্রবিশেষের সঙ্গে চা খাবেন, এ যে প্রশ্নাতীত। তিনি অবজ্ঞার সহিত বললেন, "ডিয়ার, তুমি আমাকে মাপ

কর। আমি যাচ্ছি আমার সেই প্রিভি কাউন্সিলের মামলার তদ্বির করতে। ফিরতে দেরী হবে।"

কৌশাম্বী সরল বিশ্বাসে বলল, "অলরাইট, ডারলিং।"

কৌশাম্বী যখন খুব ছেলেমানুষ ছিল—বেশী দিন আগে নয় কিন্তু—বিভূতিকে সে কী চক্ষেই যে দেখল, বিভূতিদের বাড়ী গিয়ে তার মাকে প্রণাম করে বলল, 'আপনি আমার মা', আর তার বাবাকে প্রণাম করে বলল, 'আপনি আমার বাবা।' তাঁরা এর রহস্যভেদ না করতে পেরে ভয়ে উচ্চবাচ্য করলেন না। বিভূতি এখনও মোটের উপর সুপুরুষ; তখনকার দিনে তার শরীরে মেদবাহুল্য না থাকায় সে ছিল কৃষ্ণের মতো সুদর্শন। অবশ্য বাংলার কৃষ্ণ। নবনীতকোমল, স্নিগ্ধ, নিস্তেজ। এক কথায় পৌরুষহীন সুপুরুষ। আর কৌশাম্বীর তখন সেই বয়স যে বয়সে পৃথিবীর সকলেই আপন, কেউ পর না, সকলেই সমান, কেউ নীচ নয়, সকলেই ভালো, কেউ খারাপ নয়। আদর্শবাদের তাপ লেগে তার হৃদয় মোমের মতো গলে পড়ছিল, সেই তরল মোম দিয়ে সে মনে মনে বিভূতির যে মূর্তি গড়ল তা কেবল সুপুরুষের নয়, বীরপুরুষের, রূপকথার রাজপুত্রের, রোমান্সের ল্যান্সলট-এর, পুরাণের পার্সিউসের, ইতিহাসের নেপোলিয়নের। বিভূতিতে সে বীরত্ব আরোপ করে মনে মনে ভবিষ্যদ্বাণী করল যে, এই বীর বিংশ শতাব্দীর ভাগ্যবিধাতা এবং একে আবিষ্কার ও অধিকার করবার গৌরব একা কৌশাম্বীর।

একদিন দুপুরবেলা নিজের ঘরে বিভূতি আছে ঘুমিয়ে, কৌশাম্বী কখন এসে তার পাশে বসে পাখা হাতে করে হাওয়া করছে। বিভূতি যেই পাশ ফিরল অমনি পাখার ঘায়ে তার ঘুম হলো জখম। সে চোখ মেলে দেখল, কৌশাম্বী ওরফে ডলি, ক্যাপটেন গুপ্তর সেই মেয়ে যিনি তার প্রতি কত বার অযাচিত করুণা প্রদর্শন করে তাকে জিজ্ঞাসু করে তুলেছেন। তাঁকে এমন স্থানে, কালে ও ভাবে প্রত্যাশা কিংবা আশা করেনি বিভূতি। তার মনে হল সে স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু পাখার ঘা লেগে তখন তার নাক জ্বালা করছিল। সে সচমক উঠে বসল ও থতমত খেয়ে যে ভাষায় কথা বলল তার বর্ণমালায় মাত্র একটি অক্ষর—"গা—গা—গা—গা—গা—"

তার দাঁতকপাটি লাগল, তার ঘন ঘন স্বেদ ও কম্প হল, সে মাথা ঘুরে তক্তাপোষ থেকে উল্টে পড়ল। সবশুদ্ধ একটা রোমহর্ষক কাণ্ড।

তার মা ও দিদিরা ছুটে এলেন ও কৌশাম্বীকে পাখা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। একজন জল আনতে ছুটলেন, একজন কৌশাম্বীর কাছ থেকে সবিনয়ে পাখাটি ভিক্ষা করে নিলেন, একজন গেলেন ডাক্তারকে ডাকতে যে চাকর যাবে তাকে ডাকতে।

কৌশাম্বী বহুক্ষণ হতভম্বভাবে থাকল, তারপরে তার বোধ-শক্তি ফিরে এলে সে অত্যন্ত অপদস্থ বোধ করল, তার মুখে কথা ফুটল না, সাফাই দিতে তার অপ্রবৃত্তি হল, সে দৃপ্ত পদক্ষেপে বাহির হয়ে গেল। তখন তাকে প্রসন্ন করবার জন্তে তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন স্বয়ং বিভূতির মা, কিন্তু ততক্ষণে সে হাতা পেরিয়ে অন্তঃপুরিকার নাগালের বাইরে।

ঘটনাটা চাপা রইল না। অনেক কান দিয়ে মিসেস গুপ্তের কানে পৌঁছল অতিরঞ্জিত আকারে। তিনি কন্তাসহ কলকাতা চললেন পাত্রান্বেষণে। মন্মথ সেই সময় সহসা বিপত্নীক হয়ে সোসাইটিতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন। এতদিন তিনি দিব্যি নিরীহ ভদ্রলোকটি ছিলেন, তাঁর টাক ও টাকা সমানে ও সবেগে বেড়ে চলেছিল, কেউ কোনো দিন কল্পনা করেনি যে তিনি তাঁর স্ত্রীর স্বামী ছাড়া অন্ত কোনো মানুষ। অকস্মাৎ হাওড়া পুলের নীচে সোনার খনি আবিষ্কৃত হল। অতি সাধারণ মন্মথ মিত্র হলেন একজন অতি স্পৃহণীয় পাত্র। বিবাহযোগ্যা মেয়েদের তাঁর প্রতি ব্যবহার গেল আবেগের সহিত বদলে, ওল্ড মেডদের কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য কমনীয়তা উজ্জীবিত হল, কন্তার পিতামাতা তাঁর উপর বাৎসল্যভাবাপন্ন হয়ে উঠলেন, যদিচ তিনি তাঁদের কারুর কারুর সমবয়সী ও সতীর্থ। মিসেস গুপ্তকে যে মন্মথ এতকাল 'তুমি' বলে আসছিলেন সেই মন্মথকে তিনি ডাকতে শুরু করলেন, 'বাবা মন্মথ।' তাঁর উপরোধে মন্মথ কৌশাম্বীকে বাগদান করলেন ও কৌশাম্বীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে করলেন বিয়ে। একজোড়া ছেলেমেয়ে ছিল তাদের পৌঁছিয়ে দিলেন তাদের দাদামশাইয়ের বাড়ীতে। গৃহসংসারের রুটিন কয়েক মাসের ব্যবধানান্তে জোড়া লাগল। মিত্র মহাশয় কাজের লোক, তিন হাজারী। প্রিয়ার কুঞ্জে কুহু কুহু করবেন কখন? তাই তাকে কিনে দিলেন একখানা তকতকে মোটরকার আর তার নামে খুলে দিলেন দশ হাজার টাকার ব্যাঙ্ক য়্যাকাউণ্ট। সে চৌরঙ্গী উজাড় করে বালিগঞ্জে প্রদর্শনী বসাল। সামাজিকতার আবর্তে পড়ে সে এমন ঘুরপাক খেল যে অসুখ বাধিয়ে গেল সিমলায় দিদির বাড়ী চেঞ্জে। সেখানে বড়লাটের সঙ্গে লাঞ্চ খেয়ে, জঙ্গীলাটের সঙ্গে ডিনার খেয়ে ও হোম মেম্বারের সঙ্গে নেচে তার অসুখ হল ক্রনিক। তাই তাকে আনতে হয়েছে লণ্ডনে। Court-এ presented না হওয়া পর্যন্ত তার মৃত্যু নেই। অন্তত তার স্বামী তাই মনে করেন।

"গুড ইভ্‌নিং, মিস্টার স্ন্যাগ। হাউ ডু ইউ ডু?" কৌশাম্বীর গলা থেকে তিন রকম সুর এক সঙ্গে নির্গত হচ্ছিল।

বিভূতি কী বলল শোনা গেল না। বোধ হয় গদগদ ভাবে বলছিল, "থ্যাঙ্কস ভেরি মাচ।"—কথাটা সে লণ্ডনে এসে প্রথম দিনেই কোনো এক সিগরেটের দোকানে শুনে মুখস্থ করেছিল।

কৌশাম্বী যতক্ষণ চা ঢেলে দিচ্ছিল বিভূতি ততক্ষণ এক দৃষ্টিতে চায়ের স্রোত নিরীক্ষণ করছিল। ভাবছিল, সেই একই চা অথচ হোটেল রাসেলের পট থেকে ঝরছে কী অপরূপ ভঙ্গীতে, কী বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত করে।

চারিদিক চেয়ে বিভূতি যেন স্বর্গরাজ্যে ইন্দ্রত্ব ভোগ করল। ডলিকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি Ritz Hotel-এ উঠলেন না কেন?" (বিভূতি তা হলে সপ্তম স্বর্গে বিচরণ করত।)

ডলির নিজের মনেও সেই ক্ষোভ ছিল। হোটেল রাসেল কী-ই বা হোটেল। যত মাঝারি মানুষ আনাগোনা করে। দরও এমন কিছু অপূর্ব নয়। যে সে লোক গিয়ে উঠতে পারে। স্বামীর উপর কৌশাম্বীর অভিমান বিভূতির কথায় ফাঁপিয়ে উঠল। তার চোখে এক ফোঁটা জল সন্ধ্যাকাশে একটি তারার মতো ঝক ঝক করতে থাকল।

বিভূতির বড় সরল মন। সে ভাবল, ডলি বোধ করি এই বিবাহে সুখী হয় নি। বিভূতির স্বভাব, সে যা ভাবে তাই বলে। সে আর্তকণ্ঠে বলল, "মিসেস মিটার, আমার জ্ঞাপন করবার অধিকার নেই, তবু মনে হয়, আপনি এ বিবাহে সুখী হন নি।"

বিভূতির উপর কৌশাম্বীর যে ক্রোধ এই কয়েক বছর ধূমায়িত হচ্ছিল এই অনধিকারচর্চায় তা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। কৌশাম্বী যেন বিভূতিকে চক্ষু দিয়ে ভস্মসাৎ করবে, এইরূপ বোধ হল। কিন্তু লোকটা এমন গোবেচারি, এত গরীব যে কৌশাম্বীর ক্রোধাগ্নি খড়ের আগুনের মতো দেখতে দেখতে নিঃশেষে নিবে গেল। এই লোকটি তাকে নিজের সঙ্গে জড়ায়নি বলে এর প্রতি সে প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা বোধ করল।

"মিস্টার গ্যাগ," সে জিজ্ঞাসা করল, "মিস্টার চক্রবর্তীকে তো আপনি ভালো করেই চেনেন। তাঁর কি কোনোরকম occult ক্ষমতা আছে? তিনি কি হাত দেখে ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন?"

"বলতে পারলুম না, মিসেস মিটার।" বিভূতি চোখ নামিয়ে চিন্তা করতে করতে মাথা নাড়ল। "তবে তিনি একজন মিষ্টিক বলে আমরা সবাই তাঁকে মান্য করি।"

"তাঁর সঙ্গে দেখা আবার হবে কি না জানিনে," কৌশাম্বী বলল, "হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতুম আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি কী জানেন।"

"আপনি যদি অনুমতি দেন," বিভূতি বলল, "তবে আমিই ঐ প্রশ্নের উত্তর তার কাছ থেকে এনে দেব।"

"How nice of you!" কৌশাম্বী উঠে দাঁড়াল। তার রঙচঙে scarf-খানাকে বাঁ হাত দিয়ে সামলে বিভূতির দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। "গু-ড বাই।" আবার সেই তিন রকম সুর।

বিভূতি যেন হনুমান, সীতার সংবাদ তাঁকে এখনি এনে দিতে হবে। খুব ব্যস্তসমস্ত

হয়ে করমর্দন পূর্বক বলল, "গুড বাই। কিন্তু আপনাকে কালই আমি ফোন করে জানাব।"

চলে যাচ্ছিল, কী মনে করে ফিরে দাঁড়াল। বলল, "ভালো কথা। আমি যদিও দরিদ্র ছাত্র, তবু আপনারা কৃপা করে আমার সঙ্গে পিকাডিলীতে একদিন চা খেলে—"

"Don't trouble yourself," কৌশাম্বী মাথাটা কাৎ করে একান্ত নম্রতার ভান করল, "আমাদের প্রায় সব কটা অপরাহ্ন booked. যদি লণ্ডনে আমাদের স্থিতিকাল বর্ধিত হয় তবে তখন দেখা যাবে।" এই বলে সে মুখ ফেরাল।

৩

তুচ্ছ দুটা পাউণ্ড ব্যয় করে নষ্ট করবার সুযোগ বিভূতিকে দিল না—ডলিটা এমন হৃদয়হীনা। তা হোক, বিভূতির সংকল্প যেমন করে হোক ডলির জন্যে সে দুটো পাউণ্ড উড়িয়ে দেবেই। ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। উপায় চিন্তা স্থগিত রেখে আপাতত সেই ইচ্ছার রসদ সংগ্রহ করতে চলল।

সুধী বলল, "নাগ যে। হঠাৎ কী মনে করে এতদূর আসা হলো?"

বিভূতি কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "জিনিসপত্র গোছাচ্ছেন। কোথাও যাচ্ছেন নাকি?"

"হাঁ", সুধী পোষাক ভাঁজ করতে করতে বলল, "যেতেই হবে দেখছি দিন কয়েকের জন্যে।"

"কিন্তু কোথায়?"

"প্রথমত ভেণ্টনর। ওয়াইট দ্বীপ।"

বিভূতি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করল। "আপনারাই ভাগ্যবান, আপনাদের টাকা আছে, আমরা তো এই লণ্ডনে থাকবার খরচ জোটাতে পারছিনে।"

সুধী জিজ্ঞাসা করল, "কেমন চলছে?"

বিভূতি দরদী শ্রোতা পেয়ে বলল, "আর চলা! কেন যে আমরা লণ্ডনে আসি! কে যেন বলেছেন আমি চল্লিশ বছর লণ্ডনে আছি, কিন্তু লণ্ডনের সমস্ত পাড়া দেখিনি। আমারও হয়েছে সেই দশা। কত দেখবার আছে, কত শেখবার আছে, কত ভাববার আছে, কত চাখবার আছে—"

"কী? কী?"

"বলছিলুম কত দেশের খাবার জিনিস এই একটি শহরে পাওয়া যায়—চীনা, জাপানী, তুর্কী, আফগান, রাশিয়ান, জার্মান, হাঙ্গেরিয়ান, বলকান, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ। প্রত্যেক রেস্তরাঁতে যদি একবার করে খাই তবে সুকুমার রায়ের কথায় বলতে পারব, 'কত কী

যে খায় লোক নাই তার কিনারা।' কিন্তু (মধ্যম আঙুলের সঙ্গে বুড়া আঙুল ঠেকিয়ে টঙ্কার পূর্বক) হাতে নেই সর্বার্থ সাধিকা।"

সুধী মুচকে হাসল। বলল, "পড়াশুনার কী খবর ?"

"পড়াশুনা," বিভূতি বলল, "মনের এ অবস্থায় কখনো হয় ? আর পড়াশুনা করেই বা কী হবে! বুর্জোয়া গবর্নমেণ্ট কজনকে চাকরী দিতে পারবে ? অনর্থক আত্মাকে কষ্ট দিয়ে বই মুখস্থ করা, পরীক্ষাস্থলে সীতার মতো অগ্নিপ্রবেশ, গেজেটে বলিদান। এই সব দেখে শুনে ও অনেক চিন্তা করে," বিভূতি Rodin-নির্মিত ভাবুক মূর্তির মতো হাতের উপর চিবুক রেখে বলল, "আমি কমিউনিজমে আস্থাবান হয়েছি। স্টেট থেকে দেবে খেতে পরতে সিনেমা দেখতে পরিবার শুদ্ধ সবাইকে। এরই নাম gospel of freedom !"

মার্সেল কখন এসে দরজার ওধার থেকে উঁকি মারছিল। বিভূতির দৃষ্টি এড়াবার জন্তে সরে সরে যাচ্ছিল। বিভূতি ওকে হঠাৎ দেখে হাতছানি দিল। "Come in ! Come in ! (সুধীকে) কী নাম ?"

"মার্সেল !"

"মার্সেলস ! মার্সেলস ! আমি তোমার কাকা। এস, চকোলেট দেব। এস ! মার্সেলস—"

"মার্সেলস" কি আসে ? সে যেন ভূমধ্য সাগরকূলে প্রত্যাবর্তন করল। তাকে দরজার আনাচে কানাচে দেখা গেল না। বিভূতির ধারণা ছিল শিশু মহলে ওর অসীম রঞ্জনশক্তি। মার্সেলের উপর বিরক্ত হয়ে সে সুধীকে বলল, "ভালো কথা, চাকারবাটী। আপনি তো ডলিকে চেনেন—ডলি মিটারকে।"

"হাঁ, সেদিন আলাপ করে আসা গেল।"

"ডলির বিশ্বাস," বিভূতি ঢোক গিলে বলল, "ডলির বিশ্বাস আপনি মানুষ দেখে তার ভূত ভবিষ্যৎ বলতে পারেন। মেয়েলি কুসংস্কার তা কি আমি বুঝিনি ? তবু কী করি বলুন, ডলির আজ্ঞা, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে আসা," আবার ঢোক গিলে, "জিজ্ঞাসা করতে আসা আপনি তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কী জানেন, অর্থাৎ—অর্থাৎ" শেষ করতে পারল না। কেবল 'অর্থাৎ,' 'অর্থাৎ'ই করতে থাকল।

সুধীর তখন হাতে সময় ছিল না বেশী। সে কী কী বই সঙ্গে নিয়ে যাবে মনে মনে তার একটা তালিকা করছিল। ডলির জিজ্ঞাসায় আশ্চর্য হয়ে তালিকার কথা ভুলে গেল। কিছুক্ষণ পরে তার মুখে হাসি ফুটল। বলল, "দেখুন, মাথা ব্যথা করছে কি না এই তথ্যটুকু জানাবার জন্তে ডাক্তার দাবী করে ফী। আর আমি জানাব তার চেয়ে অনেক বেশী দুর্জ্ঞেয় তথ্য—আমার বুঝি ফী নেই !"

বিভূতি এ কথা ভাবেনি। বরং ভেবেছিলে সুধী বলবে, 'আমি কী জানি ! আমাকে

জিজ্ঞাসা করা ভুল।' ভেবাচেকা খেয়ে বলল, "মাই গড। আপনি তাহলে সত্যিই occultist! আমার মতো গরীব ছাত্রের কাছেও কি ফী চার্জ করেন?"

সুধী রগড় দেখবার জন্যে বলল, "কেন? আপনিও কি নিজের ভবিষ্যৎ জানতে চান?"

বিভূতি সখেদে বলল, "কে না চায় বলুন। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য গণৎকার না পেলে অনর্থক অর্থনাশ তথা মনঃপীড়া।"

"আপনি," সুধী বলল, "হলেন আমার বন্ধুলোক। আপনার কথা আলাদা। কিন্তু মিসেস মিটারকে বলবেন ফী না নিয়ে আমি অদৃষ্ট গণনা করিনে।"

বিভূতি বলল, "তা তো ঠিকই। সকলে তো আপনার বন্ধুলোক নয়। হোটেল রামেলে থাকে, কেন দেবে না শুনি? ফী না দেয় গোটা দুই ডিনার তো দিতে পারে!"

"আমি যে নিরামিষাশী!"—সুধী বলল।

"নিরামিষাশী! তাই তো! কী আফসোসের বিষয়!" যেন বিভূতির নিজের ডিনার ফস্কে গেল। সে দার্শনিকের মতো বলল, "থাক। নগদ টাকার অনেক সুবিধে। ইচ্ছা করলে আপনি রোজ সিনেমা দেখতে পারবেন। সেটা অবশ্য নির্ভর করছে আপনার ফী কত তার উপরে।"

"বেশী নয়," সুধী কপট গাম্ভীর্যের সহিত বলল, "প্রত্যেক তথ্যের জন্যে তিন গিনি।"

"তি—ন গিনি!" বিভূতি সহর্ষে বলল, "মাই গুডনেস!" (এটা মার্জরীর কাছে শেখা)। "হা—হাআআ।" (এটাও বিলিতী হাসি)। "ইচ্ছা করছে আপনার পার্টনার হয়ে বিরাট ব্যবসা ফেঁদে বসতে। রিজেন্ট স্ট্রীটে দোকান। চাকারবাটী এণ্ড স্ত্যাগ। ওরিয়েণ্টাল কর্চুন টেলার্স।"

সুধী বলল, "ও যে ক্যাপিটালিজম।"

বিভূতি বলল, "বিষে বিষক্ষয়। গরীবকে যারা শোষণ করে সেই সকল বড়লোককে প্রতিশোষণ করতে হবে। চাকারবাটী এণ্ড স্ত্যাগ। অদৃষ্ট গণনা করবেন চাকারবাটী। ফী গণনা করে খাতায় তুলবে স্ত্যাগ। কোথায় লাগে আই-সি-এস। রিজেন্ট স্ট্রীটের সঙ্গে ড্যালহৌসী স্কোয়ার।"

সুধীর সাড়া না পেয়ে বিভূতি তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, "আপনার কোনো ভাবনা নেই, চাকারবাটী। আমি বাড়ী ভাড়া করতে, আসবাব দিয়ে সাজাতে, টেলিফোনের বন্দোবস্ত করতে, কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে, ব্যাঙ্কে য়্যাকাউণ্ট খুলতে, আয়ব্যয়ের হিসাব রাখতে—সংক্ষেপে ম্যানেজমেণ্ট-এর ভার নিতে প্রস্তুত। আপনি কেবল সম্মতি দিলে হয়।"

সুধী উঠে বলল, "দেখুন, আমাকে একটা ট্রেন ধরতে হবে। ব্যবসায় সংক্রান্ত কথা-

বার্তার সময় এটা নয়। তা ছাড়া অমন ব্যবসায় আমি করব না। কেন করব না তার কারণ আমি বাস্তবিক দৈবজ্ঞ নই, আপনাকে পরীক্ষা করছিলুম। ক্ষমা করবেন।"

অপদস্থ হয়ে বিভূতি মনে করল তার খুব রাগ করা উচিত। কিন্তু রাগ করা তার পক্ষে ভয়ানক দুঃসাহসের কাজ। সে স্বভাবত অলস, ভীতু, শান্তিপ্রিয়। শরীরও তার এক তাল জেলির মতো থল থল করছে, এত নরম যে তাত লাগলেও সে গরম হয় না। তারপর তার মনে পড়ল যে সে এসেছে দুটো পাউণ্ড ধার করতে। রাগ করলেও প্রকাশ করা সমীচীন নয়। সে হি হি করে একটু হাসল। বলল, "বেশ রসিকতা করলেন যা হোক। জুন মাসে এপ্রিল ফুল বানিয়ে ছাড়লেন। চললেন? কিন্তু আপনার কাছে আমার নিজের একটু কাজ ছিল। যদি গোটা দুই পাউণ্ড ধার দিতে পারেন। আমি এই সামনের মাসেই—বুঝলেন?" কথার শেষাংশটুকু তার মুখে আটকে গেল।

চেক্‌বুকখানা পকেট থেকে বের করে সুধী তৎক্ষণাৎ তার প্রার্থনা পূরণ করল। তারপর সকলের কাছে বিদায় নিতে গেল। মার্সেল তো কাঁদতেই লাগল। সুধী যত বলে সাত দিনের মধ্যে ফিরে আসব, মার্সেল কান্নার সুরে বলে, "না। যেতে দেব না।" অবশেষে এই শর্তে মীমাংসা হলো যে সুধী "কাল" ফিরে আসবে ও একটা বড় পুতুল আনবে। সুধী তাকে একবার কোলে নিল ও কোল থেকে নামিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

এদিকে পাউণ্ড দুটো এত অনায়াসে পেয়ে বিভূতির আহ্লাদ হয়েছে। মার্সেলকে দুই হাতে জাপটে ধরে বলল, "মার্সেলস, তুমি কী পেলে খুশি হও, বল। আমি কিনে দেব।"

মার্সেলটা নিতান্ত অরসিকের মতো কান্না জুড়ে দেওয়ায় বেচারা বিভূতি এবার এক ঘর মানুষের সামনে অপদস্থ হল। তার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে সুজেৎ তার হাত থেকে মার্সেলকে আস্তে ছিনিয়ে নিল ও ফিস্ ফিস্ করে মিষ্টি ধমক দিয়ে ঠাণ্ডা করল।

সুধী বলল, "মঁসিয়ে ও মাদাম দুপোঁ, মাদ্‌মোয়াসেল্ সুজেৎ, মনঁ ফাং মার্সেল,—Au revoir।"

তারাও সমবেত স্বরে বলল, "Au revoir। Au revoir।"

৪

উজ্জয়িনী যেখানেই থাকুক বিশ্বপতির স্নেহ তাকে পরম যত্নে রক্ষা করছে, তাকে আহারের সময় আহার্য ও বিশ্রামের সময় আশ্রয় দিচ্ছে। উজ্জয়িনী ভক্তিমতী, ভক্তের প্রতি দায়িত্ব ভগবানের আপনার। সুধী কেন অকারণে উদ্বিগ্ন হয়ে চিত্তের প্রশান্তি বিপন্ন করবে?

তবু তার বুকের উপর পাষাণ চেপে রইল, অহেতুক বেদনার স্থূল গরিষ্ঠ আকার

তাকে বিস্মৃতির সুযোগ দিল না। কতই বা উজ্জয়িনীর বয়স, কী-ই বা তার সাংসারিক অভিজ্ঞতা, ধূর্ত শঠদের সহিত কবেই বা তার পূর্ব পরিচয়। সাধুবেশী দুরাত্মার দ্বারা ধর্ষিত হয়ে হয় প্রাণ নয় মান—হয়তো দুই-ই—হারিয়ে বসবে। ভগবান তো তাঁর ভক্তদের সংকটে ফেলতে পারলে আর কিছু চান না, বেচারিদের সর্বনাশ হলে তিনি মনে করেন সর্বস্বলাভ হল। এদিকে আমরা তাদের আত্মীয়রা যে তাদের দুর্দশা চোখে দেখতে পারিনে।

সুধী এতদূর থেকে কী আর করতে পারে। প্রার্থনা ছাড়া। দেশে গিয়ে অনুসন্ধান করতে পারত, কিন্তু অনুসন্ধান কি মহিমচন্দ্র করছেন না, মিসেস গুপ্ত করছেন না, পুলিশের লোক করছে না? অনুসন্ধান তো উজ্জয়িনীর অনীপ্সিত। সে যদি ধরা পড়ে তো খাবে বকুনি ও হবে বন্দিনী—তার আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান তাতে হবে না। বরঞ্চ উজ্জয়িনীকে কিছুকাল অনুসন্ধানের দ্বারা উত্ত্যক্ত না করে ঠেকতে ও ঠকতে দেওয়াই তার পক্ষে কল্যাণকর। দায়ে পড়লে তার মতো বুদ্ধিমতী পুলিশের দ্বারস্থ হবে এটা ধরে নিতে পারা যায়।

আপাতত এই বৃহৎ সংসারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটুক, মানুষের নানা মূর্তি সে মূল্য দিয়ে দর্শন করুক, দুঃখ সুখের হিসাব সে স্বীয় উপলব্ধির দ্বারা নিক। এই বৃহৎ সংসারে একদিন সংসারী হবার জন্যে সুধী যখন তাকে প্রবর্তিত করবে তখন সে অন্ধের মতো সংসারে প্রবেশ করবে না, স্বামীর উপেক্ষা বা পিতার মৃত্যু জাতীয় নগণ্য ঘটনা তার সংসার ত্যাগের উপলক্ষ্য হবে না।

উজ্জয়িনীর চেয়ে বাদলের জন্য আশঙ্কা বেশী। অনবরত মস্তিষ্ক চালনা ও তার আনুষঙ্গিক অনিদ্রা মিলে বাদলের দেহের ও মনের স্বাস্থ্য হরণ করতে পারে। বাদল ছেলেটা একরোখা। তার বাড়াবাড়িতে বাধা দেবার জন্যে তার একজন অভিভাবক দরকার। তাকে নিছক সঙ্গ দেবার লোক না থাকলে সে হয়তো পাগল হয়ে যেতে পারে। লণ্ডন শহরে থাকা তার পক্ষে নিরাপদ ছিল। সেইজন্যে সুধীও ছিল তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। ওয়াইট দ্বীপ কেমন তা সুধী দেখেনি। কত বড় তাও সুধী জানে না। মফস্বলে বাদল মনের মতো সঙ্গীও পাবে না, মিসেস উইল্‌সের মতো মুরুব্বিও পাবে না—অন্তত সুধীর তাই বোধ হয়।

ভেণ্ট্‌নরে পৌঁছে সুধীকে বাসার জন্যে কিছু বেগ পেতে হলো। ভেণ্টনরে তখন লোকারণ্য আর সেও তার গলা-বন্ধ কোট ও হিন্দুস্থানী টুপি ত্যাগ করবে না। নইলে ইংলণ্ডের লোকের যে সূক্ষ্মদৃষ্টি তাতে সে স্বচ্ছন্দেই আমেরিকান কিংবা ইটালিয়ান বলে জায়গা পেয়ে যেত। যা হোক একটি ছোট বোর্ডিং হাউসের কর্ত্রী তাকে দেখে আমোদ পেলেন কি না তিনিই জানেন কিন্তু চশমার নীচে তাঁর চোখ দুটি থেকে কৌতুক বিচ্ছুরিত

হয়ে তাঁর গোলগাল মুখখানির উপর চারিয়ে গেল। তিনি শুধালেন "ইণ্ডিয়ান ?" সুধী বলল, "হাঁ।" তখন তিনি এমন ভাবে হাসলেন যেন তিনি দেখেই চিনেছেন।

চা খেয়েই সুধী সমুদ্রকূলে গিয়ে বাদলের জন্যে দৃষ্টি পেতে রইল। সমুদ্র সেদিন ভালো করে দেখা হল না। অগণ্য মানুষ। তাদের নানা বয়স, নানা বেশ, নানা প্রমোদ। কিন্তু তাদের মধ্যে এই একটি ক্ষীণকায় ভারতবর্ষীয় তরুণ—রং ভারতীয়দের পক্ষে ফরসা, চোখে বড় বড় চাকার মতো চশমা, পৃষ্ঠদেশ ঈষৎ বক্র, চলন বেগবান, অঙ্গভঙ্গীতে অন্যমনস্কতার ছাপ। কতকাল বাদলকে দেখেনি, আজ দেখতে পাবে বলে সুধীর বড় আশা ছিল।

বাসায় ফিরে সে সাপার খেল যে ঘরে সেটার আকারের ক্ষুদ্রতার দরুন সকলে একটা বড় টেবিলের চারিদিকে বসে খাচ্ছিল, সুধীও তাদের দলে তাদেরই একজন হলো। সুধী বলে রেখেছিল যে, সে নিরামিষাশী, তাকে রুটি মাখন, সিদ্ধ আলু, কাঁচা টুমাটো, পুডিং, ফল ও দুধ দিলেই তার পক্ষে যথেষ্ট হবে। টেবিলে যখন এই সব জিনিস রাখা হলো ও সুধী একে একে এই সব খেতে লাগল তখন একটি মহিলা অন্যান্যদের সঙ্গে কথাবার্তার মাঝখানে হঠাৎ সুধীকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, "আপনাকে স্টেক্ দিতে ভুলে গেছে—যঁ্যা।"

সুধীর হয়ে মিসেস ভাড্‌লী (কর্ত্রী) উত্তর দিলেন, "উনি নিরামিষাশী।"

মুহূর্তকাল সকলে নির্বাক। তারপর একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "আমি জানি, আমি জানি।"

তিনি যে কী জানেন তাই জানবার জন্যে অনেক জোড়া চোখ এক সঙ্গে তাঁর মুখের অভিমুখবর্তী হলো।

তিনি বললেন, "আপনি একজন বৌদ্ধ লামা।"

সে যে কী অপূর্ব বস্তু তাই অনুমান করে সকলে চমকে উঠে সুধীকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

সুধী বললে, "বৌদ্ধ লামা নই, আমি একজন ভারতীয় ছাত্র। নিরামিষ আহার ইংরেজরাও কেউ কেউ পছন্দ করে থাকেন।"

তাই নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চলল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমিষ খেতে খেতে বললেন, "আমি জানি, আমি জানি।" ক্রমশ সুধীর উপর থেকে কৌতূহল দৃষ্টি অপসারিত হলো ও বিষয়টারও পরিবর্তন হলো। কেবল মিস্ মার্শ বলে একটি অবিগতযৌবনা মহিলা সুধীকে আপ্যায়ন করতে লাগলেন। "আপনাকে আরো কিছু দুধ দিতে বলব কি ? আপনি কি চীস্‌ও খান না ?"

সুধী বলল, "না, ধন্যবাদ। বাছুরকে মেরে তার পাকস্থলী থেকে রেনেট তুলে নিয়ে

তার সাহায্যে দুধ থেকে হয় দধি (curds) এবং দধি থেকে চীস্। বাছুরের মাংস যখন খাইনে তখন চীস্ খাওয়া কি যুক্তিসঙ্গত হবে ?"

"কিন্তু," মিস্ মার্শ বললেন, "মিস্টার চক্রবর্তী, সব চীস্ তো ঐ উপায়ে হয় না। ক্রীম চীস্ খেতে আপত্তি কি ?"

"আপত্তি," সুধী হেসে উত্তর দিল, "এই যে, ও জিনিস আপনি নিজে তৈরি না করলে আমি খাব না, এবং আপনি নিজে—কিংবা মিসেস ডাড্‌লী, আপনার বোন—কেন কষ্ট করে তৈরি করবেন ?"

"না, না, কষ্ট কিসের". মিস্ মার্শ তাঁর স্বর্ণখচিত দন্তপংক্তি বিকশিত করলেন, "কষ্ট কিসের ? আমি কালই তৈরি করে পরশু আপনাকে দেব।"

সুধী এই অহেতুক অনুকম্পার হেতু না পেয়ে ঠাওরাল, তাকে এই বোর্ডিং হাউসে দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্যে এটা একটা কৌশল। ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, "দেখা যাক কয় দিন এই শহরে থাকতে হয়।"

"কেন ?" সবিস্ময়ে মিস্ মার্শ প্রশ্ন করলেন, "এই শহর কি আপনার মনে ধরছে না ? আচ্ছা, আমি আপনাকে দ্রষ্টব্যস্থানগুলি নিজে দেখিয়ে দেব। বছরে এত সূর্যালোক ইংলণ্ডের অন্য কোনো শহর পায় না। আর এমন ধাপে ধাপে সমুদ্র থেকে আকাশের দিকে উঠে গেছে কোন শহর ?"

৫

যদিও বালকের মতো অনিদ্রারোগীকে ভোর বেলা সাগরতীরে পদচারণ করতে দেখা সম্ভবপরতার অতীত, তবু সুধী জীবনে একবার জুয়া খেলবে ভাবল—কে জানে হয়তো বাদলের অনিদ্রা সেরে গেছে ও সে প্রাতর্ভ্রমণে অভ্যস্ত হয়েছে।

Esplanade-এ তখন লোক সমাগম হয়নি। কেবল তারই বয়সের কতিপয় যুবক-যুবতী স্নানের আয়োজন করছে। বালুর উপরে সারি সারি কাঠের তাঁবু। আকৃতিতে তাঁবুর মতো নয়, কিন্তু তাঁবুর কাজ করে। সেইখানে স্নানার্থী ও স্নানোত্থিতরা কাপড় ছাড়ে ও পরে।

ভগবান সূর্যদেব তখনো উদয় হননি, কিন্তু উত্তর দেশের উপর গ্রীষ্মকালে তাঁর অপার করুণা। উদয়গোধূলি ও অস্তগোধূলি দুই সমান সুদীর্ঘ। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধ ও অসমর্থরা ঠেলাগাড়ীতে চড়ে উপস্থিত হলেন, গৃহিণীরা বেঞ্চিতে বসে খোশগল্পে মশগুল হলেন। অবিবাহিতারা কুকুরকে শিকলে বেঁধে হাওয়া খাওয়াতে এনে কখনো তার সঙ্গে ধাবমান হলেন, কখনো তাকে যতই টানেন বাবাজী একেবারে অটল। ব্যাণ্ড বেজে উঠল, নানা বয়সের লোক সেখানে ভিড় করে উৎকর্ণ হয়ে রইল। ততক্ষণে সূর্য উঠেছেন, কিন্তু

প্রহরকালপূর্বে স্নান করতে যারা নেমেছে তারা আর ওঠবার নাম করছে না, তাদের জলকেলি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত চলবে। যারা শ্রান্ত হচ্ছে তাদের কেউ কেউ সৈকতের উপর শয়ান হয়ে রৌদ্র পোহাচ্ছে, কেউ কেউ বর্ণাঢ্য বৃহৎ ছত্রের নীচে ঢালা কেদারায় শুয়ে নভেল পড়ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বালুকা দুর্গ নির্মাণ করতে ব্যাপৃত। ছোট ছোট বালতিতে করে তারা সমুদ্রের জল সেঁচতে লেগেছে. তাদের অধ্যবসায় লক্ষ্য করে ঢেউরাও পা টিপে টিপে পিছু হটছে।

কোথায় বাদল ? কোথাও নেই। তবে তার অনিদ্রা রোগ এখনো প্রবলভাবে আছে, বোধ হয় প্রবলতর হয়েছে।

সুধী বাসায় ফিরল মধ্যাহ্নভোজনের জন্যে। সেই ঘর, সেই টেবিল, সেই সব ব্যক্তি—কে একজন গরহাজির। মিস্ মার্শ তেমনি আপ্যায়নের স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, “কোথায় সকালটা কাটালেন ? Esplanade-এ ? সমবয়সী বন্ধুর অভাবে আপনার স্নান করা হলো না, বড় পরিতাপের বিষয়।” —যেন পরিতাপটা তাঁর নিজের।

সুধী বলল, “সমবয়সী বন্ধুটিকে খুঁজতেই তো এখানে আসা। সে যে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে কে বলতে পারে ?”

মিস্ মার্শ বুঝতে পারলেন না। তবু বোঝবার ভান করে বললেন, “ওঃ !” সুধীর খাওয়া তদ্বির করে শেষের দিকে বললেন, “শহর ঘুরে দেখতে ইচ্ছা করেন তো আমি আপনার সঙ্গে আসতে প্রস্তুত।”

“ধন্যবাদ, মিস্ মার্শ,” সুধী বিনীত ভাবে বলল, “আজ থাক।”

আবার সেইখানে গিয়ে বাদলের প্রতীক্ষায় সূর্যাস্ত, অস্তগোধূলি ও সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হলো। কত লোক ভাগ্যপরীক্ষা করল, কত লোক নাগরদোলায় চাপল, Pier-এর প্রান্তে গিয়ে জুয়াখেলার নির্দোষ নামান্তর নিয়ে কত লোক মাতোয়ারা হলো, নৌকাবিহার করল কত লোক, কিন্তু কোনো দলে বাদল নেই। কত লোক এল, গেল, পায়চারি করল, আপনাকে ছাড়া অন্য সকলকে পর্যবেক্ষণ করল, দিনটির সম্বন্ধে মন্তব্য করল, “চমৎকার।” কিন্তু তাদের মধ্যে বাদল নেই। দুটি ভারতীয় সুধীকে দেখে চোরের মতো চুপি চুপি অপসৃত হলো, স্বদেশবাসীর সঙ্গে মিশলে পাছে বিলেতের লোক ভাবে “বিদেশী”, তাই অধিকাংশ ভারতীয়ের এই চোর মানসিকতা। যাক্, তাদের একজন বাদল নয়। বাদল তা হলে গেল কোথায় ? ভেন্টনরে নেই ?

সেদিন রাত্রে সুধীকে সকলে চির-পরিচিতের মতো গণ্য করলেন ও তার সঙ্গে কথা কইলেন সরস ভাবে। “মিস্টার চক্রবর্তীর দেশে গেলে আমাকে দেখছি অনাহারে মরতে হবে,” বললেন স্থূলকায় মিস্ কনডরসেট। ইনি একজন অবসরপ্রাপ্ত অভিনেত্রী, স্পেনদেশে এঁর অভিনয়কৃতিত্বের কাহিনী একা সুধীই ইতিমধ্যে দুবার শুনেছে। এঁর গর্ভ-

ধারিণী এখনো জীবিত আছেন, এই ঘরেই উপস্থিত। তাঁর শীর্ণ শুষ্ক শরীর থেকে কথা বেরিয়ে আসে যেন গ্রামাফোনের চোঙ-এর ভিতর থেকে। যেন তাঁর ভিতর দিয়ে আর কেউ কথা বলছে। তিনি বললেন, "ওদেশে যে মানুষ বাঁচে তা মিস্টার চক্রবর্তীকে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতুম না।" তাঁর মুখ নড়তে লাগল কথা বলার ঝুঁকিতে।

র‍্যাণ্ড্রুজ ও অন্য একটি যুবক—তার ডাক নাম লংফেলো—দুই বন্ধু বার্মিংহ্যাম থেকে এসেছে। তাদের দুজনের দুই বন্ধুনীকে তারা আজ চা খেতে ডেকেছিল, সুধী তখন ছিল না। মিস ডাডলী তাদের সঙ্গে রসিকতা করছিলেন এই নিয়ে। র‍্যাণ্ড্রুজ ছেলেটির মুখখানা ঘোড়ার মতো। সে বড় লাজুক অথচ সরল আর লংফেলোর মনের তল পাওয়া ভার। সে সাধুও হতে পারে, শয়তানও হতে পারে। প্রত্যেক বছর এরা এই শহরে আসে ও মিসেস ডাডলীর বোর্ডিং হাউসে ওঠে। কুটুম্বের মতো ব্যবহার পায়। মিসেস ডাডলীর পলিসী—"একবার যে এখানে উঠেছে প্রত্যেক বার সে এইখানেই উঠবে।"

র‍্যাণ্ড্রুজ বলল, "ভারতবর্ষে আমার যেতে ইচ্ছা করে, মিস্টার চক্রবর্তী। কাজ পেলেই যাই। অস্ট্রেলিয়ায় পোষাল না; ট্রেনে করে যেতে আসতে দিনের পর দিন কেটে যেত।"

"ভারতবর্ষেও," সুধী বলল, "ট্রেনে করে বেড়াতে বিস্তর সময় লাগে। ওদেশ ইংলণ্ডের মতো ঘননিবিষ্ট নয়।"

মিস্ মার্শ চুপ করে শুনছিলেন এক মনে। তাঁর দিকে তাকালে সুধী দেখতে পেত যে, তাঁর চোখে জল টলটল করছিল। তিনি ভারতবর্ষের প্রসঙ্গে যোগদান করছিলেন না যেন ইচ্ছাপূর্বক।

৬

পরদিনও বাদলের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। কিন্তু সন্ধানার্থীকে ভেন্ট্‌নরের সকলেই লক্ষ্য করল। দু-চারটি মানুষ তাকে এমনি গুড মর্নিং জানিয়ে গেল। কেউ কেউ সাহস করে আবহাওয়া সম্বন্ধে তার অভিমত শোনাবার জন্যে যেরূপ আগ্রহ ব্যক্ত করল তাতে সুধীর সন্দেহ হলো তাদের যথার্থ জিজ্ঞাসা সুধী ইংরেজী বলতে পারে কি না। সন্ধ্যার মুখে একটি মানুষ সুধীর সঙ্গ নিয়ে সত্যি সত্যি তার সঙ্গে আলাপ করে ফেলল। সুধী ভালো করে লোকটির মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। লোকটির নাম অবশ্য সুধীর অজ্ঞাত। বয়স অনুমান পঁয়ত্রিশ বছর হবে।

"আপনাকে," লোকটি শুরু করল, "এ দেশের বাসিন্দা বলে মনে হচ্ছে না। বোধ করি পর্যটনে বেরিয়েছেন।"

"কতকটা," সুধী দ্বিধাভরে বলল, "তাই বটে।"

"আশা করি," লোকটি সুধীকে ছাড়বার লক্ষণমাত্র না দেখিয়ে বলল, "ভেন্টনর আপনার মতো বহুদর্শী পর্যটকের অপছন্দ হবে না, কিন্তু আমি," লোকটি কতকটা আত্মস্থ ভাবে বলল, "চিরকাল একস্থানে থেকে বিরক্ত হয়ে পড়েছি।"

সুধীর কাছে সমবেদনার আশায় বলে যেতে লাগল, "প্রতি বছর সহস্র সহস্র দর্শক দেশের নানা অঞ্চল থেকে আসেন ; বিদেশী পর্যটকও প্রায়শ দেখতে পাই। কিন্তু আমার কোথাও যাবার জো নেই।"

"কেন ? ছুটির অভাব ?"

"ছুটি তো আমাদের বছরে ছয় মাস। শীত পড়লে কে এখানে হাওয়া খেতে আসবে বলুন ? হোটেলগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, বড় বড় দোকানগুলোতে বিকিকিনি অনেক কমে যাবে, ছোট ছোট দোকান কতক উঠে যাবে, কতক আমাদের মতো লোকের জন্যে টিকে থাকবে, এই অহোরাত্র উৎসব সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হবে। গ্রীষ্মকালে সম্বৎসরের জীবনোপায় সংগ্রহ করে নিয়ে শীতকালটা আমাদের ছুটি। অবশ্য তখন কেউ যে আসেন না কেমন করে বলি ? আর কাজ যে একেবারেই করতে হয় না তাও নয়।" লোকটি একটু থেমে বলল, "তবু আমি এক স্থানেই আবদ্ধ। হায়! শৈশবে কী নিশ্চিন্ত ছিলুম ! বাল্যকালে কোনো দায়িত্ব ছিল না। আপনাকে দেখতে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির মতো। আপনিই বলুন, মানুষের বয়সের সঙ্গে ভার কেন বাড়ে ?"

সুধী বিস্মিত হল, কিন্তু বিচলিত হল না। বলল, "ভার নিলেই বাড়ে। গোড়াতে ভার বলে মনে হয় না, তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে অনুভব করতে থাকি। গোড়াতে যে মজুরি কবুল করেছিলুম ক্রমে সে মজুরিতে পোষায় না।"

"মজুরি।" লোকটি বললে, মজুরিতে কাজ নেই, ভারটি নামাতে পারলেই আমার প্রাণ থাকে। কিন্তু প্রাণান্তের পূর্বে সে কি নামবে।"

সুধী বলল, "সংসারের সঙ্গে চুক্তি তো এক তরফা নয় যে, আপনার অসুবিধায় দোহাই সংসার শুনবে। যে পর্যন্ত সংসারের অসুবিধা হচ্ছে না সে পর্যন্ত সংসার বধির।"

"হা ভগবান!" বলে লোকটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করল। তারপর সুধীকে ধন্যবাদ ও অভিবাদন জানিয়ে সুধীর সঙ্গত্যাগ করল।

মিস্ মার্শ আহ্লাদ সংবরণ করতে পারছিলেন না। বললেন, "আন্দাজ করুন আপনাকে কী খেতে দেওয়া হবে।"

সুধী বলল, "তাই তো। এ এক নতুন crossword puzzle ! যদি বলি, asparagus ?"

"হলো না।"

"যদি বলি artichoke ?"

"হলো না।"

"বার বার তিন বার। যদি বলি cream cheese ?"

"হয়েছে।"

"বাঁচা গেল।" সুধী সকৌতুকে বলল, "এখন বরাতে সইলে হয়।"

সে রাত্রেও পূর্বরাত্রের মতো আলাপ আলোচনা চলল। নতুন একজনকে দেখা গেল, তিনি থিয়েটারের লোক, লণ্ডনের একটি দল এখানে কিছুদিনের জন্যে আসছে, তিনি তাদের অগ্রদূত। বিজ্ঞাপন দেওয়া, স্টেজ ভাড়া করা ইত্যাদি তাঁর কাজ। বললেন, "দেখুন মশাই এখানকার মেয়েগুলোর আস্পর্ধা! এক রত্তি মেয়ে (a slip of a girl), তাকে বললুম, দাও তো বাছা এই লেখাটা রোনিও (Roneo) করে। সে জবাব দিল, 'রোনিও কাকে বলে ?' তাজ্জব কাণ্ড! আমি প্রায় ক্ষেপে গেছলুম, মশাই। সে রোনিও কাকে বলে জানে না বলে আমার কাজের বিলম্ব সহ্য করা যায় না। সেই টাইপ রাইটিং এজেন্সীর কর্ত্রীকে যেই এ কথা শুনিয়ে দেওয়া, অমনি খুকীর মুখভাবটা যদি দেখতেন।"

ভদ্রলোক খাবার সামনে পেয়ে কারুর দিকে তাকালেন না, কারুর আরম্ভের অপেক্ষা রাখলেন না, প্রচণ্ড বুভুক্ষা প্রকাণ্ড গ্রাসে নিবারণ করতে লেগে গেলেন। কাজের ধাঁধা নিয়ে জ্বালাতন, সর্বদা দিক হয়ে আছেন। মিসেস ডাডলী বললেন, "মিস্টার ক্যাম্বেলকে কিন্তু আগে থেকে বলে রাখছি, প্রথম রজনীতে আমরা দল বেঁধে যাব, সস্তায় টিকিট না দিলে চলবে না।"

মিস্টার ক্যাম্বেল হাসলেন, হো হো হো হো হো। ছুরি দিয়ে মাছটাকে কেটে কাঁটা দিয়ে ফুঁড়ে মুখে তোলার আগে মুখটা উঁচু করে বললেন, "আসছে হ্যারিস, তাকে ও কথা বলবেন। আমি সামান্য মানুষ।"

কী কী পালা আসছে, কে কে নামছে, ইত্যাদি গল্পগুজবে ঘর জমজমাট হয়ে উঠল। মিস্ মার্শ ওথাচ সুধীর পার্শ্বে বসে ফিস ফিস করে বললেন, "ডাকঘরে আপনার ঠিকানা পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, একখানা চিঠি এসে Poste Restante-এ গচ্ছিত ছিল।"

সুধী বলল, "এরি মধ্যে। কারুর লেখবার কথা ছিল না তো ?" ভাবল, কে জানে হয়তো বাদলই কী মনে করে লিখেছে। কিংবা উজ্জয়িনীর চিঠি অনেক পাড়া ঘুরে টেণ্টারটন ড্রাইভে পৌঁছেছিল, সুজেৎ ঠিকানা বদলে দিয়েছে।

মিস্ মার্শের যেন নিজের কিছু বলার ছিল। সুধীকে অন্যমনস্ক দেখে তিনি ও প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন না। তিনি তখন ঘরের সাধারণ কথোপকথনে কর্ণপাত করলেন।

৭

কার চিঠি?

"অনামিকার।"

কে এই অনামিকা? সুধী চিঠিখানা এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করল।

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ঠিকানা কার কাছে বা কোথায় পেলুম বলব না। আশা করি ও ঠিকানায় আপনি নেই ও এ চিঠি আপনার হস্তগত হবে না। তবুও যদি হয় তবে পড়বেন না, ছিঁড়ে ফেলবেন। এই আমার প্রার্থনা। আমি জানি, আমার হাতের লেখা আপনার পরিচিত নয়, কিন্তু আপনার দৃষ্টিকে ভয় করি। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো আমার মন এর ভিতর প্রবাহিত হচ্ছে, আপনি হয়তো তাকে দৃষ্টিমাত্র চিনতে পারবেন।

আপনাকে বিরক্ত করলুম বলে ক্ষমা ভিক্ষা করি। ইতি।

নিবেদিকা
অনামিকা

কোন্ পোস্ট অফিসের মোহর তা স্পষ্ট পড়া গেল না। ডাকটিকিট থেকে বোঝা গেল চিঠিখানা ইংলণ্ডেরই।

চিঠিখানার লেখিকা কে হতে পারে? কৌশাম্বী। ছি ছি। কৌশাম্বী বিবাহিতা নারী —পরস্ত্রী। সে কী মনে করে সুধীকে এমন চিঠি লিখবে? এ চিঠি যে লিখেছে সে আত্মনিগ্রহের বহু চেষ্টায় বিফল হয়ে অবশেষে আত্মপ্রকাশ করে স্বস্তিবোধ করেছে। লেখবার সময় তার বক্ষ স্ফীত কুঞ্চিত হচ্ছিল, নিষিদ্ধ পুলকে শরমে শিহরিত হচ্ছিল তার তনু। কে সে? কৌশাম্বী কদাচ নয়।

অশোকা? না, না। অশোকার পিতা হাইকোর্টের জজ। কত অভিজাত যুবক তার পাণিপ্রার্থী। কত সুপাত্রের সঙ্গে তার প্রাক্তন পরিচয়। সুধী তো তার একটি সন্ধ্যার আকস্মিক ক্রীড়াসহচর। সুধীর প্রতি তার অনুরাগ কি সম্ভবপর? যদি সম্ভবপর বলে ধরে নেওয়া যায় তবু কী ওর পরিণাম? সুধীর জীবনে স্ত্রীরূপিণী নারীর স্থান ছিল তার স্বপ্নের পূর্বে—দিন সাতেক আগে। তখন তার কল্পনা ছিল স্বদেশে ফিরে পল্লীতে বাস করবে সাধারণ গৃহস্থ ভদ্রলোকের মতো। পৈত্রিক বিষয় আশয় দেখাশুনা করবে, দৃশ্যত স্বার্থপর হবে, পাকা হিসাবী লোক। তার বিষয়বুদ্ধির উপর যখন প্রতিবেশী চাষা কলু তাঁতী কামার মিস্ত্রী প্রভৃতির আস্থা জন্মাবে তখন তারা তার কাছে পরামর্শের জন্য আসবে, তাকে সালিশ মানবে, তার অনুকরণে ভালো বীজ ভালো সার ভালো লাঙ্গল ভালো গরু দিয়ে চাষ করবে, চরকায় সুতা কেটে সেই সুতায় কাপড় বুনিয়ে পরবে, থাকবে পরিচ্ছন্ন ঘরে, খাবে পুষ্টিকর খাদ্য, দল বেঁধে গ্রামের স্বাস্থ্যবিধান করবে, সমিতি

করে গ্রামের উদ্বৃত্ত শস্য ও পণ্য বেশি করে দালালকে বিক্রী করবে, চাঁদা করে শিক্ষক আনিয়ে গ্রামের বেকারদের নতুন ব্যবসা শেখাবে, ব্যবসার উন্নতি ছাড়া অন্য কোনো উপলক্ষ্যে দেনা করবে না কারুর কাছে, জমিদারের অন্যায় দাবির বিরুদ্ধে সমবেত ভাবে দাঁড়াবে।

এই কল্পনার সঙ্গে দাম্পত্যের অসঙ্গতি তো ছিলই না, পরন্তু দাম্পত্য ছিল এর অপরিহার্য অঙ্গ। একটি সুলক্ষণা পল্লীকন্যাকে গৃহিণী করে সাধারণের অনুকরণীয় গৃহধর্ম অনুষ্ঠান করতে হবে, পারিবারিক দায়িত্ব স্বীকার করে তাকে সুসম্পন্ন করতে হবে, পীড়িত সন্তানকে নিয়ে উদ্বেগকাতর ও অতিথি কুটুম্বকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হতে হবে। এর জন্যে সুধী প্রস্তুত ছিল।

গ্রামবৃদ্ধের চেয়েও বয়সে বড় বট-অশ্বথ তাকে বোঝাবে যে এই পৃথিবীর বয়সের পরিসীমা নেই। অথচ বছরে বছরে বীজ পরিণত হবে গাছে, গাছ ভরে যাবে শস্যে, মাটিতে গজাবে ঘাস, ঘাসের ফুলে মাঠের আঁচল জমকাল দেখাবে। প্রতি বছর পৃথিবীকে মনে হবে নবীনা। পৃথিবীর মতো নারীও হবে ঋতুমতী, গর্ভিণী, জননী। শিশুর আধান, জন্ম ও বৃদ্ধি সুধীকে সেই রহস্যের বার্তা দেবে যে রহস্য আদিম মানব হতে অন্তিম মানব পর্যন্ত—আদিম প্রাণী হতে অন্তিম প্রাণী পর্যন্ত—অমোঘভাবে সক্রিয়, যার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানে নেই, দর্শনে নেই, ধর্মতত্ত্বে নেই, যা পৃথিবীর নবীনত্বের মতো উপলব্ধি সাপেক্ষ।

একটি স্বপ্ন সমস্ত ওলটপালট করে দিল, সুধীর কল্পরাজ্যে বিপ্লব ঘটাল। সুধীর জীবনে গার্হস্থ্যের অবকাশ রইল না। গৃহস্থ যেন বনস্পতি, মৃত্তিকাকে সে শতপাকে জড়ায়, কেবল শিকড় দিয়ে নয়, ঝুরি দিয়ে। প্রবলভাবে রস টেনে নিচ্ছে, ফাঁদ পেতে আলো ধরে রাখছে, পরিশেষে অঞ্জলিভরে ফল নিবেদন করছে। অভ্যাগতকে আশ্রয় ও শ্রান্তকে ছায়াদান করছে। নিষ্ক্রিয় নিরাসক্ত দৃষ্টি যার সাধ্য তাকে হতে হবে তৃণশীর্ষে শিশিরবিন্দু সদৃশ। দাম্পত্য তার পক্ষে অর্থহীন ও অশুভ, তার পত্নীর পক্ষে বিড়ম্বনা। এখন ভারতবর্ষে ফিরে সে হয়তো একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপকতা করবে—পুরাকালের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করে ভারতের বহমান সংস্কৃতিকে বিশ্বসংস্কৃতির সাগরসঙ্গমে উত্তীর্ণ করে দেবে। অথবা হয়তো সে সত্য সত্যই নিষ্কর্মা হবে, হিমালয়ে গিয়ে ধ্যানাসনে বসবে।

সার কথা, তার ভবিষ্যতের সঙ্গে অশোকার কিংবা অপর কোনো স্ত্রীরূপিণী নারীর ভবিষ্যৎ খাপ খাবে না, অনামিকার চিঠির উত্তরে এইটে তার বক্তব্য। কিন্তু কেই বা উত্তর প্রত্যাশা করছে? লেখিকা তো নাম ঠিকানা দেননি।

৮

মিস্টার ক্যাম্‌বেল প্রস্তাব করলেন, "চলুন, আমার সঙ্গে Shanklin ঘুরে আসবেন, যদি অন্যত্র কাজ না থাকে।"

সুধী রাজী হলো। এমন হতেও পারে যে বাদল সেইখানকার চিঠি এখানে তাকে দিয়েছিল। কিংবা এখান থেকে সেইখানে উঠে গেছে। চলল সুধী, মিস্টার ক্যাম্‌বেলের সাথী হয়ে। সেই গরমেও তাঁর গায়ে রেনকোট, মাথায় বোলার হ্যাট, হাতে ছাতা। তাঁর কয়েকটা দাঁত বাঁধানো, গাল বসা, গড়ন রোগা, উচ্চতা পাঁচ ফুট, বয়স প্রায় চল্লিশ। লোকটি রসিক, কিন্তু তার রসিকতার মর্ম বোঝা কঠিন। সুধী ক্যাম্‌বেলকে হাসতে দেখে হাসির ভান করল। বহুবার 'আই বেগ ইওর পার্ডন' বলেও যখন ক্যাম্‌বেলের কণ্ঠস্বরে ও উচ্চারণে স্পষ্টতা লক্ষ করল না তখন আর করে কী, নির্বিচারে 'ইয়েস' 'নো' বলে ক্যাম্‌বেলকে তার ইংরাজীজ্ঞান সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ করে তুলল। মানুষ সঙ্গে থাকলে প্রাকৃতিক দৃশ্যে মনোনিবেশ করা যায় না, তবু সুধী চুরি করে করে পথের এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। পথ সমুদ্রের পাড় ধরে। কিন্তু জায়গায় জায়গায় বেড়া দিয়ে সমুদ্রের দিকে যাতে কেউ বেশি না ঘেঁষে তার প্রতিবিধান করা হয়েছে—ওরূপ জায়গায় পাড় ধসে পড়ায় মানুষ ডিগবাজি খেতে খেতে জলসাৎ হয় বলে এই সতর্কতা।

মিস্টার ক্যাম্‌বেল নিজের কানে অন্য মানুষের কথা শোনেন না। কেবল অন্য মানুষের 'হাঁ', 'না' ও হাসি এই নিয়মের নিপাতন। তার থেকে উনি প্রমাণ পান যে, অন্যে তাঁর কথা প্রণিধান করছে। শ্যাঙ্কলিনে পৌঁছে তিনি ঘণ্টাখানেকের জন্যে সুধীকে ছুটি দিলেন। বললেন, "আমি ততক্ষণ ব্যবসা সেরে নিই, আপনিও এখানকার প্রসিদ্ধ Chine পরিদর্শন করুন।"

সুধী সেই প্রসিদ্ধ 'Chine'-এর চমৎকারিত্ব আরোপ করে ইংরেজ জাতির সম্মান রক্ষা করল। সমুদ্রের পাড় ইংলণ্ডের পক্ষে পার্বত্য, তার একাংশে একটি সংকীর্ণ গভীর কন্দর সমুদ্রের দিকে নেমে গেছে। সুধীও ওর সঙ্গে সঙ্গে নেমে গিয়ে ওর দৌড় কতদূর তার হিসাব নিল। তারপর একটি পর্ণকুটীর দেখে বাস্তবিক চমৎকৃত হল—সুন্দর বলে নয়, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে ও-জিনিস এখনও লুপ্ত হয়নি বলে। অবশেষে সমুদ্রের ধারে পায়চারি করতে করতে ইংরেজের অনুকরণে ভগবানকে 'ধন্যবাদ' দিল, মনে মনে বলল, "এ জিনিস কোনো দিন লুপ্ত হবে না।"

ক্যাম্‌বেলের সঙ্গে আবার যখন দেখা হলো তখন তিনি বললেন, "হাঁ করে কী অত দেখছেন ? Bathing Beauty ?"

সুধী বলল, "ওঁরা আমার মতো মানুষের জন্যে নন।"

ক্যাম্‌বেল বললেন, “আমি ভুলে গেছলুম যে আপনি জাতিভেদের দেশ থেকে এসেছেন। হো হো। আচ্ছা, জাতিভেদের উদ্দেশ্য কী ? কেন আপনারা অমন সামাজিক ব্যবস্থার পক্ষপাতী ?”

“আমাদের দেশ,” সুধী সপ্রতিভভাবে বলল, “এত বিরাট যে ওকে আমাদের পূর্বপুরুষগণ সসাগরা পৃথিবী বলে জানতেন। এখনো আপনার স্বদেশবাসীরা ওকে উপমহাদেশ বলে বর্ণনা করেন। এরই সমপরিমাণ ভূখণ্ডে—অর্থাৎ ইউরোপে—কতগুলি নেশন ! ইউরোপ সৃষ্টি করেছেন নেশন ভারতবর্ষ সৃষ্টি করেছেন জাত। আপনার নেকটাই চক কাটা, আমার নেকটাই ফোঁটা ছিটানো।”

“বেশ বলেছেন।” ক্যাম্‌বেল খুশি হয়ে বললেন, “বাঘের আছে ডোরা ডোরা দাগ, চিতার আছে চাকা চাকা দাগ। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। আসুন আমরা কিছু আহার করি।”

খেতে খেতে ক্যাম্‌বেল জিজ্ঞাসা করলেন, “ওয়াইট দ্বীপ কেমন লাগছে ?”

“কেমন লাগছে ?” সুধী বলল, “সমস্ত দ্বীপটা এখনো দেখিনি, যতটুকু দেখছি তার থেকে এই পর্যন্ত বলতে পারি যে ভগবানের দ্বীপসৃষ্টির সার্থকতা ব্যর্থ হয়েছে। সেই রেল, সেই মোটর, পথের ধারে সেইসব পেট্রল-পাম্প, পথের মোড়ে সেইসব গারাজ, একই আকারের এক শ’ ধনীভোগ্য villa এবং এক হাজার দরিদ্রযোগ্য tenement house, শব্দে গন্ধে বর্ণে লণ্ডনের থেকে এমন কী তফাৎ ? কেবল ঘরে ঘরে পরিশ্রান্ত পথিককে চা খাওয়াবার প্রথা—ঘরে ঘরে “TEAS” লেখা সাইনবোর্ড দেখে অনুমান হয়--আতিথেয়তার সার্বত্রিকতা সূচনা করছে।”

ক্যাম্‌বেল খাবার মুখে পুরেছেন, হাসতে পারেন না, তাই টেবিলের উপর কাঁটা ঠন ঠন করে সুধীর শেষ মন্তব্যের তারিফ করলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন “ঠিকই বলেছেন। তবে শুধু এই দ্বীপে কেন, ইংলণ্ডের অন্যান্য অঞ্চলে এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষ করবেন। আপনি বোধ করি লণ্ডনেই থাকেন ?”

সুধী বলল, “হাঁ, প্রায় দশ-এগারো মাস আছি।”

“আমিও লণ্ডনে থাকি। আপাততঃ মফঃস্বলের নানা স্থানে ঘুরতে হবে, অক্টোবরের আগে ফিরব না। আশা করি তখন আপনার সঙ্গে দেখা হবে।”

“যদি তত দিন না থাকি !”

“সে কী ! আপনি ইতিমধ্যেই চলে যাবেন ? এ দেশটার সব জায়গা লণ্ডনের নামান্তর নয়। কোথাও পাহাড়, কোথাও হ্রদ, কোথাও উপত্যকা, কোথাও দুর্গ,; কোথাও উদ্যান, কোথাও বন। কতরকম পশু পাখী, মানুষেরও ধরন বিচিত্র।”

“অমন করে দেখতে চাইলে পৃথিবীর কোনো দেশই দেখবার উপযুক্ত আয়ু নেই

কোনো মানুষের। ভারতবর্ষের আমি কী-ই বা দেখেছি! অথচ ওদেশের বৈচিত্র্যের তালিকা হয় না। না, মিস্টার ক্যাম্‌বেল, আমি টুরিস্ট নই। আমি দূরত্বের দূরবীণ সংযোগে ভারতবর্ষকেই দেখবার জন্যে এসেছিলুম, ইংলণ্ডে না এসে ফিজি দ্বীপে গিয়ে থাকলেও আমার কাজ হত। তবে ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ এমন যে আমরা বিদেশ বলতে সচরাচর ইংলণ্ডকেই বুঝি, আমাদের ভাষায় ইংলণ্ডের প্রতিশব্দ বিলাত।"

মিস্টার ক্যাম্‌বেল ক্ষুণ্ণ হলেন।

৯

সুধী যখন বাসায় ফিরল মিস্ মার্শ তাকে দেখে তার দিকে ছুটে এলেন। "মিস্টার চক্রবর্তী, মিস্টার চক্রবর্তী", তিনি সোদ্বেগে বললেন, "আপনার জন্য দুপুরে কী আনিয়ে রেখেছিলুম যদি জানতেন।"

"জানতুম বই-কি। Sea gull-এর ডিম।"

"ধাঃ! ডিম বুঝি আপনি খান।"

"তবে কী? আস্ত sea gull?"

"দুর! Sea gull বুঝি কেউ খায়।"

"তবে অজ্ঞতা স্বীকার করছি।"

মিস মার্শ সোল্লাসে বললেন, "Asparagus।"

সুধী অবাক হয়ে শুধু বলল, "ধন্য!"

তিনটা দিন চলে গেল বাদলের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না, মার্সেল না জানি কত ব্যাকুল হচ্ছে। চারদিন পরে সুধীর লণ্ডনে ফেরবার কথা। ভেবেছিল বাদলের সঙ্গে সাধ মিটিয়ে বাক্যালাপ করবে অন্তত ছয়দিন। বাদলের চিন্তিত বিষয়ের একে একে হিসাব নিকাশ হবে, তারপর সুধীর অনুভূত বিষয়ের।

চায়ের পর সুধী মিস মার্শের প্রতি করুণা পরবশ হয়ে ভেণ্টনর ঘুরে বেড়ালো। ভেণ্টনরের পশ্চাদ্‌ভূমি তার মনে ধরল। নির্জন, পার্বত্য, তরুলতায় শ্যামল, বিহঙ্গরব-মুখর। মিস মার্শ তাকে কী যেন বলতে প্রয়াস পেলেন, কিন্তু সে তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বনভূমির প্রশংসা করল। পরে যখন তার খেয়াল হলো যে তাঁর বক্তব্যে বাদী হয়েছে তখন সে লজ্জিত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করল। কিন্তু তার চেয়েও লজ্জিত বলে বোধ হল মিস মার্শকে। সুধীকে তিনি দোষী বলে স্বীকার করলেন না।

Esplanade-এ মিস মার্শ বিদায় নিলেন। বললেন, "আপনার খাবার তৈরি করে রাখিগে। আপনি ততক্ষণ Pier-এ গিয়ে আমোদ করুন। কিন্তু দেখবেন যেন খেলার নেশায় দেরি করে ফেলবেন না।"

সুধী Pier-এ গেল না। ঐখানেই পায়চারি করতে থাকল। কখন এক সময় তার সঙ্গ নিল গত রাত্রের সেই অচেনা মানুষটি।

"ওঃ! আপনি?"

"হাঁ, আমিই। ভাবলুম আপনার সঙ্গে আলাপ করে মনটাকে একটু হাওয়া খাইয়ে আনি।"

দুজনে নিঃশব্দে পাশাপাশি পায়চারি করল। বাতির আলোয় সুধী তার মুখ দেখতে পাচ্ছিল। কঠিন পাথুরে গড়ন।

সে বলল, "Kra Abbey দেখেছেন?"

সুধী বলল, "না। কোথায়?"

"রাইড থেকে বেশিদূর নয়। আপনি এ দ্বীপে আর কতদিন আছেন?"

"ঠিক বলতে পারছিনে। বোধ হয় দিন চারেক।"

"তবে একবার Kra Abbey অবশ্যই দেখবেন। শুধু সেইখানে নয়, যেখানে যেখানে রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী আছেন সেখানে সেখানে আপনার আমার জন্যে নিত্য প্রার্থনা চলেছে। আমরা সেই প্রার্থনার ফল ভোগ করছি, অথচ একবারও আমাদের উপকারকদের খবর নিচ্ছিনে। আমি যদি স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কাছ থেকে ছুটি পেতুম তো পৃথিবীর আনাচে কানাচে আমার মঙ্গলপ্রার্থীদের আবিষ্কার করে প্রগাঢ় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতুম।"

সুধী বলল, "গৃহস্থের উপস্থিত কর্তব্য স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রতি। এদের শুভবিধান করুন, সেই হবে আপনার শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন।"

"বৃথা, বৃথা, বৃথা।" লোকটি উত্তেজনা সহকারে বলল, "যেমন মা, তেমনি ছেলেমেয়ে দুটো। একান্ত আত্মসর্বস্ব, আমার জন্যে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে না, আমার প্রতি সহানুভূতির ধার ধারে না। মাঝে মাঝে এদের খুন করতে ইচ্ছা গেলে rosary-টি নিয়ে জপ করি।"

সুধী কখনো rosary দেখেনি। সকৌতূহলে বলল, "Rosary কেমন একবার দেখতে হবে।"

"Rosary দেখেননি!" লোকটি আশ্চর্য হয়ে সুধীর মুখ নিরীক্ষণ করল। "এই দেখুন।" বলে কোথেকে একটি জপমালা বের করল। কেমন করে কী বলে জপ করতে হয় সুধীকে বোঝাল। শেষে বলল, "আপনি কোন সম্প্রদায়ের খ্রীস্টান rosary দেখেননি?"

সুধী বিনীতভাবে বলল, "আমি খ্রীস্টানই নই।"

"কী! আপনি খ্রীস্টানই নন? তবে আপনি কী। ইহুদী?"

"না।" সুধী ভাবল বলবে 'আপনি বুঝবেন না', কিন্তু তাতে করে অন্যের বুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়। দ্বিধার সঙ্গে বলল, "রিলিজন আমার দেশে ব্যক্তিগত ও গুহ্য। বিশ্বাসের স্বাধীনতা আমরা প্রত্যেককে দিয়েছি, তাই প্রত্যেকের বিশ্বাস স্বতন্ত্র। সমষ্টিগত ভাবে আমরা যা মানি তার নাম ধর্ম। বাইরের লোক বলে হিন্দু ধর্ম, অর্থাৎ ভারতীয় ধর্ম। এই ভৌগোলিক আখ্যা সার্থক। মাটি অনুসারে গাছ, গাছ অনুসারে ফল। তেমনি দেশ অনুসারে ধর্ম। কেবল ধর্ম নয়, আইন, আচার, প্রথা, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প।"

লোকটি মাথা নেড়ে বলল, "Too deep for me!"

সুধী বলল, "ইংরেজী ভাষায় ধর্মের প্রতিশব্দ নেই, তবু ধর্ম ইংরেজেরও আছে। National righteousness বললে তার কতক আভাস দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের নেশন শুধু মানুষের নয়, ওষধি বনস্পতি কীট পতঙ্গ পশুপক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণীর। তাই অহিংসা আমাদের ধর্মের একটি প্রধান সূত্র। প্রাণী বলে যাদের গোনা হয় না, নদী পর্বত অরণ্য প্রান্তরও আমাদের সমাজের সভ্য। যে ঐক্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত আমাদের ধর্ম তাকে 'ন্যাশনাল' বললে খর্ব করা হয়, মিস্টার—"

মিস্টার ততক্ষণে সুধীর পাশ থেকে অলক্ষিতে সরে পড়েছেন। সুধী ভাবাবেশে পাশ ফেরেনি।

১০

সাউথটাউনে সারাদিন বাদলের অন্বেষণ করে ব্যর্থ হয়ে সুধী বাসায় ফিরল। ফেরবার পথে স্থির করে ফেলল, আর একটা দিন দেখবে, ব্যর্থ হলে তার পরের দিন লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করবে। ওখানে মার্সেল না জানি কত ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। "কাল দাদা আসবে"— প্রত্যহ মার্সেলকে এই বলে স্তোক দেওয়া হতে থাকবে। 'কাল'—'কাল'—'কাল'। 'কাল' আর আসে না, দাদাও তাই আসে না। বেচারি মার্সেল। তাকে রেখে সুধী কোন্ প্রাণে স্বদেশ প্রত্যাগমন করবে? তার দাবি উজ্জয়িনীর দাবির থেকে কম কিসে? সে বয়সে ছোট বলে, না, জন্মত পরজাতীয় বলে? মার্সেল সপ্রমাণ করেছে যে ভালোবাসার জাতি বয়স নেই—তার আত্মা সুধীর আত্মার স্বজাতীয় ও সমবয়সী। কিন্তু তার দেহের স্বাস্থ্য ও মনের পুষ্টি ইউরোপনির্ভর, তাই তাকে থাকতে ও বাড়তে হবে ইউরোপে। পূর্ণবয়স্ক হবার আগে তার পক্ষে ভারতবর্ষে যাওয়া অবিধেয়, সম্ভব যদি বা হয়। আর সুধী তো তার অপেক্ষায় ততকাল ইউরোপে অবস্থান করতে পারে না। একদিন বিচ্ছেদ অনিবার্য। যত রকম বিদায় আছে তাদের মধ্যে করুণতম হচ্ছে শিশুর কাছ থেকে চিরবিদায়। তাকে পুনর্দর্শনের আশা দিলে সে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করবে,

তাকে মিথ্যা তারিখ দিলে সে সত্য ভেবে দিন গুনবে। ভগবান তাকে বিস্মরণের অসীম ক্ষমতা দিয়েছেন, বেদনার ক্ষত তার সহজে শুকায়। কিন্তু যে তাকে বঞ্চিত করে তার সাজা তুষানল।

বাসায় পৌঁছে সুধী দেখল বসবার ঘরে তুমুল হাস্যকোলাহল। একটি নবাগত যুবককে কেন্দ্র করে বাসার প্রায় সকলেই ঐ ঘরে সমবেত। যুবকটি এক একটি কথা বলে বা ছড়া কাটে বা সুর ভাঁজে, আর ঘরশুদ্ধ মানুষ হুল্লোড়-করে, তালি দেয়, হিয়ার হিয়ার বলে, টেবিল বাজায়। ব্যাপার কী? সুধী সকৌতূহলে ঘরের এক প্রান্তে অলক্ষ্যে আসন নিল। কিন্তু এক বর্ণ বুঝতে পারল না। একে ত সে দেশে থাকতে সাহেব প্রোফেসারদের সঙ্গে বাদলের মতো যুক্ত ছিল না, এদেশে এসেও সে ফরাসী ভাষীদের সঙ্গে আছে। খাঁটি ইংরেজী উচ্চারণের খুঁটিনাটি তার কান-সওয়া হয়নি, খাঁটি ইংরেজী হিউমারও তার অনায়ত্ত। বিষয়টা যে কী তা সে অভিনিবেশ সত্ত্বেও অধিগম করতে পারল না।

হঠাৎ তার দিকে মিসেস ডাডলীর নজর পড়ল। তিনি তাকে ডেকে নিয়ে গেলেন সেই যুবকটির সম্মুখে। বললেন, "মিস্টার চক্রবর্তী, মিস্টার হ্যারিস।"

করমর্দনের পর হ্যারিস বললেন, "বলুন দেখি আপনাকে কি কোথাও আমি দেখিনি?"

"সেটা," সুধী বলল, "আপনি নিজেই বলতে পারবেন।"

"Wait a minute, wait a minute," হ্যারিস চোখ টিপে বললেন, "আপনার সেই দাড়ি আপনি কবে কামিয়ে ফেললেন?"

"দাড়ি।" সুধী তার ইয়ার্কি আঁচতে না পেরে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "দাড়ি তো আমার কোনোদিন ছিল না।"

"হা—হা আ আ," হ্যারিস আবার চোখ টিপে বললেন, "হা—হা আ আ, আপনার সেই রত্নখচিত পাগড়ীটি কোথায়?"

"আমাকে," সুধী নিরীহভাবে বলল, "আপনি অপর কোনো ভারতীয় বলে ভ্রম করছেন।"

হ্যারিস যতবার চোখ টেপে সুধী ছাড়া সকলে ততবার নানা স্বরে হাসে—মেয়েদের হাসি পুরুষের হাসি একটি অনির্বচনীয় সমাস সৃষ্টি করে।

শেষে সুধীর মালুম হল যে হ্যারিসের উদ্দেশ্য সুধীর খরচে অন্য সবাইকে হাসানো। তখন সুধীও প্রাণ খুলে হাসল। যে মানুষ নিজেই হাসছে তাকে নিয়ে তামাশা জমে না। কাজেই হ্যারিস সুধীকে রেহাই দিলেন।

খাবার সময় মিস মার্শ বললেন, "মিস্টার চক্রবর্তী। বাসার সকলের টিকিট কেনা হয়ে গেছে, আপনারও। বৃহস্পতিবার 'Young Woodley-র প্রথম রজনী। স্থান, রাইড-এর

রঙ্গমঞ্চ। ভেণ্টনরে জায়গা নেই।"

"কিন্তু মিস্ মার্শ," সুধী অনুযোগপূর্বক বলল, "পরশু সোমবার যে আমি যাচ্ছি।"

"সে কি মিস্টার চক্রবর্তী।" মিস্ মার্শ মিসেস ডাড্‌লীকে বললেন, "ক্যাথলীন, ইনি যে পরশু চললেন।"

মিসেস ডাডলী মুরুব্বিয়ানা করে বললেন, "পরশু আপনার যাওয়া হতে পারে না, মিস্টার চক্রবর্তী।"

তাঁর কথা শুনে মিস্ কণ্ডরসেট তাঁর স্বাভাবিক সরলতা সহকারে বললেন, "না, মিস্টার চক্রবর্তী, আমাদের অনুরোধ আপনি এত শীঘ্র যাবেন না, যদি না গেলে চলে।"

বুড়ী কণ্ডরসেট বললেন, "Just think of Mr. Chakravarty deserting us!"

হ্যারিস বললেন, "আসুন আমরা ভোট নিই। মিস্টার চক্রবর্তীর যাওয়ার বিপক্ষে যাঁরা তাঁরা হাত তুলুন।"

সুধী ছাড়া সকলেই হাত তুলল।

"যাওয়ার সপক্ষে যাঁরা তাঁরা হাত তুলুন।" একা সুধী হাত তুলল।

"বিপক্ষে ১১ জন, সপক্ষে ১ জন। মিস্টার চক্রবর্তী, আপনি হেরে গেলেন,—beaten by a huge majority."

সকলে কোরাস ধরল, "A huge majority."

চুপি চুপি মিস মার্শ বললেন, "অতএব আপনি থেকে গেলেন!"

সুধী বলল, "অগত্যা।" তার মনে একটি নূতন আশার সঞ্চার হয়েছিল। বাদলের সঙ্গে থিয়েটারে হয়তো সাক্ষাৎ ঘটতে পারে।

সেই রাত্রে সুধী মাদামকে একখানা চিঠি লিখে মার্সেলের কাছে আরো চার দিন ছুটি নিল। বৃহস্পতিবার অভিনয় দেখে শুক্রবার ফিরবে।

১১

পরদিন রবিবার। গির্জার ঘণ্টা অশ্রান্ত বাজছিল। মিস্ মার্শ বললেন, "আসুন মিস্টার চক্রবর্তী, গির্জায় যাই।"

সুধী সেদিন কোন্ অভিমুখে বাদলের খোঁজে বেরবে ভাবছিল। রোজ রোজ বিফল হয়ে কোথাও যেতে বিশেষ উৎসাহ বোধ করছিল না। আলস্যের এই এক উপলক্ষ্য পেয়ে সে মিস মার্শের আহ্বানে সাড়া দিল। বলল, "যেতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কখন হাঁটু গাড়তে হয়, কখন চোখ বুজতে হয় কখন উঠে দাঁড়াতে হয়, কখন চোখ মেলতে হয়, এসব আমার কাছে প্রত্যাশা করবেন না।"

মিস মার্শ হেসে বললেন, "Heavens! No! আপনি যে ক্রিশ্চান নন তা আমি

জানি।"

"জানেন?" সুধী বলল, "কই আমি তো জানাইনি।"

মিস মার্শ যেন একটা নতুন খবর শোনাচ্ছেন এরূপভাবে বললেন, "আমি ভারতবর্ষে গেছি।"

"গেছেন? তাই বলুন। ভারতবর্ষের কোন অঞ্চলে গেছেন?"

"কী বলে ওকে—কাথিয়াবাড়।"

"আমি ও অঞ্চল দেখিনি। দেখবার ইচ্ছা আছে।"

"আমিও কি ভাল করে দেখেছি? দেখবার মতো মনোভাব তখন ছিল না।" তাঁর চোখে শোকস্মৃতির পক্ষচ্ছায়া পড়ল যেন দীঘির জলে শিকারী পক্ষীর আকস্মিক পক্ষচ্ছায়া।

সুধী জিজ্ঞাসা করল না, কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসু মনে করে মিস মার্শ বললেন, "আমার জীবনের সে এক দিন গেছে, তখন আমি দুই হাতে লড়াই করেছি—সংসারের সঙ্গে, সংস্কারের সঙ্গে। কিন্তু সে যে অনেক কথা, মিস্টার চক্রবর্তী। সেই সম্পর্কে আপনার সাহায্য আমার প্রয়োজন।

"সম্ভব হলে সাহায্য সর্বান্তঃকরণে করব, মিস মার্শ।"

গির্জাতে ওরা সকলের পিছনে একটি শূন্য সারিতে বসল। মিস মার্শ যেমন ইঙ্গিত করেন সুধী তেমনি করে, ভুলচুক যা হয় তা অন্য কারুর নজরে পড়ে না। সার্মন্-এর সময় যখন এল ততক্ষণে কঠিন কসরৎ সুধীর গায়ে পায়ে ব্যথা ধরিয়ে দিয়েছিল। কেবল কান খোশ মেজাজে ছিল choir-এর গান শুনে। সুধী উৎকর্ণ হয়ে সার্মন্ অনুধাবন করল। সেদিনকার বিষয়, "Consider the lilies." মাঠে ফুটে-থাকা লিলি-ফুলদের দেখ। কেমন করে তারা বিকশিত হয়। না করে তারা মেহনৎ, না কাটে তারা সুতা। তবুও স্বয়ং সোলোমনের রাজপরিচ্ছদ তাদের সজ্জার নিকট নিষ্প্রভ।

কেউ কেউ এর বিপরীত ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন, পরিশ্রম করতে হবে না, শস্য উৎপাদন করতে হবে না মাল নির্মাণ করতে হবে না। তবুও কেমন করে আমরা রাজার হালে বাস করব। সুপ্রচুর অবসর পেলে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিপুষ্ট হবে, আমরা রসচর্চা, রূপচর্চা ও দেহচর্চা করব, মোটর বিহার ও জলকেলি হবে আমাদের নিত্য কর্ম, আমরা হয়ে উঠব এক একজন অতিমানব।

"কিন্তু," উপদেশক মহাশয় বললেন, "অমন ব্যাখ্যার হেতু নেই। প্রভুর মনে অমন কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। একটু আগেই তিনি বলছিলেন, যে প্রাণধারণের উপকরণ সম্বন্ধে চিন্তিত হোয়ো না। কী আহার করবে, কী পান করবে, তাই নিয়ে দিনরাত কল্পনা কোরো না। শরীর সম্বন্ধেও নির্ভাবনা হও, কী পরিধান করবে, দূরে যাক ঐ ভাবনা।

লিলি ফুলের উপমা সেই প্রসঙ্গে উঠল। লিলি ফুল অর্থ সম্পত্তির অর্জন ও সঞ্চয় সম্পর্কে নিরন্তর ব্যস্ত না থেকেও ধনী-শ্রেষ্ঠের অপেক্ষা মনোহর রূপে সজ্জিত। পার্থিব বিষয়ে যে নিত্য নিরত নয় ভগবান তাকে সহজেই সুন্দর করেন, তার মোটা কাপড় মহার্ঘ পোশাকের চেয়ে সুদৃশ্য হয়ে থাকে। এক কথায়, materialism পরিহার করতে হবে, এই হচ্ছে লিলি ফুলের কাছে শিক্ষণীয়। সোলোমনের ধনগৌরবের চেয়ে লিলি ফুলের সরল শোভা আমাদের বরণীয়।"

গির্জা থেকে ফেরবার সময় সুধী বলল, "ফল কতটুকু হবে বলা যায় না, তবু ঐ সব সাড়ম্বরা সোলোমন-পত্নী ও সাড়ম্বর-সোলোমনবৃন্দকে মাঝে মাঝে ও কথা শুনিয়ে দেওয়া ভালো। রাস্তায় ঘাটে 'Drink this Whiskey,' Smoke that Cigarette,' 'Eat more Fruit,' 'Insure your Life', 'Invest your Money'—আমার দেশে এক রকম পাখী আছে, সে বলে 'চোখ গেল,' আমিও এসব দেখে সেই পাখী হয়েছি, মিস মার্শ।"

সার্মন শুনতে অভ্যস্ত মিস মার্শ গির্জায় যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণ হয়তো ওর সম্বন্ধে মনোযোগী থাকেন, বাইরে এলে ওর এক বিন্দুও মনে রাখেন না। বললেন, "ওসব বিজ্ঞাপন আমার তো চোখে ঠেকে না, মিস্টার চক্রবর্তী।"

সুধী ভাবল লোনা জলের মাছও জলকে লোনা বলে জানবে না। গির্জার প্রচারকটি তো ঐ শ্রেণীর মৎস্য। এঁর ছেলে হয়তো দ্বিতীয় Cecil Rhodes হবে। তিনিও কি materialism-এর উপর বিরক্ত, না, যাঁরা তার প্রকাশ্যে পক্ষপাতী তাদের উপর বিরক্ত? তবু ইংলণ্ডের মতো পরম সমৃদ্ধ ও প্রবল পরাক্রান্ত দেশে একটিমাত্র গির্জার একজনও আচার্য যে মনে না হোক মুখে সোলোমনের চেয়ে লিলিফুলের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করলেন এবং এতগুলি মানুষের মধ্যে কেউ প্রতিবাদ করল না, এর থেকে অনুমান হয় আধিভৌতিকের দ্বারা আচ্ছন্ন হলেও আধ্যাত্মিকের উপর এদেশ বিশ্বাস হারায়নি।

মিস মার্শ শুধালেন, "কী ভাবছেন, মিস্টার চক্রবর্তী? আপনি সব সময় এমন চিন্তাকুল কেন, বলুন দেখি? আপনার সঙ্গে কথা কইতে ভয় করে, পাছে মনে করেন আমি চিন্তাশক্তিহীন।"

"না, না," সুধী তাকে স্মিতহাস্যে অভয় দিল, "তা কেন মনে করব, মিস মার্শ? আপনার যখন যা খুশি আমাকে নির্ভয়ে বলবেন। অনেক সময় বোবা লোকদের চিন্তাকুল বলে ভ্রম হয়, আর ইংরেজী আমি বেশ স্বচ্ছন্দে বলতে পারিনে বলে প্রায় বোবার সামিল।"

মিস মার্শ শিরশ্চালন করে সুধীর দিকে তাঁর বড় বড় চোখ দুটি ফিরিয়ে দৃঢ় স্বরে বললেন, "না, মিস্টার চক্রবর্তী। আপনার উচ্চারণ পরিষ্কার ও কথাগুলি ভাবপূর্ণ।

আপনার নীরবতা ভাষাজ্ঞানের অভাব থেকে নয়, ওটি আপনার ইচ্ছাকৃত।”

১২

সোমবার ডাকঘরের ঠিকানায় সুধীর ভারতীয় মেল এল। সে খামের উপরকার হস্তাক্ষর দেখে চিনতে পারল—একখানি মহিমচন্দ্রের, একখানি তার মামার ও একখানি তার এক পুরাতন সতীর্থের। মামার চিঠিখানি মামুলী, কে কেমন আছে তার খতিয়ান ও কে কী জানিয়েছে—প্রণাম না আশীর্বাদ। সতীর্থ মুরলীমোনহর ইংলণ্ডের খরচপত্রের খবর চায়।

মহিমচন্দ্র মুঙ্গেরের ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ীর শাদা হরফে নাম তোলা পরিপাটি চিঠির কাগজে দিশাহারা হয়ে কলম ছুটিয়েছেন। প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা দার্শনিক ও পারমার্থিক তত্ত্ব। তারই ফাঁকে এক জায়গায় উজ্জয়িনীর অন্তর্ধানের তথ্য। শেষের দিকে সুধীকে বারংবার অনুরোধ করেছেন বাদলের কাছে ঘটনাটা বিশেষ কৌশলে পাড়তে। ঘটনাটার রটনা যাতে না হয়। মহিমচন্দ্র এ পর্যন্ত খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেননি, খবরের কাগজ-ওয়ালারাও গন্ধ পায়নি। পুলিশের ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ থেকে অতি সঙ্গোপনে অনুসন্ধান হচ্ছে। মহিমচন্দ্র হাজার টাকা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। উজ্জয়িনীকে তার এই গর্হিত আচরণের পর ফিরে পাওয়া গেলেও বধূরূপে স্বীকার করা যাবে না, বাদলের নতুন করে বিয়ে দিতেই হবে, তবু সামাজিক কলঙ্ক এড়াবার জন্য তাকে উদ্ধার করাও দরকার। কী করা যায়। সংসার করতে গেলে কঠিন হতে হয়। “Stern daughter of the voice of God” ইত্যাদি।

মহিমচন্দ্র আশা করেন বাদল তার স্বাস্থ্য অটুট রেখে সিবিল সার্বিস্ পরীক্ষার জন্যে তার স্বাভাবিক একাগ্রতার সহিত প্রস্তুত হচ্ছে ও যথাকালে তার পূর্ব পরীক্ষাগুলির মতো এটিতেও তার স্বাভাবিক মেধার দ্বারা কৃতকার্য হবে। তিনি তার বিক্ষেপের আশঙ্কায় ইদানীং চিঠিপত্র লেখেন না, তবে এমন একটা অভাবনীয় পারিবারিক ঘটনা সম্বন্ধে বাদলকে একটা আভাস পর্যন্ত না দিলে কোনখান থেকে উড়ো খবর কি উড়ো চিঠি পেয়ে তার পরীক্ষা যাবে ঘুচে।

উজ্জয়িনীর গৃহত্যাগকালীন অবস্থার উল্লেখ মহিমচন্দ্রের পত্রের কোথাও ছিল না, সুধী কতবার উলটে পালটে খুঁজল। কেন গেল, কেমন করে গেল, কোন অভিমুখে গেল, সঙ্গে কী নিয়ে গেল, পিছনে কী রেখে গেল—কোনো বার্তা কি কৈফিয়ৎ, এ সকল বৃত্তান্ত মহিমচন্দ্র ইচ্ছাপূর্বক চাপা দিয়েছেন, কি অনবধানবশত ছেড়ে গেছেন, সুধী সাব্যস্ত করতে পারল না। তার মর্মে বিদ্ধ হয়ে থাকল—উজ্জয়িনীকে গ্রহণ করা হবে না, শুধু উদ্ধার করা হবে। কেন, তার চরিত্র কি সন্দেহের অতীত নয়? সে কি সন্দেহের কোনো

হেতু লুকিয়েছে ? সে কি বেরিয়ে গেছে কোনো পুরুষের সঙ্গে ? কিংবা কোনো পুরুষের ইঙ্গিতে ? কেন তবে কাকামশাই ধরে নিয়েছেন যে বাদলের নূতন করে বিয়ে দিতেই হবে ? তিনি অবশ্য জানেন না যে বাদলের সাধনায় নারীর স্থান নেই—অন্তত নেই স্ত্রীর স্থান। সুধী ও বাদল দুজনেরই সাধনা স্ত্রী-বর্জিত, দুজনেই সন্ন্যাসের বিরুদ্ধবাদী হয়েও কার্যত সন্ন্যাসী।

উজ্জয়িনীর গৃহত্যাগ মহিমচন্দ্রের সংকল্পের দ্বারা সংযুক্ত হয়ে রহস্যসঙ্কুল হয়ে উঠল। যেন একটা রোমহর্ষক উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদ। তার উদ্ধারের জন্যে ডিটেকৃটিভ লেগেছে। নিশ্চয় তার পায়ের চিহ্ন, গায়ের কাপড়, বইয়ের পাতা, সিঁদুরের কৌটা, চুলের ফিতা ইত্যাদির কোনো একটাকে 'clue' করে থানায় থানায় স্টেশনে স্টেশনে সাংকেতিক লিপি ও তার প্রেরিত হচ্ছে, রেলে মোটরে গোরুর গাড়ীতে এক্কা গাড়ীতে টাঙ্গায় চড়ে নানাবেশী চর চরাচর বেষ্টন করছে। বেড়াজাল ক্রমশ গুটিয়ে গুটিয়ে আসছে ও উজ্জয়িনীকে ছেঁকে তুলবে। তার রক্ষা নেই। পুলিশের লোক তাকে উদ্ধার করবেই। হয়তো এতক্ষণে করেছে।

উদ্ধারের পর তাকে নিয়ে কাকামশাই করবেন কী। হয়তো তাকে মিসেস গুপ্তের কাছে ফেরত দিয়ে বলবেন, 'আপনার মেয়ে আপনার বাড়ীতে থাক, আমার ওখানে জায়গা নেই। জায়গা কোনোদিন হবেও না।' আহা বেচারি। তার আধ্যাত্মিক অভিসার কঠিন বাধা পেয়ে বন্ধ হবে, তার সাধ থেকে যাবে অতৃপ্ত, গার্হস্থ্যের মধ্যে তাই সে শান্তি পাবে না। শ্বশুরবাড়ীতে ছিল তার সম্মানের আশ্রয়, বাপের বাড়ীতে সে পাবে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা। তারপর তার স্বামী— এই যথেষ্ট যে বাদল পুনর্বার বিবাহ করবে না।

কিন্তু কোথায় বাদল। পাগলাটাকে কত কথা বলবার ছিল, তার পাগলামির কোন পর্যায় চলছে সেটার তত্ত্ব নেওয়া দরকার। টাইমস কাগজে তার বিজ্ঞাপন অবশ্য নিয়ম মেনে প্রতি বুধবার প্রকাশিত হচ্ছে—কিন্তু কয়েক সপ্তাহ ধরে ঐ একই বাণী : BADAL TO SUDHIDA : GETTING ALONG. এর থেকে তার চিন্ত্যমান বিষয়ের সূচনা পাওয়া যায় কি ?

"মিস মার্শ যে।" সুধী চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্ভ্রম প্রদর্শন করল। তার কোল থেকে চিঠিগুলো মেঝেয় ছড়িয়ে গেল। "না, না, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, আমি তুলে নিচ্ছি। আপনি বসুন।"

ড্রইং রুমে অন্য কেউ ছিল না, মিসেস ডাভলীর কুকুর ছাড়া। কুকুরটা সুধীর ন্যাওটা হয়ে পড়েছে, তার পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকতে ভালোবাসে।

"আপনি আজ কোথাও বেরলেন না যে ?" মিস মার্শ প্রশ্ন করলেন।

"ঠিক বেরই নি বলা যায় না। ডাকঘর থেকে এই ক'খানা চিঠি আনতে গেছলুম।"

সুধী উত্তর দিল, "ভাবছি বেরিয়ে পড়লে হয়।"

"কোন্ দিকে?"

"দ্বীপের দক্ষিণ পার ধরে Freshwater-এর দিকে।"

"হাঁ। ওদিকটাও দেখা উচিত। আমরা যখন এ দ্বীপে প্রথম আসি তখন Freshwater-এর প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হই। কেমন সমুচ্চ তটশিখর সমুদ্রের ভিতর থেকে উঠে এসেছে, কেমন সব উদগ্র চূড়া। ওদের বলে the Needles."

বাদলকে যেমন করে হোক খুঁজে বের করবার জন্যে সুধী প্রায় মরীয়া হয়ে উঠছিল। এইটুকু দ্বীপের কোনো অংশ বাদ দেবে না সে। তার আসা ও থাকা দৃশ্য উপভোগের জন্য নয়। উপভোগ অভিনিবেশ সাপেক্ষ। অন্বেষণও অভিনিবেশ সাপেক্ষ। যুগপৎ দুই বিষয়ে অভিনিবেশ মনুষ্যসাধ্য নয়। বড় বড় দাবা খেলোয়াড়েরা বোধ হয় অতিমানুষ।

"মিস মার্শ," সুধী দ্বিধাভরে বলল, "আপনাকে বলতে ইচ্ছা করি যে আমার একটি প্রিয় বন্ধু এই দ্বীপের কোনোখানে অজ্ঞাতবাস করছে। তার সন্ধানে এসে অদ্যাবধি আমি নিষ্ফল হয়েছি।"

"তিনি অবশ্য ভারতীয়?"

সুধী হাসল। বলল, "ওর ধারণা ও ইংরেজ। কিন্তু জন্ম ওর খাঁটি ভারতীয় বংশে।"

"বড়ই আশ্চর্য ধারণা। কিন্তু কই, এমন কোনো যুবক নিকটে বসবাস করছেন বলে তো শুনিনি। আপনি ঠিক জানেন যে তিনি এই দ্বীপের এই অঞ্চলে রয়েছেন?"

"এখনো রয়েছে কিনা ঠিক জানিনে। কিন্তু দিন পনেরো আগে ছিল বলে অনুমানের হেতু আছে।"

মিস মার্শ ঈষৎ অনুযোগের স্বরে বললেন, "আমাকে এতদিন বলেন নি। পুলিশের সঙ্গে আমার বেশ জানাশুনা আছে, ওরা খোঁজ নিয়ে জানাত। আচ্ছা, আমি তা হলে পুলিশের কাছে চললুম। আপনি Freshwater ঘুরে আসুন, কাজ যদি বা না হয় বেড়ানো তো হবে।"

সুধী তাঁকে ধন্যবাদ দিল। বলল, "তার দরকার নেই।"

১৩

এর পর যখন দেখা হল মিস মার্শ ধপ করে বসে পড়ে বললেন, "কী দুর্ভাগ্য! Nitonএর Ye Olde Englishe Inne-এ যে ভারতীয় যুবকটি আজ তিন মাস ধরে বাস করছিলেন তিনি ঠিক পরশু বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। হায়। হায়! ওটা আমার চেনা বাড়ী, মিসেস মেলভিলকে ফোন করায় তিনি আক্ষেপ করে বললেন, ছয় মাসের ভাড়া ও খাই খরচ আগাম পেয়েছিলুম, তিন মাসের বাবদ ঋণী হয়ে রইলুম।"

সুধী বলল, "মিসেস মেলভিলকে এ বাড়ী থেকে ফোন করা যায় না ?"

"কেন যাবে না ? আসুন ফোন করবেন।"

মিস মার্শ "মিসেস মেলভিলের সাড়া পেয়ে বললেন, "আমি Larks' Spur-এর মিস মার্শ ।···একটি ভারতীয় যুবক, মিস্টার চক্রবর্তী, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। মিস্টার চক্রবর্তী, ধরুন।"

সুধী জিজ্ঞাসা করল, "আপনার ওখানে যিনি ছিলেন তাঁর নাম কি মিস্টার সেন ?"

"হাঁ, আপনি কি তাঁকে চেনেন ?"

"তিনি আমার বন্ধু। যাবার সময় কি তিনি তাঁর ঠিকানা দিয়ে গেছেন ?"

"না। তাঁর তাড়াতাড়ি দেখে আমি তো জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলুম। বৈকালে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ এসে বললেন, 'মিসেস মেলভিল, গুডবাই, আমাকে এখনি একটা ট্রেন ধরতে হবে। ব্যাপার জরুরী।' আমি হতভম্ব হয়ে তাঁকে গেট অবধি পৌঁছে দিলুম। বললুম, 'আপনার এখনো তিন মাসের আগাম দেওয়া টাকা মজুত রয়েছে।' উনি বললেন, 'ও টাকা আমি ফেরত পেতে পারিনে, চাইওনে। ও রইল আমার স্মারক হয়ে।' আমার স্বামী বাড়ী ছিলেন না। আমার মেয়ে মেরিয়ন তাঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এল।"

"ধন্যবাদ, মিসেস মেলভিল। তিনি হয়তো আপনাকে ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখবেন। আমার অনুরোধ এই যে, ঐ ঠিকানা আপনি দয়া করে মিস্ মার্শকে জানালে তিনি অনুগ্রহ করে আমাকে সংবাদ দেবেন। বন্ধুটি একটু মাথাপাগলা, তা বোধহয় আন্দাজ করেছেন।"

"তা আর করিনি ? আপনি আসুন না একদিন এদিকে, আপনাকে তাঁর কাহিনী শোনাব।"

"ধন্যবাদ, মিসেস মেলভিল। আমার আর এ অঞ্চলে থাকতে মন লাগছে না, পাগল বন্ধুর খোঁজ খবর নিতে আমার আসা। যখন সে নেই বলে নিশ্চিত জানলুম তখন আমিও আর থাকি কেন ? গুড্ বাই।"

মিস মার্শ অনতিদূর থেকে কান পেতেছিলেন। শুধালেন, "আপনি সত্যি চললেন নাকি ?"

সুধী ব্যস্ততার সহিত বলল, "হাঁ, মিস মার্শ। আমি কাল ভোরে রওনা হব।"

"সে কী ! দল বেঁধে থিয়েটার যাওয়ার কথা ছিল যে !"

"দলের বাঁধন আমার একলার অভাবে খুলে পড়বে না।"

"আপনার টিকিট যে কেনা হয়ে গেছে !"

"বন্ধু তিন মাসের আগাম ছাড়তে পারেন। আমি একখানা টিকিটের জন্য হা-হুতাশ

করব ?"

মিস মার্শ তখন আর কিছু বললেন না। পরে এক সময় প্রসঙ্গটি পাড়লেন। বললেন, "আমাকে সাহায্য করবেন বলে ভাবতে দিয়েছিলেন যে।"

"নিশ্চয় সাহায্য করব, যদি সাধ্যে কুলায়।"

মিস মার্শ অকস্মাৎ ঝরঝর করে চোখের জল ঝরালেন। তারপর রুমালে মুখ ঢেকে বসে রইলেন। সুধী বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল।

বিকৃতকণ্ঠে মিস্ মার্শ বললেন, "তবে শুনুন, কাথিয়াবাড়ে আমার কোলের ছেলেকে ফেলে এসেছি এগারো বছর আগে। তার বাপ ওদেশের একজন রাজা, মহাযুদ্ধের সময় লণ্ডনে তাঁকে দেখি ও মূঢ়ের মতো তাঁর সঙ্গে পালিয়ে যাই। জানা ছিল না ওদেশের সমাজ কেমন। যে অপমান পেয়েছি তার ইতিহাস গেয়ে কী হবে ? খেয়াল ছিল না যে হিন্দুদের আইনে ডিভোর্স নেই। আমাদের আইন অনুসারে রাজা আমাকে বিয়ে করতে পারেন না। তাঁর অন্য রানী ছিল। ভুল যা করলুম তার থেকে নিস্তারের আর কী উপায় ছিল—ছেলেকে তার জন্মভূমিতে রেখে চিরকালের মতো চলে আসা ব্যতীত ?"

সুধী চুপ করে শুনছিল। উচ্চবাচ্য করল না।

তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, "কিন্তু তার জন্যে বড্ড মন কেমন করে। তার খবর পেতে চাই। তার বাপ চিঠির উত্তর দেন না। মনে করেন উত্তর দিলে ওকে আমি পিতৃত্বের স্বীকৃতি হিসাবে আদালতে ব্যবহার করব। শুধু কিছু টাকা পাঠিয়ে দেন আমার লেখনী বন্ধ রাখবার আশায়। কী অপমান !"

তাঁর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস সুধীকে বিব্রত করল। সে বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা, আমি দেশে চিঠি লিখে খবর আনিয়ে দেব। আপনি আমাকে রাজার ও রাজ্যের নাম জানাবেন।"

"কে জানে সে ছেলে আজও বেঁচে আছে কি না। রাজা কি তাকে রাজ্যে রেখেছেন, না তাঁর বন্ধের বাড়ীতে, না তাঁর পুনার কুঠিতে ? তার প্রতি কেমন ব্যবহার করা হচ্ছে, কে আমাকে বলবে ! রাজকুমারের মতো, না অনাথ বালকের মতো।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি সব খবর আনাব।"

"ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, হে আমার উপকারক, হে আমার বন্ধু !"

অশ্বারোহণ পর্ব

১

দেখ, অমন করে পারবে না। আপোস কর।

কে হে ! আপোস করার পরামর্শ কে তুমি আমাকে দিচ্ছ। কী তোমার নাম ?

আমার কি একটা নাম ? কেউ বলে শয়তান, কেউ বলে মার। আমি ফাউস্টের

মেফিস্টোফেলিস।

তুমি এখানে এসেছ কী করতে ? জান না আমি বাদল। আমি কারুর পরামর্শ চাইনে, পেলে নিইনে।

আহা, আমি কি পরামর্শ দিতে এসেছি ? আমি কি তোমার পর ? আপনার লোক যা বলে তা প্রকারান্তরে আপনার কথা।

তোমার তো আস্পর্ধা কম নয়। আপোসের পরামর্শ দিয়ে আমাকে বোঝাচ্ছ ওটা আমার আপনার কথা ! বাদল কখনো আপোসের চিন্তা করে ?

না, না, আমি কি তাই বলেছি ? আমি—বুঝলে কি না—আমি বলেছি—বুঝলে কি না—বলেছি যে—বুঝলে কি না—

অত বার 'বুঝলে কি না' বলে আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে অপমান কোরো না। খবরদার। জান না যে আমি বাদল। বুদ্ধিতে আমার সমকক্ষ নেই।

নিশ্চয়, নিশ্চয়। বুদ্ধিতে তোমার সমকক্ষ ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। সেই জন্যে তোমার কাছে আমার আগমন, আমি কি যার তার কাছে যাতায়াত করি ? আমি মহা খুঁৎখুঁতে সমালোচক।

হুঁ ! এসেছ ভালো করেছ ! কিন্তু বাজে বকতে পাবে না। আমি আজ চব্বিশ দিন ধরে ভাবছি আত্মা আছে কি না। রোজ মনে হয় আছে, রোজ মনে হয় নেই। রাত্রে চিন্তার সূত্রে গ্রন্থি দিই, সকালে দেখি গ্রন্থি খোলা। ভারি ফ্যাসাদ।

বাস্তবিক। সমবেদনায় আমার বুক ব্যাকুল। সেইজন্যে আমার মুখ মুখর। বন্ধুর বাণী যদি শোন তো বলি, আপ—না, না, বুঝলে কি না—

ফের 'বুঝলে কি না।'

না, না, দোষ হয়েছে, মাফ কর। আমি বলছিলুম যে আপাতত ধরে নিলে হয় আত্মা আছে। ঐ আপাতসিদ্ধান্তকে আশ্রয় করে অন্যান্য বিষয়ে মনোনিবেশ করলে সদ্য ফল পাওয়া যায়। রোজ একটা করে সমস্যার মীমাংসা হয়, একটা করে ধাঁধার জবাব মেলে।

কিন্তু ভিত্তি দুর্বল হলে তার উপর যতগুলি তলা গড়া হবে ভেঙে পড়বার সম্ভাবনা ততই বেশি হবে। ঠেকা দিয়ে ভেঙে পড়া বন্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু ছাদ ফাটবে, দেয়াল ফাটবে, মেঝে ফেটে চৌচির হবে, জোড়াতালি দিতে দিতে সব নতুন হয়ে উঠবে, অথচ তেমনি ভঙ্গুর থেকে যাবে।

পক্ষান্তরে এই ভিত্তি নিয়ে তুমি চিরকাল ব্যাপৃত থাকবে ও কোনো দিন এটুকু গড়া শেষ করবে না। সমাজ, রাষ্ট্র, যুদ্ধ, শান্তি, বিজ্ঞান, যন্ত্র ইত্যাদি হাজার বিষয়ে ভাবনা মুলতবী রাখবে ! দুনিয়ার লোক তোমার দ্বারা না হয়ে অন্যের দ্বারা নীয়মান হবে।

কিন্তু মাটির দিকে না তাকালে আমিও হব অন্ধ। সেই যে জ্যোতির্বিদ আকাশের দিকে চেয়ে চলতে চলতে গর্তে পড়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন তাঁর তুলনায় অন্ধরাও সাবধানী।

ছি, বাদল, ছি। তুমিও শেষকালে 'Safety First' আওড়ালে। গর্তে পড়ে প্রাণ হারানোর ভয়ে তুমি তোমার ও তোমার সঙ্গে সমস্ত মানুষের চলা থামালে। সমস্ত মানুষ এক সঙ্গে একটা গর্তে পড়লে গর্তটারই তো ভয় পাবার কথা।

হুঁ। তুমি তা হলে সত্যকে বাজিয়ে নিতে বল।

অগত্যা। নতুবা তুমি সত্যের খোঁজে জীবন ভোর করে দেবে। দেখ না হিন্দুরা কেমন আরামে মূর্তি পূজা করে। তোমার মতো নাছোড়বান্দা হলে ওরা হয়তো একদিন ভগবানকে পেত, কিন্তু তার আগে পেত যমকে। যেমন নচিকেতা পেয়েছিল।

আমিও একজন নচিকেতা।

ঐ তো তোমার ছেলেমানুষী। কেন, বাপু, পৃথিবী থেকে যমলোকে যাবে! তুমি ভেবে দেখ, বাদল, কোনো মতে কিছু রোজগার করে চারটি ভালোমন্দ খেয়ে বেঁচে বর্তে থাকার মতো সৌভাগ্য আর নেই। কত অচেনার সঙ্গে পরিচয়, কত বন্ধুতা, কত প্রেম, কত দেশপর্যটন, শোভাসন্দর্শন, কত থিয়েটার সিনেমা অপেরা—এই তো লণ্ডনের Covent Garden-এ অপেরা ঋতু, হায় বাদল—কত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, কত গল্পগুজব, খবরাখবর, ঘোড়দৌড়, জুয়াখেলা, কত আইন-আদালত পার্লামেণ্ট লীগ অফ নেশন্স। কত বলব? কিছুই তো বলা হল না। বেঁচে থাকার মতো আনন্দ আর নেই—শুধুমাত্র প্রাণধারণ পানভোজন বায়ুসেবন। এই অনেক।

হুঁ।

অতএব—

অতএব আপোস?

তুমি নিজেই ও কথা বললে। আমাকে বলতে হল না।

হুঁ। ভাবতে দাও।

দেখ বাদল। মানুষ চিরকাল আপোস করে এসেছে। নইলে এই সব ক্রিশ্চানরা পরস্পরকে এরোপ্লেন সাবমেরিন ট্যাঙ্ক বিষবাষ্প ইত্যাদি দিয়ে মহোল্লাসে সাবাড় করত না। ওদিকে বৌদ্ধ জাপানও আপোসের চূড়ান্ত করেছে। সৌন্দর্যোপাসক জাপান কুৎসিত সস্তা খেলো জিনিস বানিয়ে বস্তায় বস্তায় রপ্তানি করছে। কত উদাহরণ দেব! আপোস ছাড়া যে মানুষ অন্য কিছু করতে পারে এ আমি বিশ্বাস করিনে বলে ওরা আমাকে বলে শয়তান, মার, মেফিস্টোফেলিস্। প্রকৃতপক্ষে আমি হচ্ছি মানুষের কমন-সেন্স। মানুষ মুখে যে সব লম্বা চওড়া কথা বলে, কাজ করে তার সিকি পরিমাণের

সিকি পরিমাণ, মানুষ মনে যে সব মহাকীর্তির কল্পনা পোষে মনের বাইরে ওসব পাখী উড়তে পারে না, ডানা ঝটপট করে। আমি মানুষকে তার ক্ষমতার হিসাব নিয়ে জমা অনুসারে খরচ করতে বলি। শেষ পর্যন্ত ওরা করেও তাই, শুধু আমাকে নরমপন্থী বলে গরম গরম গাল পাড়ে।

সব মানুষকে তুমি এক কোঠায় ফেলছ যে।

দু চারজন ক্ষণজন্মা ছাড়া বাদবাকী সব মানুষ শেষ পর্যন্ত কমনসেন্স-এর এলাকায় আসে, আপোস করে।

আমি ঐ দু-চারজনের একজন।

তা হলে তোমাকে একটু বাজিয়ে নেব, বাছা। ক্রুশে ঝুলবে, না হেমলক খাবে? যীশু বা সোক্রেটিস—কে তুমি?

আমি বাদল।

তা হলে তোমার জন্যে নতুন ব্যবস্থা করতে হবে। তোমার উপর দিয়ে মোটর চালিয়ে দিলে মন্দ হয় না।

আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে যেন দৃঢ়ভাবে জানি যে আত্মা আছে ও থাকবে।

তা যদি তুমি জানতে পাও তবে আমার মোটর হাঁকানো বৃথা হবে। আমি পরাজয় ভালোবাসিনে। তোমার মৃত্যুর পরে তোমার সত্যনিষ্ঠা আমার উপর—মানুষের কমনসেন্সের উপর—জয়ী হলেও হতে পারে। কিন্তু তোমার জীবদ্দশায় তোমার জয় হবে না।

হবে না?

না, বাছা। যীশুরও হয়নি। সোক্রেটিসেরও না।

তবে মৃত্যুর পূর্বে আমি জানতে পাব না আত্মা আছে ও থাকবে কি না?

না। জানবে মৃত্যুমুহূর্তে। মৃত্যুমাত্রে।

শয়তান! দুশমন! মার।

যথার্থবাদী। পরীক্ষক। বন্ধু।

২

মিসেস মেলভিলের কালো বেড়াল ভাগ্যলক্ষ্মীর বাহন "Nibs" বাদলের ঘরে ঢুকে বিস্কুটের টিন খোলা পেয়ে একখানা বিস্কুট মুখে তুলে নিল, নিয়ে লাফ দিয়ে একটু দূরে সরে বসল। শেষ করে একমনে থাবা চাটছে এমন সময় বাদলের তন্দ্রা গেল ছুটে। সে চোখ মেলে দেখল, শয়তান নয়, নিব্‌স।

বেড়ালের প্রতি বাদলের অহেতুক ভয় ছিল। কেউ তাকে এই নিয়ে ক্ষেপালে সে

বলত, জান না, নেপোলিয়নের মতো বীরশ্রেষ্ঠ বেড়াল ছাড়া আর কাউকে ভয় করতেন না? আদি-মানবের সঙ্গে আদি-বিড়ালের খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নয়। বাপ রে, বেড়াল কি একটা জন্তু? বেড়াল একটা জন্তুবেশী রাক্ষস।

নিব্‌স যে জন্তুবেশী শয়তান হতে পারে এই অযৌক্তিক কুসংস্কার সদ্য তন্দ্রামুক্ত বাদলকে বিষম ভয় পাইয়ে দিল। ছোট ছেলেরা ভয় পেলে উলটা ভয় দেখিয়ে সাহস পায়—হুঙ্কার ছাড়ে, তর্জনী উঁচায়, মাটিতে পদাঘাত করে। বাদলও তেমনি ক্রোধের ভান করে ধমক দিয়ে বলল, "হুস।" নিব্‌স তা শুনে দাঁত বের করে বেপরোয়া ভাবে উত্তর দিল, "মিঁইউউ।" তার গোঁফের ভাব ব্যঙ্গব্যঞ্জক। বাদলের মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে গলিত বরফ প্রবাহিত হতে থাকল। সে আর একবার তাড়া দিয়ে বলল, "ধো!" নিব্‌স লাফ দিয়ে জানালায় উঠল। বাদলের দিকে মুখ ফিরিয়ে ত্রস্ত চকিত অথচ একাগ্র দৃষ্টিতে চাইল। বাদল ঠাওরাল ওটা স্পর্ধা সূচক কটমট চাউনি। সে সভয়ে গর্জন করে উঠল, "Get out." নিব্‌স তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হলো।

বাদল নার্ভাস হাসি হেসে আপন মনে বলল, "বেটা শয়তান। তুই ধমকে ফেরার। ইনি আসেন আমাকে আপোসের মন্ত্রণা দিতে।"

থেকে থেকে বাদলের মনে হতে লাগল, বাস্তবিক এমন করে আর কতদিন চলবে? এক একটা প্রশ্নের জন্যে চব্বিশ চব্বিশটা দিন বিসর্জন দিয়েও আদিতে যে অবস্থা অন্তেও তা-ই। জীবন তো এমনি করে আঙুলের ফাঁক দিয়ে জলের মতো গলে যায়। অথচ ওর বিনিময়ে উপচয় কি কিছু হলো? মনকে ফাঁকি দেবার জন্যে স্তোকবাক্য অবশ্য আছে, চব্বিশ দিনের নিরত চিন্তা মনের পক্ষে প্রাত্যহিক হাওয়া খাওয়ার মতো। মেরিয়নের ঘোড়া যেমন হাওয়া খেয়ে ফিট থাকে, বাদলের মনও তেমনি ফিট থাকতে চায় অহেতুক মননের দ্বারা। কিন্তু বাদলের বয়স যে বাড়ছে, সে কি কেবল ফিট থাকা মন নিয়ে আর সন্তোষ পায়? সে কি আর কলেজের ছাত্র! ফুলের কাল গেছে, ফলের কাল হলো। বাদল প্রত্যাশা করে উপচয়। শুধু ফিট-থাকা নয়, প্রফিট দরকার। লাভ দেখাতে হবে জীবনের ব্যাপারে।

আসল কথা বিশুদ্ধ মননের উপর বাদলের আর ঝোঁক ছিল না। ফলিত মননের আকর্ষণ ধীরে ধীরে ও অগোচরে তাকে আপোসের অভিমুখ করেছিল। চব্বিশ দিন কেন চব্বিশ বছরও বিশুদ্ধ মননে নিবিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে শ্রান্তিকর হতে পারে না, শ্রমই তার বিশ্রাম। বাদল কিন্তু চব্বিশ দিনের অভিনিবেশের পর ক্ষান্তি দেবার উপলক্ষ্য খুঁজছিল। তাই তার ঘরে শয়তানের আবির্ভাব।

এমন করে আর কত দিন চলবে? অন্যান্য ভাবুকরা খরগোশের বেগে অগ্রসর হচ্ছে, বাদল কেবল কচ্ছপের মতো পশ্চাতে পড়ে রয়েছে। একে একে সকলেই তাকে ছাড়িয়ে

গেল, সে এখন হাজার ত্বরান্বিত হলেও তাদের নাগাল পাবে না। ঈশপের খরগোশের মতো তারা যদি পথের ধারে ঘুমিয়ে পড়ে বাদলকে পথ ছেড়ে দেয় তবেই বাদলের যা-কিছু আশা থাকে, নতুবা বিশ্বের চিন্তা প্রতিযোগিতায় বাদল যদি একখানা আঁক চব্বিশ মিনিট ধরে কষেও বেঠিক উত্তর পায় তবে তার জায়গা হবে সকলের নিচে, সকলের পিছে।

ধাবমান মন, বেগবান মনন, সে যেন অশ্বারোহণের মতো উল্লাস-হিল্লোলযুক্ত। তা নয় তো এই নিরানন্দ স্থাণুর জীবন। শরীরটা নিশ্চল বলে মনটাও খাঁচার পাখীর মতো ছটফট করতে করতে ক্লান্ত হয়ে নিরাশ হয়ে অনড় হয়ে যায়। সমস্ত শরীর যদি না সাধনা করে, কসরৎ করে, তবে একা মস্তিষ্ক কত করবে ? যতই করবে ততই নির্জীব হবে। বাদল ভাবল, চব্বিশটা দিনের বিশটা দিন যদি সে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াত ও মনকে দিত ছুটি তবে বাকী চারটে দিনে মনের পিঠে সওয়ার হয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যেত। কিন্তু কোনো টাইমটেবলে ওর নিশ্চয়তা নেই। চার দিনে যদি সত্যকে না পাওয়া যেত তবে তো চব্বিশটা দিন এমনি গেছে, অমনি যেত—বিশ্বপ্রতিযোগিতায় পেছিয়ে পড়া নিয়ে এই আক্ষেপ ও সেই আক্ষেপ সমান হত।

তবু ধাবমান মন, বেগবান মনন—এর নূতনত্ব বাদলকে প্রলুব্ধ করে। প্রতিদিন একটা করে সমস্যার সমাধান—আজ ডেমক্রেসী, কাল সোশ্যালিস্‌ম, পরশু আকাশযুদ্ধ, তরশু আন্তর্জাতিক পুলিশ। এসব হল ফলিত মনন, applied thinking. আপাতত বড় বড় সত্যের স্থিরীকরণ স্থগিত রাখলে খুব বেশী ক্ষতি হবে কি ? আত্মা আছে কি না এর উত্তর না দিয়ে আমি যদি আপাতত বেকার সংখ্যা হ্রাসের উপায় নির্দেশ করি তবে হয়তো আমার মনশ্চক্ষে জগতের সম্পূর্ণ চিত্রখানি পরিস্ফুট হবে না, তার কোলে বেকারদের স্থান কোন প্রতিবেশে ও কী পরিমাণে তা হয়তো সন্দর্শন করব না, তা সত্ত্বে কি লাভ করব না কিছু ? আপাতত মালমশলা সংগ্রহ হোক, পরে ভিত্তি পত্তন হবে।

আপোস করতে হবে—শয়তান যে অর্থে বলেছে সে অর্থে নয়, আত্মার অস্তিত্ব ধরে নিয়ে নয়, অন্য অর্থে, আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিচার মুলতবী রেখে। ধরে নিয়ে চিন্তা করা যেন ধার করে কারবার করা—লাভ হলে ধার শোধ করতে হয়, পুরা লাভটা পকেটস্থ হয় না ; আর ক্ষতি হলে তো ভিটে মাটি বিক্রী করে মহাজনের ডিক্রীর টাকা মেটাতে হয়। ধরে নিয়ে চিন্তা করার উপর বাদলের ঘৃণা সহজাত। বেটা শয়তান ! বাদলকে বলে ঋণ করতে ? যে মানুষ বন্ধুর কাছেও এক পয়সা ধারে না।

আপোস করতে হবে—ঘোড়ায় চড়তে হবে। এই সাব্যস্ত করে বাদল বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করল। গোটা দুই হাই তুলে সে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল ও দরজা খুলে বেরল।

৩

মেরিয়নের সঙ্গে ইতিমধ্যে বাদলের আলাপ হয়েছিল। কেমন করে হল তা বেশ মজার।

একদিন মেরিয়নের একটি সখী এসেছে দূর থেকে, হয়েছে তার অতিথি। দুই সখীতে খুব হাসাহাসি করছে ইতিহাসের একটা তারিখ মনে করবার নিষ্ফল প্রয়াসে।

মেরিয়ন বলছে, "Seven years' war, রোস, ভেবে দেখি। ১৮২৫ সালে তার আরম্ভ। নেপোলিয়ন এক দিকে আর অন্য দিকে সমস্ত ইউরোপ।"

সখী বলল, "যা। নেপোলিয়ন তখন কোথায় ? Seven years' war-এর তারিখ ঠিক বলতে পারলুম না, কিন্তু ওতে উল্ফ্ জিতেছিলেন কুইবেক আর ক্লাইভ জিতেছিলেন প্লাসী।" এই বলে সে বাদলের দিকে চুরি করে চাইল।

মেরিয়ন বলল, "ওঃ! এবার মনে পড়েছে। ১৮২৫ নয়, ১৭২৫, কুইন য়্যান্‌এর সময়!"

সখী তো হাসলই, বাদলও গাম্ভীর্য ধারণ করতে পারল না। বলল, "আমাকে যদি অনুমতি দেন তো আমি ঠিক তারিখটা বলতে পারি।" অনুমতির অপেক্ষা না করে ফস্ করে বলল, "১৭৫৬ সালে শুরু, ১৭৬৩ সালে শেষ।"

জোন্ বলল, "আশ্চর্য। আমিও ঠিক তাই ভাবছিলুম, কিন্তু বলতে ভরসা পাচ্ছিলুম না।"

মেরিয়ন বলল, "তাজ্জব! ইনি বিদেশী হয়েও আমাদের ইতিহাস আদ্যন্ত জানেন, আর আমরা—" এই বলে সে সখীর দিকে চেয়ে খিল্ খিল্ করে হাসল। সখীও সে হাসিতে তেমনি স্বরে যোগ দিল।

জোন্ বলল, "আমরা দু জনে দুটি গাধা!"

মেরিয়ন বলল, "মানুষের স্কুলে গিয়ে মানুষ হতে শিখিনি।"

বাদলের এ সব কথায় মনোযোগ ছিল না। মেরিয়ন যে তাকে বিদেশী বলল এতেই তার মনে কাঁটা ফুটে খচ্ খচ্ করতে থাকল। আর ইচ্ছা করল একবার তার গায়ের চামড়াখানা খুলে তার অন্তরটা উদ্‌ঘাটন করে দেখায়। তবে যদি এই সব শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিনী তাকে আপনার বলে চিনে তাকে বিদেশী ভেবেছে বলে লজ্জিত হয়। তার অন্তর থেকে উদ্গত হতে থাকল, I am one of you. I am one of you. I am one of you. কতবার তার মুখের ভিতর থেকে ঠেলে বেরতে চাইল, I am not one among you, I am one of you. শেষ পর্যন্ত সে যা বলতে পারল তা অতি তুচ্ছ কথা। বলল, "আচ্ছা, বলুন, ঘোড়দৌড়ের মতো গাধাদের যদি একটা দৌড় হয় তবে সে দৌড়ে প্রথম পুরস্কার কোনটা পাবে—যেটা সকলের চেয়ে এগিয়ে যাবে, না, যেটা সকলের চেয়ে পেছিয়ে পড়বে ?"

মেরিয়ন ও জোন্ মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। এত বড় পণ্ডিতের কাছে আর এক দফা অপদস্থ হবার ভয়ে ওরা সহজে মুখ খুলছিল না। অথচ মুখ না খুললেও অপদস্থ হতে হয় কম না। বিদেশীটি ভাববে এরা সত্যিই গাধা। মেরিয়ন জোনের উপর চটছিল, সে কেন মুখ খোলে না ? জোন্ চটছিল মেরিয়নের উপর, অনুরূপ কারণে। দুজনেরই মুখ লাল হয়ে উঠছিল আপেল পাকবার সময় যেমন হয়। বাদল ইতিমধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে কী একটা ভাবছিল, লক্ষ করল না যে জোন্ ও মেরিয়ন প্রথমে করল ভ্রূভঙ্গী, তারপরে তর্জনী তুলে মুখে ছোঁয়াল, তার পরে মুখ খুলে ঠোঁট নেড়ে বিনা ধ্বনিতে পরস্পরকে বলল, "তুই বল।" "তুই বল্ না।" "না, তুই আগে বল্ " ইত্যাদি।

বাদলের যখন স্মরণ হল যে সে যা প্রশ্ন করেছে তার উত্তর পায়নি তখন তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির কাছে জোন্ ও মেরিয়ন হাতে হাতে ধরা পড়ে গেল। অগত্যা জোন্ বলল, "গাধার দৌড়ে সেই গাধাটাই পুরস্কার পাবে যেটা গাধাতম গাধা, যেটা সম্পূর্ণ পশ্চাদবর্তী।" এই বলে সে বাদলকে জিজ্ঞাসা করল, "না ?"

"তা কী করে হবে ?" মেরিয়ন প্রশ্ন করল। "এত কষ্ট করে যে গাধাটা দৌড়ের সর্বাগ্রে রইল তার কষ্টের কি পুরস্কার নেই ?"

বাদলের উত্তর প্রত্যাশায় দুই জনের চার কানে কানের দৌড় বাধল।

বাদল বলল "কষ্টের দরুন কি কেউ স্কুলের পরীক্ষায় পুরস্কার পেয়েছে কোনো দিন ? কত পরিশ্রমী ছাত্রকে আমি মেধার দ্বারা পরাস্ত করেছি। পরিশ্রমের পরীক্ষাক্ষেত্র মৌমাছিদের চাক, কিংবা unskilled labour নিয়ে যেখানে কাজ চলে সেই সব কারখানা। মিস মেলভিল, শয়তানকে তার পাওনা দিন, আর গাধাকে দিন গাধামির পুরস্কার।"

এ যুক্তি মেরিয়নের মনঃপূত হল না। দেখ দেখি একটা জন্তু এত আয়াসে প্রথম স্থান অধিকার করল, পুরস্কার পেল না সে, পেল যে সকলের অধম। মেরিয়ন নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করে নিঃশ্বাস বায়ু নিষ্কাশন করল। বলল, "জগতে যোগ্যের পুরস্কার নেই।"

"মিস মেলভিল্," বাদল তার তোষণের জন্যে বলল, "আপনার প্রথম গাধাটির জন্যে সমবেদনা বোধ করছি। কিন্তু কী করব বলুন, আমার হাতে পুরস্কার মোটে একটি, আর আপনার বন্ধুর অন্তিম গাধাটি আস্ত গাধা। তাকে প্রকৃতি নিজে হাতে গর্দভোত্তম করেছেন প্রাকৃতিক নির্বাচনে পুরস্কারটা তারই প্রাপ্য। তবে ঘোড়ার বেলায় আমি আপনার প্রথম ঘোড়াকে নিরাশ করব না, কথা দিচ্ছি।"

জোন্ বলল, "শুনলি তো ? এখন প্রসন্ন হ'।"

৪

আপোস করবে—ঘোড়ায় চড়বে, এই সংকল্প নিয়ে বাদল মেরিয়নকে খুঁজে বের করল ও বলল, "মিস মেলভিল, আপনার একটা ঘোড়ায় চড়তে পারি ?"

মেরিয়ন অবাক। এই মানুষটিকে উপর তল থেকে নিচে নামতে দেখা দৈবাৎ ঘটে। ঘোড়া কি ইনি দোতলায় চড়বেন ?

বাদল বলল, "দেখুন। ঘোড়ার পিঠ আমার মাথা-উঁচু হবে না, আমার কোমর পর্যন্ত হলেই আমি নিরাপদ বোধ করব।"

মেরিয়নের ইচ্ছা করল, বলে, একটা বাইসিক্ল দিলে চলবে কি ?

"আর দেখুন," বাদল বলল, 'বেশ ঠাণ্ডা মেজাজের হওয়া দরকার। আমি যখন থাম বলব—থামবে। আমার নামবার সময় বোঁ করে ছুটবে না।"

এমন অশ্ব মেরিয়ন পায় কোথায় ? তার একটি পোনি ছিল, নাম মেরী, রং ধলা, সাইজে বাদল যেমন চায়। কিন্তু আদপেই হুকুম মানে না, বেয়াদপ যাকে বলে। থাম্ বললে চলে, চল বললে থামে, ডাইনে চাইলে বাঁয়ে যায়, বাঁয়ে চাইলে ডাইনে যায়। যত মার খায় তত বায়ু ছাড়ে—সশব্দে। মোট কথা, এমন ঘোড়া কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। কেউ খুঁজতে রাজী নয় বলে মেরী স্বাধীনভাবে চরেন ও বাঁধা পায়ে বিচরণ করেন। আস্তাবলে তাঁর খানার জন্যে দানাও নেই, শোবার জন্যে খড়ও নেই।

বাদলের জন্যে সেই অশ্বিনী আনীত হল। বাদল তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে কানে কানে বলল, "ভালো ঘোড়া, শান্ত ঘোড়া, মিষ্টি ঘোড়া। চিনি খেতে দেব, চকোলেট খেতে দেব, আর কী খাবে বল ?"

মেরীর চেহারা দেখলে সাধারণ মানুষের হাসি পায়। চোখ তার হিপোপোটেমাসের চোখের মতো, দেড়খানা কান, নাসিকাছিদ্র হাপরের মতো উঠছে পড়ছে। বাদল কিন্তু মেরীর রূপে প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ! মেরী যখন চিঁহি চিঁহি করে দুবার চিৎকার করল, বাদল ভড়কে গিয়ে দু পা পিছু হটল, তারপর সেই ধ্বনিমাধুর্যের উচ্চ প্রশংসা শোনাতে শোনাতে তার দিকে এক-পা এক-পা করে অগ্রসর হলো—আশা, উচ্চ প্রশংসা শুনে ঘোড়াটা বাদলকে বন্ধু বলে জেনেছে।

বাঁ পা রেকাবে রেখে এক লম্ফে ঘোড়ার পিঠের উপর চেপে বসে ডান পা'টা যখন রেকাবে ঢুকিয়ে দিল তখন তার হাড়ে কাঁপুনি ধরল। তার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে গেল, ও মেরিয়ন, ও চার্লি, তোমরা দু জনে দু পাশ থেকে যেও না, গেলে কিন্তু আমি পড়ে যাব। সে নুয়ে পড়ে মেরীর কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি মন্ত্র পড়ল—ভালো ঘোড়া, ঠাণ্ডা ঘোড়া, মিষ্টি ঘোড়া। চিনি খাওয়াব, চকোলেট খাওয়াব, আর কী খাওয়াব ?

ঘোড়া কিন্তু নড়ে না, শুধু থেকে থেকে মিহি সুরে চিঁহি চিঁহি করে। চার্লি বাদলের হাতে একটা চাবুক গুঁজে দিয়ে বলল, "মারুন এক ঘা।" বাদল ভয়ে মারতে পারে না, যদি তিন লাফে বাদলকে ভূমিসাৎ করে, মাড়িয়ে যায়, লাথিয়ে যায়? ওরে বাপ রে। তা হলে হয়েছে। বাদল চাবুকটাকে ঘোড়ার গায়ে লাগায় না, ঘোড়াও নড়ে না। শুধু খোশামোদের মতো করে বলে, "চল, চল, চ–অল।" চললে যে কী বিপদ হবে কে জানে, অতএব ঘোড়া অচল বলে বাদল যে অধৈর্য তা নয়।

দেখেশুনে বিরক্তি দমন না করতে পেরে চার্লি কষিয়ে দিল সপাং করে এক ঘা। তখন সেই তুরঙ্গ হ্রেষাধ্বনিপূর্বক দুল্‌কি চালে চললেন।

বাদলের প্রথমটা ভয়ে চোখ বুজে এসেছিল, গা শিউরে উঠেছিল, কিন্তু দেখা গেল বেত্ত এই ঘোড়ার সাধারণ খাদ্য, বলপ্রদ। দুলকি চালও বাদলের চমৎকার লাগল। ঘোড়াটা যতক্ষণ চলতে থাকে তার পশ্চাদভাগ ততক্ষণ সোরগোল করতে থাকে, সে এক মন্দ আমোদ নয়, যদি তার সঙ্গে গন্ধ না থাকে।

প্রথম দিনে বেশি দূর যেতে বাদলের সাহস হচ্ছিল না, কে জানে গাম্ভীর আওয়াজে যদি এ ঘোড়া চমকায় তবে বাদলকে পিঠ থেকে নামিয়ে কোন মুল্লুকে যে পালাবে, বাদল যদি বাঁচে তো ঘোড়ার জন্যে দেবে খেসারত। ফিরতে ইচ্ছা করে বাদল ঘোড়ার লাগাম ঘুরিয়ে কানে কানে বলল, ডাইনে। ঘোড়া অম্লান বদনে বাঁ দিকে ঘুরল। যাক, ঘুরেছে এই যথেষ্ট। তারপর দুলকি চাল ছেড়ে এমনি হাঁটতে লাগল। বাদলের বেশ পরিশ্রম হয়েছিল, সে আপত্তি করল না। কিন্তু সরাইয়ের সামনে বহু দর্শকের সম্মুখে বাদল যখন আদেশ দিল "থাম," তখন মেরী চার পা তুলে দিয়ে ক্যাণ্টার করতে আরম্ভ করল। বাদল লজ্জার মাথা খেয়ে চেঁচিয়ে বলল, "দাঁড়াও, থামাও, থামাও।" ঘোড়াকে আগলে দাঁড় করিয়ে কয়েকজন ভদ্রলোক বাদলকে যখন নামালেন তখন শ্রমে ও শঙ্কায় সে প্রায় মূর্ছা যায়। চার্লি ঘোড়াটাকে নিয়ে গেল।

মিসেস মেলভিল ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে বললেন, "এ কী মিস্টার সেন! কে আপনাকে ঘোড়ায় চড়তে বলল?"

বাদল অধোবদন।

মিস্টার মেলভিল পৃষ্ঠপোষকের মতো বলল, "এই তো পুরুষোচিত।"

বাদল ভাবছিল অত সহজে নিরস্ত হলে চলবে না, লেগে থাকতে হবে। উপস্থিত ঘোড়ায় চড়ার পোশাক কেনা দরকার হয়ে পড়েছে, নইলে ক্যাণ্টারকে ডরাবার কোনো সঙ্গত হেতু নেই। ভেণ্টনরে যেতে হবে কাল।

সেই সঙ্গে চুলটাও ছাঁটাতে হবে, এই কয় মাসে গহন বন হয়ে উঠেছে, ক্যাণ্টারকে ডরাবার সেও এক হেতু। শরীরের ভার যতই হালকা হবে ঘোড়ার উপর আসনও হবে

ততই বেপরোয়া।

সেই সঙ্গে সুধীদার চিঠিখানা তাকে দেওয়া যাবে।

৫

পরদিন সর্বদেহে বেদনা। যে অঙ্গটাকে নাড়তে যায় সেটাই চেঁচিয়ে ওঠে—আহা। কর কী, কর কী!

উপায়ান্তর না দেখে বাদল পুনর্মূষিক হল। ঘরের দরজা জানালা খুলতে যাবে তার জো নেই; বন্ধ ঘরের অন্ধকারে বিছানায় পড়ে পড়ে ভাবে কখন মিসেস মেলভিল আসবে, মুখে এক পেয়ালা চা তুলে ধরবে।

ওদিকে ঘোড়াটা বারংবার ডাকছে—চিঁ হি, কই হে। চিঁ হি, কোথায় তুমি। চিঁ হি, চড়বে না? চিঁ হি, চিনি খাওয়াবে না? বহুকাল পরে আরূঢ় হয়ে তার ইজ্জৎ বেড়ে গেছে, সে অন্যান্য ঘোড়াদের মতো শয্যা ও আহারীয় পেয়েছে, তারও গা ডলাই মলাই ধোলাই হচ্ছে। স্বয়ং মেলভিল তার তত্ত্ব নিতে এসেছিল, মস্ত বিল বানাবে।

মিসেস মেলভিল দরজায় টোকা মেরে বাইরে থেকে সুর করে সংকেত করল, “Coo-ee.”

বাদল বলল, “এখনো বিছানায়।”

“সে কী, মিস্টার সেন। ঘোড়ায় চড়বেন না?”

“না, মিসেস মেলভিল,” বাদল ব্যথার কথা চাপা দিয়ে বলল, “আমার ব্রীচেস নেই যে।”

“ব্রীচেস নেই বলে ভাবনা? আচ্ছা, মেরিয়নের ব্রীচেস এখনকার মতো ব্যবহার করতে পারেন, তাকে আমি বলব।”

“না, মিসেস মেলভিল। অন্যের ব্রীচেস আমার গায়ে ফিট্ করবে কেন? লোকে উপহাস করবে। তা ছাড়া, আমার চুলও কাটানো দরকার—মাথার উপর জঙ্গল নিয়ে ঘোড়ায় চড়া এক জঞ্জাল।”

“এই জন্যে ভাবনা? আমার স্বামী ও-কাজেও পারদর্শী। চুল কাটতে বললে অধিকন্তু কান দুটো কেটে রেখে দেয়, এমনি তার হাত সাফাই।”

মিসেস মেলভিলকে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ঘরের ভিতর থেকে বাদল বেশ কথাবার্তা জুড়ে দিল। বলল, “ঠিক ভারতবর্ষের সেই মৌলবী সাহেবের মতো যিনি একটি ছাত্রকে ফুল মার্কের চেয়ে পাঁচ মার্ক বেশি দিয়ে বসেছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় কৈফিয়ৎ দিলেন, যা প্রশ্ন করেছিলুম তাও লিখেছে, যা প্রশ্ন করিনি তাও লিখেছে, এমন ছাত্রকে পাঁচটা মার্ক বেশি না দিলে বড়ই কার্পণ্য করা হয়। তেমনি,” বাদল রসিকতা

করে বলল, “চুল কাটার জন্যে মজুরি তো দিতে হবেই, তার উপর কান কাটার জন্যে বখশিশ না দিলে ভারি বিশ্রী হবে। না, মিসেস মেলভিল?”

“কিন্তু মিস্টার সেন,” বুড়ী অবশেষে বিরক্ত হয়ে—যা সে কদাচ হয়—বলল, “আপনার চা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব কতক্ষণ? খুলুন, খুলুন।”

বাদল উঠতে চেষ্টা করল। সমস্ত শরীর জর্জর। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে হাত দুটো এখনো চলিষ্ণু। তাই দিয়ে ড্রেসিং গাউনটা পেড়ে নিয়ে কোনোমতে জড়াল। তারপর মিসেস মেলভিলকে অনুমতি দিল আসবার।

“বুঝেছি।” মিসেস মেলভিল বাদলের পা দুটোর অবর্ণনীয় অবস্থা দেখে এক নিমেষেই টের পেল। “ঘোড়াটার গা না ডলে সওয়ারের গা ডলতে হয়, জখম হয়নি ওটা, হয়েছেন ইনি।”

বুড়ী মেলভিল বাদলের কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে নিজের হাতে খাইয়ে দিল। পরের হাতে খেতে বাদলের বড় ভালো লাগে, বিশেষত সেই পর যদি নারী হয়। নানা ছলে সুধীদার হাতে খেয়েছে, বুড়ী মেলভিলের হাতেও তার এই প্রথম খাওয়া নয়। বুড়ীও এই বালক-প্রকৃতি তরুণটির এদেশে মা নেই বলে মমতায় বিগলিত। বুড়ী ধর্মভীরু মানুষ। তার প্রত্যেক অতিথিকেই ভগবান তার নিকট প্রেরণ করেছেন, তাদের প্রতি তার দায়িত্ব টাকা লেনদেনের উর্ধ্বে। কতবার কত ভবঘুরে (Tramp)-কে সে যত্ন করে খাইয়েছে, লোকসানের জন্যে ভ্রূক্ষেপ করেনি। স্বামীর তিরস্কার হয়েছে তার পুরস্কার। আর এই বিদেশী তরুণটি তো চড়া দাম দিতে প্রস্তুত।

“ও কিছু নয়,” বুড়ী আশ্বাস দিল, “ও আপনি সেরে যাবে দু-এক দিনের মধ্যে। আপনি আপাতত গরম জলে স্নান করুন, আমি ততক্ষণ আপনার বিছানাটাকে নরম করে পাতি। গোটা কয়েক বালিশ বেশি দেব। বেশ আরাম করে শোবেন কিংবা বসবেন।”

“ধন্যবাদ, মিসেস মেলভিল,” বাদল বলল, “কিন্তু ভেন্টনরে আপনি আমার মাপের তৈরি ব্রীচেসের জন্যে লোক পাঠান, তৈরি না পাওয়া গেলে বানাতে হবে।”

“আচ্ছা।”

“আর নাপিত যদি কাছে কোথাও না মেলে তবে ভেন্টনর থেকে আনাতে হবে।”

“আচ্ছা”—বুড়ী একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল।

“আর এই চিঠিখানা ভেন্টনরে ডাকে দিতে হবে, এখানে না। ভারি জরুরী চিঠি।”

“আচ্ছা।”

গরম জলে গোসল করে নরম বিছানায়' গা ও 'পা মেলে দেওয়া যে কী আরামের তাই ধ্যান করতে করতে বাদল ভুলে গেল যে মিসেস মেলভিলকে তার আরো একটা ফরমাশ করবার আছে। বুড়ীকে পিছু ডেকে ফিরিয়ে এনে বাদল বলল, “আর দেখুন,

মেরীকে এক পাউণ্ড চিনির জেলা কিনে আমার তরফ থেকে খাওয়াবেন।"

মিসেস মেলভিল হেসে বললেন, "আচ্ছা। কিন্তু মেরী বুঝবে না যে আপনি তাকে খেতে দিলেন। ধন্যবাদ দেবে আমাকেই।" চলে যেতে যেতে বললেন, "ঘোড়াকে, ঘোড়ার সওয়ারকে দুজনকেই খেতে হচ্ছে আমার হাতে।"

৬

পুরু বিছানায় অর্ধশয়ান হয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থেকে বাদল দিব্য আরাম বোধ করল। এমন আরাম আগে পেলে কি একটা চিন্তার জন্যে চব্বিশ দিন ক্ষয় করতে হত? শরীরের আনুকূল্যে কি নিবিড় ও একান্ত অভিনিবেশের দ্বারা চার দিনেই সিদ্ধিলাভ হত না?

চব্বিশ দিন ও চার দিন—এ তো এক মন্দ সমস্যা নয়। ঘড়ি দেখে আমরা জানি কখন চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ণ হয়, পাঁজি থেকে আমরা পাই একটি নির্দিষ্ট চব্বিশ ঘণ্টার কী নম্বর। ঘড়ি ও পাঁজি যদি না থাকত কিংবা বিলুপ্ত হয়ে যেত তা হলেও আমরা নিরুপায় হতুম না। এক সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত একটি দিন; এক বসন্ত থেকে পরবর্তী বসন্ত পর্যন্ত একটি বছর। যাঁরা আকাশের তারার গতিবিধিবিদ্ তাঁদেরও একান্ত অসুবিধা হত না।

কিন্তু হঠাৎ যদি পায়ের নীচে থেকে পৃথিবীটা ফসকে যায়, যদি আমরা শূন্যে ছিটকে পড়ি তা হলে কি আমাদের সময় জ্ঞান থাকে?

বাদল ভাবল, না। আপোসের পরে কোন বিষয় চিন্তা করব সেই বিষয় বেছে নিতে পারছিলুম না, বিষয় আপনি এসে আমাকে বেছে নিল।

মানুষের সময়বোধ কিসের উপর নির্ভর করে? পৃথিবীর দ্বিবিধ গতির উপর। একটার থেকে পাই দিন, অন্যটার থেকে পাই বছর। যেখানে দ্বিবিধ গতি নেই সেখানে বছর আছে দিন নেই।

গ্রহনক্ষত্রদের কার বছর আমাদের বছরের তুলনায় কত বড় বা কত ছোট তা আমরা হিসাব করে বলতে পারি ওদের গতি ও প্রত্যাবর্তন নিরীক্ষণ করে। ওদের কোথাও যদি মানুষের মতো কোনো জীব থাকে তো তাদেরও সময়বোধ থাকা বিচিত্র নয়।

কিন্তু গ্রহনক্ষত্র যেটুকু জায়গা জুড়েছে সেটুকু অতীব সামান্য—তাদের জায়গা ছেড়ে দিয়েও স্পেস্ ধু ধু করছে। স্পেসের কি গতি আছে? যদি থাকে তবে সে গতির সঙ্গে পার্থিব সম্বৎসর গতির কী সম্বন্ধ। যদি না থাকে তবে স্পেস্ কি কালাধীন? অর্থাৎ বাদল যদি হঠাৎ পৃথিবী থেকে পা ফসকে শূন্যের গর্তে তলিয়ে যায় তবে কি বাদলের সময়জ্ঞান থাকবে? তার সঙ্গে তো থাকবে না ঘড়ি বা পাঁজি, সূর্যোদয় পরম্পরার পরিবর্তে দেখবে

—যদি চোখে পড়ে—সূর্য ছুটছে তো ছুটছেই, সে তার নিজের বছর পুরাতে ব্যস্ত। আর সূর্যই বা তখন তার কে? অমন লক্ষ লক্ষ সূর্য দৌড়াদৌড়ি করছে যে যার কক্ষে। কাকে ছেড়ে কার উপর নজর রাখবে? বাদল যেন এমন একটা ঘড়ির দোকানে পৌঁছবে যেখানে প্রত্যেক ঘড়ি নিজের চালে চলেছে, একটাতে দশটা সাত মিনিট তো আর একটাতে সাতটা সতের মিনিট, এবং তৃতীয় একটাতে তিনটে পঞ্চান্ন মিনিট। তাদের কোন্‌টা যে স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম রাখছে তা বাদল জানতে পারবে না। শুধু এই জানবে যে তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ লোকাল টাইম রাখছে।

কিন্তু গোড়ায় গলদ। তারা তো স্পেস্-সমুদ্রে ভাসমান জাহাজ। সমুদ্রের পৃষ্ঠে বহুৎ জায়গা ফাঁকা পড়ে রয়েছে। সেই সব ফাঁকা জায়গার কোনো লোকাল টাইম আছে কি? থাকা কি সম্ভব? তাদের তো স্বতন্ত্র গতি নেই বলে মনে হয়। না, আছে? শূন্য কি নানা স্বতন্ত্র খণ্ডে বিভাজ্য? যদি বিভাজ্য না হয় তবে কি অখণ্ড শূন্যের এক প্রকার গতি আছে—এক প্রকার আবর্তন? অতএব এক প্রকার টাইম আছে?

বিশ্বের গ্রহতারকা যেন একই সময়চক্রে বাঁধা, যেন তাদের একটা স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম আছে—জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় sidereal time. বেশ। গ্রহতারকার মণ্ডলী না হয় একই সময়চক্রের নিয়মানুবর্তী হল, যেমন সমুদ্রপৃষ্ঠে এক মুষ্টি নৌবহর। কিন্তু কে তারা? কত ক্ষুদ্র তারা! কতগুলো ঘূর্ণ্যমান বুদ্‌বুদ্ বই তো নয়। তবে তাদেরকে অত যত্নে পর্যবেক্ষণ করা কেন? তাদের এত প্রাধান্য কেন? কেবলমাত্র তাদেরকে যাঁরা পর্যবেক্ষণ করছেন সেই সব জ্যোতির্বিদ্ স্পেস্ সম্বন্ধে রায় দেন কোন অধিকারে? এ যেন হঠাৎ একটা দ্বীপ আবিষ্কার করে তার মাটি খুঁড়ে দশটা শিলালিপি পেয়ে একখানা ইতিহাস লিখে ফেলার মতো। অধিকাংশ ইতিহাসই তাই। সমুদ্রের বুদ্‌বুদ্‌গুলোকে পাশাপাশি এঁকে সমুদ্রের স্বরূপ দেখানো।

গতি না থাকলে কাল থাকে না। স্পেসের কি গতি আছে? যদি থাকে তবে কাল আছে। যদি না থাকে—সেইটেই সম্ভব—তবে কাল বলে কিছু নেই। স্পেসের গর্ভে সঞ্চরণশীল গ্রহনক্ষত্রগোষ্ঠীর আছে গতি, সে গতি আপেক্ষিক অর্থাৎ পরস্পর সাপেক্ষ। সে গতি চক্রবৎ, একের চক্রের অক্ষ অপরের চক্রের নেমি। সমগ্র গ্রহনক্ষত্র গোষ্ঠীকে ঘড়ির ভিতরকার যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। জানতে ইচ্ছা করে যে এই অত্যন্ত জটিল যন্ত্র একটি নির্দিষ্ট সময় রক্ষা করছে, কিন্তু সেই সময় কি স্পেসকে শাসন করতে পারে? সে কি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ? সে কি কাল?

স্পেস্ যদি গতিসম্পন্ন বলে সপ্রমাণ হয় তবে কালের অস্তিত্ব সেই সঙ্গে হবে সপ্রমাণ। স্পেস্ চলছে। কোন্‌খান থেকে কোন্‌খানে চলছে? অতীত থেকে ভবিষ্যতে। এ ছাড়া চলার অন্য পথ নেই। স্পেস্ নিজেই নিজের অন্য পথ রাখেনি। সর্বব্যাপী যদি সচল

হয় তবে তাকে চলার পথ ছেড়ে দেবে কে ? এক ছিল ফোর্থ ডাইমেন্‌সন্‌—কাল । সেই দিল পথ কেটে ।

সে পথ কিন্তু সাধারণ পথ নয় । তাতে চলবার সময় ঘর্ষণে (friction-এ) শক্তি হ্রাস বা শক্তিলাভ হয় না । এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে স্পেসের উত্তরোত্তর স্ফীতি ঘটছে । এবং পরিণামে বিদীর্ণতা ঘটবে । না, স্পেস্‌ মোটের উপর যেমনটি ছিল তেমনটি আছে । এবং তেমনটি থাকবে । পরিবর্তন যা হচ্ছে তা ওর গর্ভে । সূর্য হয়তো নিববে, পৃথিবী হয়তো হিম হয়ে যাবে, পৃথিবীস্থ প্রাণ হয়তো গ্রহান্তরের পরিমিত উত্তাপে ঘর করবার জন্যে উঠে যাবে, সেখানে পাবে জলে স্থলে আশ্রয়, সেখানে নানারূপে বিবর্তিত হবে, হতে হতে হয়তো মনুষ্যসদৃশ হয়ে উঠবে, মনুষ্যসদৃশদের মধ্যে একদা বাদলসদৃশের উদ্ভব বোধ হয় অসম্ভব নয় ।

অতীত থেকে ক্রমাগত ভবিষ্যতে, ক্রমাগত ভবিষ্যতে, স্পেসের যাত্রা । তার কি কোনো সমাপ্তি আছে ? না ।

ভাবতে ভাবতে বাদল ঘুমিয়ে পড়ল ।

৭

যা, এই তো বেশ ছোট ছোট সমস্যার হাতে হাতে সমাধান । পণ্ডিতেরা অবশ্য অবজ্ঞাভরে হাসবেন, বলবেন সমাধানটা বাদলীয় । তাতে বাদল লজ্জিত হবে না । পণ্ডিতেরাও আপন আপন বিশেষজ্ঞতার বাইরে বিশেষ অজ্ঞ । আইনস্টাইন কি জানেন কার্ল মার্ক্স কথিত ইতিহাসের অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যা ? এডিংটন কি বলতে পারেন ভারতবর্ষীয় হাতীর থেকে আফ্রিকান হাতীর কোন্‌খানে বিভিন্নতা ? মিলিকানকে জিজ্ঞাসা কর আর্ট সম্বন্ধে বেনেদেত্তো ক্রোচের সিদ্ধান্ত কী ? বেনেদেত্তো ক্রোচে বলুন আলোকাণুর বিকিরণ ক্ষমতা-বিষয়ে মিলিকানের গবেষণাবৃত্তান্ত ।

পণ্ডিতেরা যে একে অপরের অধিকারে পা বাড়াতে ভয় করেন ও কৌতূহল বোধ করলে অপরের ভাষার বর্ণপরিচয় পড়ে ভঙ্গ দেন, তা আজকাল কে না জানে ? ছিল বটে একদিন যখন লেওনার্দো দা ভিঞ্চি তৎকালীন যাবতীয় বিদ্যা আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন । গ্যেটের দিনেও গ্যেটে ছিলেন মোটের উপর সবজান্তা । তবে তিনিও চড়ুই পাখী দেখে একারমানকে শুধিয়েছিলেন, ও গুলো কি ভরত পক্ষী ?

এ তো ভারি অন্যায় যে জাগতিক ব্যাপারকে মোটামুটি বুঝতে হলে এক হাজার এক শ জন পণ্ডিতের শরণাপন্ন হতে হবে । শোনা যায়, এক আইনস্টাইনকে দন্তস্ফুট করতে পুরো সাতটি বছর সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করতে হয় । তারপর তাঁর তত্ত্ব সত্য কি মিথ্যা তার বিচার করতে অবশ্য আয়ু থাকবে না অবশেষ । তবে কি আমরা পৃথিবীর

বাদলরা চিন্তাকার্যে ইস্তফা দেব ? না, মনের মধ্যে জঙ্গল নিয়ে বাস করব ? পণ্ডিতরাই যখন নিজ নিজ এলাকার বাইরে শিশু তখন আমরা তাঁদের এলাকাগুলিতে শিশু হলে এমন কী অপরাধ করলুম। কিন্তু আমরা শিশু হলেও নিতান্ত পল্লবগ্রাহী নই, আমরা চাই জগৎটাকে সকল রকমে চিনতে, সবশুদ্ধ সেটি কেমন দেখায় তাই আমাদের ধ্যান।

আমরা বাদলরা সব কাজে হাত লাগাই, তাই কোনো একটা কাজে সাত-সাতটা বছর নিয়োগ করতে আমাদের অপ্রবৃত্তি। তোমরা স্পেশ্যালিস্টরা আমাদের স্পর্দ্ধা দেখে হাসতে পার, কিন্তু আমরাও স্পেশ্যালিস্ট—আমরা যার স্পেশ্যালিস্ট তা হচ্ছে intellect in general. আমরাও তোমাদের গণ্ডীবদ্ধ জ্ঞানসাধনাকে উপহাস করতে পারতুম, কিন্তু উদার আমাদের মতি, দরাজ আমাদের হৃদয়, আমরা জানি, তোমরাও আমাদের পক্ষে দরকারী, আমরাও তোমাদের পক্ষে দরকারী।

ভালো ঘুম হওয়ায় বাদলের মনটা সত্যিই উদার ছিল। তাই সে বিনয়বশত "আমরা বাদলরা" বলল, অহঙ্কারবশত "আমি একমাত্র বাদল" বলল না। পণ্ডিতদের সঙ্গে ঐ রূপ একটা বোঝাপড়া করে সে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কি মাত্র স্পেস্-এর একটা ডাইমেন্‌শন, না আমার নিজেরও—এই নিয়ে চিন্তা করতে বসল।

স্পেসের অন্যত্র যাবার জো নেই, তাই সে যদি যেতে চায় তো অতীত থেকে যাবে ভবিষ্যতে। আর সে তাই যাচ্ছেও বলে বাদলের বিশ্বাস। জগতে সকলেই গতিশীল, আর স্পেস্ কেবল ঘুমায়ে রয় এ কি একটা কথা হলো! স্পেস যে যাচ্ছে অতীত থেকে ভবিষ্যতে। অতীতকে কি সে পিছনে রেখে যাচ্ছে ? না, অতীতকে সে পিঠে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। কাল যেন একটা স্প্রিং, স্পেস যেন তাকে খুলতে খুলতে যাচ্ছে, আর স্পেসের পিছু পিছু সেও যাচ্ছে আগের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে। এ উপমাটা হয়তো যথোচিত হল না। কাল যেন ক্যামেরার রোল ফিল্ম। তার যেটুকু আলোকে উদ্‌ঘাটিত হল সেটুকু গেল জড়িয়ে, যেটুকুর উদ্‌ঘাটনের পালা এল সেটুকু গেল মেলে। না, এ উপমাও অযথাযথ। স্পেসের সঙ্গে কাল এমন ভাবে ওতপ্রোত যে একের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপরের অস্তিত্ব নেই। সেইজন্যে মনে হতে পারে ওরা একই জিনিস, দোনলা বন্দুকের মতো ঐ জিনিসটার জোড়া নাম স্পেস্-টাইম। ওটা যেন ভোজবাজির এক পেঁয়াজ, ওর যতই খোসা ছাড়াও ও যেমনকে তেমনি। ওর ছাড়ানো খোসাগুলো যেন ওর ভিতরে ঢুকে যায়, বাইরে জমা হয় না।

এ উপমাও বাদলের মনঃপূত হলো না। সে যা ভাবছে তার সার কথা এই যে, অতীত বললে মানুষের মনে একটি ছবি জাগে, স্পেসের মনে তা জাগে না, যেহেতু স্পেসের মন নেই। আর ভবিষ্যৎ বললে মানুষের মনে যে একটি ছায়া পড়ে স্পেসের মনে তাও পড়ে না, একই কারণে। মানুষের কাছে অতীতের নামান্তর স্মৃতি। লিখিত স্মৃতির

নাম ইতিহাস, অলিখিত স্মৃতির নাম শ্রুতি, মিশ্র স্মৃতির নাম পুরাণ, মেয়েলী স্মৃতির নাম রূপকথা, বর্বর স্মৃতির নাম "টেবু"। তারপর বর্তমানের নামান্তর চেতনা আর ভবিষ্যতের নামান্তর বিশ্বাস। কাল সকালে সূর্য উঠবে, ছ মাস পরে শীত পড়বে, বারো বছর পরে ধূমকেতু দেখা দেবে, ত্রিশ বছর পরে গবর্নমেণ্টের ঋণ শোধ হবে, জমির ইজারা মেয়াদ ফুরাতে নয়শ নিরানব্বই বছর বাকী। বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের নাম গণনা, যুক্তিহীন বিশ্বাসের নাম ভয়, আকাঙ্ক্ষারঞ্জিত বিশ্বাসের নাম রিলিজন।

স্পেসের এ সব বালাই নেই। স্পেস্ স্বয়ং বর্তমান, তার অতীত ভবিষ্যৎও সেই বর্তমানের পা ফেলা পা তোলা। কিন্তু মানুষের বেলায়ও কি সেই কথা ? আমি স্বয়ং বর্তমান। আমার অতীত কি এই বর্তমানেরই মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়েছে, মুদ্রিত হয়েছে, ছাড়ানো খোসার মতো ফিরে এসে ঢুকেছে ? আমার ভবিষ্যৎ কি আমার বর্তমানের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে এর থেকে মুক্তি পাবার অপেক্ষায় আছে ?

আমার অতীত বলতে আমি বুঝি আমার স্মৃতি। হঠাৎ আমার স্মৃতি লোপ হলে আমার অতীত কি মিথ্যা হবে, অনতীত হবে ? ভারতবর্ষের স্মৃতি আমার মুছে গেছে—জাগ্রতাবস্থায় তো গেছেই, স্বপ্নেও। তা বলে কি ভারতবর্ষে আমি আট মাস আগে ছিলুম না, সেদেশে কি জন্মাইনি, বয়ঃপ্রাপ্ত হইনি, বিবাহ করিনি ? এক এক জন মানুষ দেখা যায় তারা পূর্ব স্মৃতি হারিয়ে অন্য মানুষ হয়ে যায়, তাদের অভিনব স্মৃতি এই অন্য মানুষের। আমি হয়তো তেমনি মানুষ। আমার স্মৃতির বয়স আট মাস, আমার দেহের বয়স একুশ। বিশ বছর চার মাস কি আমার সমগ্র ব্যক্তিত্বের পক্ষে অনতীত ?

আমি আপাতত বেশিদিন আগ বাড়িয়ে ভাবতে পারছিনে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার একমাত্র স্পষ্ট ধারণা হচ্ছে আমি মহামনীষী হব। তা বলে কি আমার ভবিষ্যৎ ওইটুকু, বাকীটা অভবিতব্য ? আমি জানিনে বলে কি যা হবার তা হবে না ? আমি বিশেষ চেষ্টা করলে যতদূর জানতে পারব, বিশেষ ইচ্ছা করলে যত কিছু ঘটাতে পারব, তাই কি আমার ভবিষ্যৎ, তার অধিক অভবিতব্য ? আমার বর্তমান কি আমার ভবিষ্যতের জনক নয়, ভবিষ্যতের predestination কি বর্তমানের অন্তরে উহ্য নেই ? ভবিষ্যতের যেটুকু আমি জানব, ভবিষ্যতের কান যেটুকু আমি টানব অর্থাৎ যেটুকুর আমি কর্ণধার হব, যেটুকুর উপর আমার ইচ্ছা বলবান হবে সেইটুকুমাত্র কি আমার ভবিষ্যৎ ? সেই পুরাতন তর্ক আবার ঘুরে ফিরে হাজির (বাদল মুচকে হাসল)—Determinism, না, Free will ? আমার ভবিষ্যৎ কি বাহ্যবস্তুর ক্রিয়ার উত্তরে আমার বর্তমানের প্রতিক্রিয়া, না আমার বর্তমানের ক্রিয়ার উত্তরে বাহ্যবস্তুর প্রতিক্রিয়া ?

৮

এ এক পুরাতন অমীমাংসিত প্রশ্ন—গয়ায় পিণ্ড না পাওয়া প্রেত। এটাকে বাদল বারংবার চিন্তার মাঝখানে প্রক্ষিপ্ত হতে দেখেছে, কিন্তু প্রক্ষেপকে প্রশ্রয় দিলে না। একে যেদিন বাদল আহ্বান করে আনবে তার আগে অনাহূত ভাবে আসা এর অন্যায়।

আর প্রশ্নটা হচ্ছে, কাল যেমন স্পেসের একটা ডাইমেন্‌সন তেমনি আমারও কি না। প্রথমে বিচার করতে হবে কাল বলতে স্পেস যা বোঝে আমি কি তাই বুঝি ? স্পেসের না আছে স্মৃতি, না আছে চেতনা, না আছে বিশ্বাস, তার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তার গতির সামিল, তার গতির জন্যেই ওদের অস্তিত্ব ও গতির বাইরে ওরা নেই। আমার অতীত কিন্তু আমার গতির থেকে উপচিত একটা স্থিতি, আমার বর্তমান আমার গতির থেকে উপচীয়মান একটা স্থিতি, আমার ভবিষ্যৎও তেমনি আমার গতির থেকে উপচেতব্য একটা স্থিতি। কাল তো স্থিতির জন্যে নয়। কাল যেন একটা অশ্ব। ওর উপর আরোহণ না করলে ওর মহিমা উপলব্ধি করা যায় না, আরোহীর অভাবে ওর সার্থকতারও ঘটে অভাব।

পুডিংকে খাব অথচ রাখবও—এ নীতি মানে না স্পেস, মানি আমি। তাই আমার অতীত আমার উপচিত, আমার ভোগের উপর উদ্বৃত্ত। তাই আমার ভবিষ্যৎ আমার উপচেতব্য, আমার বিশ্বাসের চেয়ে কিছু বেশী সে আনবে, আমাকে মনীষী তো করবেই, তার অধিকও করতে পারে।

স্পেসের সঙ্গে তা হলে আমার আসল জায়গায় গরমিল। অতএব কাল হতে পারে না আমার একটা ডাইমেন্‌সন, আমি ও কাল মিলে গ্রহণ করতে পারিনে একটা দোনলা নাম। স্পেস ও তার কাল যেমন যমজ, আমি ও কাল তেমন নই।

এই পর্যন্ত এসে বাদলের মনে পড়ল, বা রে ! আমার আবার স্মৃতি কী ? স্মৃতি তো মনের। মন আমার বলে কি স্মৃতিও আমার ? আর 'আমার' হলেও সে তো বিচ্ছেদ, সে তো স্বতন্ত্র। আমি যখন দেহত্যাগ করব তখন চেতনাকে করব ত্যাগ, স্মৃতিও পড়ে থাকবে ছাড়া কাপড়ের পাড়ের মতো। বিশ্বাস ? ওরও হবে সেই দশা। ছাড়া কাপড়ের রঙের মতো। মৃত্যুর পরে আমি আবার দেহ ধারণ করব কি না, মন সেই দেহের সঙ্গে সংলগ্ন থাকবে কি না, এসব স্পেকুলেশন নিয়ে মত্ত থাকা আমার পক্ষে অশোভন। আমি স্পিরিচুয়ালিস্টদের মতো নির্বোধ নই। বাবুরা বসে বসে Seance করছেন। যত রাজ্যের বুজরুক হয়েছে তাঁদের মিডিয়াম। ঠকতে ভালোবাসে এমন গাধা বাদলচন্দ্র সেন নয়। তাই সে ভূত প্রেত তো দূরের কথা ভগবানই বিশ্বাস করল না।

কী ভাবছিলুম ? আমার আবার স্মৃতি কী ? আট মাস আগে আমার যে স্মৃতি ছিল সে আজ কই ? মৃত্যুর পরে এই স্মৃতিও থাকবে না। তখন শুধু থাকবে আমার অতীত,

স্পেসের যেমন আছে। তবে কেন কাল হবে না আমারও একটা ডাইমেন্‌সন। 'হবে' কি, মশাই! হয়ে রয়েছে। কাল আমার একটা ডাইমেন্‌শন হয়ে রয়েছে আদি থেকে। হয়ে রইবে অন্ত অবধি। কাল যতদিনের আমি ততদিনের। কাল যতদিন আমিও ততদিন। মৃত্যু তো আমার নয়, মশাই। ওটা হলো গিয়ে আমার দেহ-মনের। ওর মানে দেহমনের প্রাণবিয়োগ। গ্রহনক্ষত্র হতে বিকীর্ণ তাপ যেমন স্পেসের শূন্যে বিলীন হয়ে সঞ্চিত হয়, প্রাণও হয় তেমনি। আর গ্রহনক্ষত্রের অঙ্গ যেমন তাপবিহীন বলে বিকার প্রাপ্ত হয় দেহ-মনেরও তেমনি।

বাদল একটা কাল্পনিক প্রতিপক্ষ খাড়া করে তার সঙ্গে কথন তর্ক বাধিয়েছে। বলছে, বুঝলেন মশাই, আমি হচ্ছি অশ্বারোহী সৈনিক। কাল আমার অশ্ব। আমার গতির বাহন। কোথায় আমার বাড়ী, কে আছে সে বাড়ীতে, স্ত্রী না শিশু না বৃদ্ধ পিতামাতা, এসব নেই আমার মনে, আমি সৈনিক, আমি স্মৃতিভারমুক্ত। বাঁচব কি মরব, কোথায় হব উপনীত, স্বর্গে কি মর্তে কি ইউটোপিয়ায় কি নিরাপদ ডেমক্রেসীতে, ভাবতে পারিনে এত কথা। বিশ্বাস আমার বিক্ষেপ ঘটাবে না, আমি সৈনিক, আমি অশ্বারোহী, লড়াই করে আসছি, করছি, করতে থাকব। আমি ও আমার অশ্ব—আমরা এক। যেমন যীশু বলেছিলেন, I and my father are one. আমি আছি। এই 'আছি' কথাটাই কাল। 'আছি'র মধ্যে রয়েছে 'ছিলুম' ও 'থাকব'। আমি আছি। বুঝলেন মশাই। এই কয় মাস ধরে আমি যে 'টাইম্‌স' কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি, "I am," সেটা যদিও সুধীদার উদ্দেশে তবু সেটা আপনাদের সকলের জন্যে। "I am"—এই হচ্ছে আমার ঘোষণা। আমার ম্যানিফেস্টো, আমি আছি—তার প্রথম কথাটি হলো আমি অর্থাৎ বাদল, আর দ্বিতীয় কথাটি হলো আছি অর্থাৎ কাল। একটা হাইফেন বসিয়ে দিন তো। দেখতে কেমন হয়। ঠিক স্পেস্‌-টাইমের মতো কি না।

বাদল-কাল। বাদল-কাল। আহা, কী খোলতাই হয়েছে। এই কথাটা স্পষ্ট ছাপালে লোক ভাববে পাগল। তাই ছাপিয়েছি, I am. ওদের মধ্যে যদি কেউ সূক্ষ্মবুদ্ধি থাকেন তবে নিশ্চয় ধরতে পেরেছেন, ওটার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা হবে, Ego-Time. জানিনে ওটা আমার আবিষ্কার কি না, কিন্তু বিশ্বাস করি ওটা আমার একান্ত মৌলিক চিন্তার ফল।

৯

এত বড় একটা আবিষ্কারের পর বাদল কি বিছানায় চুপ করে শুয়ে থাকতে পারে! "Now I have a right to ride a horse" বলে সে তড়াক করে লাফ দিয়ে দাঁড়াল। "লে আও ঘোড়া" বলে হিন্দীতে কাকে যেন একটা হুকুম দিয়ে নিজেই চমকে

পড়ল—তাই তো এখনো হিন্দী মনে আছে।

বাদল দিব্যি চলছে দেখে মিসেস মেলভিল তো আহ্লাদে অবাক। বাদল বলল, "বুঝতে পারবে না তুমি আমি কী ভেবে বের করেছি। শুধু আমার নয় তোমারও, সকলেরই, স্যালভেশনের সূত্র।"

মিসেস মেলভিল তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। বাদল বলল, "Ego-Time. চুম্বকে ওর বেশি বলা যায় না।" ভাবল সব কথা এখন ফাঁস করে দিই আর কী। কেউ আড়ি পেতে শুনুক, শুনে একখানা থীসিস্ লিখে ফেলুক, বিখ্যাত হয়ে আইন্স্টাইনের দোসর হয়ে যাক। তার পর ঐ কথা আমার মুখে শুনে লোকে বলুক ধার-করা বুলি।

"কই, ঘোড়া কোথায়?" বাদল খোঁজ করল।

"ঘোড়ায় চড়বেন নাকি?" বুড়ী আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল।

"I think now I have a right to ride a horse."

বুড়ী এর কোনো অর্থ না করতে পেরে ভাবল ছোকরার মাথাটি গেছে শিথিল হয়ে। ঘোড়া আনতে লোক পাঠাল। মেরিয়নের ব্রীচেস জোড়া ধার নেবে কি না জিজ্ঞাসার উত্তরে বাদল বলল, "মেরিয়নও আসুক না আমার সঙ্গে বেড়াতে। আমার এই পোশাকে আপাতত চলবে।"

মেরিয়ন রাজী হলো। একটা বড় "বে" ঘোড়ায় তার আসন। সে ঘোড়ার ভঙ্গী যেমন দৃপ্ত হ্রেষাও তেমনি গম্ভীর। বাদলের ঘোড়াটা যেন তার শীর্ণ শ্বেত ছায়া। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাদলের আবিষ্কারোৎফুল্লতা অন্তর্হিত হলো। সাবধানে ধরতে হবে লাগাম, রাখতে হবে পা, চাপতে হবে হাঁটু, সোজা করতে হবে বুক।

ঘোড়া চলল দুলকি চালে, তুড়ুক দুম তুড়ুক দুম তুড়ুক দুম—জিনের উপর বাদলেব পাছা উঠল আর পড়ল। ঘোড়াটার আজ ফুর্তি হয়েছে স্বজাতীয়ের সঙ্গ পেয়ে। মেরিয়নের ঘোড়ার সঙ্গে সে প্রাণপণে পাল্লা দিচ্ছে। এত জোরে তার পিছু ছুটেছে যে সেটা যদি একটু ধীরে চলে তো এটা তার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মেরিয়ন ফিরে তাকায়। বাদল লজ্জায় ক্ষমা চাইবার ভাষা পায় না।

মেরিয়ন যখন রাগ করে ঘোড়াকে ক্যান্টার করাল তখন তার ঘোড়ার দেখাদেখি বাদলের ঘোড়াও চারটে ঠ্যাং তুলল। বাদল জোরসে রাশ ধরে পিছনে হেলে ভয়াতুর ডাক ছেড়ে বলল, "মিস্ মেলভিল, মারা যাব। মিস্ মেলভিল, মারা যাব।" মেরিয়ন টিপে টিপে হাসল, কিন্তু আবিষ্কারকের প্রাণের জন্যে কিছুমাত্র কেয়ার করল না। যেন ব্যঙ্গ করে বলল, প্রাণ তো আপনি নন। প্রাণ গেলেও আপনি থাকবেন ও ঘোড়ায় চড়ে লড়াই করবেন।

যাক, ক্যাণ্টার করায় খাসা আরাম। আয়াসের চেয়ে আয়েশ বেশি। জিনের উপর শক্ত হয়ে বসতে জানলেই হলো। বাদল আবিষ্কার করল যে, সে জলজ্যান্ত বেঁচে আছে, কেবল অস্তিত্ব নিয়ে নয়, প্রাণ নিয়েও। মেরিয়ন চলেছে আগে আগে, কেমন দোলায়িত তার ঋজু বলিষ্ঠ তনু, কী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে তার ঘোড়ার ভঙ্গিমার সঙ্গে মিলে। আর বাদলকে ? চশমার নীচে দুটি কোটরগত চক্ষু, শুকনো ফ্যাকাশে মুখ, চোপসা গাল, বিবর্ণ ওষ্ঠ, বক্র পৃষ্ঠ, নড়বড়ে মাজা। যেমন ঘোড়া তেমনি তার সওয়ার। ধন্য Bada-1 Time !

মেরিয়নের ঘোড়া দুলকি চাল ধরল। বাদলের ঘোড়াকে বলতে হলো না, সে আপনি নকল করল। টাল সামলাতে না পেরে বাদল মাথার উপর দিয়ে পিছলে পড়ত আর একটু হলে। তার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। ঘোড়ায় চড়া চিন্তা করার মতো নিরাপদ নয়, অথচ ঘোড়ায় চড়ে চিন্তা না করলে ঠিক-ঠিক চিন্তা করাও যায় না। ধাবমান মন, বেগবান মনন—এ কি তোমার লাইব্রেরীতে ল্যাবরেটরীতে বৈঠকখানায় শয়নকক্ষে সম্ভব ? গতি যে-বিশ্বের রীতি ও নীতি তার সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা না হলে, তার সহিত আপনাকে নিবিড় ও একান্ত ভাবে সঙ্গত না করলে, তন্ময় না হলে, তৎপ্রকৃতি না হলে তার সম্বন্ধে যা ভাববে তা তোমার অলস ভ্রান্ত ভাবনা। যতই কেন না তাকে তুমি পাণ্ডিত্যের দ্বারা মণ্ডিত করে মূর্খগুলোকে ভণ্ডিত কর।

বাদল একদিন গ্যালপ করতে শিখবে। তার ঘোড়া ছুটবে অন্তরীক্ষ চিরে, শূন্য ভেদ করে। পায়ের তলের মাটিকে এত স্বল্প বার ছোঁবে, এত স্বল্প সময়ের জন্যে ছোঁবে, এত আলগোছে ছোঁবে যে না ছোঁয়ার মতো। বাদলের মনের ক্রিয়া সেই অনুপাতে দ্রুত হবে, নিরবলম্ব হবে, স্থিতিভারমুক্ত ক্ষিতিবিযুক্ত হবে।

ওরা ফিরল গোধূলির আভা গায়ে মেখে—দুটি মানুষ ও দুটি ঘোড়া। বাদল ও তার ঘোড়া হাঁপিয়ে উঠেছিল, তারা পেছিয়ে পড়ায় মেরিয়ন ও তার ঘোড়া তাদের খাতিরে দুলকি চাল ছেড়ে গুটি গুটি করে হাঁটল। অর্থাৎ হাঁটল ঘোড়া-ই, মেরিয়ন ওর হাঁটার মন্থরতার সঙ্গে নিজের অঙ্গের সামঞ্জস্য করে নিল।

তার পক্ষে এটুকু কসরৎ কর্তব্য নয়, কিন্তু বাদলের পক্ষ হয়তো সাধ্যাতিরিক্ত। এই ভেবে সে বাদলের পাশে পাশে চলতে চলতে মিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "ক্লান্ত ?"

বাদল এতক্ষণে নিশ্চিত জেনেছিল মেরিয়নটা নির্মম তো বটেই, উপরন্তু দুঃস্থের দুঃখ দূর না করে তার দুঃস্থতার মজা দেখতে চায়। অন্ধকে পথ বলে না দিয়ে খানায় পড়তে দেখলে আমোদ পায়। তার সহৃদয় জিজ্ঞাসায় বাদল প্রসন্ন হলো কিন্তু ক্লান্তিতে তার মুখ ফুটছিল না। সে কোনোমতে একটা শব্দ করল—সেটা মানুষের "হু" কি ঘোড়ার "চিঁ হিঁ" তা নিয়ে মেরিয়ন গোলমালে পড়তে পারত।

ক্যান্টার করে ও দুলকি চালে যে পথটা আধ ঘণ্টায় অতিক্রম করা গেছল সেই পথ আর ফুরোয় না। বাদলের শরীর ভেঙে পড়ছে ; তার পায়ে ধরেছে খিল। কেউ যদি তাকে ঘোড়ার থেকে নামিয়ে গাছতলায় শুইয়ে দিত তবে সে বাঁচত। নইলে—নইলে সে ভাবতে পারে না কী করে বাঁচবে।

"মিস মেলভিল," সে কাতরাতে কাতরাতে বলল, "আমি একবার নামতে চাই।"

মেরিয়ন ভাবল বাদলের কী দরকার আছে। তার থামাটা অশোভন হবে। সে 'আচ্ছা' বলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। বাদলের ঘোড়া যদিও বাদলেরই মতো শ্রান্ত তবু সঙ্গ ছাড়তে পারে না, সেও ছুটল পিছু পিছু। বাদল ততক্ষণ হাল ছেড়ে দিয়েছে। তার ইন্‌স্টিংক্ট তখন কাজ করছে, তার মন নিস্তেজ। গতিবেগের পরিণাম যে এই হতাশা, এই ক্লান্তি, এই অবশ মুহূর্তগুলির প্রহরাধিক প্রসার, এইটুকু পথের এতটা বিস্তার, এই ইন্‌স্টিংক্ট-এর ক্রিয়ায় বাঁচা—এ কি তখন তার মনে কুয়াশার মতো জাগছিল না ?

মেরিয়ন পিছন ফিরে সুধাল, "ও কী। আপনি নামলেন না যে ?"

বাদলের বাগিন্দ্রিয়ের যেন পক্ষাঘাত হয়েছিল, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে তার জিহ্বার জড়তা যেটুকু ঘুচল তার দ্বারা সে ব্যক্ত করল যে তার ঘোড়া মেরিয়নের ঘোড়াকে অন্ধের মতো অনুসরণ করছে, তার হুকুম মানছে না।

মেরিয়ন থামল। সে এখন বুঝতে পারল বাদল কেন "মারা যাব" বলে চীৎকার করছিল ক্যাণ্টারের সময়। আগে না বুঝতে পেরে ভাবছিল হুকুম করলে তো ঘোড়া ক্যাণ্টার করা বন্ধ করত ; মারা যাওয়াটা কথার কথা।

কিন্তু বাদল নামতে পারে না। তাকে যেন কে জিনের উপর পেরেকের মত ঠুকে দিয়েছে। তার কোমর, তার উরু, তার পিঠ বেদনায় বিকল। যেটাকে নড়াতে যায় সেটা বলে, "মরে তো গেছি, মড়া নিয়ে টানাটানি কেন ? মরেও সোয়াস্তি নেই।"

বাদলকে তদবস্থ দেখে মেরিয়ন আশ্চর্য বোধ করল। ঘোড়া থেকে নেমে তার কাছে এসে বলল, "সাহায্য করব ?"

বাদল শুধু বলতে পারল, "ধন্যবাদ।"

সাহায্য কেন সবটাই করতে হলো মেরিয়নকে। বাদলকে ঘোড়ার পিঠ থেকে পেড়ে মাটির উপর দাঁড় করাবার চেষ্টা করল। বাদলের পা দুটো অসাড়। তাদের মধ্যে সহযোগের অভাব, যেন একজনের এক জোড়া পা নয়, দু খানা কাটা পা কিংবা কাঠের পা। অগত্যা মেরিয়ন বাদলকে ঘাসের উপর বসিয়ে দিল। কিন্তু পাছায় যেন ছ্যাঁকা লেগেছে, নরম ঘাসের উপরেও তার পরম জ্বালা। শেষটায় বাদল শুয়ে পড়ল। তাতেও পৃষ্ঠের অসহযোগ। ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে তার বিবাদ।

১০

বাদলকে ঐ অবস্থায় একলা রেখে লোক ডাকতে ও কার্ট আনতে যাওয়া মেরিয়নের সমীচীন বোধ হলো না। সে প্রস্তাব করল, বাদলকে ধরে ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে। পুলিশম্যান যেমন মাতালকে নিয়ে যায়।

বাদল বলল, "না পারি দাঁড়াতে, না বসতে, না শুতে। দেখি যদি হাঁটতে পারি। ধন্যবাদ, মিস মেলভিল।"

মাতালের মতো একটা বাহু মেরিয়নের বগলে সঁপে দিয়ে বাদল টলতে টলতে চলল। ঘোড়া দুটি তাদের ও পরস্পরের অনুসরণ করল। কিছুদূর যেতে না যেতে বাদল বলল, "আপনি কেন কষ্ট করছেন? আমাকে এখানে ফেলে যান।" তার নিজেরই কষ্ট হচ্ছিল সমধিক।

মেরিয়ন এর উত্তরে বাদলের হাতখানাকে তার নিজের কাঁধের উপর তুলে বাদলের এক বগল থেকে আর বগল পর্যন্ত নিজের একটা হাত চালিয়ে দিল। বাদলের বুক ও পিঠ এত সঙ্কীর্ণ যে মেরিয়নের হাত দুই বেষ্টন করল। মেরিয়নের গায়ে একটা আস্ত মানুষের জোর; আর বাদল তো ক'খানা হাড়। উড়ে চলল।

অন্ধকার হতে দেরি ছিল, ইংলণ্ডের গ্রীষ্মকালের দিন। কিন্তু ডিনারের ঘণ্টা উত্তীর্ণ হয়ে গেছল। তারা যে হেঁটে ফিরবে—তাও লেংচাতে লেংচাতে—বেরবার সময় তার জন্যে সময় হাতে রাখেনি। তাদের দেরি দেখে বুড়ী ভাবল পথে না জানি কিছু ঘটল। মেলভিল রাগ করে বলল, "যেতে দাও। মরলে খবর আপনি পাওয়া যাবে।" চার্লি গেল খোঁজ করতে।

বৃত্তান্ত শুনে চার্লি বলল, "আর সেই শক্তি নেই রে, বেটি। নইলে তোদের দুটোকে দুই কাঁধে চাপিয়ে ঐ ঘোড়া দুটোর উপর দুই পা রেখে দৌড় করাতুম। কী! বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা, এস তো বাছা তুমি, খোকাবাবু। তোমাকে পিঠে চড়িয়ে বস্তার মতো বয়ে নিয়ে যাই।"

বাদল বলল, "না, না।" কিন্তু তার লোভটি ছিল ষোল আনা। ছেলেমানুষীর সুযোগ পেলে কি সে ছাড়ে? পরের হাতে খাওয়ার মতো পরের পিঠে চড়া। সে দ্বিতীয় আমন্ত্রণের অপেক্ষা না করে "না, না" বলতে বলতে চার্লির গলা দুই হাতে জড়িয়ে ধরল ও গাছে ওঠবার মতো করে পা দুটোকে তুলে দিল।

"বহুৎ আচ্ছা, চল বাবা।" চার্লি অতিরিক্ত উদ্যমের সহিত বলল।

মেরিয়ন আপত্তি করতে যাচ্ছিল। বুড়ো মানুষের উপর ওটা একটা জুলুম। সে বেচারা মুখ থুবড়ে পড়লে বাদলও কম ভুগবে না। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে শেষ পর্যন্ত তার লজ্জা করল। সে বড় লাজুক। সে ঘোড়ায় চড়ে এক মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল

ও কিছুক্ষণ বাদে একটা কার্ট নিয়ে ফিরল। সামনে গাড়ী দেখলে কে-ই বা চায় পায়ে হাঁটতে বা পিঠে চাপতে। চার্লি ও বাদল দুজনেই উঠল গাড়ীতে।

বুড়ী বাদলকে ধরে নামাল ও ঘরে পৌঁছে দিল। বাদল কাপড় না বদলে সোজা গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল দেখে বুড়ী বলল, "প্রথম প্রথম ঘোড়ায় চড়লে অমন একটু হয়ে থাকে, মিস্টার সেন। দ্বিতীয় দিনেই অতটা চড়া ঠিক হয়নি কিন্তু।"

"ছোটবেলায়," বাদল বলল, "চড়েছিলুম যখন তখন আমার নিজের সহিস ছিল। অভ্যাস নেই বলে এই কষ্ট, নইলে," বাদল সগর্বে বলল, "ঘোড়ায় চড়ে লড়াই করাই তো আমার কাজ।"

বুড়ী ও-কথা বিশ্বাস করল না। সে তো আর জানে না যে বাদল হচ্ছে স্পেসের সমতুল এবং মেরী হচ্ছে মহাকালের প্রতীক। তার থেকে থেকে মনে পড়ছিল, "স্যালভেশনের সূত্র।" কে জানে এই পূর্বদেশী বালক হয়তো স্যালভেশনের কোনো মৌলিক প্রণালী জ্ঞাত আছে। পূর্বদেশী মানুষের পক্ষে সকলই সম্ভব। কিন্তু আপাতত বাদলকে বিরক্ত করবে না।

বলল, "আপনি একটু জিরিয়ে নিন। কাপড় ছাড়তে সাহায্য করবার জন্তে সেই ছোকরাটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যাই, আপনার খাবার গরম করি।"

বাদলের মগজ যেন জমাট বেঁধে বরফ হয়ে গেছল। দুই হাতে মাথাটাকে দাবতে দাবতে তরল করা হলো তার প্রাথমিক প্রতিবিধান। তাতে ফল হলো। বুদ্ধি ফিরলে বাদল ভাবল পিঠ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ, ওটাকে মাসাজ করিয়ে সুস্থ করলে ওর উপর শুয়ে আরাম পাবার ভরসা।

বুড়ী যখন খাবার নিয়ে ফিরল, বাদল বলল, "মিসেস্ মেলভিল, এখানে মাসাজ করতে কেউ জানে? আমার পিঠটা—"

"কী না জানে আমার স্বামী। কিন্তু কেন চাপড় খেয়ে মেরুদণ্ড ভাঙবে? তোমাকে না হয় আরো একটা তোশক দিই, ওর ওপর পিঠ রেখে শুলে মাসাজ-এর সুখ পাবে।"

বাদল ভাবল, বুড়ীটা বড় ভালো। বুড়ীর মেয়েটিও যতটা নিষ্ঠুর ভেবেছিলুম ততটা নয়। ঐ যা, ওকে ধন্যবাদ দিতে ভুলে গেছি। আর চার্লি মানুষটা এখনো মজবুত আছে —still going strong. বোধ হয় Johnnie Walker খায়। আমি কেন এক গ্লাস খাইনে? এমন পীড়ার ক্ষণে ও জিনিস সদ্য উপশমপ্রদ বলে তো শুনি।

বলল, "ধন্যবাদ, মিসেস্ মেলভিল। তোশক আমার তোষক হবে জানি, কিন্তু মিস্টার মেলভিলকে একবার পাঠিয়ে দাও না? কথা আছে। আর মেরিয়নকে দিও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।"

তার স্বামীর সঙ্গে বাদলের কী কথা থাকতে পারে বুড়ী তা আন্দাজ করল। কথা

ওদের দুজনার এত কম হয় ও এত বেশী ব্যবধানে হয় যে বুড়ী জানত কী সে কথা। এমন দিনে ও জিনিস পেটে পড়লে পিঠে সইবে। তাই বুড়ী আপত্তি করল না। তবে স্বামী হয়তো কোনো কড়া মদ অতি মাত্রায় দিয়ে ছেলেটার মাথায় নেশা চড়াবে সেই আশঙ্কায় সে নিজেই অনেকখানি জলের সঙ্গে একটুখানি ব্রাণ্ডি গুলে নিয়ে এল। বাদল পরিমাণ দেখে আহ্লাদে অধীর হলো। ব্যগ্রভাবে গ্লাসটা মুখে তুলে মিসেস্ মেলভিলের উদ্দেশে বলল, "To you".

তারপর হেসে কেঁদে চেঁচিয়ে নেশা না হলেও নেশা হয়েছে মনে করে পরমা শান্তি লাভ করল। এবং উচ্চ স্বরে হাঁকতে থাকল, "I am ! Badal-Time ! I am ! Badal-Time !"

নীচে তখন বড় বড় মাতালের বেসুরো গান চলছিল ;

"Three blind mice
See how they run."

সুতরাং ছোট মাতালের ঘোষণায় কেউ কান দিল না।

১১

দর্জি এল বাদলের মাপ নিতে, নাপিত এল বাদলের চুল ছাঁটতে, কিন্তু বাদলের হয়েছে বেদনার প্রকোপে জ্বর। সে কখনো বলছে "Badal-Time, Ego-Time," কখনো বলছে, "আনো আর-এক গ্লাস।"

তার কাছে একজনের বসা উচিত, তাকে একটু ভরসা দিতে, তোয়াজ করতে। তার মনের প্রফুল্লতাই এরূপ জ্বরের একমাত্র ঔষধ বলে মিসেস মেলভিলের বিশ্বাস। মেলভিল অবশ্য আসুরিক চিকিৎসায় আস্থাবান।

মিসেস মেলভিলের তো সময় হয় না, হাতে কত কাজ। মা'র কথায় মেরিয়ন এসে বাদলের ঘরে বসল ও ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাপ নিল, চার্ট আঁকল, জলপটি বাঁধল, এবং প্রবোধ দিল।

"ও কিছু নয়, মিস্টার সেন," মেরিয়ন বলল, "কাল আপনি আবার ঘোড়ায় চড়তে পারবেন।"

"কাল ? কাল চড়ব ?"

"হ্যাঁ। কাল।"

"আজ ?"

"আজ বিশ্রাম করুন।"

"বিশ্রাম ? স্পেস্ তো বিশ্রাম করে না ?"

মেরিয়ন এর মর্ম বুঝল না। নীরব রইল।

"স্পেস্। স্পেস্ তো টাইমের পিঠে চড়ে চলেইছে। স্পেস্-টাইম। টাইম থেকে কদাচ বিচ্ছিন্ন নয় স্পেস্।"

মেরিয়ন ভাবল আবার প্রলাপ শুরু হয়েছে। বাদলকে ভোলাবার জন্যে বলল, "মিস্টার সেন, তুরন্ত বলুন দেখি আমার সঙ্গে :—Peter Piper picked a peck of pickled pepper."

"কা ? কী ?" বাদল কান পাতল।

মেরিয়ন আবার বলল।

বাদল ভুল করল।

"হলো না।" মেরিয়ন মুচকে হাসল। "আবার।"

বাদল আবার ভুল করল। এবারকার ভুল আরো হাস্যকর।

মেরিয়ন হেসে বলল,—"আচ্ছা, আর একটা নতুন খেলা। বলুন দেখি উলটো দিক থেকে—Able was I ere I saw Elba."

বাদল এতক্ষণে কতকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছিল। "বলছি।" বলতে গিয়ে ভুল করে ব্যস্ত হয়ে বলল, "বলছি বলছি।" আবার ভুল করে হাত তুলে বলল, "একটু থামুন। আপনি বলবেন না, আমিই বলছি।"

সে ক্রমেই প্রকৃতিস্থ হচ্ছিল এই প্রয়াসের ফলে। দম্ভের সহিত বলল, "এইবার উলটো দিক থেকেও ঠিক ঐ কথা—Able was I ere I saw Elba. না ?"

মেরিয়ন বলল, "এবারে ঠিক। সাবাস।"

বাদল খুশি হয়ে বলল, "আমিও অনেক ধাঁধা জানি। বলুন দেখি এর বিপরীত—Madam, I'm Adam."

মেরিয়ন তৎক্ষণাৎ বলল, "Sir, I'm Eve."

বাদল বলল, "থান। আমি কি অমনধারা বিপরীত জানতে চেয়েছি ? উলটো দিক থেকে আমার বাক্যটা আবৃত্তি করুন।"

মেরিয়ন বলল, "ও, তাই বলুন। উলটা দিক থেকে ঐ একই কথা—Madam, I'm Adam, ও কথা কে না জানে ?"

বাদল একে একে দেখল মেরিয়নের ভাণ্ডারে অগণ্য ধাঁধা। ওর সঙ্গে ধন্দের দ্বন্দ্বে পারবে না। তখন পণ্ডিতী প্রশ্ন করল। মেরিয়ন অপ্রস্তুত। তাকে অপ্রস্তুত দেখে বাদলের মহা কৌতুক। "মিস মেলভিল। মিস মেলভিল। হো হো। মিস মেলভিল।"—ছেলেমানুষ।

মেরিয়ন উঠে বলল, "এই তো আপনি চমৎকার সেরে উঠেছেন। আমি তা হলে

আসি ।"

বাদলের হাসির উৎস শুকিয়ে গেল। তার বেদনা বোধ হল পুনর্বার তীব্র। "উঃ" বলে সে এক আর্তধ্বনি করল। যেন তার দেহযন্ত্রের কোথায় কী একটা তার ছিঁড়ে গেল। তারটার সংস্থান স্থির না জেনে সে একবার উরুতে হাত বুলোয়, একবার কোমরে, একবার পাঁজরায়। মুখ কুঁচকিয়ে, চোখ বুজে, চোখের জল উপচিয়ে, দুই হাতে চুল উপড়িয়ে।

নাচার হয়ে মেরিয়ন আবার বসে। এই বিদ্বান বিদেশী যুবকের কাছে অপ্রস্তুত হতে তার পুলক বোধ হয় না। পোপোকাটাপটল কি শহর, না পাহাড়, না দ্বীপ, সাহারা মরুভূমি কোন দেশের অধীনে, ভূমিকম্প কেন হয়, আলোক-বর্ষ (light-year) কাকে বলে—মেরিয়ন এসব প্রশ্নের উত্তর বলতে না পেরে ব্যাকুল হয়। মুরগিদের, শূওরদের, কুকুরদের সম্বন্ধে সে সবজান্তা। কিন্তু বাদল্ তো ওদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে না।

মেরিয়ন একখানা খবরের কাগজ তুলে নিয়ে বলল, "পড়ে শোনাব কি ?"

বাদল হৃষ্ট হয়ে বলল, "বেশ তো।"

কাগজ পড়া শুনতে শুনতে বাদল চাঙ্গা হয়ে উঠল। মিসেস্ পেস্ খালাস ? তাই নিয়ে পার্লামেণ্টে প্রশ্নবাণ বর্ষণ ? নিরপরাধকে অকারণে আসামী করে এই যে ক্ষতিগ্রস্ত করা হল এ তো না হলেও চলত ? আমি গোড়া থেকে জানি বেচারী মিসেস্ পেস্ নির্দোষ, বুঝলেন মিস মেলভিল ? যাক, খুব হৈ চৈ হয়েছে লণ্ডনে। আদালতের সবাই দাঁড়িয়ে হর্ষধ্বনি করেছে, রুমাল নেড়েছে,—কেউ কখনো শুনেছে এমন ব্যাপার ?

ভাইকাউণ্ট সেসিল বক্তৃতা দিয়েছেন পীস্ কংগ্রেসে ? গবর্নমেণ্ট কেলগ প্রস্তাবের সপক্ষে কি বিপক্ষে তা জানাতে দেরি করছেন কেন ? হাঁ কি না, যা হয় একটা কিছু বলতে সাহস লাগে, তা ওঁদের নেই। আমাকে মাফ করবেন, মিস মেলভিল—আপনি হয়তো কন্‌সারভেটিভ দলের একজন। উক্ত দলের গবর্নমেণ্টের নিন্দা আপনার কর্ণরোচক হবে না। আপনি কোনো দলের লোক নন ? কোন দলে যোগ দেবেন তা এখনো চিন্তা করেননি ? দিয়ে কী হবে যখন ভোট দেবার বয়স হয়নি।

আমি কন্‌সারভেটিভ নই। তবে আমি কী ? আমি লিবারল। আমরা এখন মুষ্টিমেয়, হয়তো চিরকাল তেমনি থাকব। সত্য চিরকাল মুষ্টিমেয়দের সঙ্গে। হাঁ কী পড়ছিলেন ? ন্যাশনাল লিবারল ক্লাবে ইউরোপীয় লিবারল ও র‍্যাডিকলদের সভা হয়ে গেল। শুধু ইটালীর ও স্পেনের কোনো প্রতিনিধি ছিলেন না। মুসোলিনী ও প্রিমো কি ওঁদেরকে দেশে টিকতে দিয়েছেন ? নির্বাচিত হয়ে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছেন, কেউ কেউ তো দ্বীপান্তরিত। আপনি ও সব বুঝবেন না, মিস মেলভিল।

মেরিয়ন কাগজ পড়তে থাকল। বাদল বকবক করতে থাকল। দুই কাজ একতরফা।

কতক্ষণ বাদে মেরিয়ন বাদলের তাপ নিয়ে দেখল জ্বর নেমে গেছে। কিন্তু তথাচ ছুটি পেল না।

১২

দিন কয়েক পরে বাদল আবার ঘোড়ায় চড়ল। এবার একা। আপন মনে কী ভাবতে ভাবতে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে হাওয়া খাচ্ছে ও খাওয়াচ্ছে। এমন সময় তার সঙ্গে দেখা করতে এল মেরিয়ন, বাইসাইক্লে। সে গেছল ভেন্টনর, বাদলের পোশাকের কতদূর হল তার খোঁজ নিতে। তার নিজেরও কিছু কাজ ছিল।

"মেরিয়ন যে! কী খবর?" বাদল ইতিমধ্যে তাকে মেরিয়ন বলতে আরম্ভ করেছিল। তাতে মেরিয়ন মনে মনে রুষ্ট।

"জানেন, মিস্টার সেন," মেরিয়ন যুগপৎ উত্তেজিত ও উৎসাহিত হয়ে বলল, "ভেন্টনরে কাকে দেখে এলুম?"

"কাকে?"

"আপনার মতো কালো মানুষ। সত্যি।"

বাদল হাসল। বলল,—"আমি তো কালো নই, তুমি বললেই হব?"

"ব্রাউন রঙের মানুষ। সত্যি।" মেরিয়ন সংশোধন করে বলল।

"তা হোক। কেউ বেড়াতে এসেছে।"

"বেড়াচ্ছে আর কই? এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। ছোট ছোট ছেলেরা তার কাছে ভিড় করেছে তাকে এক মনে দেখতে। আমিও খানিক ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালুম।"

বাদল বলল, "এক মনে দেখবার এত কি পেলে?"

"কী পেলুম?" মেরিয়ন স্মরণ করে বলল,—"ওর মাথায় কেমনতর একটা টুপি। অমন এদেশে কেউ পরে না।"

বাদলের মনে সংশয় জাগল। সে বলল,—"তার কোট কী রকম?"

"কোটের ঝুল হাঁটু অবধি নেমেছে। গলায় টাই নেই, গলা বোতাম দিয়ে আঁটা।"

বাদল চমকে বলল,—"হ্যাঁ!"

মেরিয়ন সাগ্রহে বলল,—"লোকটিকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ক'টা বেজেছে? সে তার ঘড়িটা আমার চোখের সুমুখে ধরে খালি টিপে টিপে হাসল, কিছু বলল না।"

সুধীদার দস্তুর ঐ। বাদলের মনে পড়ল। কিন্তু অমন দস্তুর অন্যের থাকা বিচিত্র নয়। বাদল আরো নিশ্চিত হবার জন্যে জিজ্ঞাসা করল,—"লোকটি আমার চেয়ে লম্বা চওড়া কি না?"

"আপনি লম্বা চওড়া নাকি ?" মেরিয়ন ধৃষ্টতার সহিত বলল। "সে লম্বা বটে, তবে লাইটহাউসের মতো নয়। আর চওড়া বটে, কিন্তু বাঁধাকপির মতো নয়।"

"আচ্ছা, তাঁর গোঁপদাড়ি আছে ?"

"না।"

তা হলে 'ভারতীয় মহারাজা' নয়।

"আচ্ছা, তার পোশাকের রং কী ?"

"বা রে ! মেরিয়ন অনুযোগের স্বরে বলল, "আমি কি আপনার মতো পণ্ডিত নাকি যে এত কথা মনে রাখতে পারব ? বোধ হয় জাফরানি।"

এই রে ! সুধীদা জাফরানি রঙের পোশাক এনেছিল দেশ থেকে। গরমকালে পরবে বলে। তথাপি বাদল সুনিশ্চিত হতে পারল না। সুধাল, "আচ্ছা ওর চোখে চশমা দেখলে ?"

"না।"

মেরিয়ন বেশ স্মরণ করতে পারছিল। বলল, "তার দৃষ্টি শান্ত, অচঞ্চল। আপনার মতো অতবার সে চোখ মিটমিট করে না। আমি তো একবারও তাকে পলক ফেলতে দেখলুম না।"

সুধীদা-ই। সুধীদা ছাড়া আর কেউ নয়। বাপ্ রে ! সুধীদা কেন ভেণ্টনরে উপস্থিত ? চিঠিখানা ভেণ্টনর থেকে পেয়ে দাদা বোধ করি সেইটেকে ঠাওরেছেন বাদলের আস্তানা।

সুধীদা-ই। আর কেউ নয়।

বাদল হঠাৎ চিন্তিত হয়ে পড়ল।

মেরিয়ন বলল, "আসল কথা। আপনার ব্রীচেস কাল দেবে বলেছে। কাল আপনি স্বয়ং গিয়ে পরে দেখলে কেমন হয় ? যার জিনিস তার দেখেশুনে কেনা ভালো।"

বাদল এর উত্তরে অন্যমনস্কভাবে বলল, "হুঁ"।

তার কেবল ভয় হচ্ছিল সুধীদার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সুধীদা তার ঘোড়ায় চড়া দেখে বলবে, "জীবনের সঙ্গে ফ্লার্ট করার নাম বাঁচা নয়।"

বাদল কৈফিয়ৎ দিয়ে বলবে, "কিন্তু সুধীদা, ও তো ঘোড়া নয়, ও যে মহাকাল।"

সুধীদা করবে অট্টহাস্য। ঐ অট্টহাস্যকেই বাদলের ভয়। কেউ তার সঙ্গে যতক্ষণ বিতর্ক করে ততক্ষণ বুদ্ধির লড়াই, কিন্তু বিতর্কের মাঝখানে হাস্য-পরিহাস লড়াইকে করে তোলে তামাশা। তামাশায় বাদল ওৎরাতে পারে না, ঠাট্টার বদলে ঠাট্টা করতে গিয়ে ঠিক রসের কথা বলতে পারে না, যা বলে তাতে কোনো প্যাঁচ নেই, তার নেই দ্ব্যর্থ। সুধীদা যদি রহস্য করে বলে, "ঘোড়া নয়, মহাকাল ? সশরীরে মহাকাল ? আমাদের

জন্মমৃত্যু এর খুরের খটখটানি ? আর এর ল্যাজের ঝাপটে বিশ্বের প্রলয় ?" তা হলে বাদল বলবে, "আর তার সওয়ার হচ্ছে প্রত্যেকের আত্মা।" সুধীদা যদি চেপে ধরে, যদি বলে, "একটার পিঠে এতগুলো সওয়ার ? ঘোড়াটা চলে তো ?" তবে তো বাদল চুপ !

না, সুধীদার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় হয়নি। সুধীদাকে এই কয় মাসের হিসাব দিতে হবে, হিসাব-নিকাশের জন্যে বাদল আপাতত প্রস্তুত নয়। কোথাও এক চুল গরমিল হলে গোলমাল বাধবে। সুধীদা বলবে, "জীবনের সঙ্গে ফ্লার্ট করেছিস ?" বাদল বলবে, "ফ্লার্ট করতে আমি জানিনে, কিন্তু চমক দিয়েছি।" সুধীদা বলবে, "এরই জন্যে সরাই-খানায় মুসাফির ?" বাদল লজ্জায় অধোবদন হবে।

এখানে থাকলে যে-কোনো দিন সুধীদার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। সুধীদা তো সব সময় ভেন্টনরেই সমুদ্র সন্দর্শন করতে থাকবে না, সমুদ্র এদিকেও আছে, সন্দর্শন এদিকেও হয়। দেখা যাতে না হয় তার একমাত্র উপায় বাদলের স্থানত্যাগ।

যেই ও কথা মনে হওয়া অমনি ও কাজ স্থির করা। বাদল বলল, "মেরিয়ন, তুমি এই ঘোড়ায় চড়ো, আমাকে ঐ বাইসাইক্ল দাও দেখি।"

মেরিয়নের গায়ে ঘোড়ায় চড়বার পোশাক ছিল না। বাদল তার ওজর শুনল না। "বেশ তা হলে তুমি ঘোড়াকে ধরে হাঁটো। সাইক্লটা কিন্তু আমাকে দিতেই হবে।"

সরাইতে পৌঁছে বাদল কী করল তার বিবরণ বুড়ী সুধীকে টেলিফোন যোগে শুনিয়েছে।

খণ্ড ভারতী

১

পাখী উড়ে গেল।

গিয়ে এবার যে গাছে বসল সেটা সমুদ্র থেকে দূরে। সেটা একটা ছোট মার্কেট টাউন, সেই নামের ডিউকের প্রসিদ্ধির প্রতিফলনেই তার প্রসিদ্ধি। তবে প্রাচীনতায় সে প্রাগ্‌-রোমান যুগের সঙ্গে সংপৃক্ত বলে প্রবাদ। রাজা আর্থারের যাদুকর মার্লিন নাকি সেখানে কবরস্থ হয়েছিলেন, সেই থেকে তার নাম মার্লবরা। সন্নিকটে সেভারনেক বন। এই বনে নর্মান যুগের রাজারা মৃগয়া করতেন।

যে বাড়ীতে বাদল স্থান পেল সেটি একটি যুদ্ধ-বিধবার। বিধবার নাম মিসেস গ্রেস, বয়স বছর চল্লিশ, আকার মাঝারি, আকৃতি অভিরাম। পুনর্বার পতিপরিগ্রহ করেন নি। তিনটি সন্তানের মধ্যে বড়টি মডলিন, লণ্ডনের অন্তঃপাতী কোন এক বরা (borough) স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হয়ে স্বাবলম্বী হয়েছে, সামনের বন্ধে বাড়ী আসবে। মেজ রবার্ট ওরফে বব্‌, লণ্ডনে পালিয়ে গিয়ে কোন দোকানে শিক্ষানবীশ হয়েছে, বাড়ী থেকে টাকা নেয়

না। ছোট ফ্রেডরিক ওরফে ফ্রেডী মার্লবরোতেই পড়ছে, তাকে অক্সফোর্ডে পাঠাবেন বলে মিসেস গ্রেস এখন থেকেই মনঃস্থ করেছেন। অক্সফোর্ডের খরচ তো বড় কম নয়, সেই-জন্যে তিনি বাড়ীতে অর্থদাতা অতিথি রাখতে বাধ্য হয়েছেন। ঠিক অতিথি না হলেও অর্থ দিয়ে দিদির আশ্রয়ে থাকেন খঞ্জ মিস্টার মারউড। যুদ্ধে তাঁর একটি পা বেবাক গেছে, অন্যটি নামমাত্র আছে। বগলে দুটো ক্রাচ দিয়ে এঘর ওঘর করেন, বাইরে যেতে হলে চড়েন হস্তচালিত গাড়ীতে। তাঁর আছে একটা তামাকের দোকান, তাতে খবরের কাগজও বিক্রী হয়।

মিসেস গ্রেস হিসাবের বেলায় ঠিক আছেন, অতিথির জন্যে যা খরচ করলেন তার দু'গুণ যদি না আদায় করলেন তবে ফ্রেডের অক্সফোর্ডে যাওয়া হয় না। বাদলকে হাঁকেন চড়া দর, এমন চমৎকার করে হাসেন যেন কত বড় অনুগ্রহ করলেন, বাদলও কৃতজ্ঞতায় গলে যায়। কাজেই বাদলকে পেয়ে তিনি বর্তে গেছেন বলতে হবে। কিন্তু ছেলে তাঁর কালো মানুষের কাছে ঘেঁষতে চান না—কতকটা ভয়ে, কতকটা অহঙ্কারে।

মিস্টার মারউডের মুখে লেগে আছে একটি ক্লিষ্ট সংশয়ের হাসি। তিনি প্রায়ই ফ্রেডকে ক্ষেপান তার অক্সফোর্ডে যাওয়া নিয়ে। "Is your brow getting high enough ?" কিংবা "You little Imperialist !" কিংবা "Where is our Prime Minister from Oxford ?" তাঁর সঙ্গে তাই নিয়ে তাঁর দিদির ঈষৎ মনোমালিন্য। দিদিও মনে মনে লেবার পার্টির পক্ষে। কিন্তু কন্‌সারভেটিভ বলে নিজের পরিচয় না দিলে রেস্‌পেক্‌টেবল বলে গণ্য হওয়া যায় না। মার্কেট টাউনের সমাজ ছি ছি করবে। এদিকে মিস্টার মারউড যে পুরোপুরি লেবার তাও নয়। তিনি বলেন, "One has to choose among three devils. শয়তান হিসাবে কনিষ্ঠ হচ্ছেন তিনি যিনি যুদ্ধের সময় ছিলেন যুদ্ধবিরোধী।" যাক, পুরুষে কী না বলে। মার্কেট টাউনের প্রৌঢ়ারা তাঁর বেলায় ছি ছি ছি করেন না, সকরুণ বদনে বলেন, "বেচারা খঞ্জ।"

তামাক আর খবরের কাগজের দোকান করেন এই কারণেই হোক অথবা ঐ দুই জিনিসের দোকান করলেন যে কারণে সেই কারণেই হোক, মিস্টার মারউড ফাঁক পেলেই খবরের কাগজ হাতে করে তন্ময় হয়ে যান এবং ফাঁক না পেলেও সর্বক্ষণ পাইপ মুখে করে তন্নিবিষ্ট হয়ে থাকেন। বাদল তাঁর দোকানে গিয়ে খোঁজ করল, "ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান রাখেন ?"

"রাখি, কিন্তু বিক্রয়ের জন্যে নয়। অন্য কাগজ হলে আপনার চলবে—টাইমস্‌, ডেলী টেলিগ্রাফ, মর্নিং পোস্ট ?"

"না, ধন্যবাদ। আমি আমার নিজের ঘোড়ার পক্ষ নেওয়া পছন্দ করি।"

মিস্টার মারউড-এর নির্বাক জিজ্ঞাসার উত্তরে বাদল বলল, "আমি একজন

লিবারল ।”

“কিন্তু ভারতবর্ষের লিবারলদের সঙ্গে এ দেশের লিবারল পত্রিকার কী সম্পর্ক ?”

“আঃ মিস্টার মারউড !” বাদল হতাশ ভাবে বসে পড়ল । “সারা ইংলণ্ডের সবাইকে আমি বার বার এই কথা বলে ক্লান্ত হয়ে গেলুম যে, আমি জন্মত ভারতীয় হলেও স্বেচ্ছায় ইংরেজ । জন্মের উপর হাত নেই, সেখানে free will খাটে না, তা বলে কি জন্মের পরও determinism মেনে নিতে হবে ? আমি যে ইংরেজ হয়েছি তার যদি অন্য কোনো সদ্‌হেতু না থাকে তবে তার এই একমাত্র কারণ যে, আমি determinism-কে অপ্রমাণ করতে চাই তার দ্বারা ।”

একথা শুনে মিস্টার মারউডের হলো চক্ষু বিস্ফারিত, গাল আকুঞ্চিত, মুখ সংকীর্ণ । এ ছোকরা তো সামান্য মানুষ নয় । ‘ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান’ পড়ে determinism-কে অপ্রমাণ করবার জন্যে ।

“আপনি তা হলে আমার খানা নিন । আমি পড়ি অমন কোনো বৃহৎ উদ্দেশ্যে নয়, খালি তামাশা দেখতে ।” বললেন মিস্টার মারউড ।

“কী ! তামাশা দেখতে ।” বাদল আশ্চর্য হয়ে বলল, “জিজ্ঞাসা করতে পারি কি আপনি তামাশা বলতে কী বোঝেন ?”

অন্য একজন খদ্দেরকে বিদায় করে মারউড বললেন, “খবরের কাগজে যা-কিছু বেরোয় সবই তামাশা । যেগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না সেগুলো তো তামাশাই, যেগুলোয় বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় সেগুলোও তামাশা । অধিকাংশ খবর তো কোন নেশন কী করল তাই নিয়ে ?”

“হাঁ, তাই ।” বাদল এতক্ষণে বুঝেছিল যে আক্রমণটা একমাত্র ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানের উপর নয় । সংবাদ পত্রিকামাত্রের উপর ।

“কিন্তু নেশনকে কি কেউ চোখে দেখেছে ? ব্রিটিশ নেশন কি পার্লামেন্টের ইমারৎ ?”

“না, তা কেন হবে ? ব্রিটিশ নেশন হচ্ছি আপনি আমি ও আরো কোটী কোটী ব্রিটিশার ।”

“বেশ । এই কোটী কোটী ব্রিটিশার কি এমনিতর কোটী কোটী জার্মানকে চোখে দেখেছিল ? না, ওরা দেখেছিল এদেরকে ? আমি তো যুদ্ধের পূর্বে একজনও জার্মানকে দেখে থাকলেও চিনতুম না । কেন বিশ্বাস করলুম যে জার্মানরা আমাদের শত্রু ?”

“জার্মান রাষ্ট্র ব্রিটিশ রাষ্ট্রের শত্রু ।”

“তা হলে নেশন নয় ? স্টেট ? আগে ও দুটোর পার্থক্য জানলে যুদ্ধ করতে যেতুম কি না জানিনে, গেলেও জানতুম যে উভয়পক্ষের যোদ্ধারা আমরা স্টেটের দ্বারা প্রতারিত

নির্বোধ।"

"কিন্তু মিস্টার মারউড," বাদল তাঁর সিগ্রেট নিবেদন অগ্রাহ্য করে বলল, "আপনি বিস্মৃত হচ্ছেন যে স্টেট হচ্ছে নেশনের প্রত্যেকেরই—অন্তত ইংলণ্ডে।"

"কোন স্বত্বে?"

"ভোট স্বত্বে।"

"কথা নেই বার্তা নেই তিনটে লোক এসে বলল, 'আমাকে ভোট দিন, আমি কন্সারভেটিভ' 'আমাকে ভোট দিন, আমি লিবারল,' 'আমাকে ভোট দিন, আমি লেবার' —এই তিনটের মধ্যে একটাকে পছন্দ না করলে আমার পছন্দের কোনো কার্যকারিতা নেই। বিশ হাজার লোকের ভিতর থেকে ঐ তিনটে লোক কেন এগিয়ে এল, অন্য কেউ কেন এল না?"

"ও তো খুব সোজা," বাদল তাঁর বুদ্ধির স্থূলত্ব অবলোকন করে বিস্মিত হয়ে বলল, "তিনটে পার্টি আছে বলে তিনজন প্রার্থী আসে, নইলে কম কিংবা বেশি আসত।"

মারউড মস্তকভঙ্গীর দ্বারা সায় দিয়ে বললেন, "অবিকল তাই। তা হলে ওরা এল পার্টির টাউট হয়ে, পার্টির জনবল বৃদ্ধি করবার অভিসন্ধি নিয়ে। ওদেরকে আমরা পাঠাইনে, ওরা আমাদের পাঠায়।"

"কিন্তু", বাদল আপত্তি করল, "পার্টিও যে আমাদের। এখানে কি পার্টির ক্লাব কি পার্টির এসোসিয়েশন নেই?"

"আছে। সে কেমন আমাদের সে আমি জানি। আমাদেরই যদি হতো আমরা সবাই চাঁদা দিতুম তার তহবিলে। আমাদের মধ্যে যারা ধনবান, যারা সবচেয়ে বাকচতুর, যারা সবচেয়ে কুচক্রী, যারা সবচেয়ে গোঁড়া তাদেরই তাতে প্রাধান্য থাকত না। এই সমস্ত খবরের কাগজ যেমন, আমাদের ঐ সকল পার্টি প্রতিষ্ঠানও তেমনি আমাদের। আর তিন পার্টি যেখানে পালা করে লীলা করেন বা করবার ভরসা রাখেন সেই তিন পার্টির এক স্টেজও—অর্থাৎ পার্লামেন্টও—তেমনি আমাদের!"

বাদল বিরক্ত হয়ে বিদায় নিল। মনে মনে কিন্তু জানল যে খোঁড়াটা একটু আধটু ভাবতে পারে বটে।

২

খাবার সময় যখন মারউডের সঙ্গে বাদলের দেখা হলো তখন ও প্রসঙ্গ উঠল না। কোনো গৃহকর্ত্রী আহারকালে কারুকে তর্ক করতে দেন না। তা ছাড়া, মারউডও অত্যন্ত ভালোমানুষ, উত্তেজিত না হলে তর্ক করেন না। দোকানের পরিশ্রমের উপর পথের পরিশ্রম মিলে তাঁকে এমন ক্ষুধার্ত করে তোলে যে তিনি কারুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে প্রথমে

একটি প্লেট সুপ শুষে নিঃশেষ করেন, তারপর এক টুকরো রুটি ভেঙে মুখে দেন, সেটাও ফুরাতে না ফুরাতে আর এক টুকরো, যতক্ষণ না মাছ আসে। সব শেষ হলে পরে বাঁ হাত দিয়ে আড় করে ডান হাত দিয়ে পাইপ ধরান, দুই বগলে দুই ক্রাচ চেপে লাফাতে লাফাতে লেংচাতে লেংচাতে ড্রয়িং রুমে গিয়ে কফি পান করেন। বাদল সেই সময়টাতে লণ্ডনের মতো পায়ে হেঁটে বেড়াতে বেরয়। সমুদ্রের হাওয়া তো নেই। ঘরে বন্ধ থাকা কী যন্ত্রণা।

রাত হয়েছে অনেকক্ষণ, কিন্তু অন্ধকার নেই। অন্ধকার না হলে ঘুমও আসবে না। তার মানে প্রায় এগারোটা। শীতকালে তাকেই মনে হতো নিশুতি রাত। ঘুম আসুক না আসুক বাদল ততক্ষণে বিছানায় কম্বলের নীচে আরাম করে শুয়ে মনটাকে ঠেলে দিয়েছে চিন্তালোকের শীত-বর্ষা কুহেলিকার মাঝখানে, সেখানে বিবস্ত্র মন থর থর করে কাঁপছে। জুলাই মাস এটা। গায়েই জামা রাখতে ইচ্ছা করে না, মন তো দিগম্বর হয়ে দিশাহারা হতে চায়।

শহরের চওড়া সড়কটা দিয়ে বাদল চলে যায় নদীর ধারে। ছোট্ট নদী, জলের তল দেখা যাচ্ছে। সন্নিহিত দৃশ্য বাদলের মন ভোলায়। দিগন্তে সেভারনেক বন, দীর্ঘকায় বনস্পতিরা এক পায়ে দাঁড়িয়েছে পরস্পরের মাঝখানে ব্যবধান রেখে। এ অঞ্চল বিরল বসতি। বাদলেরই মতো পর্যটকরা এসে জটলা করছে, তাদের জন্যে যত্রতত্র TEA, যত্রতত্র BED AND BREAKFAST. সকলের মতো মারউডও দুপয়সা করে নিচ্ছে।

মনে পড়ছিল মারউডের কথা। বেচারা যদি খঞ্জ না হতেন তা হলে হয়তো তাঁর ফিলসফি ভিন্নরকম হতো! নিজে পারছেন না বলে ভাবছেন গলার জোরে, টাকার জোরে ও চক্রান্ত করে অন্যরা পার্টি প্রতিষ্ঠান হস্তগত করেছে, প্রতিনিধিরা হচ্ছে পার্টির টাউট ও পার্লামেণ্ট হচ্ছে পার্টিদের স্টেজ। অথচ যারা পারছে তারা ভালো কাজও করছে, মন্দ কাজও করছে, করছে যা হোক কিছু। পথে হোক বিপথে হোক চালাচ্ছে তো তারা স্টেটকে। মোটের উপর পার্টি-ওয়ালাদের দ্বারা রাষ্ট্রের পুরোগতিই হচ্ছে। নইলে বাদল কেন লিবারল পার্টিতে যোগ দিয়ে ভবিষ্যতে নির্বাচিত প্রতিনিধি রূপে পার্লামেণ্টে যেতে কেয়ার করত ? মোটা গোছের চাঁদা দিতে, লম্বা চওড়া বক্তৃতা করতে, দরকার হলে চক্রান্ত করতে তার বিবেকের বাধা নেই—কে না জানে যে politics is a dirty game ? এমন কোন খেলা আছে যা শীতবৃষ্টিতে খেললে গায়ে কাদা লাগে না ?

বেচারা মারউড। তাঁর বেদনায় বাদলের সমবেদনা অশেষ। তিনি যে বাদল নন, বাদলের একতম নন, এই তাঁর দুর্ভাগ্য। পৃথিবীতে সবাই কিছু জয়ী হয় না, সিদ্ধার্থ হয় না। যারা হয় না তারা নিজের দোষেই হয় না। কত লাখ লাখ যুবক যুদ্ধ করতে গিয়ে মারাই পড়ল, তাদের দোষ মারউডের চেয়েও বেশি বলে তাদের দুর্ভাগ্য আরো বেশী।

যারা অক্ষত শরীরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এল তাদের কোনো গুণ ছিল। নইলে তারাও হতো এক একটি মারউড। বাদল দৈব বিশ্বাস করে না, আকস্মিকতা স্বীকার করে না, অবশ্য বিপাক মানে না। ওগুলো determinism-এর নামান্তর। এত লোকের মধ্যে মারউডের যে পা ভাঙল এর জন্যে মারউড স্বয়ং দায়ী। তিনি কেন সতর্ক হলেন না, সতর্ক হওয়া যদি অসম্ভব ছিল তবে কেন জেনেশুনে সৈনিক হতে গেলেন? না জেনেশুনে যদি হয়ে থাকেন তবে অজ্ঞতার জন্যে মানুষের আইনে ছাড় নেই, প্রকৃতির নিয়মেরও ব্যতিক্রম নেই, যুদ্ধক্ষেত্রের কায়দাকানুনের কেন অন্যথা হবে?

মারউড হয়তো বলবেন ও কথা অবান্তর, গোড়ার কথাটা এই যে, স্টেট চলে পার্টির চালনায়, পার্টির ইচ্ছায় কর্ম, আর পার্টি হচ্ছে প্রাইভেট কোম্পানীর মতো ঘরোয়া ব্যাপার, তার পিছনে রয়েছে প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজ। রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি—এই দুইয়ের যোগাযোগ মধ্যস্থহীন হয় না কেন? কেন লাভের ভাগী হয় মিডলম্যান? পার্টিকে যদি একবার গ্রাহ্য করা যায় তবে তিনটে পার্টির বদলে একটা পার্টি থাকলে অন্যায়টা কোথায়? রাশিয়াতে ও ইটালীতে তো সেই একচ্ছত্রতা ঘটেছে। মোটর গাড়ীর ড্রাইভার একজন হবে আর দুজন সব সময় তার খুঁৎ ধরতে থাকবে, তাকে শ্লেষ করতে থাকবে, তাকে ওখান থেকে নড়াবার জন্য কত রকম চক্রান্ত করতে থাকবে—যুদ্ধের সময় য়্যাসকুইথকে যেমন করে সরানো গেল, এই সে দিন Zinoviev-এর চিঠি জাল করে লেবার পার্টিকে যেমন ভাবে তাড়ানো গেল—কর্মীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললে কি কাজ পাওয়া যায় তার কাছে?

ফল কথা, মারউড হয়তো, বলবেন—তিনটে চালকের মধ্যে এক রকম আপোস হয়েছে যে ওদের যার উপর সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক আরোহীর আস্থা সে-ই অনির্দিষ্টকাল চালনদণ্ড ধারণ করবে। আরোহীদের দৌড় বড় জোর তাদের অধিক সংখ্যকের আস্থাকে পাত্রান্তরিত করা পর্যন্ত। তারা চালক নয়, চালিত। তবে তাদের ইচ্ছামতো তিনটের যে কোনো একটা চালকের দ্বারা চালিত হতে পারে। যদি তাদের কেউ বলে কোনোটার উপর আমার ভরসা নেই, ভরসা একমাত্র নিজের উপর তা হলে সে কারুকে ভোট না দিয়ে অমনি বসে থাকুক, তার জন্যে গাড়ী তো থামবে না, গাড়ী চলবে যেদিকে তখনকার-মতো গাড়োয়ানের খেয়াল ও যতক্ষণ অপরাপর গাড়োয়ান সেই গাড়োয়ানের পক্ষের ভোটার ভাঙিয়ে নেয়নি। এ যেন একটা শহরে তিনটি মাত্র পোশাকের দোকান, তাদের যেটার খরিদ্দার সবচেয়ে বেশী সেইটে যে ফ্যাশন চালাতে চায় শহরে সেটাই তখনকার মতো হাল ফ্যাশন। অন্য দুটো তার সঙ্গে পাল্লা দেয়, তাকে হাস্যকর প্রতিপন্ন করে, চলতি ফ্যাশনের চেয়ে আপাতরমণীয় ফ্যাশন উদ্ভাবন পূর্বক তার পসার মাটি করে। এখন তুমি যদি তাদের তিনটের কোনোটার খরিদ্দার না হও তাতে দোকানগুলোর কিছু

এসে যাবে না, তোমারই পাড়ার লোক তোমাকে বলবে—সৃষ্টিছাড়া। এবং তোমারই ঘরের লোক ঐ ফ্যাশনের পোশাক পরে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে ভাববে, আহা! কি খোলতাই হয়েছে!

দাঁড়াল এই—মারউডের সম্ভবপর সিদ্ধান্ত যে, নেই ভোটের চেয়ে কানা ভোট ভালো। তোমার কানা ভোটটি পেয়ে ছোট শয়তান হয়তো বড় শয়তান ও মেজ শয়তানকে শাসনদণ্ডের থেকে দূরে হটিয়ে রাখবে এখনকার মতো। কিন্তু এতেও ল্যাঠা আছে। ছোট শয়তান তখ্‌তে বসলেই বড় শয়তান বনে যাবে। তখন তাকে নামাতে হয় সেই ভোটের জোরে—তার বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের বাই-ইলেকশনে উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে।

রণবিদ্যাশিক্ষার্থীরা যেমন নকল শত্রুর মূর্তি টিপ করে বন্দুক চালায় বাদলও তেমনি একটা কাল্পনিক প্রতিপক্ষ খাড়া করে তর্কের লড়াই বাধায়। ফলত কেল্লা ফতে। পার্টি সংক্রান্ত এই তর্কেরও বাদল দিল মুখ বন্ধ-করা জবাব। অবশ্য মনে মনে বলল, বেশ তো, মিডলম্যানকে একদম ছেঁটে ফেলা যাক, কেউ কারুর প্রতিনিধি না হোক, প্রত্যেকে নিজ হাতে রাষ্ট্রের রশি ধরুক। তাতে যদি রাষ্ট্র বাবাজী বিমুখ অশ্বের মতো নড়ন চড়ন বন্ধ করেন তবে তার পরিণাম ডিক্টেটারশিপ—খাঁটি ডিক্টেটারশিপ, মুসোলিনীয় নয়, নেপোলিয়নীয়।

কিন্তু যদি পালটা প্রশ্ন উঠে, ডেমক্রেসীর পরিণাম যদি ডিক্টেটারশিপ হয় তবে ডেমক্রেসীর জন্যে আমরা প্রাণ দিতে গেছলুম কেন? এত লোক প্রাণ দিল, আমি দিলুম প্রাণধারণের আনন্দ, সে কি এই ডেমক্রেসীর ছাপ মারা ভেজাল জিনিসটার জন্যে? এত মর্যাদা এই বেনামী অলিগার্কি ত্রয়ের যে কোনো একটার!

তখন বাদলের মুখে রা থাকবে না।

৩

মিসেস উইলসের ও মিসেস মেলভিলের আদুরে অতিথি বাদল মিসেস গ্রেসের বাড়ীতে পেল অনাত্মীয়ের মতন ব্যবহার। আবদার ধরে কেউ এটা ওটা খাওয়ায় না, জিজ্ঞাসাও করে না যে শরীরটা কেমন যাচ্ছে। তবে ভদ্রতার ত্রুটি নেই। ভদ্রতার ত্রুটি যেমন ওদিক থেকে নেই তেমনি ভদ্রতার ত্রুটি যাতে এদিক থেকে না থাকে সে বিষয়ে বাদলকে হুঁশিয়ার হতে হয়েছে। একবার ধন্যবাদ দিতে ভুলেছে কি এক বেলা অনুশোচনায় ছটফট করেছে। আবার যখন খাবার টেবিলে দেখা তখন কার্পণ্য করেনি, কারণে অকারণে ধন্যবাদের থলি উজাড় করেছে। ড্রেসিং গাউন পরে বাদল দিনের পর দিন কাটিয়ে দিয়ে এল, কিন্তু এ বাড়ীতে কায়দা মেনে চলতে হয় খোঁড়া মারউডকেও।

মিসেস গ্রেস মানুষটি যদিও হাসতে জানেন তবু কেমন যেন ভারী। না, মোটা নন মোটেই। গম্ভীরও নন। তবে আগাগোড়া সীরেট। তাঁর কোনো কৌতূহল নেই, কোনো নেশা নেই, কোনোরূপ সময়ক্ষেপ তাঁর দ্বারা হবার নয়, তিনি তাস খেলেন না, গির্জায় যান বটে কিন্তু সেটা বোধ হয় দুর্নাম এড়াতে, সিনেমাতেও যান হপ্তায় একবার, কিন্তু ও বিষয়ে আলোচনা করেন না। খাটতে পারেন অসাধারণ, রাঁধেন বাড়েন ঝাঁটান ঝাড়েন বাসন ধোন বসন ধোন। কোমরে এপ্রন বেঁধে তিনি যখন মেঝে সাফ করতে থাকেন তখন বাদল তাঁর দিকে চেয়ে সাহায্য করতে ছুটে যাবে কি, ও কথা ভাবতে তার সাহস হয় না, পাছে তিনি কঠোর স্বরে বলেন, না।

মনের জোর তাঁর আশ্চর্য রকম। বছরে অন্তত সাতটা দিন ছুটি প্রত্যেক গৃহিণীই নিয়ে থাকেন, নিয়ে লণ্ডন কিংবা সমুদ্র দেখে আসেন। মিসেস গ্রেস এগারো বছর এই এক জায়গাতেই গাছের মতো শিকড় গেড়ে রয়েছেন ; ফ্রেড যতদিন না অক্সফোর্ডে গিয়ে লায়েক হয় ততদিন। তারপর থেকে তাঁর ছুটি, ছুটি, ছুটি। তখন হয়তো তিনি আবার বিয়েও করবেন। কিংবা ভাইয়ের খাতিরে নাও করতে পারেন। খঞ্জকে দেখতে শুনতে হবে তো। বয়স যতই বাড়বে ও বেচারা ততই অসহায় বোধ করবে।

এমন যে মিসেস গ্রেস একটি কালো মানুষকে বাড়ীতে ঠাঁই দিয়ে তিনি তার প্রতি যে পরিমাণ প্রেম প্রদর্শন করেছেন মার্লবরায় অন্যে কি তা করত ? বাদল কত বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিল—Knock and it will be opened unto you, দোর খুলল ঠিক, কিন্তু বন্ধও হয়ে গেল তার পিঠ পিঠ। খোলাখুলি বলল না যে আমরা কালো মানুষ নিইনে, কিন্তু প্রত্যেকেই বলল, ও বাড়ীতে চেষ্টা করুন, ওরা আপনাকে নিতে পারে। মিসেস মেলভিলের মতো উদার গৃহিণী হয় না—বাদলকে তিনি কালো বলে স্বীকারই করতেন না, বলতেন সূর্যের তাত লেগে আসল রংটা পুড়ে গেছে !

যাক, আশ্রয় যদি বা জুটল আদর জুটল না। এই বাদলের খেদ। সে এক রকম ধরেই নিয়েছিল যে সে ইংলণ্ডের যেখানে যাবে সেখানে পাবে আত্মীয়তা। তার মধ্যে এমন এক শক্তি আছে যে সে যে পরিবারে যাবে সেই পরিবারের একজন বলে গণ্য হবে। পর পর মিসেস উইলস ও মিসেস মেলভিল ঐ শক্তির দ্বারা অভিভূত হলেন, কিন্তু এ কী ! মিসেস গ্রেস ঐ শক্তিকে দ্বার খুলে দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন, কিন্তু আসন পেতে বসালেন না।

তাঁর ছেলেটা তো বাদলের সঙ্গে কথাই বলে না। বাদল যদি তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে সে জড়িয়ে জড়িয়ে কী যে উত্তর করে বাদল তা ধরতে পারে না, বারংবার 'বেগ ইওর পার্ডন' করে ওকেও নাকাল করে নিজেও নাকাল হয়। ওটা তো একটা জড়ভরত। ও যে কী করে অক্সফোর্ডে যাবে ও কী করতে যাবে তা বাদলকে ভাবায় ও হাসায়।

"Home of lost causes" বলে অক্সফোর্ডের প্রতি বাদলের অবজ্ঞা ছিল। তবু সেটা তো home of dumb dullness নয়।

এ বাড়ীর প্রধান আকর্ষণ ঐ খঞ্জ। লোকটি যেন মহাযুদ্ধের মহাপ্রতীক। কী জন্তে অত বড় যুদ্ধটা হলো, কী হলো ওর ফলাফল? না Versailles-এর সন্ধি! অমন একটা খঞ্জ উপসংহার কোনো খারাপ নভেলেরও হয় না। কোনো মতে ঠেকা-দেওয়া শান্তি, বগলে ক্রাচ লাগিয়ে কায়ক্লেশে নড়চড় করছে, একদিন হঠাৎ পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারবে না। আর এক মহাযুদ্ধ—মহত্তর যুদ্ধ—শকুনীর মতো স্তব্ধ হয়ে প্রতীক্ষা করছে কখন ওটাকে বিদীর্ণ করে ওর অন্ত্রতন্ত্র খাবে। বাদলের মনে পড়ে সেই এক দিন যেদিন সকলের সহজে বিশ্বাস হয়েছিল যে এই যুদ্ধই পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ। বাদলও কত লোকের সঙ্গে তর্ক করে তাদের বিশ্বাস করাতে চেয়েছে যে এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ, এই শান্তিই অশেষ শান্তি, তারা বিশ্বাস না করলে তাদের গাল পেড়ে বলেছে তারা তাদের অবিশ্বাসের দ্বারা শক্তির পদতলভূমি সচ্ছিদ্র করছে, তারা মৃৎকীট। চাই লীগ অফ নেশনসে আস্থা, সালিশী নিষ্পত্তিতে নির্ভরতা, মানবভাগ্যে শ্রদ্ধা। এ কথা সে পরকে বুঝিয়ে এসে নিজে ক্রমে ক্রমে বুঝছে, যে সন্ধির উপর শান্তির ভিত্তি সেই সন্ধিকে পাকা বলে গ্রহণ করা যায় না, সেটা কাঁচা ভিত্তি। বাদলের আশা ছিল তার একটা সময় থাকতে পরিশোধন হবে। কিন্তু দেখছে তো ফ্রান্সের মতিগতি। বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ দখল ছাড়বে না। জার্মানিকে ফ্রান্স এক রত্তি বিশ্বাস করে না। ওদিকে রাশিয়া আর এদিকে আমেরিকা লীগ-এ যোগ না দিয়ে আপন আপন বাহুবল বৃদ্ধি করছে। দেখ না আমাদের ব্রিটিশ নৌবহরের সঙ্গে আমেরিকা তার নৌবহরকে সমান করে নিল। এত অবিশ্বাস। আমরা কি আমাদের কাজিনদের সঙ্গে সত্যি যুদ্ধ করতে যাচ্ছিলুম?

ঐ খঞ্জের জন্যই এ বাড়ীতে টেকা। নইলে বাদল অন্ত কোনো অঞ্চলে মনের মতো বাড়ী তল্লাস করত।

"মিস্টার মারউড," দোকানে গিয়ে বাদল জমিয়ে বলল, "আপনি কি বিশ্বাস করেন যে যুদ্ধের জড় সালিশী নিষ্পত্তির দ্বারা বিনষ্ট হতে পারে?"

"আমার তাতে কী এসে যায়, মিস্টার সেন? আমি কি আমার পা ফিরে পাব? না, আমার বন্ধুদের রেসারেক্‌শন হবে?"

"তবু", বাদল পীড়াপীড়ি করল, "তবু ভাবী মানবের লাভ। যুদ্ধ যদি উঠে যায় যৌবনের উপর থেকে রক্তশুল্ক উঠে যাবে, আমরা অক্ষত শরীরে জীবিত থেকে সভ্যতাকে নিত্য নব সম্ভারে সমৃদ্ধ করব।"

"মিস্টার সেন," বললেন মারউড, "এই যে বিরাট অপচয়টা ঘটে গেল আগে আমি চাই এর দরুন জবাবদিহি—বিধাতার কাছে, চার্চের কাছে, স্টেটের কাছে, পলিটি-

সিয়ানদের কাছে, দার্শনিকদের কাছে, কবিদের কাছে. ধনিকদের কাছে, শ্রমিকদের কাছে। আমার ভবিষ্যৎ নেই, আমার আছে অতীত। কেমন করে যে কী হয়ে গেল তাই আমার এখনো বোধগম্য হলো না। বলুন, এই অপচয়ের অন্তিম সার্থকতা কী ? না, এটা অপচয়ই নয়।”

বাদলও বিপদে পড়ল। যদিও সে তখন ছেলেমানুষ ছিল তবু ছিল তো সে জগতে। যুদ্ধের জন্যে তাকেও দায়ী করা যায় পরোক্ষ ভাবে। বিশ্বের প্রত্যেকটি ঘটনার জন্যে প্রত্যেকটি অণু পরমাণুও দায়ী। এখন মারউড জানতে চান এই অপচয়ের দরুন বাদলের জবাবদিহি। এর কি কোনো আবশ্যক ছিল ? এর কি কোনো সুফল ফলেছে ? এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য কী ? মারউডের যে পা ভাঙল তার দ্বারা কার কী মঙ্গল হলো ? দেশ কি চিরকালের মতো—অন্তত দীর্ঘকালের মতো—নিরাপদ হলো ? কার জন্যে নিরাপদ হলো—ডেমক্রেসীর জন্যে, না পাট্রিয়ের জন্যে, না, Big Business-এর জন্যে, না, Trade Union-দের জন্যে।

“এই দেখুন না, একখানা ছোট দোকান নিয়ে পড়ে আছি, এই আমার অবলম্বন। এখানা যদি W. H. Smith বা তেমন কোনো কোম্পানী কিনে নেয়—নিয়ে আমাকে তাদের কর্মচারী করে—তবে কি আমার আপনার সঙ্গে আলাপ করবার এই স্বাধীনতাটুকু থাকবে ? আমি আমার নিজের ইচ্ছায় আমার নিজের জিনিস ভাঙতে গড়তে, এর মধ্যে প্রাণ ঢালতে, এর উপর কল্পনা ফলাতে, একে মনের মতো করতে পারব ? ও যুদ্ধ তো আপনি সালিশী নিষ্পত্তির দ্বারা রোধ করলেন, এ যুদ্ধ—এই অর্থনৈতিক যুদ্ধ – এই বৃহৎ কর্তৃক ক্ষুদ্রকে গ্রাস, এর কী মীমাংসা ? ও যুদ্ধে আমার পা দুটো গেছে, এ যুদ্ধে যাবে আমার ব্যক্তিত্ব—কী ভীষণ অপচয়। অবশ্য যদি আমাকে মানবজাতির বা ব্রিটিশ নেশনের দিক থেকে কিছুমাত্র মূল্যবান বলে বিবেচনা করেন।”

এখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাদল দ্বিতীয়ত্বহীন, অনন্যাধীন ও সমানস্বত্বসম্পন্ন বলে বিশ্বাস করে, নইলে সে লিবারল্ কিসের ? পৃথিবীতে আর একটিও জেমস্ লিস্টার মারউড নেই। জেমস্ লিস্টার মারউডএর সত্তা স্বাধীন—অপরের দ্বারা যদি তাঁর সত্তা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে অপরের সত্তাও তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পৃথিবীর কোনো মানুষের চেয়ে জেম্স্ লিস্টার মারউডের স্বত্ব কম নয়, কারুর চেয়ে বেশিও নয়। নানা কারণে তাঁর দখল কম-বেশি হতে পারে, কিন্তু স্বত্ব—টাইটল্—সমান। বাদল মানে পার্সনালিটি, লিবার্টি, ইকুয়ালিটি। এদের মধ্যে প্রধান হ'চ্ছে পার্সনালিটি। পার্সনালিটি যদি ক্ষুণ্ণ হয় তবে জীবন বৃথা। আর পার্সনালিটি যদি না থাকে তবে তো জীবন থাকা না থাকা সমান। কমিউনিজমের উপর সেইজন্যে বাদলের রাগ। লেনিন নাকি বলেছেন যে পৃথিবীর এক পোয়া লোককে সুখী করবার জন্যে যদি তিন পোয়া লোককে হত্যা করতে হয় তবে তাই কর্তব্য। এখন ঐ

এক পোয়া লোক কোন গুণে বাঁচবার অধিকারী হবে ? ওরাও কেন সহমরণে যায় না। পৃথিবীতে একটাও মানুষ না থাকলে তো পৃথিবী ভূস্বর্গে পরিণত হয়। না, মঁসিয়ে লেনিন, ওটা আপনার উন্মাদগ্রস্ততা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে যা কেবলমাত্র তার মধ্যেই আছে, তার ভাইয়ের মধ্যে নেই, ছেলের মধ্যে নেই, বন্ধুর মধ্যে নেই, স্বজাতির মধ্যে নেই, স্বদেশবাসীর মধ্যে নেই। মারউড যদি মারা পড়তেন তবে পৃথিবীতে একটা ফাঁক রেখে যেতেন, ইংলণ্ডে একটা অভাব ঘটিয়ে যেতেন, সে ফাঁক ও সে অভাব অন্যের দ্বারা পূরণ হবার নয়, পূরণ হতো না। তিনি তো সেন্‌সাসের একটি সংখ্যা নন। দেশের জনসংখ্যা আজ কমেছে, কাল বাড়বে, জনসংখ্যার এটুকু অপচয় বলতে গেলে কিছুই নয়, জনসংখ্যার উপচয়ই ভাবনার কথা। কিন্তু পার্সনালিটির অপচয় ! ও যেন নিরপরাধের প্রাণদণ্ড ! একটিমাত্র মিসেস্ পেস্‌কে বিনা অপরাধে প্রাণদণ্ড দিলে সমগ্র ইংলণ্ডে বিপ্লব উপস্থিত হতো না কি ? অথচ প্রাণের চেয়ে যা মূল্যবান, যার মূল্যে প্রাণের মূল্য, সেই পার্সনালিটির উপর রাশিয়াতে ও ইটালীতে রকমারি অত্যাচার—স্টেটের জগন্নাথের রথ মানুষের, সিটিজনের, বুকের হাড় গুঁড়িয়ে দিয়ে চলেছে। মারউডের উক্তি যদি যথার্থ হয় তবে ইংলণ্ডের পার্টি ও Big Business কি দৈত্যের মতো হাঁ করে পার্সনালিটিকে গিলতে উদ্যত হয়নি ?

৪

এত অপচয় কেন ? না, এ অপচয়ই নয় ?

এই নিয়ে চিন্তা করতে বসে বাদলের মনে হলো জগতে কি অপচয়ের সীমা-পরিসীমা আছে ? জগতের কথা ছেড়ে দাও, পৃথিবীর কথা—না, ইংলণ্ডের কথাই—ধর। লণ্ডন, ম্যাঞ্চেস্টার, গ্লাস্‌গো প্রভৃতির বস্তিতে কত লোক জীয়ন্তে পচছে। সেই ক্যালিডোনিয়ান মার্কেটে দে সরকারের সঙ্গে যাওয়া মনে পড়লে এখনো গা ঘিন ঘিন করে। পিকাডিলীতে কত বিশ্রী পুরোনো কাপড়-পরা গরীব বুড়োবুড়িকে দেশলাই ও ফুল বেচবার ভান করে ভিক্ষা করতে দেখে বাদলের কান্না পেয়েছে, পকেটে হাত পুরে যখন যা উঠেছে তাই দান করে সে পালিয়ে বেঁচেছে। দে সরকার রহস্য করে তাদের বলেছে, 'বাবা, সবংশে লুটে খাচ্ছ আমাদের দেশ, তবু পেট ভরল না ? আমাদের পকেটে নজর ?' বাদল রেগে দে সরকারকে নিষ্ঠুর বলে গালাগাল দিয়েছে।

বেকার বসে অমানুষ হয়ে যাচ্ছে কত যুবক। তাদের হাতে কাজ নেই, তারা তো ভাবুক নয় যে হাতে কাজ না থাকলে মাথা খাটাবার সুযোগ পাবে, তারা কর্মের অভাবে অকর্মণ্য হয়ে কর্মের অভ্যাস হারাচ্ছে, শিক্ষা বিস্মৃত হচ্ছে। কাজ পেলেও তারা কাজ রাখতে পারবে না, যদি না কর্তারা তাদের আবার শিখিয়ে পড়িয়ে নেয়।

যারা বেকার নয় স-কার খাটুনির চাপে তাদের মগজ যাচ্ছে ভোঁতা হয়ে। তারা পড়ে বুঝতে পারে রোমাঞ্চকর খবর, দেখে বুঝতে পারে ঘোড়দৌড়, শুনে বুঝতে পারে ছেলেভোলানো বক্তৃতা। বাদলের মনে পড়ে একদিন রাস্তায় লোকের ভিড় দেখে সে-ও ভিড়ে গেছল, গিয়ে শুনল, বক্তা একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে বলছেন, "আমার বন্ধুর সঙ্গে সেদিন দেখা হলো। বললুম বন্ধু, তোমাকে এত দুর্বল দেখছি কেন ? বন্ধু বলল, দুঃখের কথা কী বলব, আমার ফ্লু হয়েছিল। বটে ? তোমার ফ্লু হয়েছিল ? তিন হপ্তা ছুটি নিয়ে চেঞ্জে গেলে না কেন ? হ্যাঁ, চেঞ্জে যেতে দেবে না আরো কিছু। একদিন কামাই করেছি, অমনি মালিক চোখ রাঙিয়ে বলেছে, তোমার ফ্লু হয়েছিল বলে আমার কারবারের লোকসানটা যা হলো সেটা কে পুষিয়ে দেবে শুনি ? এই তো জীবন। সঙ্ঘবদ্ধ হও, ভাই সব। লেবার পার্টিকে পরিপুষ্ট করো। Vote Labour."

এমনি কত অপচয়ই না সহজে চোখে পড়ে। বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে যে সব পণ্যের তার সব কি মানুষের দরকার, দরকার হলেও অত বহুল পরিমাণে ? রকম রকম সিগ্রেট ও মদ ; পেটেণ্ট ওষুধ ও টিনে বন্ধ খাদ্য ; খুনখারাবির উপন্যাস ও যৌনব্যাপারের ছায়াচিত্র। উৎপাদক চায় শুধু লাভ, লাভ, লাভ। লাভের আশায় যা তৈরি করে ফেলেছে তা যদি কেউ না কেনে তবে তা তো অপচয় হলোই, আবার যে খরচটা করে ফেলেছে তাও গেল লোকসান। কোনমতে সেটাকে যদি ক্রেতার ঘাড়ে চাপাল তার ক্রেতাও যে সেই ওষুধ খেয়ে সত্যি সত্যি সেরে উঠল বা সেই খাদ্য খেয়ে হজম করতে পারল তাও সব সময় হয় না। ভোক্তারও লোকসান হলো টাকার, অপচয় হলো শক্তির। কতগুলো কাঁচা মালের শ্রাদ্ধ হলো ! একখানা বই ছেপে বের করতে কাগজ কালি হরফ যন্ত্র ইত্যাদি হরেক রকম সরঞ্জাম তো লাগলই, অধিকন্তু কম্পোজিটার প্রুফ রীডার পাব্‌লিশার ও বিজ্ঞাপনলেখক কতটা উদ্যম ন্যস্ত করল। নাটের গুরু লেখক যা দিল তা হয়তো তার অর্ধেক জীবন। ও বই কেউ কিনল না, ধার করে পড়লও না। না কিনে ও না পড়ে কাগজওয়ালারা করল সমালোচনা, তাই পড়ে লোকে ভাবল, যথেষ্ট জ্ঞান হলো। এখন ঐ জ্ঞান পেটে থাকলে বন্ধু মহলে অপদস্থ হবে না। নাটকের প্রয়োজনীয় টাকা ও রিহার্সলের সময় খরচ হলো বিস্তর। স্টেজে ও জিনিস জমল না। বক্স অফিসের দিকে আর কেউ ঘেঁষল না। আর একটা রাত সবুর করে কর্তারা নাটক তুলে নিলেন।

অপচয়ের অবধি নেই। এই দেখ না বাদলের নিজের অবস্থা। পাস করবার জন্যে তাকে অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব পড়ে মনে রাখতে হলো, তারপর মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হলো—মনের অপচয় হলো না কি ? অন্যান্য ছাত্রদের তো আরো দুর্দশা। বেচারিরা হয়তো পাসই করতে পারবে না অথচ ভুলেও যাবে যা পড়েছিল। পরবর্তী জীবনে ও বিদ্যার প্রয়োজন হবে না, হবে ডিগ্রীর প্রয়োজন। তারও বাজারদর এমন

যে তার জন্যে যে খরচটা হলো বাজারদরের চেয়ে সেইটে হয়তো বেশি।

সুতরাং স্বীকার করতেই হবে—বাদল ভেবে সাব্যস্ত করল—যে, অপচয় আছে। ইংলণ্ডেও আছে, ভারতবর্ষেও আছে, সর্বত্র আছে। মানবমাত্রেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ বলে, পরস্পর সম্বন্ধে অজ্ঞ বলে সময় শক্তি ও স্বর্ণ অপচয় করে, করছে, করে আসছে। অজ্ঞতা যদিও প্রধান কারণ, অনধিকারচর্চাও সামান্ত নয়। যাদের যে কাজে হাত দেওয়া উচিত নয় তারা সেই কাজে হাত দেবেই—গড্ডলিকার মতো। একজন ওই ব্যবসায়ে লাভবান হয়েছে, আমরাও কেন হব না? একজন পাস করে বড় চাকরি পেল, আমরাও কেন পাব না? একজন যা করে সফল হয়েছে আমরাও কেন তাই করব না?

পরিণামে ঐ একজনের ক্ষতি, অন্তান্ত সকলেরও ক্ষতি। বলা যেতে পারে, প্রতিযোগিতার দরুন মাল সস্তা হচ্ছে, উৎকৃষ্টও হচ্ছে। সস্তা হচ্ছে সেটা প্রত্যক্ষ। উৎকৃষ্ট হচ্ছে কি? যন্ত্রপাতি হয়তো উৎকৃষ্ট হচ্ছে, কিন্তু শিল্পদ্রব্য? শিল্পদ্রব্য যারা বানায় তারা কি আর তেমন যত্ন করে নিজের হাতে বানায়? সেসব নিপুণ কারিকর কি আর আছে? কলে তৈরি লাখ লাখ একই মাপের একই ঢঙের জিনিস কি তেমনি তৃপ্তি দেয়?

বাদল বলল, "মিস্টার মারউড, মানবের জগতে অপচয় আছে। প্রকৃতিতে আছে কি না তা অনুসন্ধান করিনি। এই অপচয়ের সার্থকতা অবশ্য এই যে তা আমাদের অভিজ্ঞতার প্রসার বাড়িয়ে দেয়—কোনটা অপচয় তা জানলে কোনটা অপচয় নয় তাও জানি।"

"তা যদি জানতুম," মিস্টার মারউড বক্রোক্তি করলেন, "তবে আমরা হাজার দুই বছর আগে লড়াই করা ছেড়ে দিয়ে নতুন কিছু করতুম। ইতিহাস থেকে আমি এই শিখেছি যে ইতিহাস আপনাকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে, যেমন সূর্যোদয় করছে দিনে দিনে আপনাকে আবৃত্তি, যেমন জন্ম করছে পুরুষানুক্রমে আপনাকে আবৃত্তি। কয়েকটা সরল উপাদানে তৈরি হয়েছে এ জগৎ—ইতিহাসেরও তেমনি গোটা কয়েক সরল সূত্র। আমি এই শিক্ষা করেছি, মিস্টার সেন, যে, শিক্ষা করলে জরা, অশিক্ষিত থাকলে যৌবন।"

"তার মানে?" বাদল আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"মানে খুব সোজা। যে নেশন ইতিহাসের মর্ম জেনেছে সে নেশন কাজ কর্মে ইস্তফা দিয়েছে—খাওয়ার পর শোওয়া আর শোওয়ার পর খাটা আর মাঝে মাঝে লড়াই করা, এ ছাড়া আর নতুন কী করবে? বংশরক্ষার প্রবল তাড়না তাকে ধরাপৃষ্ঠে টিকিয়ে রাখে, তাও যখন দুর্বল হয়ে আসে তখন তার বিলোপ। আর যারা দেখেও শেখে না, ঠেকেও শেখে না, যারা বর্বর তারাই চিরকাল অপচয় দিয়েও মহোল্লাসে বাঁচে। কত সভ্যতা নিস্তেজ হয়ে নির্বাপিত, কিন্তু বর্বরতা সমান দীপ্যমান।"

৫

"তা হলে," বাদল বলল, "আপনি অপচয়ের জন্যে চিন্তিত কেন ?"

"সেই তো মজা," বললেন মিস্টার মারউড। "অপচয় সম্বন্ধে অচেতন থাকলে আমি হয়তো এও ভুলে যেতাম যে আমি খঞ্জ, কিন্তু এই পা আর সেই অপচয়—দুই আমাকে পেয়ে বসেছে। কেন, কেন, কেন—আচ্ছা আপনি কি ফিলসফার ?"

"না," বাদল বলল নিশ্চিতভাবে। "ওঁরা ঘরে দরজা দিয়ে দরজায় খিল দিয়ে ভাবতে বসেন। আমি ভাবতে বসি ঘোড়ার পিঠে। অবশ্য বিক্ষেপ আমিও বরদাস্ত করিনে। তবু আমার জাত আলাদা। আমি কর্মী হয়ে বেরোবার আগে চিন্তার দেনা চুকিয়ে দিতে চাই। আমি পার্লামেন্টে যাব, মিস্টার মারউড, আমি ইংলণ্ডের নেতৃত্বে পৃথিবীর সব নেশনকে সঙ্ঘবদ্ধ করব। প্রতিযোগিতার যুগান্তকারী আমি, সহযোগিতার ঋষি। আমরা সবাই মিলে দোহন করব পৃথিবীকে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে, হয়তো যেতেও পারি উড়ে আমরা মঙ্গলগ্রহে কি চন্দ্রে। একটা সামঞ্জস্য করতে হবে উৎপাদনের সঙ্গে উপভোজনের—একটা ভাগাভাগি করতে হবে কোন দেশ কী বানাবে ও কোন দেশ কী ফলাবে। একটা আন্তর্জাতিক বিনিময়মান স্থাপন করতে হবে, মিস্টার মারউড। পৃথিবীর একটা নতুন বন্দোবস্ত না করে এই গ্রহটার থেকে আমি নড়ছিনে।"

মারউড বাদলের মুখের পানে একদৃষ্টে চেয়ে বোধ হয় ভাবছিলেন যে ছোকরা হয় পাগলা গারদের ফেরারী বাসিন্দে, নয় পাগলা গারদে যাবার রাস্তা ধরেছে। ইহুদী ডিস্‌রেলী প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন বটে, কিন্তু এ কি কখনো সম্ভব যে এই ভারতীয় যুবক একদিন ডাউনিং স্ট্রীটের বাসাটা দখল করবে ? প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে এর অভিযান, কিন্তু আমারই ভাগনে ফ্রেডরিক গ্রেস যে প্রধান মন্ত্রীর পদে এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

"মাই ডিয়ার সাব্" মারউড বাদলকে আপ্যায়িত করে বললেন, "বহু সংস্কারকের ঘা খেয়ে পৃথিবী বুড়ী মাগী হয়ে গেছে। একে ভেঙে গড়বার কল্পনা বৃথা। এ ভাঙা দূরে থাকুক, বেঁকবেও না। প্রতিযোগিতার উপর যে ব্যবস্থা খাড়া হয়েছে তাকে নাড়া দিয়েছেন লেনিন, কিন্তু তাতে করে প্রতিযোগিতার উচ্ছেদ কি হবে ? হবে বড় জোর রকমফের। আমি বেঁচে আছি ইতিহাসের পুনরাবর্তন দেখতে—যাই বলুন, ও জিনিস হাজার বার দেখেও অবসাদ নেই, প্রত্যেক বার মনে হয় নাও ঘটতে পারে অমন, আশা হয় নতুন কিছু আসছে।" তিনি বাদলের স্ফুরিত অধর লক্ষ করে ভাবলেন বাদল একটা কড়া জবাব দিতে যাচ্ছে। মোলায়েম সুরে বললেন, "না, মিস্টার সেন, অপচয়ের আপনি যে তাৎপর্য দিলেন তা আমি গ্রহণ করতে পারলুম না। আপনার মুখ থেকে যদি শুনি যে অপচয়ের কোনো সার্থকতা নেই, অপচয় হচ্ছে এক একটা unmitigated evil, কেউ ওকে থামাতে কিংবা কমাতে পারবে না, মানুষের ও দুর্ভাগ্য, তবেই আমি সন্তুষ্ট

হব, তবেই পাব আমি সান্ত্বনা। জানব যে জীবনের কাছে জবাবদিহি চাওয়াটাই অন্যায়, জীবনের দস্তুরই হচ্ছে পাগলা ষাঁড়ের মতো অসতর্ক পথিককে অকস্মাৎ গুঁতিয়ে জখম করে দেয়, খতম করে দেয়। পৃথিবী নামক মুল্লুকে বাস করতে চাইলে অনিশ্চয়ের শাসন স্বীকার করে নিতে হয়। ওটা তার প্রথম শর্ত। বর্বর জাতিরা দিন আনে দিন খায়, ওদের দারিদ্র্য ভয় নেই, বার্ধক্য ভয় নেই, মৃত্যু ভয় নেই, ওরা মারে ও মরে বিনা আড়ম্বরে, ওরা ভালোবাসে ও ঘৃণা করে পর্যায়ক্রমে, যখন ভালো লাগে তখন খাটে, ভালো না লাগলে খাটে না। অপচয় ওদের যা হচ্ছে তার জন্যে ওদের পরোয়া নেই। ওটা বাঁচার অঙ্গ, ও না থাকলে বাঁচা বিস্বাদ লাগে। আমরা সভ্য জাতিরা বড়ো আরামপ্রিয় হয়ে উঠেছি, আয়েশটি আগে, শৃঙ্খলাটি আগাগোড়া, তাই একটু অপচয় ঘটলে আমরা অধীর হই—কি সময়ের, কি অর্থের, কি উপকরণের।—" এই বলে একজন আগতকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই যে, কী চাই?"

খঞ্জ উঠে গিয়ে সরবরাহ করতে পারেন না। বললেন, "ওই যে! ওইখানে রয়েছে। দয়া করে নিন।" গ্রাহক দাম দিয়ে "গুড বাই" বলে প্রস্থান করলেন। তখন বিক্রেতা বাদলের দিকে চেয়ে বললেন, "সব জিনিসের একটা মূল্য ধরা হয়েছে, তার দ্বারা অপচয়ের হিসাব কষা যায়। একজন অঙ্গীকার করে অন্য একজনকে বিবাহ করল না, হৃদয় ভঙ্গ করার দাও ক্ষতিপূরণ। এটুকু অপচয়ও মাফ করা যায় না।"

তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে বাদল হাসল। সে তখন কঠিন মননে মগ্ন ছিল। অপচয় সমস্যা তো খুব সরল সমস্যা নয়। জীবনের সঙ্গে অপচয়ের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ কি সত্যই আছে? এমন সুদিন কি হবে না যেদিন অপচয় থাকবে না? তবে আর প্রগতি কী হলো, পারফেকশনে কই পৌঁছানো গেল? ইউটোপিয়াতে যা থাকবে না তার গোষ্ঠী-নাম অপচয়। তার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত—বিরোধ, প্রতিযোগিতা, অপরাধ, শাস্তি, আবর্জনা, ব্যাধি, দমন (repression), খণ্ডন (frustration), ভয়। আমাদের ক্রম অভিজ্ঞতা আমাদেরকে ইউটোপিয়ায় নিয়ে যাচ্ছে, রাস্তায় এই সব স্টেশনকে আমরা একে একে অতিক্রম করছি। এদের এক একটাতে ভুল ভেবে নেমে পড়ে দেখি যে ইউটোপিয়া নয়, অন্য স্টেশন, তখন আবার গাড়ীতে উঠি, হেসে বলাবলি করি আর একটু হলে গাড়ী ছেড়ে যেতে।

ইতিহাস কি কলুর চোখ ঢাকা বলদ—একটি ঘানিগাছকে ঘিরে অনাদি কাল থেকে ঘুরছে, অনন্ত কাল ঘুরবে? প্রগতি কি তবে পরিবর্তন? পারফেকশন কি তবে বলদকে যা বল দেয়—অলীক স্বপ্ন! স্পেস্ কি তবে সরল রেখার মতো কালের পাতার উপর আঁকা হয়ে যাচ্ছে না, তারপর সে পাতা গুটিয়ে গিয়ে সরল রেখার সঙ্গ রাখছে না? স্পেস্ কি প্রথম পড়ুয়ার মতো দাগা বুলাচ্ছে তো বুলাচ্ছে? কাল কি স্পেস্ কর্তৃক অঙ্কিত একটা মায়া মণ্ডল—নিজের লেজ কামড়ে ধরে থাকা একটা সাপ? যেখানে আদি

সেইখানেই অন্ত ? প্রত্যেক মুহূর্তেই একটা বৃত্তের আদিবিন্দু—প্রত্যেক মুহূর্তই অন্ত একটা বৃত্তের অন্তিম বিন্দু ? এবং সকল বৃত্তই একই বৃত্তের পুনরাবৃত্তি ?

"না," বাদল তার মনে মনে বলল, কিন্তু বলাটা মনের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে মুখ দিয়ে নির্গত হলো।

মারউড জিজ্ঞাসুনেত্রে বাদলের দিকে তাকালেন।

বাদল বলল, "না, মিস্টার মারউড, ইতিহাস তার আপনাকে ফিরে পুনরাবর্তন করে না। তা যদি করত তবে কালকের ঘটনা আজও ঘটত।"

"হা-হাআআ।" মিস্টার মারউডও সশব্দে হাসতে জানেন। "আপনি ও কথার আক্ষরিক অর্থ করলেন, মিস্টার সেন ? তা আমার অভিপ্রেত নয়। ঘটনা বিভিন্ন, কিন্তু ঘটনার উদ্দেশ্য সেই এক, তাৎপর্য সেই এক। আপনার-জীবনে যখন প্রেম আসবে আপনি ভাববেন এমন ভালোবাসা কেউ কোনোদিন বাসেনি, এমন ভালোবাসা কেউ কোনোদিন পায়নি—কিন্তু সুচতুরা প্রকৃতি আপনার কাজটি করিয়ে নেবার জন্যে প্রত্যেকের চিত্তে অবিকল ঐ প্রবর্তনা উপজাত করে। মানুষ কি মোহমুক্ত ভাবে প্রকৃতির কোনো কর্ম করতে চায়। অনিয়ন্ত্রিতভাবে দেশে দেশে প্রজাবৃদ্ধি হচ্ছে, এদের খোরপোশ যোগাতে প্রকৃতির পদে পদে আপত্তি, প্রকৃতি বলে, বনের প্রাণী যেমন একে অপরকে মেরে বৃদ্ধিকে ক্ষয় করে ও প্রকৃতির আয়ব্যয়ের হিসেব মেলায়, মানুষও তাই করুক। কিন্তু মানুষকে মন্ত্র পড়ে অন্ধ না করে দিলে তো মানুষ তা করবে না। তাই ডেমক্রেসীর জন্যে যুদ্ধ। আগে হতো ভগবানের জন্যে, রাজার জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে। পরেও হবে একটা কিছুর জন্যে।···এই যে, আসুন। কী চাই ?"

গ্রাহক বিদায় হলে বাদল বলল, "তা হলে দাঁড়ায় এই যে, প্রকৃতিই প্রজাবৃদ্ধির কাজ করিয়ে নিয়ে প্রজাক্ষয়ের কর্মে প্রেরণা দেয়। আদৌ প্রজাবৃদ্ধির প্রয়োজনটা কী ছিল ?"

"সেই তো মজা," মারউড কষ্টের হাসি হেসে বললেন, "লোকে চাকরি না করে ব্যবসা করতে যায় কেন, ব্যবসা করতে গিয়ে স্টক এক্সচেঞ্জে জুয়া খেলে কেন ? প্রচুর-তরের আশায় প্রচুরকে উড়িয়ে দিতে না জানলে বড় মানুষ কিসের ? অজস্র অপচয় না করতে শিখলে বড় মানুষের স্ত্রী হওয়া যায় না। আমি যেন আমেরিকান টুরিস্টের হাতের একশ' ডলার নোট। সে তার সুটকেসের গায়ে আমাকে এঁটে দিয়ে লেবেল বানায়, তার মুটেরা আমাকে ছিঁড়ে নিতে চাইলে আমার খানিকটা উঠে যায়, খানিকটা লেগে থাকে।"

"কিন্তু" বাদল উষ্ণ হয়ে বলল, "প্রকৃতির ঐ খামখেয়াল কি চিরকাল চলতে থাকবে ? আমরা তা হলে কী করতে আছি ? প্রকৃতির প্রকৃতি বদলে দিতে পারি সেটা জানেন ?"

মারউডের দুটি ভুরু দুটি বিড়ালের মতো কুঁজো হয়ে দাঁড়াল, তাঁর গাল দুটি

পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে দুই দিকে দুই গর্ত সৃজন করল, আর তাঁর মুখগহ্বর বুজে গিয়ে রইল একটি ছিদ্র। তিনি বোধ হয় ভাবলেন, পাগল, পাগল বদ্ধ পাগল। প্রকৃতির প্রকৃতি বদলে দেবে, এত বড় স্পর্ধার কথা কেউ এ পর্যন্ত বলেনি। এই প্রথম শোনা গেল। প্রকৃতিকে জয় কর, দমন কর, শাসন কর, শোষণ কর—তা না, প্রকৃতির প্রকৃতি বদলে দাও! য়্যাঁ!

১১

দোকানে হাজিরা দিতে দিতে বাদল কাজের লোক হয়ে উঠল। গ্রাহক এলে মারউডের হয়ে সে-ই এটা পেড়ে দেয় ওটা বাড়িয়ে দেয়। কালো মানুষ দেখে যাঁদের কৌতূহল হয় তাঁরা একবারের জায়গায় দুবার আসেন। সে মানুষের মতো কথা বলতে পারে শুনে একটি খুকী তো তার মাকে ফস্ করে শুধিয়ে বসল, “O mummy, look, look, he can speak like a man.” গরীবের ছেলেরা রাস্তায় খেলা করতে করতে দোকানে উঁকি মেরে পরস্পরকে আঙুল দিয়ে দেখায়—দ্যাখ, দ্যাখ, নিগার। একদিন দোকান থেকে বেরিয়ে বাদল পিছন ফিরে দেখে একপাল ছেলে তার অনুসরণ করছে। তারা চুপি চুপি বলাবলি করছে, “Hush, hush, he will eat you up.” বাদল ওকথা শুনে বিকট হাঁ করে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। তখন ওরা চিঁ চিঁ করে লম্বা লাফ দিয়ে দশ হাত ছটকে পড়ল।

রাস্তায় যে সব সাবালক চলাফেরা করছিলেন তাদের একজন—এক প্রৌঢ়া তাকে থামিয়ে বললেন, “I wonder if you will have a cup of tea with me.” বাদল অপরিচিতার এই অযাচিত অনুগ্রহের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। যদি বলে আমি তো আপনাকে চিনিনে তা হলে হয়তো রূঢ়তা হবে। অথচ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেও নিজেকে সুলভ করে ফেলা হয়। প্রৌঢ়া তার দ্বিধা লক্ষ্য করে বললেন, “You see, my children would love to see a black man eat.”

বাদল অপমানে থর্ থর্ থর্ থর্ করে কাঁপল। তারপর বললে, “আপনি কি জানেন না যে কালো মানুষরা শাদা ছেলেমেয়ে পেলে আর কিছু খেতে চায় না? Would your children love to see a black man to eat one of them?”

প্রৌঢ়া তো ভয়ে ভিমি খেয়ে পড়ি পড়ি করলেন। তারপর হঠাৎ ঘুরে বাদলকে জবাব না দিয়ে খট খট করে খুর চালিয়ে দিলেন।

একদিন বাদল বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় বসে একটু বিশ্রাম করছে, তার অল্প দূরে একটা বেঁটে শুঁটকো বুড়ো একটা শিকল-বাঁধা কুকুর নিয়ে এসে বসল। বাদলের ওর দিকে নজর ছিল না। এক সময় বাদলের কানে বাজল লোকটা তার কুকুরটাকে

বলছে, "Do you know how to treat a native ?" বাদল অবাক হয়ে কান পাতল।

"Oh, you don't know, my lad ? Well, kick him. Like this, you know." এই বলে ঘাসের উপর এক লাথি।

বাদল এর অর্থ বুঝতে পারল না। কে-ই বা নেটিব, তার সঙ্গে কুকুরেরই বা কী সম্পর্ক ! ভাবছে, এমন সময় শুনল, "Now there you see a native. Not as good a dog as you are. Kick him with your hind legs. Go at him."

বাদল চেয়ে দেখল একটা বেঁটে শুঁটকো বুড়ো মাতাল তার দিকে ইশারা করছে। লোকটা বাদলের চোখ দেখে চোখ নামাল। বোধ হয় চক্ষুলজ্জায়। কুকুরটা ভালো মানুষের মতো জিব লক লক করছিল শুয়ে শুয়ে। বাদলের দিকে তাড়া করে আসতে কিছুমাত্র উদ্যোগ ছিল না তার। তবে পরের কুকুরকে বাদলের ভারী ভয়। হাতেও তার একখানা ছড়ি পর্যন্ত নেই। ও কুকুর যদি ক্ষেপে বাদল তাকে কী দিয়ে ঠেকাবে ? বাদল ভাবল পলায়নই পন্থা। কিন্তু তাকে পালাতে দেখলে কুকুরটাও উঠবে। কুকুরকে জাগিয়ো না, এই নীতিবাক্য তার স্মরণে জাগল।

কাজেই সে অপমান পকেটস্থ করল। এমন ভাব দেখাল যেন সে কানে কম শোনে। সাহেবও আন্দাজ করলেন যে সে কেবল কালা আদমি নয়, সে কালা। এই আন্দাজের ফলে সাহেব যে চুপ করলেন তা নয়। সাহেবের স্ফূর্তি বাড়ল। তিনি ইংরেজী ছেড়ে হিন্দুস্থানী ধরলেন। বহুদিন হিন্দুস্থানী মুখখিস্তির সুযোগ পাননি। পেনসন নিয়ে দেশে ফিরে এসে অবধি আগুন যেন ছাই চাপা ছিল। তিনি 'শ' দিয়ে শুরু করলেন। বোধ হয় চা বাগানের কুলীদের বড়সাহেব ছিলেন, কিংবা চটকলের কুলীদের। যে বাদলের ধারণা সে ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষীয় ভাষাগুলোকে নিঃশেষে বিস্মৃত হয়েছে, অশ্লীল হিন্দুস্থানী গালিগালাজ শুনে সে হয়ে উঠল জাতিস্মর। সব বুঝতে পারে তার সাধ্য কী ! তবু যা যা বুঝল তা স্বয়ং যীশু খ্রীস্টকে সাক্ষাৎ চেঙ্গিস খাঁ করে তুলতে পারত।

সুতরাং কুকুরের ভয় মনে না এনে বাদল গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। গোটা গোটা পা ফেলে বুড়ো মাতালটার সমুখে গিয়ে দাঁড়াল। গর্জন করল, "Apologise."

লোকটা কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল, "বা রে ! হি হি ! Indeed !"

বাদল এক চড়ে তার টুপিটা উড়িয়ে দিল। লোকটা তবু বলতে থাকল, "হি হি ! ভারী আবদার !"

বাদল আর এক চড়ে তার মাথাটা বেঁকা করে দিল।

তবু লোকটা ক্ষমা চাইল না, রাগ করল না, কুকুর লেলিয়ে দিল না, বলতে থাকল, "হি হি ! শূয়ারকা বাচ্চা। হি হি !—" (অমুদ্রণীয়)

বাদল ভাবল এটাকে যদি খুন করি তবু এটার শিক্ষা হবে না। কেন অনর্থক ফাঁসি গিয়ে মানবজাতির অপূরণীয় ক্ষতি করি। লোকজন তার কাণ্ড দেখে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। সে সোজা তাদের সম্মুখীন হয়ে বলল, "আইনের প্রয়োগ স্বহস্তে করেছি বলে দুঃখিত। লোকটা আমাকে ইতরের মতো গালাগাল দিচ্ছিল।"

লোকটা তখনো হি হি করছিল। মার খাওয়া মানুষ মার চুরি করে হাসছে দেখে ওরা আশ্চর্য হলো, আশ্বস্ত হলো। নইলে বাদলকে সে যাত্রা থানায় যেতে হতো।

বাদলের প্রসাদে মারউডের দোকানে খরিদ্দারের সংখ্যা বাড়ছিল। মারউড সেটা লক্ষ করে বাদলকে অপচয়তত্ত্ব নিয়ে মাতিয়ে রাখল। "আহ্, মিস্টার সেন। আপনার নয়া বন্দোবস্তের ভিতরে অপচয়ের জন্য একটু ঠাঁই রাখবেন। সৌজাত্যের সাহায্যে জন্মত সবাই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ও সুবোধ হোক, কিন্তু জন্মের পর কেউ বিকলাঙ্গ হবে না, বিকৃত-মস্তিষ্ক হবে না, অকালে মরে তার শিক্ষা দিতে যে ব্যয়টা হলো সেটাকে ব্যর্থ করে দেবে না—এ যে অবিশ্বাস্য।"

বাদল যেতে গেল। "ও হচ্ছে গল্পের উটের মতো। ওকে মাথা গোঁজবার ঠাঁই দিলে ক্রমে ক্রমে তাঁবুর সমস্তটা ছেড়ে দিতে হবে। না, মিস্টার মারউড, অপচয়ের জড় রাখব না।"

"O cruel Mr. Sen," মারউড বাদলকে ক্ষেপিয়ে দেন। "আপনার কি দয়ামায়া নেই? কালা বোবা খোঁড়া হাবারা যদি লুপ্ত হয় তবে তাদের সেবার জন্যে যে সব বুড়ো-বুড়িরা চাঁদা দিয়ে পরম তৃপ্তি পান তাঁদের হৃদয়বৃত্তি অচরিতার্থ রয়ে যাবে। বস্তির রোগা রোগা ছেলেমেয়েদেরকে যে সব পাত্রী হাওয়া খাওয়াচ্ছেন তাঁদের নিজেদের খাওয়ার অবশ্য আপনি একটা উপায় করবেন, কিন্তু তাঁদের মুরুব্বিয়ানার ঐ পরিণামের পর তাঁরা কি প্রাণে বাঁচবেন?"

বাদল মুষ্টি উদ্যত করে বলে, "হাঁ, এইবার প্রাণে বাঁচাচ্ছি!"

৭

এক পেনী দামের খবরের কাগজ কিনতে এসে একদিন এক ভদ্রমহিলা জাঁকিয়ে বসলেন। মারউডকে অতিপরিচয়ের স্বরে বললেন, "জিম্, তোমার এই বন্ধুটির সঙ্গে দুটো কথা কইতে এলুম।"

বয়স পঞ্চাশের ওপারে। কেশে পাক ধরেছে। শাদাতে ধূসরে মিলে সে এক অপরূপ সমাস। চোখের রং প্রায় সবুজ। লম্বা মুখ, তার লম্বয়ের এক তৃতীয়াংশ নিয়েছে চিবুক। বাঁধানো দাঁত।

"দেখুন, আপনি এই শহরে এত দিন আছেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আমরা

সবাই উৎসুক। আসুন না একদিন আমার ওখানে একটা সান্ধ্য পার্টিতে। আমি মিসেস্ গ্রেসকেও বলব। জিমও আসবে।"

নেড়াকে খেতে বললে সে বলে, হাত ধোব কোথায়! বাদল বলল, "আমি কিন্তু নাচতে জানিনে।"

"তাতে কী? আপনাকে শিখিয়ে নেব। বল্‌রুম নাচ নয়, মরিস্ নাচ। লোকনৃত্য। আপনি ইংলণ্ডে কবে এসেছেন?"

"সে কি আমার মনে আছে। যেন চিরকাল এদেশেই আছি।"

"মিস এফিংহ্যাম," মারউড বললেন, "আপনি কি জানেন যে আমার বন্ধু এই দেশেই চিরস্থায়ী হবেন বলে স্থির করেছেন?"

"ও!" মিস এফিংহ্যাম চিবুকটা বাড়িয়ে দিয়ে হাত-দিয়ে-টেপা রবারের পুতুলের মতো ধ্বনি করলেন। "ও! আপনি তা হলে পর্যটক নন?"

"না, মিস এফিংহ্যাম," বাদল মুচকি হেসে বলল, "আমি পর্যটক নই। আমি বাসিন্দে।"

মিস এফিংহ্যামের উৎসাহ মন্দীভূত হলো। তিনি জানতেন যে ইহুদীরাই ইংলণ্ডে বসবাস করে ইংরেজ বনে যায়। ভাবলেন বাদলও ইহুদী। ইহুদীর প্রতি তাঁর অমূলক ভয় ও বিদ্বেষ ছিল। এই ছোকরা তা হলে মার্লবরাতে এসেছে ব্যবসার সুবিধা খুঁজতে। দোকান খুলে বাড়তে বাড়তে কত বড়ো হবে কে জানে। এক এক করে জমি কিনবে বাড়ি কিনবে, সবাইকে হাতের মুঠোর মধ্যে আনবে।

দেখতে দেখতে মিস এফিংহ্যামের অনুকম্পা বিরাগে পর্যবসিত হলো। নিমন্ত্রণ যখন করে ফেলেছেন তখন প্রত্যাহার করতে পারেন না, তবে ব্যবহারটাকে ইচ্ছাপূর্বক রুক্ষ করলেন। বাদল কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে "গুড্ বাই" বলে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে মিসেস গ্রেস ও মিস্টার মারউড সমভিব্যাহারে বাদল গেল মিস এফিংহ্যামের বাড়ি। তাঁর বাগানের লন্‌এর উপর নাচের আয়োজন। আসরের চারদিকে দাঁড়িয়ে ও বসে নানা বয়সের নরনারী জুতো বদলাচ্ছেন। মিস এফিংহ্যাম বাদলকে মিষ্ট হাসির সহিত অভ্যর্থনা করলেন, কিন্তু সেই পর্যন্ত। মারউড তাঁর ভাঙা পা নিয়ে নাচতে পারলেন না, তিনি দর্শক হিসাবে এক প্রান্তে আসন নিলেন। বাদলও তাঁর পাশে মনমরা ভাবে বসল। ওদিকে মিসেস গ্রেসকে সাথী করবার জন্যে যুবক উমেদারের অভাব হয় নি, তিনি তাদের সবাইকে নিরাশ করে এক বৃদ্ধের সাথী হয়েছেন।

বলরুম নাচে যেমন পুরুষ একহাতে ধরে নারীর একটিমাত্র হাত ও অন্য হাত দিয়ে বেষ্টন করে তার কটি, আর নারী তার যুক্ত হাতটি রাখে পুরুষের কাঁধের উপর, মরিস

নাচে তেমন নয়। মরিস নাচে হাত ধরাধরিও সর্বক্ষণব্যাপী নয়। স্ত্রীপুরুষ নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে একা একা নাচতে নাচতে কখন এক সময় সামনাসামনি দাঁড়িয়ে হাত ধরাধরি করে নাচে। আবার বলরুম নাচে যেমন একটি বারের আদ্যন্ত সেই পুরুষকে সেই নারীর সঙ্গে নাচতে হয় মরিস নাচে তেমন কোনো বাঁধাবাঁধি নেই। সামনে যেই এসে পড়ুক তার হাতে হাত মিলিয়ে নেচে হাত ছেড়ে দিতে হবে।

মরিস নাচেরও নানা প্রকার আছে—প্রকার অনুসারে নাম। কোনোটাতে তালি বাজাতে হয়, কোনোটাতে কাটি বাজাতে হয়। তবে পদক্ষেপ সাধারণত দাঁড়িয়ে ধান মাড়াই করার মতো, মার্চ করার মতো। হাতও সেই সঙ্গে ওঠে নামে।

বাদল মারউডের পাশে বসে অধীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকল। অপর সকলে নৃত্যোল্লাসে তাদের অস্তিত্ব বিস্মৃত হল। এক দফা নাচ হয়ে গেলে মিসেস গ্রেসের নজর পড়ল বাদলের উপর। তিনি বলে উঠলেন, "O dear, why isn't my little Indian dancing ?" ওকথা শুনে মিস এফিংহ্যামের খেয়াল হলো যে বাদল ইহুদী নয়, ভারতীয়। তিনি শশব্যস্ত হয়ে বাদলের দিকে দৌড়িয়ে গেলেন ও হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "আপনি নাচতে জানেন না বললে শুনব না, মিস্টার সেন, আসুন আমিই আপনাকে শেখাব।"

বাদল এতক্ষণ মনে মনে ধেই ধেই করছিল, পর্যবেক্ষণ সূত্রে যতটা শেখা যায় ততটা সে ইতিমধ্যেই শিখে নিয়েছে। দ্বিরুক্তি না করে উঠল। মারউড তাকে উঠতে দেখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। হায়! পৃথিবীতে নবযুগ এলেও তাঁর নতুন একজোড়া পা গজাবে না। নৃত্যের আনন্দ তিনি চিরকালের মতো হারিয়েছেন। এই নৃত্যপর ও নৃত্যপরাদের কেউ কি তাঁর বেদনা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। সমবেদনা অবশ্য জনে জনে জানিয়ে গেছেন। মারউড মানবদ্বেষী নন, অপরের আনন্দে তিনি আনন্দিত হতে চান বলে সামাজিক উৎসবে দর্শকরূপে উপস্থিত থাকেন, কপাটে খিল দিয়ে ভোগক্ষমদের প্রতি ঈর্ষায় দগ্ধ হওয়া তাঁর স্বভাব নয়। তবু অকারণে বুকটা বিমর্দিত হয়। পা দুটো চঞ্চল হয়ে উঠে অক্ষমতায় মুহ্যমান হয়। এর চেয়ে মরণ ছিল শ্রেয়। ঐ তো ষাট বছরের বুড়ো অশ্রান্তভাবে নাচছে। জীবনের আনন্দ সে কড়ায় গণ্ডায় উশুল করে নেবে, এই যেন তার মতলব। মারউডের বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশটি বছর, কিন্তু জগতের গতিচ্ছন্দ ও নৃত্য হিল্লোল তাঁর কাছে এখন কল্পনার সামগ্রী।

বাদল যখন যোগ দিল তখন নাচের প্রকার পরিবর্তিত হয়েছে, এ নাচের পদ্ধতি প্রথমটার থেকে ভিন্ন। সে একেবারে আনাড়ির মতো নাচল, ভুল করল, অন্যের পথ জুড়ল, ধাক্কা খেল, মিস এফিংহ্যামের সঙ্গচ্যুত হয়ে হাতে হাতে ফিরতে ফিরতে কার হাতের মাল কার হাতে গিয়ে পড়ল। তার নাচের ধরন লক্ষ করে সবাই টিপে টিপে

হাসছিল। মাটি ছেড়ে তার পা উঠছিল না, মাটি ছুঁয়ে থেকে সে যেন জোরে পায়চারি করছিল। তাতেই তার ক্লান্তি কত।

দ্বিতীয় বারের নাচের শেষে মিস এফিংহ্যাম তার সন্ধানে এলেন।

"সাবাস, মিস্টার সেন, কে বললে যে আপনি নাচতে জানেন না ? আপনি একজন born dancer."

ঠিক এই সময়ে মুঙ্গেরে রায় বাহাদুর মহিমচন্দ্র সেন waltz নাচছিলেন, tango নাচছিলেন, fox trot নাচছিলেন। জামালপুর থেকে তাঁর বাড়িতে মহাসম্ভ্রান্ত ফিরিঙ্গী বন্ধু বন্ধুনীরা এসেছিলেন। গ্রামোফোন বাজছিল, নাচ চলছিল, নাচের ব্যবধানে পানীয় বিতরণ হচ্ছিল। নাচিয়েরা পানীয় মুখে তুলে চেঁচিয়ে বলছিলেন, "To our popular District Officer, Mr. Sen, Rai Bahadur." রায় বাহাদুর ভাবছিলেন, যাক, কালকেই গঙ্গায় একটা ডুব দিলে সব ধুয়ে মুছে পবিত্র হয়ে যাবে।

কাজেই born dancer বটে। বাপকা বেটা। বিশ্বাস করল। ধন্যবাদ দিল। তারপর আগামী বারের নাচের জন্যে মিসেস গ্রেসকে পাকড়াও করল।

৮

তৃতীয়বারের নাচ যখন চলছে তখন সেই কুকুরওয়ালা বেঁটে শুঁটকো বুড়ো কুকুরটাকে বাইরে বেঁধে নাচের চত্বরে উপস্থিত। ভারতবর্ষে সারাজীবন কাটিয়ে তার সময়ানুবর্তিতার অভ্যাস শিথিল হয়েছিল। বহুৎ পুঁজি নিয়ে ফিরেছে, নবাবপুত্তুর, তার জন্যে নাচ কেন আটক থাকবে না দিতে হবে এর কৈফিয়ৎ। সমাজে ওঠবার জন্যে সে অনেক ঝুলাঝুলি করেছে। এখানে ওখানে চাঁদা দিতে দিতে তার টাকার থলিটার তেমন ভুঁড়ি আর নেই। এর পরেও যদি সে আধঘণ্টা দেরি না করতে পারে তবে তার মর্যাদা কী থাকল!

কেউ তাকে অভ্যর্থনা করল না, বাড়ির ঝি ছাড়া। নাচ তার খাতিরে এক সেকেণ্ড থামল না। মারউড যেখানে বসেছিলেন সেইখানেই বসে রইলেন। বুড়ো তখন একটা আস্ত লবস্টারের মতো লাল হয়ে হাতের কাছে যে চেয়ারটা পেল তাতেই ধপ করে আছাড় খেল। দু তিনবার নাক শুঁ শুঁ করল। যেন কিছু শুঁকল। তারপর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনী জুড়ে গোলাকার করে বাঁ চোখের সামনে ধরল। সেই দূরবীণ দিয়ে কী দেখতে পেল তা সে-ই জানে। সেটা নামিয়ে আরো বার দু' তিনেক শুঁ শুঁ করল। ডান হাতের আঙুলের দূরবীণ ডান চোখে লাগিয়ে যা দেখল তাও তার বিশ্বাস হলো না। পকেট থেকে বের করল চশমা। চশমাটা নাসাগ্রে স্থাপন করে চক্ষুপিণ্ড দুটোকে যেন উপড়িয়ে তার উপর ফেলল।

সে যেখানে বসেছিল আর কেউ সেখানে ছিল না। আপন মনে যা তা বলতে লাগল।

তৃতীয় বারের নাচ ভাঙলে গৃহকর্ত্রী মিস এফিংহ্যাম হাঁপাতে হাঁপাতে এসে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "হাউ ডু ইউ ডু, মিস্টার পিউ।"

পিউ ফোঁস করে উঠল। বলল, "আমি যদি জানতুম যে একটা কালো নিগার ইংলণ্ডের পরম পবিত্র গৃহস্থালয়ে প্রবেশ করে ইংলণ্ডের সুন্দরী তরুণীদের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করে— O Lord!"—কথাটা শেষ না করে সে দুই হাত নিংড়াতে লাগল। পরম শোকের সময় পশ্চিমের লোক যা করে।

সুন্দরী তরুণী সেখানে বড়ো কেউ ছিল না। সুন্দরী তরুণী বল্‌রুম নাচ ফেলে মরিস নাচবে কোন দুঃখে। ছিল যারা তাদের প্রায় সকলেই মধ্যবয়সিনী, কিংবা তরুণী হলে অসুন্দরী।

মিস্টার পিউ দক্ষিণ হস্ত আস্ফালন করে চিৎকার করে উঠল, "Down with the swell, swarthy native."

বীরবরের ধারণা ছিল বিশজন স্ত্রীপুরুষের সকলে সহর্ষে সাড়া দেবে, দেশপ্রেমিককে অভিনন্দন করে 'হিপ্‌ হিপ্‌ হুরে' ধ্বনি করবে, বাদলকে গলাধাক্কা দিয়ে বাইরে পৌঁছে দিলে মিস্টার পিউ তার গায়ে কুঙ্কুম লেপিয়ে দেবে।

কিন্তু একজনও তার সমর্থন করল না। মিস এফিংহ্যাম কাঁপতে কাঁপতে শুধু বললেন, "How dare you?"

মিস্টার পিউ জড়পুত্তলীবৎ নির্বাক।

"How dare you insult my guest?" মিস এফিংহ্যাম চারদিকে চেয়ে বাদলের অন্বেষণ করলেন, দেখলেন সেও দাঁড়িয়ে কাঁপছে।

"How dare you insult the girls?" মিস এফিংহ্যাম আবার চারদিকে চেয়ে দেখলেন বাদল যাকে যাকে স্পর্শ করেছিল তারাও লজ্জায় লোহিত।

"And how dare you insult me?"

মিস্টার পিউ বিড় বিড় করে কী বলল, বোঝা গেল না। মিসেস গ্রেসের সঙ্গে প্রথমে হাত মিলিয়েছিলেন যে বৃদ্ধটি তিনি বললেন, "আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।"

পিউ যদি ক্ষমা প্রার্থনাই করবে তবে সে নবাবপুত্তুর কিসের?

সে ফিক করে হাসল। "হি হি। বটে!"

একে একে সবাই তাকে চেপে ধরল। সে তবু হি হি করল এক অদ্ভুত স্বরে। তখন মিস এফিংহ্যাম অতিশয় বিনয়ের সহিত বললেন, "Will you please leave my house?"

সে বলল, "ছি ছি ।" তারপর প্রাচ্যপ্রথায় একটা সেলাম করে কী বিড় বিড় করতে করতে হন হন করে বেরিয়ে গেল । একবার পিছন ফিরে বাদলকে লক্ষ্য করে একটি লাথির অভিনয় করল ।

মিস এফিংহ্যাম বাদলের কাছে বললেন, "আমি বাস্তবিক অত্যন্ত দুঃখিত । আপনি যদি ওর নামে নালিশ করেন আমি সাক্ষী দেব ।"

বাদল বলল, "অপমানটা তো একা আমার নয় । নালিশ করতে হলে সবাইকে করতে হয় ।"

ও প্রস্তাবে কারুর উৎসাহ লক্ষিত হলো না । পিউ হলো মার্লবরার একজন সম্পন্ন অধিবাসী, তার চাঁদায় স্থানীয় নানা প্রতিষ্ঠান প্রতিপালিত । তার নামে যদি নালিশ করতে হয় তবে বিদেশী যুবকটি করুক । যা শত্রু পরে পরে । সাক্ষীও যে সকলে দেবে তাও তাদের মুখভাব থেকে অনুমিত হলো না ।

মিসেস গ্রেসের বৃদ্ধ বললেন, "না, না, নালিশ কেন ? সামাজিক ব্যাপারে আপোস করাই সঙ্গত । আমার উপর ছেড়ে দিন, আমি একটা মিটমাট করে দেব । লোকটা একগুঁয়ে, একটু সময় লাগবে ।"

স্থির হলো যে মিস এফিংহ্যাম ও তিনি বাদলকে সঙ্গে করে পিউর বাড়ি যাবেন । তাতেও যদি ফল না হয় তবে স্থানীয় ধর্মযাজকের সাহায্য নিতে হবে ।

এই সরল সমাধানের পর কথা চলে না । আমোদ করবেই বলে কোমর বেঁধেছে যারা তারা ঐ তুচ্ছ সমস্যায় ওর বেশি সময় নিয়োগ করতে অনিচ্ছুক । নাচ সমানে চলল । শুধু বাদলের পা অচল ।

সে মারউডের কাছে গিয়ে বসতেই মারউড বললেন, "মিস্টার পিউ কি আপনাকে আগে থেকে চিনতেন ?"

বাদল তখনো নার্ভাস বোধ করছিল । মারউডকে সেদিনকার গল্প বলতে বলতে চাঙ্গা হয়ে উঠল । "যাক, মেরেছি তো কয়েক ঘা । হতভাগা কাপুরুষ লাথি দেখিয়ে গেল, পায়ের কাছে ছিল না তাই রক্ষা, নইলে ও একটি না বসাতে আমি দুটি বসিয়ে দিতুম ।"

মারউড বললেন, "ভারতবর্ষের লোকের উপর কেন এ অহেতুক অবজ্ঞা । মিস্টার পিউ তো আপনাকে আপনি বলে অপমান করেননি, করেছেন আপনি ভারতবর্ষজ বলে !"

কথাটা বাদলের মর্মে বিদ্ধ হলো । বাদলকে সে লোকটা অপমান করেনি, করেছে বাদলের বর্ণে ও রূপে যে দেশের পরিচয় সেই দেশকে অপমান । এখন এই বর্ণ ও এই রূপ কি এতই অবজ্ঞেয় ? আর এই বর্ণ ও এই রূপ কি যথার্থ-ই বাদলের 'আপনার' থেকে বিচ্ছিন্ন ? তা যদি না হয় তবে তো ঐ অবজ্ঞা বাদলকেও অর্শায় ।

লোকটা যদি বাদলের গায়ে লাথি মারত তা হলে কি বাদল এই ভেবে তাকে ক্ষমা

করত যে লোকটা আমাকে লাথি মারেনি, মেরেছে আমার গায়ে যে বংশের লক্ষণ দাগা হয়ে গেছে সেই বংশকে ? আমার শরীরটা কি আমার আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন ? বংশটা কি এতই অবস্ত যে যাতে তার লক্ষণ দৃষ্ট হয় তা-ই পদাঘাতযোগ্য ?

চকিতে বাদলের জ্ঞান হলো, মনে আমি ইংরেজ হতে পারি কিন্তু দেহে আমি ভারতীয় এবং দেহও সত্য। দেশকে অস্বীকার করতে পারি, কিন্তু দেহকে পারিনে। আর দেহকে যদি অস্বীকার না করি তবে দেশকে করা স্বতোবিরুদ্ধ। দেশ তো কেবল দেশের মাটি জল নয়, দেশ হচ্ছে রেস্। আমার চেহারা, আমার গায়ের রং, আমার মস্তিষ্ক—এ সব সেই রেস্-এর সামিল। তার থেকে এদের ছিন্ন করে আনলে এদের পরিচয়ের পরিবর্তন হয় না। সেই রেস্‌কে যে লোক ঘৃণা করে সে যে এদেরকেও ঘৃণা করবে এই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু স্বাভাবিক বলে কি তা সহনীয় ? কদাচ নয়। কালো বলে আমি কুশ্রী নই, পিউটা তো রীতিমতো কদাকার। তার কুকুরও তার চেয়ে সুদর্শন। কালো বলে সুধীদা কুশ্রী নয়। রবীন্দ্রনাথ কুশ্রী নন, জগদীশ বসু কুশ্রী নন। (অবশ্য 'কালো' এ স্থলে পিউর ব্যবহৃত শব্দ।) ভারতীয়দের মধ্যে কুশ্রী নিশ্চয় অনেক আছে, কিন্তু ইউরোপীয়দের মধ্যে পিউও তো একমাত্র কদাকার ব্যক্তি নয়। এমনও নয় যে ভারতীয়রা সাধারণত কুশ্রী ও ইউরোপীয়রা সাধারণত সুশ্রী। তবে কেন পিউ কালো মানুষদের এমন ঘৃণা করে ?

এর কারণ আর যাই হোক কালো মানুষদের কালিমা নয়। হতে পারে তাদের চরিত্রগত দীনহীনতা। কিংবা তাদের ঐতিহাসিক দুর্ভাগ্য। আমি তো তাদের চরিত্রের অংশ নিইনি, আমি তাদের ইতিহাসের থেকে নিজেকে বিযুক্ত করেছি—আমার ভারতীয় স্মৃতির অবশেষ নেই—আমি তবে কেন ঘৃণাভাজন হব ? আর সত্যই কি তাদের চরিত্র ও ইতিহাস ঘৃণাভাজন ? সুধীদাকে দেখে তো তা মনে হয় না ? জানতে ইচ্ছা করে সুধীদা এরূপ ক্ষেত্রে কী রূপ ব্যবহার করত। সুধীদা বোধ হয় ভাবত, অবমাননার যোগ্য নই বলে শক্ত করে জানলে অপমান যে গায়ের জোরে করবে তাকে বাধা দিতে হবে না। তার গায়ের জোরটুকু ফুরিয়ে গেলে সে আপনি পায়ে পড়বে। আমার কর্তব্য অটল থাকা, ধাক্কা খেয়ে যেন না গড়াগড়ি খাই। ভারতবর্ষের ভরসা তার আত্মার অটলত্ব। ভারতবর্ষের নীতি, Resist not evil.

৯

বৃদ্ধ মিস্টার হুডার ও নিমন্ত্রণকর্ত্রী মিস এফিংহ্যামের সঙ্গে অপমানিত বাদল গেল অপমানকর্তা মিস্টার পিউর বাড়ি। লোকটার পোশাক দেখে তাকে একটা ছন্নছাড়ার

মতো মনে হলে কী হয়, বাড়িখানা তার যক্ষপুরী। বিপত্নীক কি কুমার তা বোঝবার উপায় নেই, কিন্তু নিঃসন্তান। আড়াই গণ্ডা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তার চিত্ত বিনোদন করে। ঘোড়াও আছে গোটা দুই। বাড়ির নাম রেখেছে, "HOME FOREVER". অর্থাৎ আর বিদেশে যাচ্ছিনে, এইখানে মরব।

পিউ বাড়িতেই ছিল, বাদলের মুখ দর্শন করে তার পিত্ত প্রকুপিত হলো, বাদলেরও চিত্ত রসসিক্ত। বাদল বাগানে পায়চারি করতে থাকল, অন্যেরা এগিয়ে গেলেন।

হডার বললেন, "দেখুন মিস্টার পিউ, অতিথি হয়ে যে বাড়িতে গেছেন সে বাড়ির কর্ত্রীর মান রাখতে হয় সর্বাগ্রে।"

পিউ দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "মান তো আমারই গেল, উল্টো আমার দোষ!"

"সে কী, মিস্টার পিউ!" মিস এফিংহ্যাম মিহি সুরে চেঁচিয়ে উঠলেন।

"হাঁ, ম্যাডাম, মান আমারই গেছে। একটা নেটিভ কুলীকে যে পার্টিতে ডেকেছেন আমাকেও ডেকেছেন সেই পার্টিতে। আপনি কী জানেন না যে আমি ছিলুম দশ হাজার কুলীর হর্তাকর্তা বিধাতা। অমন কত ব্যাবো, কতো বেবুন, আমার নোকরি করেছে। Oh, its incredible, ekdam incredible, bilkul incredible hai।" (ইংরেজীর সঙ্গে হিন্দুস্থানীর মিশাল।)

তিনি তিনবার হুঁ হুঁ করে বর্ণনা করলেন কেমন করে আঙুলের দূরবীণ দিয়ে কালো মানুষ দেখে প্রথমটা তিনি নিজের দুই চক্ষুকে বিশ্বাস করেননি। পরে প্রচক্ষু নাকে লাগিয়ে ঠিক বিশ্বাস করলেন।

তিনি আর্তস্বরে বললেন, "আপনারা তাকে আমার বাড়িতে এনেছেন, তাকে বসতে দিলে আমার ড্রইং রুম নোংরা হবে।"

"সে কী মিস্টার পিউ। তিনি যে লণ্ডনে আইনের ছাত্র। He must be treated as such." মিস এফিংহ্যাম সবিস্ময়ে বললেন।

"How do they treat their own untouchables?" মিস্টার পিউ খেঁকি কুকুরের মতো খেঁক করে উঠল।

সে কথা মিস্ এফিংহ্যাম কী করে জানবেন? তিনি মিস্টার হডারের দিকে তাকালেন। হডার বললেন, "মিস্ এফিংহ্যাম তো আপনার মতো ভারতফের্তা নন। তিনি যা করেছেন অজ্ঞানে করেছেন। তাঁকে একান্তে ডেকে নিয়ে তাঁর ভুল শুধরে দিলেই ঠিক হতো। এতগুলো মানুষের সামনে আপনি তাঁকে অপদস্থ করলেন, আমি প্রকাশ্যে আপনার কাছে apology তলব করলুম, আপনি হি হি করে হাসলেন—এর একটা মীমাংসা চাই, মিস্টার পিউ।"

পিউ নরম হয়ে বলল, "ঐ apology কথাটার একটু ইতিহাস ছিল। তাতেই

আমার ভারি রাগ হয়েছিল। রাগ হলে আমি হাসি। It pays you in the long run."

"In the long run কী লাভ হবে তা আপনি বসে বসে খতান। আপাতত মিস এফিংহ্যামের কাছে মাফ চান দেখি।"

পিউ মুখ কাঁচু মাচু করে বলল, "Forgive, but do not forget."

নিজের পাওনাগণ্ডা আদায় করে মিস এফিংহ্যাম ঝট্ করে একবার বাড়িখানার উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। কে জানে হয়তো তিনিই এই যক্ষপুরীর অধিশ্বরী হবেন। অতএব মালিকটিকে মাফ করাই পলিসী। বাদলের হয়ে তার পাওনা দাবী করলেন না। উঠলেন ও এক গাল হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। "আপনি আরেকদিন আসুন, মিস্টার পিউ। আপনি গরহাজির থাকায় নাচটা সেদিন জুৎ হল না। আপনার প্রিয় কুকুরটিকেও আনতে ভুলবেন না।" এই বলে তিনি সেটাকে একটু আদর করলেন। তার পিঠ চাপড়ে দিলেন।

বাদল জিজ্ঞাসা করল, "কী হলো ?"

মিস এফিংহ্যাম বললেন, "মিস্টার পিউ জানতে চাইলেন, আপনারা আমাদের অস্পৃশ্যদের প্রতি কী রূপ ব্যবহার করেন। আমি জানতুম না বলে জানাতে পারলুম না।"

"কিন্তু," বাদল বলল, "আমি তো অস্পৃশ্যদের সঙ্গে ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার করেছি, অপরে যদি অন্যরূপ ব্যবহার করে সেজন্যে আমি তো দায়ী হতে পারিনে।"

মিস এফিংহ্যাম নির্লিপ্তভাবে বললেন, "কী জানি, আমি অত বুঝিনে। তবে আপনাকে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি আপনি ওঁর কাছে ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার প্রত্যাশা করবেন না।"

"তবে," বাদল কাঁদ কাঁদ স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "আমি নালিশ করব ?"

"করতে পারেন," মিস এফিংহ্যাম উদাসীনভাবে বললেন, "কিন্তু সাক্ষ্য দিতে আমার বিশেষ আগ্রহ নেই। আমার মতে ও ঘটনা আপনার ভুলে যাওয়াই ভালো।"

মিস্টার হডার এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। বাদলের কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, "That's wisdom. মামলা মোকদ্দমা বড়োই ব্যয়সাপেক্ষ। জিৎ যে হবেই তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে ?"

বাদল এদের পক্ষ পরিবর্তনে নিতান্ত মর্মাহত হয়েছিল। ভণ্ডামি বরদাস্ত করতে পারল না। বলল, "বিবাদী যদি সাক্ষী ভাঙিয়ে নেয় তবে পরাজয় অবধারিত।"

"কী বললেন !" "কী বললেন !" তাঁরা দুজনে একসঙ্গে গর্জে উঠলেন।

"আমি পুনরুক্তি করতে বাধ্য নই। গুড বাই।" বাদল প্রস্থান করল।

১০

বৃত্তান্ত শুনে মারউড মন্তব্য করলেন, “মৌখিক ক্ষমাপ্রার্থনায় আপনি কৃতার্থ হয়ে যেতেন না। তবে কেন মন খারাপ করছেন, মিস্টার সেন ?”

বাদল বলল, “মৌখিক বলছেন কেন ? মানসিকও তো হতে পারত ?”

“বৃদ্ধ বয়সে মানুষের মন এত ঘন ঘন বিবর্তিত হয় না যে কালকের ঘৃণা আজকে সম্ভ্রমে পরিণত হবে ।”

“তবে কি আমি ঐ ঘৃণা নীরবে পরিপাক করব ?”

“ইচ্ছা করলে আপনি পাল্টা ঘৃণা করতে পারেন, কিন্তু ঘৃণার অস্তিত্ব যখন অস্বীকার করতে পারবেন না তখন সহ্য না করে কী করবেন ?”

“কেন, দণ্ডবিধান ?”

“দণ্ডবিধান করে ঘৃণাকে নির্মূল করা যায় না। ফরাসীদের উপর জার্মানদের ঘৃণা কি লেশমাত্র ন্যূন হয়েছে ? না অতিমাত্রায় অধিক হয়েছে ?”

“পরেরটাই।”

“তবে ?”

“তবে কাপুরুষের মতো সহ্য করে যাব ?”

“আমি কি তাই করতে বলছি ? বললুম না ইচ্ছা করলে পাল্টা ঘৃণা করতে পারেন ? ফরাসীরা যা করছে।”

বাদল বিচার করল। বলল, “নাঃ। কুকুর মানুষকে কামড়ায় বলে মানুষও কুকুরকে কামড়াবে, বাঘ মানুষকে খায় বলে মানুষও বাঘকে খাবে, এ কখনো ঠিক নয়। পিউকে সেদিন চড় মেরে অন্যায় করেছি। বোধ হয় সেই রাগে অমন অপমান করল। ওটাকে চড় না মেরে নিজের কানে হাত দিলেই চুকে যেত।”

মারউড খুশি হয়ে বললেন, “সব চেয়ে সোজা যুক্তিটা সব চেয়ে দেরিতে মনে আসে।”

বাদল আবার চিন্তা করল। এবার বলল, “বিবাদ চুকে যেত বটে, কিন্তু ঘৃণা তো বেঁচে থাকত। ঘৃণাকে হত্যা করবার উপায় কী ?”

“আর যাই হোক ঘৃণাকারীকে হত্যা নয়।”

“না, তা তো নয়ই।”

“আমার মনে হয় ঘৃণার কারণ অনুসন্ধান করে তার মধ্যে যদি কোনো সত্য থাকে তবে সেই অনুসারে নিজের চিকিৎসা করা। পক্ষান্তরে পাগলের চিকিৎসা করানো।”

“তা হলে বিবেচনা করতে হয় পিউর ঘৃণাটা আমার রোগ দেখে, না ওর নিজের রোগ থেকে।”

মারউড মাথাটাকে কাৎ করে বললেন, “হুবহু তাই।”

বাদল বলল, “ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর তো তার ঘৃণা নেই, ঘৃণা আমার রেস্-এর উপর। আমার রেস্-এর যদি কোনো দোষ থাকে তার জন্যে কি আমি দায়ী? ওর দোষ বিদূরিত করবার দায় কি ন্যায়ত আমার?”

মারউড বললেন, “বাপের রোগ ছেলেকে বর্তে তা কি দেখা যায় না? দায়িত্বের সম্বন্ধ না হলে কেন বর্তায়? বংশগত রোগের উচ্ছেদ না করলে যে বংশ উচ্ছন্ন হবে, মিস্টার সেন।”

“তার মানে ভারতবর্ষের যতদিন ঘৃণার্হতা থাকবে আমাকেও ততদিন ঘৃণাসহিষ্ণু হতে হবে—যেখানেই থাকি না কেন?”

“যেখানেই থাকুন না কেন।”

“যত বড়ো হই না কেন?”

“যত বড়ো হন না কেন।”

“ইংলণ্ড যদি ঘৃণার্হ না হয় তবে পিউর মতো তুচ্ছ ব্যক্তি মহাত্মা গান্ধীর মতো উচ্চ ব্যক্তির চেয়ে অধিক সম্মানের অধিকারী হবে?”

“হবে, ইংলণ্ড যদি ঘৃণার্হ না হয়।” মারউড জেরার চোটে জর্জর হয়েছিলেন। ক্ষীণ হাস্য করে বললেন, “মহাত্মা গান্ধী কে? মিস্টার গ্যাণ্ডী বলে তো একজন ছিলেন, পড়েছি।”

“তিনিই। আস্ত মধ্যযুগীয় মানুষ—আইডিয়ার দিক থেকে পাঁচ শ’ বছর পশ্চাৎপদ। কিন্তু একেবারে খাঁটি।”

“তবে। সে তো বড়ো সুলভ গুণ নয়। দেশের পাপ অমন একজন মানুষের বিশুদ্ধতার দ্বারা বহু পরিমাণে ক্ষালিত হতে পারে, সন্দেহ নেই। আবার একজন বা একদল মানুষের পাপে দেশের মহাদুর্গতি। ইংলণ্ডের তাই ঘটেছে। Daily M—ইত্যাদি কাগজ দেশের শরীরে বিষ অন্তঃপ্রবিষ্ট করে দিচ্ছে। আজ আমরা এক পেনী করে দাম দিচ্ছি, কাল যে দাম দেব তার সোনারূপায় হিসাব হবে না, বুকের রক্তেও নয়। আত্মার বিশুদ্ধির অপচয়। প্রত্যহ সকালে যে সর্বনাশ ঘটছে মহাযুদ্ধ তার কাছে লাগে না। আমি পার্টির ও Big Business-এর নিন্দা করেছি, কিন্তু প্রেস-এর নিন্দা করবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাইনে।”

বাদল লিবারল মানুষ, প্রেসের স্বাধীনতায় গোঁড়া বিশ্বাসী। ডেমক্রেসী তার উপাস্য দেবতা, পার্টি তার উপাসক সম্প্রদায়, প্রেস তার সাম্প্রদায়িক প্রচারক। Big Business নিজের স্বার্থপরতার দ্বারা পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করছে। আজ যে আমরা শস্তায় সব জিনিস পাচ্ছি—বই কাগজ থেকে মোটর গাড়ি পর্যন্ত—এর জন্যে কাকে ধন্যবাদ দেব?

Big Businessকে। ভূপর্যটন এত সুকর অথচ এত সুলভ হলো কার কর্তৃত্বে? Big Business-এর। ঘরে ঘরে বিজলির বাতি কে জ্বালাল? Big Business. তার কীর্তির শুমারি হয় না। ডেমক্রেসী যদিও দেবতা তবু Big Business-এর কাজ স্বহস্তে সম্পাদন করতে অসমর্থ। যার কর্ম তারে সাজে— দেবতার কর্ম দেবতার, বিষয়ীর কর্ম বিষয়ীর। যারা ডেমক্রেসীও মানে, সোশ্যালিসমও মানে তারা বোঝে না যে কল কারখানা দোকান হাট চালাবে Big Business-এর চেয়ে বৃহত্তর এক ব্যুরোক্রেসী। পার্লামেন্টের মেম্বাররা তো কয়লার খনির নিত্য কাজ নিত্য তদারক করে বেড়াবেন না, ব্যাঙ্কেও গিয়ে দিনের শেষে তহবিলের হিসাব নেবেন না। আর ভোটাররাও নিজ নিজ গণ্ডীর বাইরে পা বাড়ালে পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি বাধিয়ে বসবে। অতএব ঐ বিরাট ব্যুরোক্রেসী নিজের চালে চলবে, চুরি করলেও ধরা পড়বে না। আজ আমরা যে ক্ষুদ্র ব্যুরোক্রেসীর সাধুতায় ও পটুতায় বিস্মিত ও মুগ্ধ হচ্ছি, অনবরত তার পিছনে প্রেস লেগে রয়েছে বলেই সে এমন। কিন্তু সোশ্যালিসমের আমলে প্রেসও তো আমলাদের দ্বারাই চালিত হবে, প্রেসের আমলা ভাইরা কী ডাকঘরের আমলা ভায়াদের দোষ ঘাঁটবে? পার্লামেন্টের মেম্বাররা কেমন করে ভিতরের খবর পাবেন যদি না চর পোষেন? আর সেই চরই যে সত্য কথা বলবে তার প্রমাণ কী? সোশ্যালিসম্-এর পরিণাম ব্যুরোক্রেসী, ব্যুরোক্রেসীর পরিণাম চর প্রয়োগ। রাশিয়াতে তাই হয়েছে। কিন্তু তাই চরম নয়। অবশেষে ব্যুরোক্রেসীর ষড়যন্ত্রে কোনো একজন উচ্চ পদস্থ আমলা স্টালিনকে দেবেন ভাগিয়ে, নিজেই তাঁর স্থানে ছত্রপতি হয়ে বসবেন, সৈন্যদের ভাতা বাড়িয়ে দেবেন ও সোভিয়েটরা যদি বিদ্রোহী হয় তবে বিদ্রোহীদের উপরে সৈন্য লেলিয়ে দেবেন। নেপোলিয়নও তো গোড়াতে ছিলেন একজন আমলা।

বাদলের ইচ্ছা করল বলতে, "মিস্টার মারউড, আপনি লেংড়া মানুষ, আর কিছু তো করতে পারেন না, করেন বসে নিন্দা, ধরেন বসে দোষ।" কিন্তু ভদ্রলোকের মনে কষ্ট হবে।

বলল, "আপনি ভালো করে ভেবে দেখবেন Big Business-এর বিকল্প কী। তা যদি হয় সোশ্যালিসম তবে তার চরম পরিণাম ব্যুরোক্রেসী কর্তৃক রাষ্ট্র দখল।"

"তা কেন?" মারউড সাশ্চর্যে বললেন, "Big Business-এর বিকল্প সোশ্যালিসম নয়, ছোট ছোট ব্যবসা। আমি পরকে খাটাইনে, খাটুনির সবটা আমার নিজের। আপনি ও আমি দুজনে মিলে ব্যবসা করলে খাটুনিটা বখরা করে নেব। জন দশেকেও ব্যবসা মন্দ চলে না, হয়তো জন শতকেও না। তবে sleeping partner কেউ হবে না। আমি পরের টাকা নিয়ে কারবার করতে ও পরের কাছে জবাবদিহি করতে নারাজ। আর পরকে খাটাতে যে আমার প্রবৃত্তি হয় না ও কথা একটু আগেই বলেছি। ভাড়াটে লোক

যেখানে বেশি ভাড়া পাবে সেখানে যাবে, তার স্বার্থের সঙ্গে আমার স্বার্থের যোগাযোগ সম্পূর্ণ আকস্মিক। আমি চাই স্বার্থে স্বার্থে অর্গ্যানিক সহযোগ, যেমন আমার হাতের সঙ্গে," মারউড করুণ হেসে বললেন, "পায়ের।"

"বুঝেছি," বাদল সবজান্তার মতো মাথা নাড়ল। "বুঝেছি, আপনি আরেকজন গান্ধী। মূর্তিমান মধ্যযুগ।"

মারউড সবিনয়ে বললেন, "অত বড়ো মানুষ নই যে বিদেশের কাগজে নাম উঠবে, তবে আমার স্বার্থটি আমি ভালো করে বুঝি বলে সকলের স্বার্থের সামঞ্জস্য কিসে হবে সে সম্বন্ধে সাধ্যানুসারে চিন্তা করে থাকি। মুশকিল এই যে দুটো হাত ও দুটো পায়ে সকলে সন্তুষ্ট নয়। আমার পা দুটো গিয়ে আমি এই শিখেছি যে বিধাতা আমাদের যে সম্পত্তি দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছেন তাই আমাদের যথেষ্ট, তাতেই আমাদের মঙ্গল, তারই ভোগে আমাদের আনন্দ। পা দুটো থাকলে কি তাদের জন্যে আমি ভুলেও ভগবানকে ধন্যবাদ দিতুম? না কস্মিনকালে তাদের পরিচালনায় রোমাঞ্চ বোধ করতুম? যাদের পা আছে তারা চায় মোটর, সেই মোটরের কড়ি জোটাবার জন্যে ভাড়া খাটে বা টাকা খাটায়। এমনি করে চারিদিকে নিরানন্দ স্তূপীকৃত হয়ে উঠবে। একদিন স্তূপে অগ্নি সংযোগ হয়, কারুর যায় প্রাণ, কারুর যায় পা, কিন্তু মোটর তো থাকেই, উপরন্তু নব নব মডেল পরিগ্রহ করে।"

বাদল বলল, "যুদ্ধের অন্য কারণ আছে।"

"আমি কি," মারউড মিষ্টি হেসে বললেন, "তা অস্বীকার করছি? তবে মোটর প্রমুখ ভোগোপকরণ যে নশ্বর সত্ত্বেও অমর এবং তাদের ভোক্তারা নশ্বর এইটে আমার প্রতিপাদ্য। মোটর থাকলে তার কারখানা থাকে, কারখানার জন্যে শ্রমিক দরকার হয়, শ্রমিক যা পায় তাতে তার পোষায় না, তা ছাড়া সে-ও চায় কারখানার লভ্যাংশ, তারও অভিলাষ কর্তৃপক্ষের শরিক হতে—তার স্বপ্ন যদি রচিত হয় সোশ্যালিসম্‌কে ঘিরে তবে কে তার জন্য দায়ী?"

বাদল লিবারল দলের চাঁইর মতো বলল, "শ্রমিকদের জন্যে আমাদের সুনির্দিষ্ট পলিসী আছে, আমরাই তাদের প্রকৃত বন্ধু, তাদের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্যে আমরা কত বড়ো বড়ো স্কীম করেছি তা পড়েন নি?"

মারউড টিপে টিপে হাসতে থাকলেন এই বিদেশী যুবকের স্পর্ধায়, এই বিত্তবান যুবকের ধৃষ্টতায়।

বাদল বলতে থাকল, "দেখুন আমাদের নীতি হচ্ছে enlightened self-interest, প্রজ্ঞাদীপ্ত স্বার্থ। শ্রমিকই যে ধনিকের খরিদ্দার, উৎপন্ন সামগ্রীর উপভোক্তা। তার ক্রয়শক্তি বর্ধন না করলে ধনিকের গুদামে মাল জমে থাকবে, টাকা আটকা পড়বে, কারখানা

বন্ধ করে দিতে হবে।"

"ওটা," মারউড বললেন, "একটা আপাত সত্য। শ্রমিকের মজুরি যদি বাড়ে আর সেই সঙ্গে বাড়ে শ্রমজাত সামগ্রীর মূল্য তবে শ্রমিক যে তিমিরে সেই তিমিরে। পক্ষান্তরে শ্রমিকের মজুরি যদি বাড়ে আর শ্রমজাত সামগ্রীর মূল্য থাকে সমান তবে শ্রমিক হয়ে উঠতে পারে সঞ্চয়ী, তার সঞ্চয়ের টাকা মূলধনের বাজার মন্দা করে দিতে পারে, বড়ো বড়ো মূলধনওয়ালাদের সুদের হার ও পরিমাণ দুই কমিয়ে দিতে পারে।"

বাদল চিন্তান্বিত হলো।

১১

ঐটুকু ছোট শহরে বেশিদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকা যায় না। অচেনা কালো মানুষটিকে একে একে সকলেই চিনল। তারপর তার প্রতি আর ভুলেও ভ্রূক্ষেপ করল না। বাদল নিরুপদ্রব হলো। কিন্তু তার নিভৃত মনন একবার ভেঙে গিয়ে আর জোড়া লাগল না।

ওদিকে মারউডও তাকে আর নতুন কথা শোনাতে পারছিলেন না। তাঁর পুঁজি অল্প—কী বিত্তে কী বিদ্যায় কী মনীষায়। ঘুরে ফিরে ঐ একই বিষয় উঠছিল—অপচয় যে করে সেও পশুতায়, যে করে না সেও পশুতায়। পা দুটি দিয়েছেন বলে মারউডের খেদ, অতবড় দানযজ্ঞে তুল্যমূল্যের কিছু না দিলেও তাঁর খেদ থেকে যেত। মহাযুদ্ধের দিনে যুবকদের কেবল একটিমাত্র ধ্যান ছিল—দেশের জন্যে সভ্যতার জন্যে প্রিয়ার শ্রদ্ধা ও জননীর মুখরক্ষার জন্যে কী দান করবে সে। অপচয় করতেই সে চেয়েছিল, প্রেমিক যেমন উপহার বাবদ অপচয় করতেই চায়। হিসাব যারা করেছিল তারা কৃপণ, তারা কৃপার পাত্র। তারা হাত পা আস্ত রেখে জয়গৌরবের ভাগী হয়ে দিন দিন পোক্ত হচ্ছে, ঝুনো ইম্পিরিয়ালিস্ট ও কুণো পেট্রিয়ট তারাই।

মারউড বলেন, "যারা যুদ্ধে লড়ে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছে তারা জানে যে তাদের আশপাশের মানুষের সঙ্গে তারাও মরত অনায়াসে। তাদের বাঁচনটা মরণের অনুগ্রহ, তাদের পরবর্তী জীবনের দিনগুলো days of grace. পৃথিবীর উপর তাদের চাপ হালকা, তাদের কামড় আলগা। লক্ষ করবেন যে তারা অন্য দেশের শত্রু নয়। অন্য দেশের মানুষকেও তারা ঘৃণা করে না।"

বাদল বলে, "তারা আর ক' জন। ছোট সাপের যেমন বিষ বেশি তেমনি মেয়েগুলোরই বিষের বেশি। এদেরকে বোমা দিয়ে উড়িয়ে, গুঁড়িয়ে, খুঁড়িয়ে দেবার জন্যে আরেকটা মহাযুদ্ধের আবশ্যকতা আছে।"

মারউড হেসে বলেন, "তুলবেন ও কথা মজলিসের কাছে।"

মডলিন এলে তার সঙ্গে কেমন তর্ক করতে পারা যাবে এই জল্পনা কল্পনা নিয়ে বাদল এ শহরে টিঁকে ছিল । নইলে সুধীদার কাছ থেকে আত্মগোপন করবার পক্ষে এই কি ইংলণ্ডে একমাত্র গুহা ? টাইমসে বিজ্ঞাপন দেওয়ায় গাফিলতি ছিল না । দাদা জানুন যে বাদল কর্তব্য বিষয়ে ইংরেজের মতো দৃঢ় । তবে সপ্তাহে একবার সংবাদ প্রদানের অতিরিক্ত কর্তব্য যে তার আছে তা সে স্বীকার করে না ।

মডলিন এল একদিন অধিক রাত্রে । ঘুমিয়ে পড়েছিল, টের পেল না । পরদিন মডলিন উঠল দেরিতে । ব্রেকফাস্টের সময় বাদলকে কেউ জানাল না যে মডলিন এসেছে । তারপর বাদল যখন ড্রয়িং রুমের বুকশেল্ফ্ থেকে একখানা পুরাতন বই পেড়ে নিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে পড়ে চলেছে তখন ও ঘরে ঢুকল মডলিন ।

তার বয়স বিশ একুশ হবে, বাদলের চেয়ে কয়েক মাস কম কি বেশি । কিন্তু তার মুখ দেখলে মনে হয় সে প্রৌঢ়া । মুখ তা বলে মাংসল বা শীর্ণ নয় । সুগঠিত, সুস্মিত । মুখের রেখাগুলি স্পষ্টাঙ্কিত । কেশ তার কানের উপর চাকার মতো করে বিনানো, যাকে বলে ear-phone. পরেছিল সে একখানি maroon রঙের ফ্রক, সেটার ঝুল বেশ নিচু ।

বাদলকে দাঁড়াতে দেখে মডলিন বলল, "না, না, আপনি বসুন । আমার অনুমান হয় আপনি মিস্টার সেন ।"

বাদল সহাস্যে বলল, "নির্ভুলরূপে সে-ই । আমার অনুমান হয় আপনি মিস গ্রেস ।"

মডলিন হাসির পাল্লা দিয়ে বলল, "নির্ভুলরূপে সে-ই ।" তারপর জিজ্ঞাসা করল, "আপনি লণ্ডনে আইন পড়েন শুনেছি ।"

"হ্যাঁ । কয়েকবার ডিনার খেয়েছি বটে । সেটাকে ওখানে পড়ার অঙ্গ বলে গণ্য করা হয় ।"

"উদরের সঙ্গে মস্তিষ্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমার জানা আছে, কিন্তু ও দুটো যন্ত্র যে এক তা বোধ করি আইনজ্ঞগণ তর্কযোগে প্রমাণ করতে পারেন ।"

এমনি করে আলাপ জমে উঠল ।

মডলিন বলল, "ওটা কী পড়া হচ্ছে ?"

বাদল বলল, "একখানা সেকেলে বই, ১৯১৪ সালের আগের ।"

"ওঃ আপনার জন্ম বুঝি তার পরের কোনো সালে ?"

বাদল অপ্রস্তুত হয়ে লজ্জিত হলো । তারপর প্রস্তুত হয়ে বলল, "আপনি তো শিক্ষয়িত্রী, আমাকে কি স্কুলের ছেলের মতো দেখায় ?"

মডলিন এর উত্তর চেপে গেল । বলল, "কী ওটা ? Great illusion ?"

বাদল বইখানা মুড়ে রাখল । অভদ্রতা হচ্ছিল অন্যের সঙ্গে বাক্যালাপের ফাঁকে চুরি করে করে পড়াটা । বলল, "হাঁ, মিস গ্রেস ।"

"Great Illusion থেকে ওটা দেখছি Great Obsessionএ পরিণত হয়েছে।"

"কেন বলুন দেখি ?"

"আপনিই বলুন না জগতে এত চিন্তনীয় বিষয় থাকতে যুদ্ধ আমাদের মনের কতখানি জায়গা জুড়েছে। গ্রীকরা কি ও নিয়ে দিনে দুমিনিট ভাবত ? রোমানরা ভাবত বটে, কিন্তু সে কি আমাদের মতো ভীতির সহিত ?"

বাদল যেন একেবারেই ভয় পায় না এ রকম ভাব দেখিয়ে বলল, "বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের তরুণ ভীতি কাকে বলে জানে না, কিন্তু অপচয় কার নাম তা জানে, তাকে চেনে। War and Waste have more than a W in common."

মডলিন খিল খিল করে হাসল। বলল, "আপনি দেখছি একজন গবেষক।"

বাদল বলল, "গ্রীকদের যুগের যুদ্ধ এমন অপচয়পূর্ণ ছিল না বলে গ্রীক ভাবুকদের মনে আমল পায়নি। রোমানরা তো অর্ধবর্বর, ওদের ভাবনার বালাই ছিল না। কিন্তু আমরা," বাদল সগর্বে বলল, "আমরা সবাই কিছু কিছু চিন্তা করে থাকি এবং অপচয়কে যে পরিমাণে জগতে লক্ষ করি সেই অনুপাতে চিন্তার অংশ দিই।"

মডলিন বাদলকে পরীক্ষা করছিল। ছাত্রীদের পরীক্ষা করতে করতে সে স্বভাবত পরীক্ষাপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। সহজ ভাবে বলল, "অপচয় সম্বন্ধে যতই ভাবা যায় ততই ক্ষেপা যায়। আমি তো জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছি, মিস্টার সেন। যাদের আমি পড়াই —এমন সুন্দর ফুটফুটে মেয়েগুলি—কী রকম বাড়িতে তারা থাকে, কী তারা খেতে পায়, কেমন তাদের পারিবারিক পরিমণ্ডল। স্কুলটাও এমন অলক্ষুণে জায়গায়, প্রত্যেকটি গাড়ি ঠিক ঐখান দিয়ে যাবেই, গাড়ির আওয়াজে আমার পড়ানো চাপা পড়বেই, যদিও গাড়ির চাকার নিচে আমার মেয়েরা—ভগবানের কৃপায়—চাপা পড়েনি।"

বাদল বিস্মিত হয়ে বলল, "উপরে দরখাস্ত দিয়ে দেখেছেন ?"

মডলিন শ্লেষের স্বরে বলল, "দেখে আসছি।"

বাদলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "Strange।"

মডলিন বলল, "Strange কিছুমাত্র নয়। দরিদ্রকে দারিদ্র্যের খেসারৎ দিতে হবে। সেই দাম দিয়ে যে শিক্ষা সেই শিক্ষাই কার্যকরী, আমরা যে শেখাচ্ছি তা ওরা মনে রাখবে না।"

"আপনি যা শেখাচ্ছেন সেটা তা হলে অপচয় ?"

"না, মিস্টার সেন। আমি অতটা নিঃসন্দেহ নই। আমার মেয়েদের দেখলে আপনি প্রগাঢ় বিস্ময়বোধ করবেন। এত অভাগিনী ওরা, তবু ওদের মধ্যে এমন খাঁটি সোনা আছে—এমন প্রতিভা। ওদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাইনে—কোনো ধনী-

কন্যাদের স্কুলে। আমরা তো গুরুশিষ্য নই, আমরা বন্ধুমণ্ডলী।"

বাদলের মাথায় ঘুরছিল অপচয়েরই কথা। বলল, "তা হলে মোটের উপর অপচয় নয়?"

"এই দেখুন," মডলিন ফিক্ করে হাসল। "আপনি বোঝেন বলে মনে হয় না যে এক দিক থেকে যেটা অপচয় অন্যদিক থেকে সেটা কার্যকর। তা নইলে কি আমাদের কোনো আশা ভরসা থাকত, আমরা ক্লৈব্যপ্রাপ্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিতুম না, ভাসতে ভাসতে ডুবে যেতুম না? আমাদের খারাপ ছেলেরাই তো সাম্রাজ্য জয় করল, বাতিল ছেলেরাই তো উপনিবেশ গড়ল।"

১২

বাদল বলল, "ঠিক।"

মডলিন ও বাদল পরস্পরের সঙ্গে কথা কইতে কইতে দিনকে রাত করে দিল, এমনি তাদের মশগুল অবস্থা। আবার টেবলেও তারা মজলিসী রসিকতার আড়ালে মত বিনিময় করল, কেউ টের পেল না তাদের কথায় গূঢ় অর্থ কী। সাধারণ শব্দগুলোই হলো তাদের code word। কাজেই কারুর মনে সন্দেহ জন্মাল না।

বাদল প্রশ্ন করল, ' Free Will সত্য, না Determinism?"

মডলিন উত্তর দিল, "দুই-ই।"

বাদল চ্যালেঞ্জের সুরে বলল, "তা কেমন করে সম্ভব?"

মডলিন যেন এ বিষয়ে চিন্তা করতে করতে বুড়ী হয়ে গেছে এইরূপ ভাব ব্যক্ত করে বলল, "বাঁধা রাস্তায় চলবার স্বাধীনতা যেমন সত্য এ-ও তেমনি। আজ যখন আমরা বেড়াতে যাব তখন কেউ আমাদের পথ রোধ করবে না। কিন্তু পথ আমাদের জন্যে আগে থাকতে নির্দিষ্ট। পরের বাড়ীর ভিতর দিয়ে পথ করে নিতে পারব না।"

"বেশ, বিশ্ব-ব্যাপারে ঐ সত্যের প্রয়োগ দর্শান।"

"ও তো খুব সোজা। সূর্য চন্দ্র পৃথিবী ইত্যাদি নিজ নিজ নির্দিষ্ট কক্ষে নির্ভয়ে বিচরণ করছে; লক্ষকোটি গ্রহতারায় কোনো সংঘর্ষের বার্তা শোনা যায় না; অথচ ওরা যে কেউ কারুর অধীন তাও তো নয়।"

"এই মুহূর্তে আমরা স্বাধীন না নিয়ন্ত্রিত?"

"নিয়মের সীমানার মধ্যে স্বাধীন। টেবল ম্যানার্স না মেনে টেবলে স্থিতি নেই।"

"অবস্থার দ্বারা আমাদের কার্য নির্ধারিত কি না?"

"হাঁ, কিন্তু কর্তা আমরা। অর্থাৎ কাজ করি আমরাই, শুধু আইন অনুসারে করি। আইন অবশ্য আপনার পঠনীয় আইনের থেকে অনেক ব্যাপক। বিজ্ঞানের আইনের

থেকেও। ব্যক্তিত্বেরও একটা আইন আছে।"

"মানেন আপনি ব্যক্তিত্ব ?"

"মানিনে ?"

"আজকালের দিনে ক' জন মানে বলুন। সবাই তো ভাবে বিশাল বিশ্বের কার্বে পৃথিবীই পাত্তা পায় না, বিশ্ব যদি সাগর হয় ওটা একটা বিন্দু, ওটার ভিতরে কোথায়ই বা আমি, কোথায়ই বা আমার মহত্ব!"

"আমরা কি কেবল মানুষ যে আমাদের দেহ কতটা স্পেস অধিকার করে ও মোট স্পেসের অনুপাতে তা কত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তারই দ্বারা আমাদের মহত্ত্বের ইয়ত্তা হবে ?"

"অবিকল আমার কথা।" বাদল উল্লাস সংযত করতে পারল না।

"কী তোমরা গুজ গুজ করছ," শুধালেন মিসেস্ গ্রেস। তিনি মারউডের সঙ্গে কী একটা সামাজিক কেচ্ছা নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। মারউডের পা খোঁড়া হলে কি হয়, কান তাঁর তাজী ঘোড়া। তিনি কত লোকের কাছে কত খবর শোনেন। তিনিই দিদির খবরের কাগজ।

"সে ভারি মজার কথা," মডলিন রহস্যের হাসি হাসল।

"তবু শুনতে পাই একবার ?"

"দিন, মিস্টার সেন, ফাঁস করে দিন।"

বাদল রহস্যের ভান করে ভেঙে বলল, "কথা হচ্ছে আমরা কি কেবল মানুষ, না আমাদের আরেকটা পরিচয় আছে যা স্পেসের আমলে আসে না।"

"এবং টাইমেরও।" মডলিন যোগ করে দিল।

"ছিঃ, কী আবোল তাবোল বকছে এ দুটো।"

"মেব্‌ল, ওরা যা বলাবলি করছে সে আজকালকার সবার সেরা কেচ্ছা। এক জার্মানভাষী ইহুদী, আইনস্টাইন তাঁর নাম, তিনি এই কেচ্ছার কবি।"

বাদল ও মডলিন চোখ টেপাটিপি করল।

মিসেস গ্রেস বললেন, "কা'তে কা'তে ?"

মারউড বললেন, "বুড়ীর নাম টাইম, ছোঁড়ার নাম স্পেস। অবশ্য ছদ্মনাম।"

"য়্যাঁ, এমন অসমবয়সীতে। ছি ছি ছি।" মিসেস্ গ্রেস রাগ করে টেবল থেকে উঠে গেলেন। বাইরে থেকে তাঁর চাপা হাসি শোনা গেল।

বাদল ও মডলিন মারউডকে অভিনন্দন জানাল। মারউড তাদেরকেও ছাড়লেন না। বললেন, "দেখিস বাপু, তোরা সমবয়সী হলেও ঢলাঢলি করিসনে।"

তখন বাদল ও মডলিন দুজনে দুটো দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল, কিন্তু মিলিত হল একই স্থানে মেইন গেট-এ।

মার্লবরার প্রশস্ত রাজপথে মডলিন বাদলকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি লেখেন না কেন ?"

বাদল উত্তর দিল, "লেখা হচ্ছে ছাঁটা চাল। কলমের প্রহার তার ভিটামিন ঝরিয়ে দেয়। যারা পড়ে তারা জানে না কী জিনিস কী হয়েছে।"

"ওটুকু লোকসান প্রত্যেক লেখককে দিতে হয়। আমি লিখি।"

"সত্যি ?"

"আপনি Daily Herald পড়েন ?"

"না, আমি পড়ি Manchester Guardian."

"আপনি ?"

"লিবারল। আপনি ?"

"সোশ্যালিস্ট।"

"যুদ্ধং দেহি।"

"আপনার সাথে আবার যুদ্ধ কী ? যুদ্ধ টোরীদের সাথে। দেখবেন আরেক বছর যেতে না যেতে।"

"এতটা নিশ্চিত ?"

"অনিশ্চয়ের কারণ কী ? আসছে বারের নির্বাচনে আমি ভোট দিতে পারব। আমার মতো কত মেয়ে দিতে পারবে। এই নতুন ভোটগুলো কী সাবেক পার্টিরাই পাবে ? Give Labour a chance."

বাদল বলল, "আপনারা পার্লামেন্টও মানবেন, সোশ্যালিজমও আনবেন, এ দুটোর অসঙ্গতি কি আপনারা হৃদয়ঙ্গম করেন নি ?"

মডলিন সবিস্ময়ে বলল, "কিসের অসঙ্গতি ?"

"পার্লামেন্ট মানলে একাধিক পার্টি মানতে হয়। দুদিন পরে যদি টোরীরা ভোটে জেতে তবে দুদিনের সোশ্যালিজম কোন স্বর্গ গড়ে রেখে যাবে ?"

"ওদের জিৎ হবেই না। লোকে আমাদের কাজের নমুনা দেখে আমাদেরকেই আবার পাঠাবে।"

"আপনাদেরও তো বাম বাহু আছে। কমিউনিস্টরা যদি দলে ভারি হয়, তবে ?"

"হবে না।"

"ঠিক জানেন ?"

"ও তো সোজা কথা। কমিউনিস্টরা পার্লামেন্ট তুলে দিতে চায়। ওদেরকে পার্লামেন্টে কে সাধ করে পাঠাবে ? ভোটারগুলো কি এতই আহাম্মক যে, পার্লামেন্ট উঠে গেলে ওদেরও ভোট দেবার উপলক্ষ্য থাকবে না, অতএব থাকবে না কোনো গুরুত্ব,

এটুকু ওদের মাথায় ঢুকবে না ?"

বাদল বলল, "ঠিক। You are always right".

মডলিন আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল। তার চলন প্রৌঢার মতন নয়, ধরনও নয় প্রৌঢার মতন। সে ডান হাতে তার স্কার্টের প্রান্ত ধরে ডান পা বাড়িয়ে দিল। নিমেষেকের জন্যে ডান হাঁটু নামিয়ে বাঁ হাঁটু নুইয়ে একটি Curtsey করল।

বাদল ভেবে বলল, "সম্পত্তি এমন জিনিস যার জন্যে মানুষ নেকড়ে বাঘের মতো কামড়াকামড়ি করতে লজ্জা বোধ করে না, যা নিয়ে মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা নেই, আমরা আইনজীবীরাও বর্তে আছি। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে লোকে আপন আপন সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করতে বিন্দুমাত্র রাজী হবে ? বড়লোকদের কথা ছেড়ে দিন, মধ্যবিত্ত লোকেরা কি নাচার দেখলে কোনো ব্রিটিশ মুসোলিনির নেতৃত্বে ফাসিস্ট হয়ে গায়ের জোরে পার্লামেণ্ট দখল করবে না ?"

"বটে ? গায়ের জোর একমাত্র ওদেরই আছে ?" মডলিন রেগে বলল।

"তবু বলা তো যায় না।"

"আপনি বিশ্বাস করেন ?"

"না, আমি বিশ্বাস করিনে যে ইংলণ্ডে কোনোদিন ফাসিজম প্রবর্তিত হবে। আমাদের এটা ডেমক্রেসীর দেশ। সেইজন্যে আমার এও বিশ্বাস হয় না যে সোশ্যালিজম এদেশে সুবিধা করতে পারবে।"

মডলিন ক্ষেপে গেল। বলল, "ফলেন পরিচীয়তে। সামনের ইলেকশনটা আগে জিতি তারপর দেখব আপনার বিশ্বাস হয় কি না।"

"বেশ, আপনিও দেখবেন আপনারা ব্যক্তির সম্পত্তিকে রাষ্ট্রের করতে গিয়ে কী পরিমাণে সফল হন। ফলেন পরিচীয়তের সেই তো সময়।"

"ব্যক্তির সম্পত্তিকে," মডলিন বলল, "রাষ্ট্রের করতে আমাদের ত্বরা নেই। আমরা আপাতত সকল ব্যক্তির সম্পত্তি ও সমান আয় প্রতিষ্ঠা করতে প্রবৃত্ত হব।"

"সম্পত্তির উপর," বাদল বলল, "যে মুহূর্তে আপনি ব্যক্তির স্বত্ব স্বীকার করলেন সেই মুহূর্তে আপনি এ-ও স্বীকার করলেন যে ঐ স্বত্ব কার্যত সমান হতে পারে না।"

মডলিন চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "তাই কি ?"

"দেখুন ভেবে। ব্যক্তির স্বত্ব যদি একবার মানেন তবে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে নৈসর্গিক ভেদ আছে তার ফলে একজনের সম্পত্তি আরেকজনের সম্পত্তির মাথা ছাড়িয়ে উঠবে। আয়েরও ইতর বিশেষ হতে বাধ্য, আর যদি আদৌ কবুল করেন।"

মডলিন একটা চোখ টিপে মুচকি হেসে বলল, "সত্যি কি আর উনিশ বিশ থাকবে না ? তবে একটা ঊর্ধ্বতম ও একটা নিম্নতম পরিমাণ ধার্য করে দেওয়া হবে, কারুর সম্পত্তি

ওর ওপরেও উঠবে না, নিচেও নামবে না। উর্ধ্বতম ও নিম্নতমের মধ্যে বেশি ব্যবধান না থাকলেই হলো।"

"হা-হাআআ," বাদল হেসে উঠল। "এতক্ষণে বেড়াল ঝুলি থেকে বেরিয়েছেন। যে বন্দোবস্ত চিরকাল চলে আসছে তাকেই বাহাল রাখবেন, কেবল খুব বড় ও খুব ছোটর মাঝখানের ব্যবধানটাকে সংকীর্ণ করে আনবেন। এরই নাম সোশ্যালিজম? না মডলিনিজম্?"

মডলিন হাতের কাছে কোনো উত্তর খুঁজে পেল না। বিষম অপদস্থ হয়ে অভিমান ভরে বলল, "আমরা ইংরেজরা ওকেই সোশ্যালিজম বলে বিশ্বাস করতে পছন্দ করি। বাইরের লোকের সোশ্যালিজমের সঙ্গে আমাদের রক্তের অমিল।"

বাদল তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "এই একটা কথার মতো কথা। আমরা ইংরেজ, আমাদের বিশেষত্ব আমরা বাড়াবাড়ি ভালোবাসিনে। নাম নিয়ে মারামারি করে কী হবে, মিস গ্রেস? টোরী ও লিবারলরা আপনার ঐ দাবী—ব্যবধান হ্রাসের দাবী—আন্তরিক সমর্থন করে। তবে ধীরে ধীরে, অলক্ষ্যে—বুঝলেন?"

মডলিন মিষ্টি হেসে বলল, "বুঝেছি। কিন্তু ঐ ধীরে ধীরে'টি মানব না। চাপ না পড়লে বাপ কিছু কি ছাড়তে চান? তবে বাড়াবাড়ির দিকেও পা বাড়াব না।"

আরো অনেক কথাবার্তার পর ওরা যখন বেড়িয়ে ফিরল মিসেস্ গ্রেস বাদলকে ডেকে বললেন, "শুনুন।"

বাদল তাঁর কাছে গিয়ে দেখল তাঁর মুখ অন্ধকার।

"ব্যাঙ্ক থেকে আপনার চেক ঘুরিয়ে দিয়েছে।"

"অসম্ভব!"

"এই দেখুন।"

"কই, দেখি? হ্যাঁ। তাই তো।"

ব্যাঙ্কে তা হলে বাদলের হিসাবে টাকা বাকি নেই। কী করে থাকবে—ওয়াইট দ্বীপে ছ'মাসের পাওনা আগাম দিয়েও মেলভিলের অতিরিক্ত বিল মিটিয়ে দিতে হয়েছে। বাদল মাথায় হাত দিয়ে বসল।

সুধীদাকে একখানা তার করলে হয়। কিন্তু সুধীদা যদি এখনো বাদলের সন্ধানে লণ্ডনের বাইরে থাকে?

মিসেস গ্রেসের কাছে কী ডিসগ্রেস! মডলিনই বা মনে করবে কী। যার ব্যাঙ্কে টাকা নেই তার মুখে এত বড়ো বড়ো কথা! মারউডও শেষকালে যা তা ঠাওরাবেন।

বাদল ধরা দেবে স্থির করল। গিয়ে বলবে সুধীদাকে, পাখি তো উড়ে যেতেই চায়, উড়েও যায়, কিন্তু আকাশে খোরাক না পেলে ভূতলে নেমে আসে। Free Will

যে Determinism-এর টান এড়াতে পারে না। কে যেন বলে, যাও তুমি যতো খুশি এগিয়ে যাও, তোমাকে আবার ততখানি পিছু হটিয়ে তোমার খুশির উপর আমার খুশিকে বলবৎ করব।

বাদল ভেঙে পড়ে বলল, "মিসেস্ গ্রেস, আমাকে যদি বিশ্বাস করেন তো লণ্ডনে গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে দিন। নতুবা ভারতবর্ষে cable করব, তার খরচা অনুগ্রহ করে দিন।"

মিসেস্ গ্রেস বললেন, "লণ্ডনেই যান আপনি। cable-এর চেয়ে শস্তায় ও cable-এরও আগে সেখানে পৌঁছতে পারবেন। টিকিটের দাম দেব কি?"

"না, ধন্যবাদ।" বাদল পকেটে হাত দিয়ে বলল, "যা আছে তাতেই হয়ে যাবে।"

জিনিসপত্র গুছিয়ে বাদল যখন বিদায় নেবার মুখে তখন মডলিন বলল, "চিঠি লিখতে ভুলবেন না। আপনার ছাঁটা চালেও যথেষ্ট ভিটামিন থাকে। আর নতুন কোনো কেচ্ছা জানতে পেলে জানাবেন।"

মারউড বললেন, "অপচয় তত্বটার একটা হেস্তনেস্ত হলো না। আশা করি ওটার গভীর অনুশীলন করবেন।"

মিসেস গ্রেস বললেন, "আপনার ওভারকোটটা বাঁধা রইল। পরে পাঠিয়ে দেব।"

পথে বাদলের একই ধ্যান—ফ্রী উইল কি বস্তুত আছে, না ওটার থাকা আমাদের ভালো লাগে বলে ওটা আছে আমাদের আকাঙ্ক্ষায়?

ট্রেন প্যাডিংটনে থামলে বাদল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। চির প্রিয় লণ্ডন। এখানে সবাই তার চেনা। লণ্ডন ছেড়ে আর কোথাও সে ছুটবে না।

হেণ্ডনে গিয়ে সুধীদার ওখানে উঠল।

সুধী বলল, "কে? বাদলা?"

বাদলের তর সইল না। সে বিনা ভূমিকায় সুধাল, "সুধীদা, ফ্রী উইল, না ডিটারমিনিজম্?"

(১৯৩২-৩৩)

কবিতা

প্রথম স্বাক্ষর □ রাখী □ একটি বসন্ত □ কালের শাসন □ লিপি □ নীড় □ জার্নাল

সনেট-১

এ জীবন লয়ে আমি কী করিব, প্রভু ?
ইচ্ছা করে দিয়ে যাই কালের ভাণ্ডারে
এর ছায়া বেঁচে থাক ইতিহাসে। তবু
তৃপ্তি কোথা ? চিরপ্রাণ ভবিষ্যৎ তারে
স্থান দেবে এক কোণে যাহার মাঝারে
সে তো শুধু প্রাণহীন বর্ণমালা ছাওয়া
বর্ণহীন শুষ্ক শ্বেত পাতা। আমি তারে
বলিব না বেঁচে থাকা, অমরত্ব পাওয়া।
প্রতিক্ষণে ভরে দাও যদি উচ্ছ্বসিত
আনন্দ বেদনা মেশা প্রেমের অমৃতে
প্রতিক্ষণে ভরে দাও যদি লীলায়িত
অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের রূপে গন্ধে গীতে
মুহূর্তে ঝরিয়া যাক দেহ, মুহূর্তেই
উবে যাক স্মৃতি। তবু মৃত্যু মোর নেই।

(১৯২১-২২)

সনেট-২

আমি চলে গেলেও তো থাকিবে সংসার
পাখীরা গাহিবে গান আজিকার মতো
ফুল ফোটা ফুল ঝরা নিত্য লীলা যত
সবি রবে অনাহত প্রকৃতি মাতার।
শুধু আমি যাব চলে। আমারি মতন

কত আসিবে তরুণ। তরুণীর মুখে
চাহি ঝড় বহে যাবে তাহাদেরো বুকে।
তাহাদের পদধ্বনি করেছি শ্রবণ
তাহাদের প্রেমস্বপ্ন পেয়েছি অন্তরে।
হে তরুণ, হে তরুণী, তোমরা যখন
এ পথের এইখানে ফেলিবে চরণ
পূর্বগামী পথিকেরে স্মরো ক্ষণতরে।
এই ঝরা ফুলে তার রেখে গেছে স্মৃতি
পথের বাতাসে তার মিশে আছে গীতি।

(১৯২১-২২)

এলেন কেই

বন্ধু মোর অসমবয়সী
আশা ছিল একদিন শিখে লব পদপ্রান্তে বসি'
হৃদয়ের চিরন্তনী নীতি
প্রীতি হতে কত উর্ধ্বে যারে তুমি বল পরা প্রীতি
রীতি তার বিধি তার কিবা,
স্বনেত্রে হেরিব তব সৌম্যস্নিগ্ধ বদনের বিভা
নারী অঙ্গে দেবীর মহিমা
সুন্দর ভাবনা আনে মুখপদ্মে কিবা মধুরিমা,
নিয়ত কল্যাণব্রত হতে
সর্বদেহে কী লাবণ্য অলক্ষে উৎসরে কোন্ পথে।
পূরিল না আমার সে আশ—
সব আশা পূরিয়াছে কার। ব্যর্থ দীরঘ নিশ্বাস।
তুমি গেলে দূর হতে দূরে
মরণের বাঁশিখানি ভরি' দিয়া যৌবনের সুরে।
হে রুচিরা সুচিরযৌবনা,
তরুণীর তরুণের প্রেমে তব নিত্য আনাগোনা।
প্রণয়সংহিতা মাঝে থাকি
প্রতি যুগলের করে বেঁধে গেছ মিলনের রাখী।
ভালো যারা বাসে একমনে

মিলিবে মিলিবে তারা কোনোদিন কোথাও কেমনে—
দিয়েছ এ সান্ত্বনা সংবাদ
প্রতি যুগলের শিরে শুভ্রশুচি তব আশীর্বাদ।
বাণী তব কী রহস্যভরা
প্রিয়ে করে প্রিয়তর প্রিয়ারে সে করে প্রিয়তরা।
প্রেমিকেরা খুঁজে পায় দিশা
বরণের মালা হাতে অপেক্ষিতে পারে সারা নিশা।
স্খলন্তেরে ধিক্কারিতে জানে
কঠিনের তপস্যায় বাঞ্ছিতারে জয় করি' আনে।
প্রত্যহের তুচ্ছতা পাসরি'
চিরপ্রেমব্রতটিরে প্রতি কাজে প্রত্যহ আচরি'।
দুটি প্রাণে অখণ্ড প্রণয়
একটি জাগ্রত স্বপ্ন কায়মন সর্বসত্তাময়।
একখানি সম্পূর্ণ জীবন
প্রেম তার কেন্দ্র আর পরিধি যে অনন্ত ভুবন।
শেষ তার পূর্ণ পরিণতি
পবিত্র সুন্দর শিশু আরাধিত কাঙ্ক্ষিত সন্ততি।
চিরন্তন প্রণয়ের কোলে
প্রিয় হতে প্রিয়তর প্রিয়া হতে প্রিয়তরা দোলে।
শুচিস্মিতে, তোমারি এ বাণী
সারাপথ চলি মোরা প্রেমে প্রেমে প্রাণে প্রাণে মানি'

(১৯২৪)

কৃষ্ণ

সুন্দর, তুমি খুঁজিয়া ফিরিছ কারে ?
নাই সে খোঁজার আদি আর অবসান।
সুরের দূতীরে পাঠাও কাহার দ্বারে ?
নাই সে জনের কোথা কোনো সন্ধান।
তুমি শুধু সুর, তুমি পথে চলা সুর,
তুমি চলি' যাও বাঁশিতে বাঁশিতে বেজে।
দূর হতে আসি' নিকট, পালাও দূর

এক যুগ হতে আর যুগে চলা এ যে।
তোমার খোঁজার সমারোহ দেখে মরি
ওগো সুন্দর, এতো জানো ছলাকলা।
কত রূপ কত বর্ণ বিকাশ করি'
গন্ধে ছন্দে অবিরাম তব চলা।
প্রাতে খুলে ফেলি' যামিনীর যবনিকা
চিনিবার তরে কার মুখ তুলে ধরো।
উষার অলকে আঁকি' সিন্দূর লিখা
মেখে চুম দিয়া সরমে অরুণ করো।
সারা দিন ছোটো হেথায় হোথায় মিছে
আলোয় উজলি' মুগ্ধ ধরণী সারা
দিনশেষে তবু বারুণীর পিছে পিছে
মশাল ধরিয়া তিমিরে হও যে হারা।
লক্ষ নয়ন ফুটে ওঠে দিকে দিকে
নিশিভোর চলে শুধু খোঁজা, শুধু খোঁজা
ছায়াপথ বেয়ে চরণচিহ্ন লিখে
অসীমের মাঝে ছুটে বাহিরাও সোজা।
যৌবন, তব পথপাশে জাগে হাসি
কুসুমে কুসুমে মাতামাতি কানাকানি
কেলিকদম্ব ঝরায় মুকুলরাশি
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলবাণ হানাহানি।
রঙে রঙে তুমি রাঙাইলে দিশি দিশি
রঙের নেশায় খুঁজিয়া চলিলে কী যে
কালো হয়ে গেল সব ক'টি রঙ্, মিশি'
তুমি যে কালিমা অঙ্গে মাখিলে নিজে।

ওগো যৌবন, ওগো চির যৌবন,
নিতি নিতি তুমি জাগাও নবীন প্রাণ
জরারে জোগাও সবুজের রসায়ন
কচি ও কাঁচায় শক্তির অভিযান।
এতো করি' তবু হয় নাকো মনোমতো

প্রিয়ার লাগিয়া আরো বুঝি কিছু চাই
মরণ সাজিয়া ভাঙো যদি অবিরত
কচি ও কাঁচা ও জরতীর ভেদ নাই।
ওগো নিষ্ঠুর সুন্দর, ওগো কালো,
কোথা পেলে ঐ সাপ খেলানোর বাঁশি।
দিকে দিকে কী যে সুরের আগুন জ্বালো
যারা শোনে তারা ঝাঁপ দিয়ে পড়ে হাসি'।
এক দিক হতে আর দিকে পড়ে সাড়া
নৃত্যের তালে চরণে শিহরে সুখ
উল্কার বেগে ঘুরে মরে রবি তারা
বিপুল ব্যথায় দোলে সিন্ধুর বুক।
কুহকী! এত যে কুহক লাগাও প্রাণে
বিশ্বের প্রতি কণায় স্বপন সৃজে
আমরা বৃথাই খুঁজে মরি ওর মানে
তুমি শুধু হাসো, হয়তো জানো না নিজে।
বিশ্বের তুমি শোভারূপ, তুমি কান্ত
ফোটা সুষমার নির্যাসে তুমি গড়া
মনোহর তুমি হয়ে ওঠ অবিশ্রান্ত
তোমার মাধুরী তোমারি সৃজন করা।
এত সুন্দর তবু তুমি চাও কারে?
খুঁজিয়া বেড়াও কী বিপুল পূর্ণতা?
কত কী গড়িলে নিজ হাতে বারে বারে
মন ভরিল না, করি' দিলে চূর্ণ তা'।

জানি জানি, তুমি কী ধন খুঁজিয়া ফির
কার তরে তব অবিরাম অভিসার
পাইলে না, তাই বিরহী সেজেছ চির
যত বার গেলে ফিরে এলে তত বার।
নিখিলের রূপ কেঁদে মরে যার তরে
সে যে নিখিলের বক্ষে লুকানো প্রীতি
তারে তুমি যত চাহিলে বাহিরে ঘরে

পাইলে না, তুমি নাহি জানো তার রীতি।
সে আছে তোমার অন্তর আলো করি'
সে আছে তোমার বাঁশরির সুরে বাঁধা
তুমি ঘুরে মরো সারাটি গোকুল ভরি'
তোমারি বক্ষে লতাইয়া আছে রাধা।
পথ খোঁজা রীতি ঘুচিবে তোমার কবে?
চলিতে চলিতে কবে দাঁড়াইবে থেমে?
সুন্দর, তুমি প্রেমিক যেদিন হবে
সুষমা সেদিন সার্থক হবে প্রেমে।
জানি জানি কভু আসিবে না হেন দিন
তুমি নিষ্ঠুর, প্রেমপাশ যাও টুটি'
তুমি তো পালালে মথুরায় উদাসীন
বিরহিণী রাধা ভূতলে পড়িল লুটি'।
সেই তুমি কভু প্রেমে কি পড়িবে ধরা?
সুচির বিরহ, বিলাস তোমার সে যে।
তুমি শুধু সুর, শুধু পথ খুঁজে মরা,
তুমি চলি' যাও বাঁশিতে বাঁশিতে বেজে।

(১৯২৫)

রাধা

ওগো সুন্দরী, ওগো সুন্দরী রাধা—
শীতল জানিয়া তোমার ও দুটি চরণে পড়িনু বাঁধা।
কত জনে কত দেবতা মিলয় যেমন যাহার রুচি
কেহ গড়ে লয় কেহ খুঁজে পায় পণ্ডিতজনে পুছি'।
কত না আয়াসে ওরা তো করিল রহস্য পরিমাণ
আপনা হইতে মোরে মিলি' গেল সুন্দরী ভগবান।
সুন্দরী ভগবান গো আমার সুন্দরী মোর নারী
সাগর হইতে উঠিয়া আসিলে হাতে লয়ে সুধা বারি।
দেবতার পদ প্রক্ষালি' কেহ সে জলে মিটায় ক্ষুধা
আমার পিয়াসা ধন্য করিল নারীকণ্ঠের সুধা।
নারীকণ্ঠের সুধা গো আমার নারীকুন্তল বাস
এতো সুখ মোর সহিবে কি যদি মেলি' দাও কেশপাশ।

ঘেরি' দাও যদি কেশ দিয়া মোরে ঢাকি' দাও যদি দেহ
সংজ্ঞা হারাব ও-সুরা চুমুকি' সুরভি করিয়া লেহ।
সৃষ্টির সার ধরণী গো আর ধরণীর সার নারী
নারীর মাধুরী দশ ইন্দ্রিয়ে আহরিতে যদি পারি!
ধরণীর সার রমণী গো আর রমণীর সেরা সে
জনমে জনমে আমার লাগিয়া জনম মাগিল যে।
পরশি তাহার প্রতিটি অঙ্গ প্রতিটি অঙ্গ দিয়া
এ যে বিশ্বের আদি বহ্নি গো এসেছে কী রূপ নিয়া!
রূপের বহ্নি কেমন করিয়া এমন তন্বী হলো
এমন শীতল এমন কোমল এত লাবণ্যী হলো!
সারা সৃষ্টি সে গৌরীর মতো তপ করেছিল একা
তাই তার তনুরেখায় রেখায় লাবণ্য দিল দেখা।
তারায় তারায় যুগযুগান্ত অনঙ্গ পুড়ে মরে
শীতলিয়া ধরা তবে না এমন ফুলে ফলে ওঠে ভরে।
ধূলির আগুন ফুল হয়ে ফোটে ফুলের আগুন ফল
তারার আগুন তরুণীর আঁখিতারা হয়ে ঝলমল।
সৃষ্টি সে আসি' শেষ হয়ে গেছে তোমার দু'গাছি কেশে
অনন্ত কাল বিকশি' উঠেছে তোমার অধরে হেসে।
কোথা হতে তুমি আসিবে কেন গো তুমি তো আদির আদি
আপন আগুনে ফাগুন করেছ সৃষ্টির মায়া ফাঁদি'।
ওগো মায়াবিনী. ওগো মায়াবিনী রাধা,
গোরোচনা গোরা অঙ্গে তোমার সৃষ্টির মায়া ফাঁদা।

ওগো সুন্দরী, ওগো সুন্দরী রাধা—
বলো, কবে মোর হবে সমাপন বাঁশরির সুর সাধা।
বাঁশরির সুরে কাঁদা গো আমার কারে পাইবার আশা
কারে পাইবার কাহারে দিবার কার হইবার আশা!
সুবর্ণ করে নাও গো আমায় সুকণ্ঠ করে নাও
ধ্বনিতে আমার প্রেমের পরশমণি পরশিয়া যাও।
সহজ সুরের গানটি গাহিব, গাহিব সহজ সুরে
বনের পাখীর কণ্ঠ আমার কণ্ঠে দাও তো পুরে।

সহজ হবার সাধন সে যদি কঠিন সবার চেয়ে
করুণা কোরো না, ভিক্ষা দিয়ো না, অন্ন কী হবে পেয়ে !
সরস মাটিতে হরষে ফুটিবে শুচি সৌরভ লয়ে
যেখানে পড়িব বাস বিতরিব জিনিব সহজ জয়ে।
জিনিব সহজ জয়ে গো, বন্ধু, জিনিব তোমারে শেষে
ধুলার চাইতে রিক্ত হইয়া বাহিরিব বর বেশে।
ওগো একাকিনী, ওগো একাকিনী রাধা,
কেহ নাহি জানে তুমি আর আমি কোন অবাঁধনে বাঁধা।

(১৯২৭)

কৈফিয়ৎ

না-ই যদি হয় নাই হলো আহা ভারতের স্বাধীনতা
হুঙ্কার ছাড়ি' তর্জনী নাড়ি' নাই মুছালেম ব্যথা !
নাই মুছালেম ভিজে আঁখিপাতা
হাহুতাশ ভরা রচি' বীরগাথা
ইনায়ে বিনায়ে কবে মান্ধাতা কারে জিনেছিল কোথা
বৃথা মোরে ডাকো আমি পারি নাকো হেন ঘোর রসিকতা !
আমি ক্ষীণজীবী কবি
আয়ু কই, সখি, মহারথীদের মহাযশ যাব লভি !

ভীরু বলে তুমি ফিরাবে নয়ন মূঢ় বলে দিবে গালি
বাঁকা হাসি হেসে তালে তালে তালে বাজাইবে করতালি।
সেও সই, তবু পারি না কিছুতে
সাধ্য যা নয় তাহারি পিছুতে
ছুটিয়া ছুটিয়া মরীচিকা ছুঁতে শ্বাসটুকু দিতে ঢালি'
বৃথা দাও লাজ আছে আরো কাজ তারি লাগি প্রাণ জ্বালি।
আমি ক্ষীণজীবী কবি
যুগ যুগ ধরে যে পাবক জ্বলে কেন হব তার হবি ?

যে রূপবহ্নি নয়নে জ্বলিছে যে রসবহ্নি বুকে
যে মায়াবহ্নি কল্পনা মোর রাঙাইছে কৌতুকে

সেই অনলের কয়েকটি কণা
লয়ে বিরচিব নব আল্পনা
বসে বসে তাই চলে জল্পনা বিরহবিরস মুখে
বহে যায় বেলা নীরবে একেলা নিষ্ফলতার দুখে।
আমি দিনেকের কবি
নভ অঙ্গনে আল্পনা আঁকি' নিভে যাবে মোর রবি।

আপনারে লয়ে ফিরি অহরহ নামাতে না পারি ব্যথা।
ভ্রূণ লয়ে কাঁদে গরভিণী নারী কুঁড়ি লয়ে কাঁদে লতা।
সৃজন বেদনা জাগে অনিবার
কত কী যে মোর রয়েছে দিবার
ফাগুন থাকিতে তাই তো আমার ফুটিবার ব্যাকুলতা
বলিবার যত কবে তা বলিব মনে থেকে যায় কথা।
আমি অস্ফুট কবি
ফুটিলেই মোর ব্যথা যাবে, সখি, না ফুটিলে যাবে সবি।

আমারে পাবে না জগতের কাজে আমি চির পলাতকা
বচন বিনাতে নাহি জানে যারা আমিই তাদের সখা।
প্রণয়ীরা মোরে ডাকি' লয়ে যায়
বাসরঘরের চোরা ঝরোকায়
আমি লিখে লই আপন ভাষায় ওদের প্রলাপ বকা
আমি দিই ছেপে যত চাপা হাসি যতেক মিছে চমকা।
আমি বাণীচোরা কবি
বাচাল জনার যত কথাভার উজাড়িয়া লই সবি।

তরুণ ছেড়েছে তরুণীর মায়া দীক্ষা লয়েছে একা
জনমের মতো করেছে বরণ জাগিয়া স্বপন দেখা।
শ্রবণে বেজেছে মা'র হাহাকার
উতলা হয়েছে খাপে তরবার
তবু ভাঙিবে না ধৈর্য তাহার আগে চাই রণশেখা
কথাটি বলে না নিজেরে ছলে না ললাটে নিষ্ঠা লেখা।

আমি বিমুগ্ধ কবি
মরণে কী শোক তার জয় হোক, আঁকি' লব তার ছবি।

হেম শৃঙ্খল কাটি' কোন জন কোথায় নিরুদ্দেশ
কেহ নাহি জানে বাজে তার প্রাণে সকলের সব ক্লেশ।
সৃষ্টির আদি অন্ত বুঝিতে
জরা মরণের ওষধি খুঁজিতে
মারের সঙ্গে নিত্য যুঝিতে আয়ু তার নিঃশেষ
সাধনা না সাধি' সাধক মরিল কেহ না জানিল লেশ।
আমি বিনম্র কবি
সেই অজানার তর্পণ করি' পরম পুণ্য লভি।

ঘরে ঘরে পাই গৌরীর দেখা তপোনির্মল রূপ
সে বর অঙ্গ রঙ্গে বিলোকি' অনঙ্গ মানে চুপ।
কল্যাণী যায় গৃহ কাজ করি'
পূর্ণা চলিছে অন্ন বিতরি'
সম্মুখে তার হাত পাতে ভরি' আপনি ভুবন ভূপ
কোলে দোলে শিশু ভয় পরিহরি' এ যে অতি অপরূপ।
আমি কুতূহলী কবি
রহস্য এর নাহি পেয়ে টের রসনা রয় নীরবি'।

তাই বলি মোর কোথা অবসর যোগ দেব কোনো কাজে
দৃশ্য নেহারি' ঠাঁই ঠাঁই ফিরি মিলি সকলের মাঝে।
দেখি আর লিখি যখন যা আসে
কখন কে কাঁদে কখন কে হাসে
খেয়ালীর মতো ঘুরি আশে পাশে ভাববিলাসীর সাজে
রণভেরী শুনে সরে না চরণ মনে মনে মরি লাজে।
আমি দর্শক কবি
নাটবেদী পরে যেতে ভয় বাসি, দূর হতে অনুভবি।

আমার এ কাজ কে করিবে আজ আমি যদি যাই রণে
কবে জানিবে কে যাহা গেল থেকে শুধু আমারি এ মনে ?

কোটি কোটি পথ একটি জীবন
তাও ছুটি দিনে হবে সমাপন
আপনারি পথে চলি সে কারণ নিজেরি অনুসরণে
কভু চলে নাই কভু চলিবে না এ পথে অপর জনে।
আমি যে তোমারি কবি
তোমারি আলোকে আলোকিত আমি, তব তরে এ পদবী।

(১৯২৭)

পুনর্জন্ম

এই জনমের পরে যদি আরেক জনম নাহি
বিশ্বরাজের কাছে নেব অনেক ভিক্ষা চাহি'।
বদ্‌লে নেব দেশটা আগে,
পশ্চিমেরি প্রান্তভাগে,
রংটা যাতে ফরসা থাকে, প্রাণটা জেলের বা'র।
অন্নচিন্তা চমৎকারা
মুখ করে না অন্ধকারা,
জন্মে যেন ছুটতে না হয় বড়বাবুর দ্বার।
সংক্ষেপেতে বলতে গেলে—
পুরানো এই খোলস ফেলে'
বদ্‌লে নেব সে';
কিন্তু যেন বদ্‌লে নারে
এই যে আছে মোর বাধারে
পুরানো এই সে।

আরেক জন্ম পাই যদি তো এইটি আমার চাই,
যে ঘরে জন্মাব সেথা দ্বন্দ্ব ঘৃণা নাই।
প্রেমিক যুগল আমার তরে
তপ করিবে নিষ্ঠাভরে
একটি করে প্রার্থি' লবে অমৃত-সন্তান।
দুই প্রণয়ীর একটি নীড়ে
চলতে র'বে আমায় ঘিরে'

যেমনি কঠোর আনন্দতপ উত্তপ্ত কল্যাণ।
পুরানো এই পিতামাতাই
নিখুঁৎ করে পাই বা না পাই
আর জনমের দ্বারে
পাই রে যেন পাইরে আবার
দোষেগুণে তৈরি আমার
পুরানো এই তারে।

পাওয়া

কে জানতো পাওয়া এমন দুখের।
জয়ের ভয়ে প্রহর প্রহর কাঁপন শুনি বুকের
পাওয়া তেমন শক্ত নয় শক্ত যেমন রাখা,
জয়ের পরে হারবো না আর, করবো সে জয় পাকা,
কখন হারি কখন হারাই নিত্য সজাগ থাকা,
অন্ত নাই এ দুখের
এর চাইতে সেই না-পাওয়া সে ছিলো ঢের সুখের।

তখন আমি ছিলেম শিকারী,
অলক থেকে খসে পড়া ফুলের ভিখারী।
অলক্তকের তিলকলেখা ভালে নিতেম এঁকে
নুইয়ে মাথা বাঁকিয়ে আঁখি বারেক নিতেম দেখে,
যে পথে তার আসা যাওয়া চিহ্ন যেতেম রেখে
অলখ শিকারী
নানান ছন্দে জানিয়ে দিতেম কিসের ভিখারী।

পেয়েছি তায় যারে চেয়েছি
যক্ষরাজার ধন যে মানিক তারে পেয়েছি।
চক্ষু হতে মুক্ত ঢেলে নিলেম তারে কিনে,
জনে জনে হার মানিয়ে নিলেম তারে জিনে,
অধর পেলেম সেই অধরা যারে ধেয়েছি দীর্ঘ অলস দিনে।

হায়রে পাওয়া, হায়রে আমার জয় ।
যে পারে না রাখতে ধরে কেনই বা সে লয় ।
কতই বা হায় চোখে চোখে রাখবো আগলি
নয়ন হতে কখন সরে নয়ন পুতলি ।
বক্ষে বাঁধি দুই বাহুতে নিষ্পেষি' দলি'
শঙ্কা তবু রয় ।
বক্ষ চিরে ভরতে নারি, নইলে হতো জয় ।

দৈবে যদি আঘাত দিয়ে ফেলি,
দৈবে যদি মূঢ়ের মতো সমুখ হতে ঠেলি,
কতই বা তার মান ভাঙাবো পা' দুখানি ধরে !
কখন যে তার মন কোথা ধায় মরি গো সেই ডরে !
আর কারে বা চায় কখনো কোন্ নিরাশা ভরে
আমায় অবহেলি' !
বাঁচবো না তো যায় যদি সে ফেলি' !

সে যদি হায় এমনি সাধন সাধ্‌ত,
পাবার তরে এমনি কেঁদে পাবার পরে কাঁদ্‌ত !
সে যদি হায় আমায় নিত লক্ষ সময় জিতে,
পালাই পাছে সেই ভয়ে সে আপন আঁচলটিতে
যত্নে মোরে বাঁধ্‌ত !
আমার তরে আমার মতো সে যদি গো কাঁদ্‌ত !

তবে আমার ভাবনা ছিল কিবা !
দুয়ের তরে দুয়ের পিয়াস মিটতো নিশি দিবা ।
পুলক সুধা আস্‌ত উঠে অধর মন্থনে,
ফেনায় ফেনায় পড়্‌ত ফেটে অশেষ চুম্বনে,
তাল মিল্‌ত ডাইনে বামে হৃদয় স্পন্দনে ;
ছাপিয়ে সুখের সীমা
দুই পায়েতেই বান ডাকতো মিলন পূর্ণিমা ।

(১৯২৭)

বিরহী

আমার আঁখি দিয়া সবার আঁখি যায় কেঁদে,
নহে যা মিলিবার কেন যে মরি তার খেদে।
কেবলি হায় হায় করিয়া দিন যায়,
সকলি শেষ করে' পাইতে প্রাণ চায়,
স'বে না কোন ফাঁকি র'বে না কিছু বাকী কোথা।
না পেলে এতটুকু ফুঁপায়ে উঠে বুক,
চক্ষে উথলায় জগত-জোড়া দুখ,
দু'হাতে ঝাঁপি মুখ রুধিতে নারি বিধুরতা।

আমার আঁখি হতে সবার আঁখিজল ঝরে,
সবার ব্যথা বাজে আমার হৃদয়ের ঘরে।
না জানি কবেকার যক্ষ অলকার
আমার আঁখি হতে ঝরায় আঁধার,
নিশাস্ জমে জমে বুঝি বা হয়ে ওঠে মেঘ।
বুঝি বা দূত হয়ে ? বয়ে,
লঙ্ঘি' বাধা যত লঙ্ঘি' লাজ ভয়ে,
নামায় বুকে তব আমার ঘন সে আবেগ।

তোমারো বুকে সখি চাপা সে ঝড় ফিরে শ্বসে',
আঁচল যায় তিতি' উছল বেদনার রসে,
মন সে নিঃসরে গোপন অভিসারে,
তনুটি একাকিনী পড়িয়া একধারে,
আশায় নিরাশায় রজনীদিন যায় বহে'।
তোমারো হৃদি জাগে সুখ লালসা জাগে,
দরশ পরশন লাগি' মিলন মাগে,
অচল পরমাণ তবু যে ব্যবধান রহে।

তারে শুধাই সখি ভাবিয়া বল্ একবার
মিলনে মিটিবেকি মিলন সাধ দোঁহাকার ?
আঁখিতে আঁখি রাখি' মুখেতে মুখ দিয়া
বুকেতে বুক গাথি' হিয়াতে থুই হিয়া

মেটে কি আশা তোর, মেলে কি বাসনার শেষ ?
হলো বা এক তনু, হলো বা এক মন,
প্রতিটি অঙ্গের ঘুচিল ক্রন্দন,
পুছি সজনে তবু মুছিল কতটুকু ক্লেশ ?

যতই কাছে টানো, যতই কাছে আনো দেহ,
যতই ফাঁস কষে বাঁধিয়া ফেলো মনটাকেও,
হোক্‌না একাকার হৃদয় দোঁহাকার,
মিলন হ'বে না গো, মিলন না হ'বার
তুমি যে তুমি সখি আমি যে আমি চিরদিন
এ যে গো ব্যবধান যোজন যোজনের,
একজন সাথে কভু মেলে কি দুজনের ?
কাহারো মাঝে কেহ পারে কি হতে কভু লীন ?

রও গো রও তুমি রয়েছ সেই মতো
কেন সমুখে আসি স্মরায়ে দিবে বাধা কত।
দূরেতে আছ তাই সদা হৃদয়ে পাই
আমাতে আছ বলে যেন প্রভেদ নাই
মনেরে চোখ ঠারি আমি আমার নারী ভেবে'।
আসিলে কাছে পাছে সে মায়া নাহি রয়,
পাছে সচকি' হেরি একজন আমি নয়
কেন গো দেখা দিয়া আমারে জাগাইয়া দেবে ?

বিধাতা সিরজিল কেন এ ক্রূর ব্যবধান
এক তো ছিনু দোঁহে করিল কেন খান্ খান্।
ধরণী চাঁদ লয়ে ছিল তো এক হয়ে,
আহা কি ঘন গূঢ় নিবিড় পরিণয়ে,
ভাঙিয়া এক হিয়া পড়িল প্রিয় প্রিয়া কেন ?
কেন ঘুরিল শশী ধরারে ঘিরি' ঘিরি',
গেল যে কত যুগ তবু ঘুরিয়া ফিরি,
মিলিব সেই মতো ভরসা নাই আর হেন।

এক তো ছিনু দোঁহে নাম-না-জানা কোন্ প্রাণী,
বিধাতা মাঝে কেন এ ভেদরেখা দিল টানি' ?
কেন গড়িল নারী কেন গড়িল নর
প্রণয় সেতু বাঁধি' দিল দোঁহার পর ?
দুকূল কি আকুলি' মধুর কোলাকুলি যাচে।
তবু যে আশা নাই বিরহ ঘুচিবার,
যতই দূতীপনা করুক স্রোতোধার,
দোঁহার কানাকানি শুনিতে কেহ, আনে, আছে !

আঁখিতে আঁখি রাখি কি জানি কেন মনে হয়
কে থাকি আড়ালেতে হেরিছে যেন সমুদয়।
মুখেতে মুখ দিয়া তবু ভরসা নাই
চোরায়ে নিল চুমা কে যেন, ভাবি তাই,
বুকেতে বুক গাথি' শূন্য মানি ছাতি তবু।
কে যেন নিল হরি' কি যেন সুখটুকু,
কেমনে দিল ভরি' অবোঝা দুখটুকু,
ধরা সে পড়িল না দূরে সে নড়িল না কভু।

যতই কাছাকাছি ততই দূরে আছি, থাকি।
যতই পাই তোরে তবু যে তোর বহু বাকী।
পরাণ ক্ষুধা হায় কিসের সুধা চায়
শুধু চুমিয়া মুখে সে কি তৃপতি পায়,
আমার ক্ষুধা লয়ে আমি গেলাম রয়ে একা
তুমি এসো না পাশে কি হবে লঘু হাসে
কি হবে দু'দিনের ও সহবাসে
পারি কি পাসরিতে যে কাঁদা ভালে আছে লেখা।

আমার আঁখি দিয়া আঁখি যায় কেঁদে
বিরহী নারী নর কেন যে মরে মিছা খেদে।
পাবো না যদি পুরো, কি হবে ওটুকুতে,
কি সুখ আছে পেয়ে কোলে মাথাটি থু'য়ে,

কেন এ অকারণ নিরন্ত দরশন যাচা ?
তোরে শুধাই তবে বল্ গো বল্ কবে
মুদিয়া আঁখি দু'টি ধেয়াব সুনীরবে,
মরণে পুরো মিলি' পুরায়ে লব এই বাঁচা ।

(১৯২৭)

অনন্-একনিষ্ঠ

ওগো এই যে আমার চপল চক্ষু জোড়া
যেন রাশ না মানা পক্ষিরাজ ঘোড়া ।
কোথাও কোন্ রূপসীর ওড়্না আড়ে আড়ে
যেই এমনি দু'টি পক্ষিরাণী ঠারে
এদের অমনি শুরু ওড়া ।
ওগো কথা রাখো, রাখো ;
আমার চোখে পরাও ঠুলি :—
তোমার ঘর করনা ভুলি'
আমার চোখে চোখে থাকো ।

ওগো এই যে আমার চাতক দুটি কান
এঁরা ডুবে ডুবে সবঠাঁই জল খা'ন ।
হোথা সাঁওতালদের কোকিলরঙা বৌ
যেই গুনগুনিয়ে কণ্ঠে ক্ষরায় মৌ
এঁরা অমনি যেতে যা'ন ।
ওগো কথা দিও, নিও ;
আমার কানে গুঁজে তুলো—
যতেক কাজকর্ম ভুলে,
ডাকো "প্রিয়", "প্রিয়", "প্রিয়" ।

ওগো এই যে আমার চকোরপানা মুখ
এর পরশ সুধা অশেষ পিয়ে সুখ ।
কোন [illegible] ভরদুপুরক্ পাওয়া
যেই পাশ দিয়ে যব একটু বেহোঁশ হওয়া
ইহার অমনি জাগে ভুখ্ ।

ওগো   কথা রাখো, রাখো ;
আমায়   অম্‌নি থাকো ছুঁয়ে,
তোমার   হাতের কাজটি থুয়ে'
শুধু   ছুঁয়ে ছুঁয়ে থাকো।

ওগো   এই যে আমার মন কাড়ানে মন
ইনি   ভুবন জুড়ে অন্যমনা র'ন।
নাহয়   বাঁধ্‌লে তুমি স্পর্শে গানে রূপে
তবু   কোলে থেকেও কখন চুপে চুপে
করেন   কার অভিসরণ।
ওগো   কথা ধরো, ধরো,
নিজের   মনটি দিও পুরো—
ঘরের   আর সবারে ;
সকল   আমা দিয়েই ভরো!

ওগো   এই যে আমার ঠিক-না-জানা আমি
এই   মায়া হরিণ রয় না কোথাও থামি'।
নাহয়   ধরলে এরে জাগরণের বেলা
তবু   স্বপ্নে কে এর থামায় লীলা খেলা ?
কোথায়   কাটায় সারাযামী।
ওগো   কথা শোন, শোন ;
দিও   সকল শূন্য করে :—
কিছু   ফিরে পাবার তরে
মনে   আশ রেখো না কোনো।

(১৯২৭)

বিপরীত

ধরা পেয়ে সুখ নাই গো ধরা দিয়েই সুখ ;
একি গো কৌতুক!
আমার তরে একটি কেহ
সাজাবে তার হৃদয় গেহ ;

ধরবে তুলে সকল দেহ
আরতি উৎসুক ;
ধরা দিয়েই সুখ ।

কাছে পেয়ে সুখ নাই গো পালিয়ে ফিরে সুখ ;
এ কি গো কৌতুক ।
আমার পিছে একটি অমা
ছুটতে রবে অন্‌-আনমনা
ক্লান্তি মেনে হেলতে এলে
সরিয়ে নেবো বুক,
পালিয়ে দূরে সুখ ।

তোমায় ভেবে সুখ নেই গো ভাবিয়ে তোরে সুখ ;
একি গো কৌতুক ।
রাত্রি জুড়ে দেখবে স্বপন
দিনের কাজে বস্‌বে না মন,
হৃদয় ভরে সারাটি'খন
ঘেরাবে মোর মুখ,
কাঁদিয়ে তোরে সুখ ।

আমার করে সুখ নেই গো তোমার হয়ে সুখ ;
একি গো কৌতুক ।
লোলুপ প্রতি অঙ্গ দিয়ে
এই মাধুরী শুষবে, প্রিয়ে
শুষে তবু শেষ হবে না
মোর মদিরাটুক
তোমায় দিয়ে সুখ ।

(১৯২৭)

একনিষ্ঠ

কোলে তোমার—
আর হবো না কারো ;
ভুল ভাবনা ছাড়ো ।

ফুলে ফুলে চুমুক দিয়ে দিয়ে
ফাগুনটুকু দেবো না বইয়ে ;
একটি ফুলে তিয়াস মিটাইয়ে
মৌ তো থাকে আরো।
সেই ফুলেরই সবটু' মধু পিয়ে
দূরে যাবো না
ভুল ভাবনা ছাড়ো।

একলা তোমার—
একাধিকের নই
ভয় রেখো না সই।
নানান্ জনার সখ মেটাবার
আপনটুকু দেবো না শেষ করে,
একটিজনের সবটা দিতে ভরে
সাধ্য তবু কই ?
সেই জনেরে তৃপ্ত করার পরে
আর কাহারো নই ;
ভয় রেখো না সই।

পুরো তোমার—
অনেক কারো নয় ;
কোরো না সংশয়।
ওরা কারেও সবটা দিতে নারে
কতক মোরে অনেক অন্য কারে
পাঁচের মাঝে গণ্য হবো না রে
রইবে হৃদয়ময়
পাঁচজনো হিয়ার একটি একটি
পাঁচের শামিল নয় ;
রেখো না সংশয়।

শুধু তোমার—
নইক অন্য কার
থামাও মনোভার।

যদি বা কেউ কেবল মোরেই চায়
ষোলো আনাই রাখি আমার পায়
সঙ্গে তাহার কাঁদব তবু হায়
দান ল'ব না তায়।
কিছুই তুমি নাই দিলে আমায়
তবু আমি তোমায়
ঘুচাও মনোভার।

(১৯২৭)

মাথুর

তুমি কি পারিলে রাখিতে ধরি'
হে সহচরী
দুটি বাহু দিয়ে তীরে আঁকড়ি'
এ মোর তরী।
হায় রে অবোধ তটদেশিনী
সুনীল তমাল তালীকেশিনী
তুমি কি পারিলে রাখিতে ধরি'
এ মোর তরী
বেণী পাশে এরে বৃথা পাকড়ি'
হে সহচরী।

আঁখির মিনতি বাঁধিল না রে
ঘরছাড়ারে।
এ কাঠ হৃদয় কাঁদিল না রে
ছাড়িতে কারে।
কূল ছেড়ে আজ চলে যে ভেসে
নাহি জানে কোথা থামিবে এসে
সাঁতারি' পাথার কোন সে পারে
লভিতে কারে
আঁখিজলে ভাসা সাজে কি তারে
ঘর ছাড়ারে।

আজ ভেসে চলি কালের স্রোতে
মহাজগতে।

ঘাটে ঘাটে বাঁধা ঘটনা হতে
অকূল পথে।
আজ আমি চলি দুলে দুলে রে
মহা আকাশের কূলে কূলে রে
প্রতি দিবসের শাসন হতে
অকাল পথে
দেশ ছেড়ে চলি বিরাট রথে
মহাজগতে।

যত দূর মম নয়ন যায়
সীমা কোথায়!
এরি কোলে ভানু জাগে ঘুমায়
তারা হারায়।
ঢেউ ফুটে ওঠে ঢেউ ঝ'রে গো
ফেনায় ফেনায় থরে থরে গো
বসন্ত নিতি তুলি বুলায়
দিক্ সীঁথায়
সমীরণ নিতি বাঁশি বাজায়
"রাধা কোথায়!"

পুন কোন বনে পড়িব বাঁধা
নূতনা রাধা!
পুন কোন বলে বাঁশরি সাধা
আবার কাঁদা।
পথের কোথাও শেষ কি আছে
পথিকের কোনো দেশ কি আছে।
ঘরের বাঁধনে নাই কি বাঁধা
নাই কি কাঁদা।
সমাপিবে চির বাঁশরি সাধা
সুচিরা রাধা!

(জাহাজ ১৯২৭)

মিলনের গান

তোমাদের তরে মিলনের গান গাই
ওগো জগতের তরুণতরুণী যত।
তোমাদের সুখে সুখ মিলাবারে চাই
ওগো জগতের তরুণতরুণী যত।
প্রিয়বাহুলীনা অয়ি তনু তনুলতা
কানে কানে মৃদু সোহাগকূজনরতা
তোমারে নেহারি' কী যে আনন্দ পাই
ওগো নববধূ কেমনে বোঝাব কত।
তোমাদের সুখে সুখ মিলাবারে চাই
ওগো জগতের তরুণতরুণী যত।

চির মন্দার ফোটে তোমাদের বুকে
ওগো জগতের তরুণতরুণী যত।
শরৎ শেফালী ঝরে হাসিঝরা মুখে
ওগো জগতের তরুণতরুণী যত।
আঁখিতে আঁখিতে চপলা পড়েছে ধরা
চরণধূলায় মরণে মিলায় জরা
রজনীতে রাস নবনব কৌতুকে
দিবসে বিবশ নিলাজ নর্ম শত।
মলয়গন্ধি সুরা তোমাদের মুখে
ওগো জগতের তরুণতরুণী যত।

তোমাদের কেহ লক্ষ্মী লভিলে রণে
ওগো জগতের তরুণতরুণী যত।
তোমাদের কেহ তরণী তরিলে বনে
ওগো জগতের তরুণতরুণী যত।
তোমাদের কেহ বাণীরে মানায়ে বশ
শ্বেত চন্দনে ললাটে আঁকিলে যশ
তোমাদের কেহ ঘরে ডাকি' জনে জনে
আপনা বিলায়ে দিলে দধীচির মতো

কোনো তথাগত একাকী চলিলে বনে
ওগো জগতের তরুণতরুণী যত।

তোমরা ধন্য তোমরা সফল, ভাই
ওগো জগতের তরুণতরুণী যত।
সবার গর্বে সকলের জয় গাই
ওগো জগতের তরুণতরুণী যত।
জীবনের ছকে নিয়তি চালায় পাশা
পণে হারিলাম রাজকন্যার আশা
হে বন্ধু মোর কেহ নাই কিছু নাই
হে বন্ধু আমি পরাভব লাজে নত।
তোমাদের সুখে সুখী হয়ে উঠি তাই
ওগো জগতের তরুণতরুণী যত।

(জাহাজ ১৯২৭)

পথের সাথী

পথের সাথী, পথেই মোদের দেখা
পথের বাঁকে মোদের ছাড়াছাড়ি।
বিদায় দেহ, চলি এবার একা
অকূল পথে একেলা দিই পাড়ি।
পথের সাথী, ক্ষমো আমায়, ক্ষমো
চোখের কোণে জল জমেনি মম
অলস বাহু অধীর রাহু সম
ব্যাকুল নহে রাখতে তোমায় কাড়ি'।
পথের সাথী, আমি কী নির্মম
পথের বাঁকে হেলায় চলি ছাড়ি'।

পথের সাথী, চুকিয়ে দেছি কাঁদা
ফুরিয়ে আমার গেছে সকল চাওয়া
হৃদয় আমার পড়বে কিসে বাঁধা ?
হৃদয় যে মোর হাল্‌কা উদাস হাওয়া।

পথের সাথী এই হাওয়া সে কবে
পড়ল লুটে বাঁশির ভীরু রবে
কুঞ্জবনে যৌবন উৎসবে
        ডাকল যারে থাকল তারে পাওয়া।
পরম চাওয়া চাইতে গেলেম যবে
        চক্ষে আমার মিলিয়ে গেল চাওয়া।

পথের সাথী, কুসুম না ফুটিতে
        আমার শাখে মুকুল গেল ঝরে
আর ভাবিনে কখন অলক্ষিতে
        আবার মুকুল ধরে কি না ধরে।
পথের সাথী, চলতে কি মোর সাধ
পদে পদে নাই কি অবসাদ?
বাহির জুড়ে পাতা ঘরের ফাঁদ
        তবু আমার পা পড়ে না ঘরে।
পায় লেগেছে ব্যর্থ চলার স্বাদ
        সেই সুখে মোর বুক রয়েছে ভরে।

পথের সাথী, বিদায় দেহ তবে
        ক্ষমো তোমায় ভুলতে যদি পারি
তোমার স্মৃতি স্বপ্ন যখন হবে
        স্বপ্নে হয়তো ঝরবে আঁখিবারি।
পথের সাথী, ভুলব তোমায় বলে
হৃদয় মম কেমন যেন দোলে
হায় রে যে জন যাবেই যাবে চলে
        বুকের বোঝা কেনই করে ভারী?
পথের সাথী, মর্মে তবু জ্বলে
        তোমার শিখা—তোমারো শিখা—নারি।

(জাহাজ ১৯২৭)

বিমুগ্ধ

এ ধরণী কত সুন্দরী। কত সুন্দরী!
        মানুষ সেও কী সুন্দর! সে কি সুন্দর।

রূপসুধা পিই প্রাণ ভরি' দু'নয়ান ভরি'
আনন্দরসে উথলায় মম অন্তর।
দেশে দেশে সেই শ্যামল কোমল ঘাসগুলি
লতাদের কোলে ফুলেদের কচি হাসগুলি
পাখী উড়ে যায় তরুদের বাহুপাশ খুলি'
ছায়ায় শিহরে তটিনীর তটপ্রান্তর।
সেই যে ধরণী সুন্দরী সেই সুন্দরী
পর দেশে এত সুন্দর! এত সুন্দর!

মানুষ সেও কী সুন্দর! সে কী সুন্দর!
ভালোবাসা তার ভালো, আহা, কত ভালো!
মমতার রঙে রাঙা যে তাহার অন্তর
বাহির তাহার যত হোক শাদা কালো।
দেশে দেশে নারী তেমনি দোলায় চিত্ত
শিশুর খেলায় অকারণে পায় নৃত্য
জীবন ছাপায়ে মাধুরী ঝরিছে নিত্য
প্রেমের দেয়ালি মর্ত্য করেছে আলো।
মানুষ সে যে কী সুন্দর! সে কী সুন্দর!
ভালোবাসা তার ভালো, আহা, কত ভালো!

এ জীবন কী যে নন্দিত! কী যে নন্দিত।
বেঁচে আছি বলে ধন্য রে আমি ধন্য!
মানুষ আমারে ভালোবেসে দেয় কী অমৃত
ধরণী আমারে ভালোবেসে দেয় অন্ন।
দেশে দেশে মোর তেমনি মধুর বন্ধন
আরেকের তরে একেরে ছাড়িতে ক্রন্দন
যেথা যাই সেথা পাই প্রীতি অভিনন্দন
মরণেও কিছু এ ছাড়া হবে'না অন্য।
এ জীবন কত নন্দিত! কত নন্দিত!
জন্মেছি বলে ধন্য রে আমি ধন্য।

(ইংলণ্ড ১৯২৭)

অনাগতার তরে

এই ভরা যৌবনের ডালি তোমার পায়ে রাখার আগে
হঠাৎ যদি মরণ এসে একটি মুঠি ভিক্ষা মাগে
একটি মুঠি আয়ু আমার পাত্রে তাহার দিব ঢালি'
তোমার তরে রইবে তোলা এই ভরা যৌবনের ডালি।

এই ভরা যৌবনের ডালি মরণে এর ক্ষয় কতটুক?
এক জনমের তেইশটি ফুল নাই থাকে তো নাইবা থাকুক।
দিনে দিনে যা পেয়েছি একটি দিনে হবে খালি?
কোন জন্মান্তরের ফুলে ভরা এ যৌবনের ডালি।

দিনে দিনে যা পেয়েছি, যা ছিল মোর পাবার আশা
যা পেয়ে মোর মিটল না সাধ—শতেক বারের ভালোবাসা—
হঠাৎ যদি আজকে মরি দেখবে সবি রেখে গেছি
কালের কোলে গেছি রেখে যা পেয়েছি যা মেগেছি।

দিনে দিনে যা পেয়েছি—হোক না নিমেষেকের পাওয়া—
যা ছিল মোর পাবার আশা—হোক না যুগান্তরের চাওয়া—
মরার সাথে মরার তো নয় যা সয়েছি যা হয়েছি
আয়ুর সাথে যাবার তো নয় যা চেয়েছি যা লয়েছি।

এই ভরা যৌবনের ডালি তোমার পায়ে রাখার আগে
হঠাৎ যদি মরণ এসে একটি মুঠি ভিক্ষা মাগে
একটি মুঠি আয়ু আমার পাত্রে তাহার দিক ঢালি'
তোমার তরে রইবে তোলা এই ভরা যৌবনের ডালি।

(ইংলণ্ড ১৯২৮)

অন্বেষণ

বার বার আমি পথ ভুলে ভুলে
পথ খুঁজে মরি কত।
শুক্তচারীর মতো।

অমা আঁধারের গোলকধাঁধায়
তারা খুঁজে মোর রজনী পোহায়
প্রতি তারা যে গো নয়ন ভুলায়
ধ্রুবতারা পাব কবে ?
অন্য তারায় কী আমার বলো হবে।

ঋতু-যুবতীর খোঁপাভরা ফুলে
ফুল খুঁজে মরি কত।
মুগ্ধ অলির মতো।
কোন ফুল ছেড়ে কোন ফুলে বসি
ভেবে ভেবে গেল সারাটি দিবসই
প্রতি ফুল যে গো অতুলা রূপসী
নিজ ফুল পাব কবে ?
অন্য ফুলেতে কী আমার বলো হবে।

রূপসায়রের উপকূলে কূলে
নুড়ি কুড়াইব কত।
বিমনা ক্ষ্যাপার মতো।
কত না পরশ পদে পদে পাই
নয় নয় বলে ঠেলে চলে যাই
পরম পরশ কবে পাব ভাই
সাঁচা মণি পাব কবে ?
অন্য মাণিকে কী আমার বলো হবে।

ফুল ধরার কাঁটা তুলে তুলে
আঙুল রাঙাব কত।
আত্মঘাতীর মতো।
আমার ধরণী শ্যামা অপ্‌সরা
নাচে শিরে ধরি' শোভার পসরা
কোথা রে মৃত্যু কোথা তার জরা
এ দেখা দেখিব কবে ?
অন্য দেখায় কী আমার বলো হবে।

বার বার আমি পথ ভুলে ভুলে
পথ খুঁজে মরি কত।
স্বপ্নচারীর মতো।
সুন্দর এই স্বপনের মাঝে
সত্যের বাঁশি কত সুরে বাজে
কোন্ সুর ধরে যাব বুঝি না যে
নিজ সুর পাব কবে?
অন্য সুরেতে কী আমার বলো হবে।

(ইংলণ্ড ১৯২৮)

পাশাপাশি

হে লোভনে মোর লোভ নাই
নাহি যদি পাই ক্ষোভ নাই।
তুমি সুন্দরী তুমি সুধা
নয়নে আমার রূপক্ষুধা
চোখে চাই আমি বুকে চাই
সুখে চাই আর দুখে চাই।
তবু রাখি নাকো মিছে আশা
বচনে চাকি না মনোভাষা।
কারো তরে কোনো লোভ নাই
হারাই যদি তো ক্ষোভ নাই।

তুমি পথে আর আমি পথে
চকিতের মতো থামি' পথে
চোখে ভরে লই যাহা পারি।
কি যে রহস্য তুমি নারী।
কণা পরিমাণ কোনো মতে
খুঁটে খুঁটে লই দূর হতে।
সাথে সাথে চলা হাতে ধরা
নাহি যদি হয় নাই ত্বরা।

বাঁকে বাঁকে ভরা বাঁকা পথে
কেন কারে ধরে রাখা পথে ?

হে শোভনে আমি সাধিব না
নাই যদি পাই কাঁদিব না।
তুমি চঞ্চলা তুমি পাখী
সাধ যায় বুকে বেঁধে রাখী।
বাঁধিবার তরে কী বেদনা।
সকল অর্ঘ্য নিবেদনা।
তবু রাখিব না মিছে আশা
পাখীরে বাঁধিতে নারে বাসা।
বাঁধিবার তরে সাধিব না
বাঁধা নাহি পড়ো কাঁদিব না।

উড়িতে উড়িতে পাশাপাশি
নিমেষের ভালোবাসাবাসি।
বুকে ভরে লই যাহা পারি।
কী অমৃতময়ী তুমি নারী।

ক্ষণিক চাহনি তিল হাসি
বুকে বাজাইল সুখ বাঁশি।
এর বেশী পাওয়া অতি পাওয়া
নাহি যদি পাই নাই ধাওয়া।
আকাশে আকাশে পাশাপাশি
এই বেশ ভালোবাসাবাসি।

(ইংলণ্ড ১৯২৮)

বিলম্বিতা

কত সাধনায় এলে যদি হায় কেন এলে কেন এলে ?
আমার সে মন গেছে যখন আমায় এ মন ফেলে।

আমি কিগো আর সেইখানে আছি
যৌবন বানে ভেসে চলিয়াছি
যে ঘাটে তোমায় ডেকেছিনু হায় সে ঘাট রহিল পিছে
আজি এত দূরে আসি' বন্ধু রে কত আশা হল মিছে।

কেন জানিলে না রজনীর চেনা রজনী পোহালে বাসি
ক্ষণিক জীবন প্রেম কতখন বিফলে বাজাবে বাঁশি।
উতলা চরণ থির নাহি রহে
অভিসারিকার সুচির বিরহে
আপনি কখন ফিরে চলে মন কুঞ্জ বীথিকা হতে
নিরাশার ব্যথা স্বপনের কথা ভলায় দিনের স্রোতে।

সারাদিন ভর কোথা অবসর অতীতের কথা ভাবি ?
নূতন রাতের সাথে আসে ফের নূতন রাতের দাবী।
ভাঙ্গা বাঁশি তুলি' লয়ে আর বার
করি প্রাণপণ, হয়তো আবার
তেমনি নিরাশা আঁখিনিদনাশা চূর করে দেয় হাসি
ক্ষণিক জীবন প্রেম কতখন বিফলে বাজাবে বাঁশি।
আঘাত আবরি' যে জন সরিল
আঘাত পাসরি' যে জন মরিল
ডাকো ডাকো ডাকো সাড়া পাবে নাকো আমি তো সে জন নই
আমার মাঝে কে কবে গেল থেকে ঠিকানা তাহার কই ?

আজি অকারণে জাগাও স্মরণে কবেকার কত স্মৃতি
স্মৃতি এলে ফিরে ফেরে কি সখি রে হারানো দিনের প্রীতি ?
নয়ন ভুলানো সে যে বিস্ময়
একই রূপ হেরা ত্রিভুবনময়
মৃগনাভিবুকে মৃগসম সুখে সে যে প্রেম বয়ে ফেরা
এত দিন বাদ হলো তব সাধ তারি অভিনয় হেরা।

কত দাও খোঁচা—"ওগো, গেছে বোঝা তোমার প্রেমের রীতি
যত না চপল ততোধিক খল তোমার মুখের প্রীতি।

আজীবন নাহি রয় যে অপেখি'
আপনা পাসরা সাঁচা প্রেম সে কি ?
সে কি সুগভীর ? সে কি অনধীর ? সে কি প্রেম ? সে কি সোনা ?
ওগো গেছে বোঝা তোমার সে খোঁজা নিছক শিকারীপনা।"

বেশ তাই হোক মুছে ফেল শোক, আমারি যতেক ত্রুটি
অক্ষমে ক্ষমা করো নিরুপমা পলাতকে দাও ছুটি ।
চিরটি জীবন একঠাঁই থেমে
করো তবে পূজা নিষ্ফল প্রেমে
আপনা পরখি' মিটাইয়ো সখি পর বিচারের সাধ
আজি শুধু ক্ষমা করো নিরুপমা বিমুখের অপরাধ ।

(ইংলণ্ড ১৯২৮)

মনের মানুষ

মনের মানুষ মনেই থাকে
মিথ্যে তারে বাইরে খুঁজি'
শেষ করে দি' আয়ুর পুঁজি ।
চোখের পাতায় যত্নে ঢাকি'
রাত্রে যারে গোপন রাখি
মধ্যদিনে পাতায় ফাঁকে
মিথ্যে তারে বাইরে খুঁজি'
শেষ করে দি' আয়ুর পুঁজি ।
মনের মানুষ মনেই থাকে
স্বপ্ন দেখি চক্ষু বুজি' ।
আমার আপন সৃষ্টি সে জন
মনের মানুষ আমার একা
বাইরে কি তার মেলে দেখা ।
আমার মনের ভক্তরসে
তনু যে তার গড়ছি বসে
মায়ের কোলে শিশুর মতন

মনের মানুষ আমার একা
বাইরে কি তার মেলে দেখা।
আমার আপন সৃষ্টি সে জন
অঙ্গে যে তার আমি লেখা।
আমায় আমি বাইরে খুঁজি'
বাহিরকে হায় দেখনু না রে
দূরে দূরেই রাখনু তারে।
বিচিত্র তার চোখের চাওয়া
কেশের গন্ধ শাড়ীর হাওয়া
বিচিত্র তার পরশ বুঝি
বাহিরকে হায় দেখনু না রে
দূরে দূরেই রাখনু তারে।
আমায় আমি বাইরে খুঁজি'
নাই চিনিলাম বিচিত্রারে।
বাহিরকে তাই লবো যেচে
নাই হলো বা মনের মতো
হায় রে মনোহর সে কত।
এবার আমি রইনু আশে
আপন মানুষ কখন আসে
মন যে এত মরছে যেচে
মন কি আমার মনের মতো।
হায় রে মনোহর সে কত।
বাহিরকে তাই লবো যেচে
রইব না রে আত্মরত।

(১৯২৮)

প্রাতে ও রাতে

নিত্য প্রাতে নয়নপাতে লাগে নতুন আলো
নিত্য আমি নতুন বাসি ভালো
ওগো আমার আজকে প্রাতের নতুন দেখা ফুল
এই জনমের শতেক ভুলের শতেকতম ভুল

তোমায় ভালোবাসি আমি সত্য ভালোবাসা
একটি দিনের একটু কাঁদা-হাসা।

ওগো আমার নতুন দিনের নতুন মনোরমা
কেমনে বলি তুমিই প্রিয়তমা।
এই কাননের লক্ষকোটির সকল ক'টি ফুল
আমার দুটি মুগ্ধ চোখে প্রত্যেকে অতুল
সবার ভালোবাসি আমি সত্য ভালোবাসা
ভাগ করে নিই সবার কাঁদা-হাসা।

প্রিয়ে, তোমায় বৃন্ত হতে ছিন্ন করে পাওয়া
এমনতরো নয়তো আমার চাওয়া।
আমার চাওয়া নয়ন মেলে সূর্য যেমন চায়
রাঙিয়ে দিয়ে পাকিয়ে দিয়ে রিক্ত ফিরে যায়
তেমনি ভালোবাসি আমি সত্য ভালোবাসা
কাহারো তরে নাই নিরাশা আশা।

নিত্য রাতে নয়নপাতে মিলিয়ে আসে আলো
চিরন্তনে তখন বাসি ভালো।
যে আসে মোর তন্দ্রা ছেয়ে স্বপ্নদেশিনী
সেই কি দিনে এসেছিল ছদ্মবেশিনী
তারই পায়ে সঁপি আমার সত্য ভালোবাসা
নিত্য নব নব দুরাশা আশা।

(১৯২৮)

চকোর ও চাঁদ

আকাশের চাঁদ আকাশে থাকে
সে তো নাহি জানে কে তারে ডাকে।
কাহার কণ্ঠে কিসের তৃষা
কে কোথা জাগিছে বিরহনিশা
সে তো নাহি তার ঠিকানা রাখে
আকাশের চাঁদ আকাশে থাকে।

ধরার চকোর থাকি' ধরায়
কারে চায় আর আঁখি ঝরায়।
একদূর সে কি উড়িতে পারে
আপনি আসিবে কে তার দ্বারে।
যে আসে সে নয় যারে সে চায়
ধরার চকোর থাকে ধরায়।

আকাশের চাঁদ সে কি কাঁদে না।
কারো কাছে সেই তারো কি দেনা।
একদূর হতে যায় না দেখা
তারো আঁখিপাতে কালিমা লেখা।
একা ঘুরে মরে ঘর বাঁধে না
আকাশের চাঁদ সে কি কাঁদে না।

ধরার চকোর বোঝে না অত
আপনার কোণে আপনা হত।
কাঁদে আর সেই কাঁদার ফাঁকে
কেবল ডাকে সে কেবল ডাকে।
নাহি যায় শোনা দূর যে কত
ধরার চকোর বোঝে না অত।

(১৯২৮)

বিস্মরণ

কার চুম্বন কাহারে দিয়াছি
স্মরণ তো আর নাহি
আমি চুম্বনবাহী।
একের অধরপুটে ধরিয়াছি
অপরের মদিরাই।
আমি চুম্বনবাহী।
তুমি যদি, প্রিয়ে, সুখ পেয়ে থাকো
একটু অশ্রু ঢালো
তারে একটুকু বাসো ভালো।

যার সুখ নিলে তারে ভুলো নাকো
একটি দলিতা আলো ।
তারে এতটুকু বাসো ভালো ।

কাহার হৃদয় কাহারে দিয়েছি
সে আমার মনে নাই ;
আমি অন্তরবাহী ।
তার ভালোবাসা তোমারে বেসেছি
প্রাণ আকুলিছে তাই ।
তুমি যদি, প্রিয়ে, মন দিয়ে থাকো
একটু বিমনা হও
তার ব্যথা বুকে বও ।
যার ধন নিলে তারে ভুলো নাকো
তার পরিচয় লও
তার ব্যথা বুকে বও ।

(১৯২৮)

এখন আর তখন

সুখের দিনের গান গাই আর দুখের কথা ভাবি
হাল্‌কা পাখায় নামবে যখন বিষয় বোঝার দাবী
যখন তলার টানে
টানবে ধূলার পানে
মেঘের ভারে খসবে আকাশ বেলাশেষের তানে
তখন পাখী করবে কী ?
কণ্ঠে লয়ে গানের সুধা দুঃখকেও বরবে কি
সুখশেষের গানে ?

চপল সুরের গান গাই আর গভীর কথা ভাবি
মুক্ত পাখায় ফিরবে যখন বাঁধা নীড়ের দাবী
যখন বাহুর টানে
টানবে বুকের পানে

রঙে রঙে রাঙবে, আকাশ বেলাশেষের টানে
তখন পাখী করবে কী ?
কণ্ঠে লয়ে গানের সুধা বদ্ধ হৃদয় ভরবে কি
মুক্তি শেষের গানে ?

সহজ হাসির গান গাই আর কঠিন কথা ভাবি
চোখের পাতায় জমবে যখন চোখের জলের দাবী
যখন ভাঁটার টানে
লবে বিচ্ছেদ পানে'
ফুলে' ফুলে' কাঁদবে আকাশ বেলাশেষের তানে
তখন পাখী করবে কী ?
কণ্ঠে লয়ে গানের সুধা আশায় জীবন ধরবে কি
প্রেমশেষের গানে ?

তরুণ প্রাণের গান গাই আর জরার কথা ভাবি
অধীর পাখায় লাগবে যখন ক্লান্তিকালের দাবী
যখন শিথিল টানে
টানবে আরাম পানে
তন্দ্রালসে ঢুলবে আকাশ বেলাশেষের তানে
তখন পাখী করবে কী ?
কণ্ঠে লয়ে গানের সুধা যৌবন লোক গড়বে কি
স্বপ্ন শেষের গানে ?

ক্ষণিক আলোর গান গাই আর ঝরার কথা ভাবি
তৃপ্ত পাখায় বাজবে যখন স্নিগ্ধ সাঁঝের দাবী
যখন নিবিড় টানে
টানবে ঝরার পানে
আঁধার হয়ে আসবে আকাশ বেলাশেষের তানে
তখন পাখী করবে কী ?
কণ্ঠে লয়ে গানের সুধা মুগ্ধ মরণ মরবে কি
সর্বশেষের গানে ?

(ইংলণ্ড ১৯২৮)

বিদায়

চির সৌন্দর্যের মাঝে আঁখি মোর যারই পানে চায়
সেই হাঁকে, "বিদায় ! বিদায় !"
এই গিরি এই বন এই তরু এই তৃণদল
ধরণীর এ অপূর্ব স্থল
একটি পলকে মোর যেই হলো নয়ানের নিধি
অমনি কাঁপায়ে দিল হৃদি ।
গিরি বলে, বন বলে, তরু বলে, তৃণ বলে, "হায় !
আঁখি হতে বিদায় ! বিদায় !
এই যে প্রথম দেখা দোঁহাকার এই দেখা শেষ !"
এই মতো নিমেষ নিমেষ ।
আদিকাল হতে শুধু রূপে রূপে আঁখি অভিসারী
প্রাণ তবু রূপের ভিখারী ।
মিলনের চারি চোখে জলে যেন মিলনের চিতা
যত চাই তত চাই বৃথা ।
চির আনন্দের মাঝে চলিয়াছি রজনী দিবস
তবু মোর অন্তর বিবশ ।
ভালো যাহাদের বাসি একে একে তারা রয় সরে
একা চলি লোক লোকান্তরে ।
একটি পলকে যারে প্রাণ চেনে মন বলে, "এই"
বুকে লয়ে দেখি বুকে নেই ।
মাতা বলে ভ্রাতা বলে-সখা বলে সখী বলে, "হায় !
এখনি কি লইবে বিদায় !
এইটুকু চেনাশোনা এখনি কি হবে এর শেষ !"
এই মতো নিমেষ নিমেষ ।
জন্মক্ষণ হতে শুধু জনে জনে ক্ষণে ক্ষণে পাওয়া
ফেলে ফেলে ভুলে ভুলে যাওয়া ।
মিলনের বাহুপাশে কোথা যেন আছে কোনো ফাঁকি
যত পাই তত পাওয়া বাকী ।

(টিয়োল ১৯২৮)

চলা ও থামা

আমি যখন চলি যখন চলি
ডাইনে বামে বিশ্ব চলে সাথে
বাতাস সে দেয় পথের দিশা বলি'
আকাশ এসে হাতটি মিলায় হাতে।
হাতছানি দেয় চন্দ্র তপন তারা
এই অনাদি সঙ্গ কাঙাল তারা
তাদের চলা আমার চলা বিনে
শূন্যপথে কখন যেত থামি'।
বিশ্বজগৎ চালাই রাত্রে দিনে
সবার সাথে চলি যখন আমি।

যখন আমি থামি যখন থামি
পৃথ্বী আমার জড়িয়ে ধরে পায়
সেই সোহাগীর আলিঙ্গনে আমি
মরণমুখে রই যে বাঁধা হায়।
আসন করে সবুজ আঁচলখানি
আধ আঁচরে সঙ্গে বসায় রানী
তাহার বসা আমার বসা বিনে
সবুজকে যে করত কখন ধলা।
যৌবনেরে বাঁচাই মরণ দিনে
যখন আমি থামাই আমার চলা।

(ইংলণ্ড ১৯২৮)

স্রষ্টা

তোদের জগতে দিন আসে যায়
পুবের তপন পশ্চিমে তায়
গৃহকাজ সারি' কবরী এলায়
তারকিত কুন্তলা
জন কলরোল তালে তালে বাজে
জীবন মরণ পারাবার মাঝে

প্রেম মহিমায় অভিসার সাজে
যৌবন উজ্জলা।
খোঁজ নাহি রাখি আমি যে সবার
আমার জগতে আমি একা, আর
আপনার মনে একেলা আমার
খেলাঘর গেঁথে চলা!

জানি না কখন দিন আসে কি না
আলো সুরে কাঁপে আঁধারের বীণা
আমার লোচনে জাগরণ ক্ষীণা
মায়া অঞ্জন মাখা।
নিদ নাই শুধু স্বপনে স্বপনে
খেলাঘর রচা চলেছে গোপনে
কত যে কল্প কাটিল এমনে
আঁখি পল্লব ঢাকা।
শ্রবণে পশে না হাসি ক্রন্দন
যেন এ ত্রিলোক নিস্পন্দন
চেয়ে আছে মম মনোমন্থন
সুধা কবে হবে ছাঁকা।

প্রলাপের মতো কারা গরজায়
বাজীকরসম অসি চমকায়
নাটবেদী পরে আসে আর যায়
বহুরূপী অভিনেতা।
শিশু ভুলাইয়া লুটি করতালি
ওরা ভাবে ওরা রবে চিরকালই
শ্মশান মশাল দিকে দিকে জ্বালি'
ওরা ভাবে ওরা জেতা।
যুগে যুগে কর হানি' মোর দ্বারে
স্বপন আমার টুটাইতে নারে
চকিতে মিলায় বিস্মৃতি পারে
সত্য দ্বাপর ত্রেতা।

কবে হবে দিন পাব তার দেখা
যার লাগি আমি রাত জাগি একা
অন্তরাকাশে অরুণাভ রেখা
উজলি' উঠিবে কবে!
গাঁথা খেলাঘর ঝলকি' ঝলসি'
কবে সে জ্বলিবে অচলা উর্বশী
আমার মানসী আমার রূপসী
আমাতে উদয় হবে!
আমারে ছাপায়ে আমারে টুটায়ে
আমার অমিয়া পড়িবে লুটায়ে
ত্রিভুবন আসি' তিয়াসা মিটায়ে
প্রাণ মন ভরি লবে।

(ইংলণ্ড ১৯২৮–২৯)

সৃষ্টি

যখন আমি সৃষ্টি করি আপন রবি আপন তারা
আপন প্রাণের আগুন হতে বৃষ্টি করি উল্কা ধারা
যখন আমার বক্ষতটে
পুলক-ভূমিকম্প ঘটে
দীর্ঘশ্বাসের ঝড় ডেকে যায় আঁখির অথির সাগর সারা
তখন ওগো স্রষ্টা তোমার দুঃখ সুখের পাই কিনারা।

তখন তোমার সঙ্গ লভি, বিশ্ব হিয়ার হে একাকী
তোমার চরণপাতের সাথে চরণপাতে ছন্দ রাখি।
তোমার হাতে হাতটি ভরে
তখন চলি কালের পরে
শিশুর মতো খেলার সুখে থামতে থাকি চলতে থাকি।
সৃষ্টি আমার ছায়ার মতো পিছনে রয় ধুলায় ঢাকি।

(ইংলণ্ড ১৯২৮)

স্বীকৃতি

এ বিশ্ব যেমনি হোক এরে আমি করিনু স্বীকার
লইনু আপন হাতে এর রাজসিংহাসন ভার।
আর মোর খেদ লেশ নাই
যা লয়েছি বুঝে সব তাই।

এ যদি দুঃখের হয় সে আমার গোপনীয় দুখ
অজানা কাঁটার মতো বুকে থাক্ চির জাগরূক।
তারে তুলি' ভুলিবার নয়
তারি সাথে জাগুক হৃদয়।

মনো মতো নাহি হলে কার সনে করিব কলহ?
আমার আপন লিপি কেন হবে আমার অসহ?
বন্ধহারা ছন্দপাতান্বিতা।
আমারি এ অবাধ্য কবিতা।

উচ্ছ্বসিত বাক্য সম তারা সূর্য ধায় চারি ভিতে
সেই সব পলাতকে কেমনে বাঁধিব মহাগীতে
সেই মম নিগূঢ় ভাবনা
আমারে রাখুক একমনা।

কী কাম মৃত্তিকা মথি' উল্লাসি' উন্মাদি' অরণ্যানী
প্রসূনি' কুসুমি' ধায় যে বারতা কেমনে বাখানি?
দুর্বার কামনাখানি মোর
নীরবে ঝরাক আঁখি লোর।

এ বিশ্বের বিশ্বকর্মা তাঁরে মোর কোটি নমস্কার
তাঁর গড়া সিংহাসন স্ববীর্যে করিনু অধিকার
তাঁর বাক্য তাঁর মনস্কাম
নিজ বক্ষে আমি ধরিলাম।

(ইংলণ্ড ১৯২৮)

প্রণিপাত

আমার লেগেছে ভালো পরিপূর্ণ এ বিশ্ব সংসার
যেন কোন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার
সর্বধনাধার।
যাহা চাই তাহা আছে, যাহা নাহি চাই আছে তাও
অকুলান নাই তো কোথাও
নাই অযথাও।
যত দুঃখ যত সুখ চেয়েছি পেয়েছি অবিরত
ভাবনা যাতনা যত শত
সবি মনোমতো।
সুন্দরে কুৎসিতে মিশা ছবিখানি নিখুঁত রচনা
এর বাড়া আমি পারিব না
এ যে অতুলনা।
অর্থ বুঝি নাহি বুঝি সবিস্ময়ে করি নেত্রপাত
শ্রদ্ধা ভরে জোড় করি হাত
করি প্রণিপাত।

(ইংলণ্ড ১৯২৮)

একদিন

একদিন এ সুখের হবে সমাপন
নিশাশেষে নিবে যাবে নিশার স্বপন।
কেমনে বিদায় লব ? কী কহিব কানে ?
কতবার চুম্বনিব শিয়রে শিথানে ?
কতক্ষণ চেয়ে রবো পলক না ফেলি' ?
অথবা রুধিব জল নয়ন না মেলি' ?
কোন ফুল গুঁজে দিয়ে এ হাতে ও হাতে
চকিতে চলিয়া যাব লঘু পদপাতে ?
বিদায়ের দিন, প্রিয়ে, ক্ষমা কোরো মোরে
কিছু যদি নাও দিই করে ও অধরে !
জেনো, প্রিয়ে, যা দিইনি সেও যে তোমারি
অন্তরে রহিল যাহা, অন্তরতমারই।
মনে যদি নাও রাখি তবু জেনো মনে
আরো কাছে রাখিয়াছি বুকের স্পন্দনে।

(ইংলণ্ড ১৯২৯)

মাঝে মাঝে

মাঝে মাঝে যদি আখি আর কারো পানে
আন মনে চেয়ে রই তিয়াসী নয়ানে।
জেনো, প্রিয়ে, সে আমার নয় ভালোবাসা
প্রেমের তিয়াসা নয়, রূপের তিয়াসা।
এমন সুন্দরী ধরা শ্যাম জ্যোৎস্নাবতী
নারী সে সুন্দরতরা সুধা-স্রোতস্বতী।

আমারে লোভায় ওরা এমন শোভায়
প্রেমের পালঙ্ক হতে মন উড়ে যায়।
তবু, প্রিয়ে, সে আমার নয় চপলতা
প্রেমের অন্ততা নয়, তৃষ্ণার অন্ততা।
হৃদয় রয়েছে বাঁধা অচল নোঙরে
চাহনি ভাসিয়া ফিরে লহরে লহরে।
তারায় তারায় খুঁজি রহস্যের আলো
তুমি মোর ধ্রুবতারা, তোরে বাসি ভালো!

(ইংলণ্ড ১৯২৯)

দোলা

স্মরিতেও আজ, প্রিয়ে, স্বপ্ন মনে হয়
কাল যে আনন্দ দিয়া পীড়িলে হৃদয়।
বুক পেতে সাঁতরিনু বক্ষ পারাবার
দুলিনু তরঙ্গ দোলে লক্ষ শত বার।
মরি মরি সে কী দোল পতনে উথানে
কী অশান্ত কলরোল তার মধ্যখানে।
হিয়া দিয়ে অন্বেষিনু রমণীর হিয়া
কী হেরিনু ? কী লভিনু ? অনির্বচনীয়া।
সকল আনন্দ যেন সেইখান হতে
উৎসরি' সঞ্চরিতেছে নিখিল জগতে।
সেই সিন্ধুতল হতে বিশ্বের অমৃত
পুরুষ মথিয়া তোলে পুলক-বিস্মিত।
কামনার কামধেনু রমণীর হিয়া
তুমি মোরে পিয়াইলে তাহারি অমিয়া।

(ইংলণ্ড ১৯২৯)

স্মৃতি

কাল যাহা সত্য ছিল আজ তাহা স্মৃতি
তবু সে অসত্য নয় দোঁহার যে প্রীতি।
তুমি ধন্য তুমি মোরে ভালোবাসাইলে
যা চাইনি তাও দিলে যা চাই তা দিলে

আমি ধন্য আমি তোরে ভালোবাসিলাম
পাবার অধিক ধন ফিরায়ে দিলাম।
তেমনি মাহেন্দ্রক্ষণ আসিবে কি আর ?
কোটি যুগ যদি যায় সে কি আসিবার ?
আজ যাহা স্মৃতি, প্রিয়ে, কাল তা বিস্মৃতি
তবু সে অসত্য নয় দোঁহার যে প্রীতি।
সত্যেরে লেগেছে ভালো স্মৃতিকেও লাগে
বিস্মরণ সেও ভালো পূর্ণ অনুরাগে।
পূর্ণ কামনারে নাই হারাবার ভীতি
সেবিত অমৃত সে যে দোঁহার সে প্রীতি।

(ইংলণ্ড ১৯২৯)

ছবি

ওরে কবি তোর ছবির পসরা
ভরিয়া লইবি আয়
উৎসবময়ী সাজিয়াছে ধরা
বসন্ত নাটিকায়।
আজ পেয়ে যাবি যাহা চায় মন
এতো মিঠা লাগে ভানুর কিরণ
পাখীদের সনে বনে সমীরণ
এতো শিষ দিয়ে যায়।

একখানি মেঘ কোনোখানে নাই
মেঘেরা নিয়াছে ছুটী
তরী চলাচল থামিয়াছে, তাই
স্থির আছে সিন্ধুটি।
আমাদের এই শ্যাম দ্বীপটির
কূলে ছলছলে তারি নীল নীর
আমাদের গায়ে লাগে ঝির ঝির
তারি ফেন মুঠি মুঠি।

তরুর পাণ্ডু অধরে ফিরেছে
সবুজ সোনালি তামা।
চুম দিতে তার আনন ঘিরেছে
পাখীরা বিদেশীনামা।
এরা সেই পাখী যারা তোর দেশে
হেসে ফাঁসি যায় বকুলের কেশে
আকাশসিন্ধু সন্তরি' শেষে
সাজ ফিরায়েছে শ্যামা।

জুঁই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফুটিয়াছে ফুল
রূপসীর পদপাতে।
নব শিশু সম নাড়িছে আঙুল
সু-রঙীন আঙিনাতে।
এরা নয় তোর অশোক করবী
তবু চির চেনা এরা তোর সবি
জন্ম নিয়াছে মল্লী মাধবী
পরদেশী ভূমিকাতে।

ওরে কবি আয় নিবি একে একে
সকলের পরিচয়।
সাত ভাই চাঁপা তোরে ডেকে ডেকে
মৌন বুঝি বা হয়।
এ যে আমাদের সেই আদরিণী
হর্ষ্যবদনা সোনার মেদিনী
এর প্রতি তিল চিনি চিনি চিনি
প্রতিটি অজনয়।

এই আলোকের ফেনিল পিয়ালা
রাখিস্নে হাতে করে।
এখনি ছুটিবে সবটুকু আলা
টুটিবে পিয়ালা ওরে।

প্রাণভরে এরে করে নে রে পান
এ যে ত্রিলোকের তরলিত প্রাণ
আকাশমথিত এ অমৃত দান
পিয়াসী মেনেছে তোরে ।

ছবির পশরা করিয়া উজাড়
প্রিয় রমণীর পায়
মন হতে তোর নেমে গেছে ভার
ওরে কবি ছুটে আয় ।
তোর তরে হেথা মেলিয়াছে ছবি
আন জগতের আরো এক কবি
ভালোবেসে এরে শিরে তুলে লবি
এইটুকু সে যে চায় ।

(ইংলণ্ড ১৯২৯)

আনমনা

ওরা ডেকে বলে, "কে আছো রে সাড়া দাও"
ওরা দুর্বাসা, ওরা যে অভ্যাগত ।
আমি আনমনা তোমাতে আছিনু রত
নিজে আছি কি না নাহি জানিতাম তাও ।
প্রিয়ে, ওরা গেল ফিরে
অভিশাপ দিল কি রে ।

কনক তপন রজত মেঘ বলাকা
ওরা উড়ে গেল ওরা চির চঞ্চল ।
নিবিড় নীলাভ মুখর গগনতল
সেও সাজ ছেড়ে আঁধিয়ারে হলো ঢাকা ।
প্রিয়ে, ওরা হলো ক্ষুণ্ণ
কোথা চলে গেল তূর্ণ ।

জগতের শোভা ফিরায়ে দিলেম ভুলে
তোমার শোভাতে আছিনু মগন থাকি' ।

তুমি ছেয়েছিলে শ্রবণ পরশ আঁখি।
জগতের শোভা দাঁড়াল তোমার কূলে।
প্রিয়ে, রহিল না থামি'
ওরা দূর পথগামী।

তুমি আজ গেছ তুমিও গেছ কি দূর!
আর কি আসিবে কক্ষে আমার ফিরি'?
তৃষা হরিবে কি হৃদয়ে হৃদয় ঘিরি'?
অভিশাপভয়ে আমি গো অতি বিধুর।
প্রিয়ে, তুমি নাই কাছে
প্রাণে কোন সুখ আছে!

তপন ওঠেনি বারিধারা ঝরে না-ও
পশারী চলেছে ক্লান্ত কথাটি হাঁকি'।
তরু-পিঞ্জরে স্তব্ধ রয়েছে পাখী।
কে আজ ডাকিবে, "সাড়া দাও, সাড়া দাও।"
প্রিয়ে, আমি আছি জাগি'
একটি অতিথি লাগি।

(ইংলণ্ড ১৯২৯)

অভাজন

আমার বেদনা কোটি কোটি নয়
শত শত নয়
শুধু দুটি শুধু দুটি।
যত ফুল ফুটিয়াছে বনময়
ত্রিভুবনময়
আমি নিতে চাই লুটি'।
এক এক ক'রে দিতে চাই পুরে
প্রিয়ার চিকুরে
যেথা রবে তারা ফুটি'।

আমারে কাঁদায় চির বসন্ত
কুসুমবন্ত
রূপস্বগন্ধবান।
তার আছে এতো মোর নাই কিছু
মাথা হল নীচু
বুকে বাজে অপমান।
প্রতি প্রভাতে সে একটি নয়ানে
চাহি' মোর পানে
উদ্ধত হাসি হাসে।
বৈতালিকেরা ত্রস্তে অমনি
তার আগমনী
গাহিয়া ফিরে আকাশে।
তার কণ্ঠের পারিজাত হার
খুলে পড়ে, আর
ফুল ফুটে যায় ঘাসে।

ওগো মোর প্রিয়া আমি অভাজন
নাই সভাজন
কনক মুকুট নাই।
মালা নাই মোর—তবে কোন মুখে
তব সম্মুখে
প্রেম নিবেদিতে যাই।
দুটি বেদনায় দুটি আঁখি ঝরে
অধীর অধরে
ধরে না গো বেদনা-ই।

আমার মনের জাল ফেলে যদি
অতল অবধি
সব সম্পদ ছাঁকি
আমার মনের বেড়া দিয়ে যদি
অসীম অবধি

সব শোভা দিয়ে রাখি
তাই লয়ে যদি তোমার ও হাতে
আমার এ হাতে
দু'খানি পরাই রাখী
তবে হয় মোর খেদের অন্ত
চির বসন্ত
সখা বলে লয় ডাকি'।

(ইংলণ্ড ১৯২৯)

অকৃতী

আমার দিন যায় কাজে অকাজে
আমার নিশি যায় স্বপন মাঝে।
কেন যে আসা মোর কেন যে থাকা
আমারি মনে মনে রহিল ঢাকা।
আপন পরিচয় দিলাম না যে
জীবন বহে গেল ফাঁকিতে ফাঁকা।

বীর সে করে যায় পরাণ পণ
মরণে মরে না রে তারে স্মরণ।
কবি যে ছবি লেখে গানের ছাঁদে
শতেক যুগ তার ক্রৌঞ্চী কাঁদে।
আমার আজ যদি আসে মরণ
কিছু কি বাঁধা রবে কালের বাঁধে ?

এ শোভাবতী ধরা কাঁদায় মোরে
কিছুই রাখি নাই নয়নে ভরে।
নূতন লাগে সবি যতই হেরি
রূপের পারাবার রূপেরে ঘেরি।
জনমদিন মম চলে আজো রে
কিছুই চিনি নাই এ ভুবনেরি।

আকাশ ছুঁড়ে মারে আলোর সোনা
জমানো সোনা মোর যায় না গোনা।
পাখীরা গান হানে কানের কাছে
মরমে পশি গান চরণে নাচে।
পাগল করে দিল সুখ-বেদনা
প্রাণে কি আর মম চেতনা আছে।

জীবন যাবে তবু যাবে না বলা
কী মধুরতা দিল অপথে-চলা।
নয়ন মুদে চলি দিকে বিদিকে
পরশি' যায় কারা নাম না লিখে।
অপথে চলা মোর নয় বিফলা
সকলে ভালোবাসে ভোলা পথিকে।

"ধন্য করে দিলে জীবন মম"
কহিতে কথা রই মূকের সম।
সে বাণী বুক ছাড়ি' মুখের পানে
যখনি পাড়ি দেয় হারায় মানে।
হে মোর পড়শীরা ক্ষমো গো ক্ষমো
প্রীতির প্রতিদান নাহিক গানে।

যায় রে দিন যায়, যায় রে নিশা
আমার থেকে যায় দানের তৃষা।
সকল দিতে চাই একটি স্তবে
"ধন্য এসেছিনু ধনীর ভবে।"
ধনের একে একে পেয়েছি দিশা
দু'হাত খালি করে বিলাবো কবে?

(ইংলণ্ড ১৯২৯)

পূর্ণিমা

আমার প্রিয়া আছে আমার ঘরে
আমার মন আছে ভালো।

আকাশ হতে খালি কুসুম ঝরে
মাটির ফুলদানী ফাটিয়া পড়ে
বন্যায় ধরে না যে আলো।

আমার পূর্ণিমা আমার পাশে
হৃদয়ে কোনো খেদ নাই।
আমার জামাখান বুনিছে তা সে
কদাচ মুখ তুলে মুচুকি হাসে
আকাশে পূর্ণিমা তাই।

(ইংলণ্ড ১৯২৯)

মৌন

কথায় কথা আমি কহিব না গো আর
অচল চাহনিতে কহিব।
আঙুলগুলি লয়ে খেলিব বার বার
হৃদয়ে করখানি বহিব।
সহসা মুখে তুলে সোয়াদ লবো তার
ক্ষণেক চোখ মুদি' রহিব।

আমার ভালোবাসা নিলে কি নিলে-না তা
নাই বা শুধালেম জীবনে।
নিয়েছ স্নেহভরে কোলের পরে মাথা
একটি অমরণ লগনে।
হয়েছ একাধারে বধূ কুমারী মাতা
আমার ভীরু দিবাস্বপনে।

কত যে অভিমান মরিল মন মাঝে
কত যে আশা আর নিরাশা।
তোমারে মুখ ফুটে জানাতে মরি লাজে
জানালে মিটাইতে পিয়াসা।
আমার তনুময় বাণীর বীণা বাজে
পরশে বোঝো নি কি সে ভাষা?

যতই সাধ যায় শুনাই অনিবার
কত যে ভালোবাসা বহেছি
কহিতে গিয়া এক কহিয়া আসি আর
কহিছে যত, ভুল করেছি।
আপনি মথি' লবে হৃদয় পারাবার
মৌন তাই আজ রয়েছি।

(ইংলণ্ড ১৯২৯)

অসপত্ন

জীবনে আমার কত আসে যায়
তুমি থাক অসপত্ন।
তুমি জলতল-রত্ন।
হৃদয় গভীরে ততই লভি রে
যত করি অপযত্ন।
তুমি হৃদয়তল-রত্ন।

ভুলে থাকি বলে ফেলে থাকি না গো
তুমি থাক মোর মর্মে
নর্মে অথবা কর্মে।
আপনে সখি রে রাখিয়াছ ঘিরে
তোমার প্রেমের বর্মে
নর্মে অথবা কর্মে।

সমাপন

আমাদের প্রেমে ফুরালো কথার পালা
মন-জানাজানি কিছু না রহিল বাকি।
বাসনার দীপে নিখিল নিবিড় জ্বালা
বাসর শয়নে নীরবে নমিল আঁখি।
এবার কেবল আঁখিতে আঁখিতে লাগা
দুটিতে মিলিয়া একটি স্বপনে জাগা।

এবার প্রেমেরে সহজ করিয়া আনা
অনল হইতে আলোক ছানিয়া তোলা।
এবার প্রেমেরে মনের আড়ালে মানা
চির চেতনায় চির বেদনারে ভোলা।
আসে ক্লান্তির মৌন গভীর শান্তি
এতখনে হলো উদ্দামতার ক্ষান্তি।

চুম্বনতাপ হিম হয়ে আসে ধীরে
চুম্বন ছাপ জাগিবে যামিনী ভোর।
ক'টি নিমেষের চকিত সুখস্মৃতিরে
জননীর মতো আবরিবে ঘুমঘোর
আমাদের প্রেমে এলো মরণের বেলা
তারপরে, প্রিয়ে, বিস্মরণের খেলা।

মিলিত প্রেমের স্বপ্নে পোহাক রাতি
মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে রও গো মনের কাছে।
অচির মরণে চির মিলনের সাথী
এখনো তোমারে চিত্ত আমার যাচে।
প্রভাতে হেরিব তোমারি অচেনা মুখ
আমার পাশের উপাধানে জাগরূক।

আজিকার মতো ফুরালো হিয়ার দ্বন্দ্ব
জানি ভালোবাসো, জানালেম ভালোবাসি
মৃদু হয়ে এলো অধীর আবেগ অন্ধ
মুদিত নেত্রে ভাতিল তৃপ্ত হাসি।
আমাদের প্রেমে আসিল মধুর ক্ষণ
আজি তাই তার মধুরেই সমাপন।

(ইংলণ্ড ১৯২৯)

কালের শাসন

১

মানবের দেশে শুধু চিনিতে শুনিতে
যায় বেলা—পরিচয় দিতে ও লইতে।
এ যেন কুটুম্বালয় ; এর ঘরে ঘরে
যাই, দেখি, দেখা দিই ; কভু যুক্ত করে
কভু স্নিগ্ধ চোখে। কাছে বসি' কিছুকাল
শুধাই কুশল প্রশ্ন। সম্বন্ধের জাল
ধীরে বোনা হয়। তখন উঠিয়া বলি
"তবে আসি"। আসক্তিরে টেনে টেনে চলি
ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে। এই মতো যায় বেলা
মানবের দেশে শুধু "চেনাশুনা" খেলা।
কোনো কাজে লাগি নাই। দিই নাই কিছু
আমি চলি' গেলে যাহা রবে মোর পিছু।
সাথে এনেছিনু কত, বেলা নাই দিতে
রহিল আমার দান আমার ঝুলিতে॥

(জার্মানী ১৯২৯)

২*

ঋষি, তব স্থিরদৃষ্টি উদ্বেগকাতর।
সত্যের গোধনগুলি আসে নাই ঘর ;
রজনী গভীরা হলো। কচিৎ নিরাশ
হেরিতে লেগেছ যেন উষার আভাস।
অসমাপ্ত অন্বেষণ নিতে হবে তুলে
কাল প্রত্যুষেই। আসন্ন সুপ্তিরে ভুলে

যেতে হবে আজিকার মতো। দৃষ্টি শিখা
জ্বলে তাই খরতর। ধূম্র মসী লিখা
নয়ন প্রদীপতল স্ফীত হয়ে উঠে;
সংকল্প প্রহর জাগে বদ্ধ ওষ্ঠ পুটে।
হে ঋষি, সত্যেরা তব অদূরেই আছে
তিমির বিভিন্ন, সুপ্ত। সাড়া দেবে কাছে
রজনী পোহালে কাল।—সেও তুমি জানো,
তবু তব শুভ্রমুখ চিন্তা জরে ম্লান॥

*গ্যেটে
(জার্মানী ১৯২৯)

৩*

মহাশিল্পী, আমি কথা দিনু, আমি লবো
সৌন্দর্যের দায়। সোনার তুলিকা তব
আমি তুলি' লবো। চির সৌন্দর্যের ক্রশ্
বহিব হৃদয়ে বক্ষে রজনী দিবস।
অবসাদ মানিব না, তৃপ্তি জানিব না,
মুক্তির বাসনা কল্পনায় আনিব না,
যদি না আপনি মুক্তি আসে মৃত্যুসম।
কোনো সুখ ভুলাবে না এ বেদনা মম,
কোনো দুঃখ টলাবে না একাগ্র এ ধ্যান।
জীবনের সাথে দিব জীবনের দান
অমিত সৌন্দর্য—বিশ্বের ক্ষুধার অন্ন,
বিশ্বের আজন্ম তীব্র তিয়াষার স্তন্য।
তারপরে চলে যাবো, যুগ যাবে; শেষে
দান মুছে যাবে। শুধু দায় রবে হেসে॥

*রাস্কেল
(ইটালী ১৯২৯)

৪

নিখিল শিল্পীর সৃষ্টি শশী সূর্য তারা
তারাও রবে না চির। রূপ বহ্নি হারা

তারাও হারাবে কোথা আকাশ কুসুম।
আমাদের সৃষ্টি ? সে নয় অক্ষয় ক্রম
লক্ষ যুগ পরমায়ু যায়। কিন্তু মোরা জানি
শিল্পীরে যে দায় দেন সৌন্দর্যের রাণী
বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী অমর সে দায় ;
সেই দেয় বারে বারে শিল্পীরে বিদায়।
সে যারে কাঁদায় তার সেই মোছে চোখ ;
তার মুখ হতে শোনে সৌন্দর্যের শ্লোক,
ভুলে যায় শুনিতে শুনিতে। কীর্তি যত
নাশে কীর্তিনাশা, "কীর্তি কই ?" হাঁকে তত।
মোরা কাঁদি মোরা দিই—থাক্ নাই থাক্ ;
সার্থক শুনেছি মোরা সুন্দরীর ডাক।

(ইটালী ১৯২৯)

৫

দিনগুলি যার তার হোক
রাতগুলি তোমার আমার
যত কথা মনে মনে থাকে
মুখোমুখি বলিয়া যাবার
তারপরে নিজ নিজ ঘরে
চলিয়া যাবার।

তারপরে স্বপনে মিলন
(সে মিলন আজো ঘটে, রাণি)
যত কথা বলা নাহি যায়
কেমনে সে হয় জানাজানি।
ভাষাহীন আশা ও তিয়াষা
ইঙ্গিতে বাখানি।

আজ রাতে তুমি কোথা প্রিয়ে
অকূল পাথারে আমি একা

যত দূর চোখ মেলে চাই
চোখ দুটি যায় না তো দেখা।
এত বড় আকাশেতে নাই
ও আঁচল রেখা।

সমুখের পানে চলি যত
তোমা হতে দূরে দূরে সরি
একবার ঘাট যদি ছাড়
ফেরে না গো জীবনের তরী।
বিরহের ফাঁক শুধু বাড়ে
দিন দিন ধরি'।

মিছে কথা 'আবার মিলন'
কে কবে মিলেছে পুনরায়!
কোনোদিন ফিরে যদি পাও
কার নামে কারে পাবে, হায়!
তার সনে নবতন প্রেম
নূতন বিদায়।

কে জানে গো সে কেমন প্রেম
কোন দেশ কী বেশা যামিনী
হয় তো বকুল বীথিকায়
ফুটিয়াছে করবী কামিনী
আনমনা আমারি মতন
আমার ভামিনী।

মনে যেন পড়েছে দোঁহার
গত জনমের কত স্মৃতি
দিনময় হাত ধরে চলা
রাত করে কথা বলা নিতি
বহু কাজ বহু অবসর
বহুতর প্রীতি।

জীবনের সেই সত্যযুগ
        দুটি মনে ঘনায়ে আসিবে
অকস্মাৎ দেশ কাল ভুলে
        অনন্তর ভালো কি বাসিবে ?
বিভ্রম টুটিয়া গেলে পরে
        অশ্রুতে ভাসিবে।

কে জানে গো সে কেমন প্রেম
        কোথা রাত কবে পরিচয়
যত দূর মন মেলে ভাবি
        আজ নয়, আজ সে তো নয়।
আজ রাতে তুমি নাই সাথে
        কাটে না সময়।

(জাহাজ ১৯২৯)

৬

এবার চলেছি নিজ দেশে
        ভারতের ছায়াতরুতলে
ধ্যানী যেথা মীলিত লোচন
        প্রকৃতিরে মানা দেয় হেসে
স্বামী যেন কামিনীরে বলে
        "ওগো তুমি থাম কিছুখন।"

হে আমার নব আবিষ্কার
        হে মহান হে চির স্বাধীন
হে প্রেমিক মহা কারুণিক
        খোলো খোলো তব সিংহদ্বার
তুমি নহ কারো হতে দীন
        তুমি নহ ভিখারী ধনিক।

তোমার উদার তরুতল
        তোমার সুঅনুগতা সতী

পতি সে মুক্তির তপে রত
বনিতা ভাবিছে কত ছল
সে তব মানিনী প্রেমবতী
হে ভারত কোথা তব ক্ষত ?

সুখে তুমি পরিয়াছ চীর
মন তবু কটীবাসে নাই
তন্ময় রয়েছ শরবৎ
কুশাসনে বসিয়াছ স্থির
কত না শতাব্দী ধরে তাই
তব দ্বারে অতিথি জগৎ ।

অতিথি দস্যুর ছদ্মবেশে
আসে যায় শত শত বার
মুঠাভরে যত সোনা লয়
তত সত্য লয় অবশেষে ।
অফুরাণ তোমার ভাণ্ডার
যত ধন যায় তত রয় ।

আমরা ভাবিয়া হই সারা
সে মোদের ভাবনা বিলাস
তুমি দেব অজর অমর
তোমারে রুধিতে নারে কারা
তোমারে টলাতে নারে ত্রাস
অপমানে তুমি অকাতর ।

হে ভারত তোমার ধ্যানের
তোমার তনয়ে করো ভাগী
মোরে দাও বীজমন্ত্র তব ।
অর্থহীন ধনের মানের
হবো না হবো না অনুরাগী
জনকের যোগ্য পুত্র হবো ॥

(জাহাজ ১৯২৯)

৭

ক্রোধে ক্ষোভে দুশ্চিন্তায় বিষান্বিত প্রাণ
তবু প্রাণ ভরে বাজে অমৃতের গান।
দুটি কর জোড় করি' আকাশে প্রণমি।
ধন্য এ জগৎ, ধন্য হয়েছি জনমি'।
কত যে ক্রূরতা এর, কত কুটিলতা
তবু এ আমার দেশ, আমার দেবতা।
হৃদয়ে জ্বলিতে থাক্ বহ্নি অনির্ব্বাণ
সেই সন্ধ্যাদীপ লয়ে গাই স্তবগান।

আমি আছি—এই মম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ
আমারে সকল শোকে সম্পূর্ণ রাখুক।
যে শত সৌভাগ্য পেনু কিছু ভুলিব না
সেই ঋণ নিশিদিন হানুক বেদনা।
ধাবমান কাল স্রোত যে ঘাটেই নিক্
আত্মবিস্মৃতির কূপে রবো না ক্ষণিক।
সকল তুচ্ছতা মাঝে আপন উচ্চতা
স্মরণ করিয়া মোর লজ্জা পাক্ ব্যথা॥

(জাহাজ ১৯২৯)

৮

তোমারে স্মরিব আজ অনন্ত অমোঘ ভবিষ্যৎ
আমার সত্তার ভবিষ্যৎ
লক্ষ বর্ষ পরে জানি পুরিবে প্রত্যেক মনোরথ
পুরেনি যতেক মনোরথ।
বার বার ব্রতভঙ্গ করে মোরে নিয়ত বিধুর
সিদ্ধি সে হাতের কাছে তবু মুষ্টি হতে চির দূর
দীর্ঘতন অক্ষমতা আশা-নাশা স্বপ্নাবেশ-ভাঙা
ওষ্ঠের রক্তিমা লয়ে চক্ষু মোর করিয়াছে রাঙা
সেই চক্ষে যাই হেরি তাই যেন প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ
নাই আর ধরণীতে নাই আর রমণীতে রূপ।

তোমারে স্মরিব তাই অবশ্য-সম্ভব ভবিষ্যৎ
আমার আত্মার ভবিষ্যৎ
তোমাতে রয়েছে মোর তপস্যার প্রার্থিত জগৎ
তব কাছে গচ্ছিত জগৎ।
একদা লভিব জানি এই ভুজে ইন্দ্রের শকতি
এই চিত্তে উদ্ভাসিবে সিদ্ধার্থের নির্বাণ-মুকতি
ক্ষমায় নমিবে আর করুণায় ক্ষরিবে লোচন
শির উন্নমিবে ঊর্দ্ধে, আত্মজয়ে সুপ্রসন্ন মন।
নয়ন মুদিলে পাবো অন্তরের ঐশ্বর্যের দিশা
আপন অমৃত পিয়ে মিটাইব আপনার তৃষা।

হে আমার পরমায়ু অলঙ্ঘ্য অমেয় ভবিষ্যৎ
আমার বিধাতা ভবিষ্যৎ
অমর তুমি ও আমি একত্র চলেছি এক পথ
তুমি মোরে দেখাইছ পথ।
হে সারথি, মোরে তুমি অনুক্ষণ দিব্যদৃষ্টি দেহ।
অনুক্ষণ বলো কানে—দীন যারা দীন নহে কেহ
অপমানে নীল যারা মনে প্রাণে মানী তারা তবু।
কাপুরুষ ? সেও জানি আপনার ভাগ্যধর প্রভু।
মিথ্যা এ আমার ক্লৈব্য, একা এ আমার চিন্তাজ্বর
অভাব কাহারো নাই, সূর্যালোকে সবাই ভাস্বর।

স্পষ্ট হও, স্পষ্ট হও, অস্পষ্ট আচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ
বিশ্বের মঙ্গল ভবিষ্যৎ
সব সত্য সত্য নয় সব স্বপ্ন নয় কো অ-সৎ
সব স্বপ্ন নয় কো অ-সৎ।
ছদ্মবেশী মিথ্যা যবে দর্পে করে দৃপ্ত অধিকার
তারে আমি করিব না সত্যভ্রমে নিত্য নমস্কার।
তোমা পরে রাখি' আঁখি' ধীরে ধীরে হবো আগুয়ান
বিশ্বাস করিবে মোরে সংশয়ীর চেয়ে বলবান।
দিনে দিনে বিস্তারিবে ধ্যাননেত্রে দিগন্তর সীমা
একদা চকোর পাবে মর্তলোক প্লাবিনী পূর্ণিমা।

তোমারে স্মরিব নিত্য কুবের-ভাণ্ডারী ভবিষ্যৎ
আমার ভাণ্ডারী ভবিষ্যৎ
সংকল্পের তৃতীয়াক্ষি রবে মম ললাটে জাগ্রৎ
শয়নের স্বপ্নেও জাগ্রত
বিশ্বের সকল তীর্থে অবিশ্রাম চলিয়াছে হোম
তাই এ সাগর নীল তারি ধূমে নীল এই ব্যোম।
দেহদুর্গে একা থাকি তাই বলে করিব সন্দেহ ?
অদুর্ব্বল সাধনায় ক্ষয়ে যাক প্রাণ মন দেহ।
আজ যাহা মিলিল না কাল তাহা মিলিবে বলেই
যা চেয়েছি সব পাবো যা দেবার সব যদি দেই।

(জাহাজ ১৯২৯)

৯

গোটা দুই গাধা গুটি দুই ছাগ
ছয়টি বাছুর গরু
এদের মাথায় ছাতা ধরিয়াছে
একটি শিরীষ তরু !
কোথা হতে এক কাক জুটিয়াছে
উঠিয়াছে কার পিঠে
কাছে দেয় হানা মুরগীর ছানা
মুরগীও দু'চারিটে।
সকালে যখন জল এসেছিল
সকলে আছিল স্থির
এইবার রবি আঁখি মুছিয়াছে
এরা ঝাড়িতেছে নীর।
ফাটা নারিকেল নাড়াচাড়া করে
একটি ছাগলছানা
অসহায় গাধা ল্যাজ দুলাইয়া
কাকেরে জানায় মানা।

মাঠভরা ঘাসে মুখ লাগায়েছে
পাশাপাশি সকলেই
ফড়িঙের খোঁজে শালিকগুলার
মরিবার ত্বর নেই !
এতদিন যার ধ্যান করিয়াছি
এই সেই পূর্ণতা
মহামিলনের মুখে কথা নাই
ক্ষুদ্র মিলনে যথা ।
আপন আপন কর্মে মগন
গায়ে গায়ে লাগালাগি
বিনা পরিচয়ে সকলে হয়েছে
সকলের অনুরাগী ।
দ্বন্দ্বের মাঝে ছন্দ বিরাজে
মিলন নিবিড়তর
মৃত্যুর মাঝে অন্ত নাই তো
বৃদ্ধি নিরন্তর ।
কাল সকালেও মাঠভরা ঘাস
পাঠাবে নিমন্ত্রণ
ফড়িঙের সনে শালিকের রণ
কালিও অসমাপন ।
চির দিবসের গ্রন্থ হইতে
একখানি পাতা এই
এতে লিখিয়াছে—"সকলেই আছে
সকলের সুখ সেই ।"

(বহরমপুর ১৯২৯-৩০)

১০

কাছে যারা আছে তাহাদের কাছে
পাই নি সাড়া
এই ব্যথা মোর এ জীবন তোর
সবার বাড়া ।

দিই পরিচয়—ওরা নাহি লয়
কেহ উদাসীন কেহ বা নিদয়
কাহারো শঙ্কা কারো সংশয়
হাসে কাহারা
আর পারি না যে! অভিমানে লাজে
আত্মহারা।

আমার মাঝারে রয়েছে যে, তারে
দেখাই যত
কেহ বলে ধিক্ এ তো নহে ঠিক্
মনের মতো।
কেহ ভাবে এক কেহ ভাবে আর
কিছু নাহি ভাবে মহাসংসার
কত অপমান কত অবিচার
হেলা যে কত!
আর পারি না যে! অভিমানে লাজে
মর্মাহত।
মিলনের ছল খুঁজি অবিরল
সবার সহ
মানি' পরাভব প্রাণভরা ক্ষোভ
দুর্বিষহ।
আমি সকলেরে চাই এত করে'
ওরা কেন তবে নাহি চায় মোরে
হৃদয় আমার শত অনাদরে
যাতনাবহ।
আর পারি না যে! অভিমানে লাজে
বাজে বিরহ॥

১১

না হয় আমার বসন্ত নাই মনে
চিন্তা-চিতা জ্বলছে ধু-ধু বনে

তাই বলে কি দক্ষিণ পবনে
দিব না দ্বার খুলি'
দ্বারে সে মোর হানিছে অঙ্গুলি।

ক্লান্ত-কায়া রাজার দূতের মতো
নিঃশ্বসে সে আধেক মূর্ছা'হতে
বার্তা যে তার বলার আছে কত
আমার কানে প্রাণে
বল্‌বে নাকি নিযুত পাখীর গানে।

আমার ঘরে নাই যে রে খাজানা
এ কি উহার আছিল না-জানা
বাতায়নের প্রান্তে দিল হানা
আমের মঞ্জরী।
ঋতুরাজের প্রথম কিঙ্করী।

দূর আকাশে নীল হয়েছে আলো
বসন্ত তার তুলিকা বুলালো
তারি মাঝে কোথা যে হারালো
বিন্দু সম চিল।
নীল রঙেতে সে কি হলো নীল।

নিযুত পাখীর গানের কালোয়াতী
ডালে ডালে তুমুল মাতামাতি
আমার হিয়া তাদের হতে সাথী
মেলে গানের ডানা
হায় রে তারে কে দিয়েছে মানা।

আজ্‌কে আমার আনন্দ কই মনে?
চিন্তা ছায়া আননে কাননে
ভাব্‌ছি বসে দক্ষিণ পবনে
দ্বার খুলিব কি না
দুঃখ আমার দিব কি দক্ষিণা।

১২

আমি হবো আকাশের কবি।
উদয় গোধূলি হতে অস্ত গোধূলি তক্
আকাশে রহিব চেয়ে অনলস অপলক
রঙ্‌গুলি একে একে নয়নে লইব এঁকে
মনে মনে বিরচিব ছবি।
অস্ত গোধূলি হতে উদয় গোধূলি তক্
তেমনি রহিব চেয়ে অনলস অপলক
তারাগুলি একে একে চিনিয়া লইব দেখে
মনেতে রাখিয়া দিব সবি।

আমি হবো আকাশের পাখী।
দূর হতে পৃথিবীরে হেরিব একটি বার
রবিলোক শশীলোক উড়িয়া হইব পার
দূরতর গগনের নব নব ভুবনের
অতিথি হইব থাকি' থাকি'।
কত যুগে কত দূরে আকাশের শেষ পাবো
অভিসার অবসানে আপনার দেশ পাবো
সুরপুর রূপসীর সোহাগে রচিব নীড়
পৃথিবীরে যাবো ভুলিয়া কি।

আমি হবো আকাশের তারা।
তোমাদের লাখ যুগ আমার একটি বেলা
তোমাদের শত কাজ আমার কেবলি খেলা
তোদের মরণ জরা জীবনের মিছে ত্বরা
লীলা সুখে আমি কালহারা।
যোজন যোজন জুড়ে আঁধারে আঁধার সব
তারি মাঝে সাথীজন মিলে করি উৎসব
অপার আকাশতলে আমাদের সভা চলে
তারি আলো ত্রিভুবন সারা॥

(বহরমপুর ১৯২৯-৩০)

১৩

আপনা মাঝারে চাহি' রহিনু থমকি'।
মোর মাঝে এও আছে। হে আমার আমি,
সুন্দর করেছে বিশ্ব তারা-শুভ্র যামী
দূরের দখিনা বহে দমকি দমকি'
চূত তরুতরুণীর আহ্বানে চমকি'।
পিকবধূ সে বুঝিবা পেল তার স্বামী।
মিলন লজ্জায় তার বাণী গেছে থামি';
সুন্দর ভুবন—তবু তোমার সম কি ?

মুকুরে যাহারে হেরি সেও তো সুন্দর
সুন্দর মেনেছে তারে সুন্দরী রমণী
কাহারে আকুল করে তার কণ্ঠস্বর
উন্মনা করেছে কারে তার পদধ্বনি।
সুন্দর বাহির—তবু তা হতে সুন্দর
আমার অন্তরলোক ; সৌন্দর্যের খনি ॥

(বহরমপুর ১৯৩০)

১৪

উহাদের নাই কোনো কাজ
সারা বেলা খালি ডাকাডাকি
শাখা হতে শাখাতে ঝাঁপায়
পাতাদের খামোখা কাঁপায়
নিজ মনে উহারা নির্লাজ
কী যে এত বকে থাকি' থাকি'
কেমনে বুঝিব আমি হায়
আমি নই পাখী।

খেয়ালের সাথে উড়ে যায়
খেয়ালীরা দেশ হতে দেশে
সব দেশ উহাদের জানা
কোনো দেশে কোনো নাই মানা

যেথা যায় সেথা পুনরায়
এমনি আকুল হয় হেসে
সম্বল দুইটি শুধু ডানা
দেশে ও বিদেশে।

সারা পথ ডেকে ডেকে চলে
যারে ডাকে সে কেমন প্রিয়া
সুর চিনে সাড়া দেয় সুরে
রূপ তার হেরেনি কভু রে
সুরের মিলনমালা গলে
দু'জনায় অশরীরী বিয়া।
সারা পথ সাড়ায় উছলে
আহ্বানে ভরিয়া।

উহাদের সুন্দর ভুবন
আমাদের ভুবনেরি পাশে
প্রতিবেশী—রোজ দেখা হয়
তবু নাহি ভালো পরিচয়
উহাদের সহজ জীবন
আমাদের সহজে না আসে
মোরা করি বাঁধিয়া আপন
ওরা ভালোবাসে।

(বহরমপুর ১৯৩০)

১৫

অন্যমনে থাকি আর বসন্তের দিন
কখন জাগিয়া ওঠে বৈতালিক গানে
কখন সদলে যায় নীলাকাশ স্নানে
সিংহাসনে আসি' হয় কখন আসীন
মধ্যাহ্নের মদির বীজনে তন্দ্রাধীন
ছায়া-তন্দ্রাতপ তলে ক্ষণ স্বস্তি মানে।

কখন উঠিয়া চলে সন্ধ্যার সন্ধানে
পশ্চিমে ঢলিয়া পড়ে প্রিয় বাহুলীন।
অন্যমনে থাকি তবু মনের আড়ালে
কাকলী জমিছে আসি বিহগ সবার
যেথা যত ফুল ফোটে বিহানে বৈকালে
সকলের বাস জমে নাসায় আমার।
এবারের মতো বিশ্বে বসন্ত ফুরালে
মোর চিত্তে রবে তার আনন্দ সম্ভার।

(বহরমপুর ১৯৩০)

১৬

ঝরা পাতাদের ঝড। দুরন্ত পবন
ধুলারে করেছে তাড়া। পথতরুগণ
গায়ে গায়ে টলে পড়ে, ঝড়ায় মুকুল।
আকাশ পরেছে আজ ধূসর দুকূল।
খরতর খরতর বায়ু বীণা বাজে
ঘন ঘন ঝন ঝন। সে সঙ্গীত মাঝে
ডুবে গেছে পিক কুহু, বায়সের রব,
ছাগ শিশুটির স্বর, গাড়ীর গরব।
এই যেন নিখিলের আসন্ন প্রলয়-
আগমনী। আজিকার নিষ্ঠুর মলয়
কাল হবে করাল সৈমুম, মরুচর।
বড় বড় বনস্পতি কাঁপে থরথর
তারি দাপে। আকাশ কিংশুকবর্ণ হবে।
দুর্দিন পড়িবে ভাঙি' অচিরাৎ ভবে।
ওরে কবি, ত্বরা কর্। তোর কুহুতান
দ্রুতকণ্ঠে সারা হোক্। বৃহত্তর গান
তোমারে করিবে মৌন। সেদিনের তরে
বাহুতে রহুক বীর্য, ধৈর্য অন্তরে।

(বহরমপুর ১৯৩০)

১৭

তোমার প্রবল প্রেম আজো মোরে নিখুঁৎ করেনি
সেই মোর খেদ।
স্নাতকের তনু ধোয় অহর্দিন প্রেমের ত্রিবেণী
তবু কেন ক্লেদ ?
এখনো রয়েছে ভয়—হৃদয়ের গূঢ়তম মসী—
আদিম কলঙ্ক।
কত মিথ্যা ভাবনা যে তব প্রাপ্য কেড়েছে, প্রেয়সী,
জুড়েছে পালঙ্ক।
আচার সংযত নয় বিচার উদার নয় আরো
জিহ্বাগ্রে চাতুরী।
এত যার অপূর্ণতা তার প্রাণে ফোটাতে কি পারো
প্রেমজ মাধুরী !
উচ্চতম ব্রত যার তুচ্ছতম ঈর্ষার ঘর্ষণে
চূর্ণ হয়ে যায়
তারে স্নান করায়েছ বৃথা তুমি অমৃত বর্ষণে
অজস্র ধারায় !
সে নয় দুর্ভাগা যারে কভু লক্ষ্মী না দিলেন বর।
সেই ভাগ্যহীন
লক্ষ্মীর বরণমাল্য পেয়ে যেবা হলো না ঈশ্বর
রয়ে গেলো দীন ॥

(বহরমপুর ১৯৩০)

১৮

সকলের শ্রেষ্ঠ প্রেম সেও মানে কালের শাসন
তাই মোরা কেহ কারে করিব না অপ্রিয় ভাষণ
প্রেম যবে চলে অস্তাচলে।
কহিব এই তো ভালো, দিনমান ভালোবাসিয়াছি
ভোরে জাগা দুটি পাখী অবিরাম কল ভাষিয়াছি
শেষ বার ডাকি 'প্রিয়' বলে।

কহিব, প্রগাঢ় প্রেম তার সাক্ষী প্রগাঢ় বিস্মৃতি
পরিপূর্ণ জাগরণ ঘনঘোর নিদ্রায় প্রতীতি
জীবনের প্রমাণ মরণে।

আমরা রাখিনি ক্ষোভ সময়ের অমিয়া পিয়েছি
হৃত সার স্মৃতিভাণ্ড—বৃথা তার নহে বহনীয়
কেহো কারো রবো না স্মরণে।
দু'খানি অধরপুটে একটি চুম্বন বিনিময়
তারপরে স্মৃতিলোপ, তুমি আমি কেহ-কারো নয়
আমাদের মধুর বিচ্ছেদ।
হয়ত নিযুত বর্ষে কোনো দূর নীহারিকা লোকে
চারি চোখ এক হলে আমাদের প্রেমোজ্জ্বল চোখে
কালের তিমির হবে ভেদ।

কহিব এই তো মোরা সেইরূপ যেইরূপ আছি
আদি যুগ হতে যেন এইরূপ ভালোবাসিয়াছি
মিলিয়াছি অনন্ত মিলনে।
ভুলিব, প্রত্যেক প্রেম অপর প্রেমের বিস্মরণ
নিযুতের কুঞ্জে মোরা পালা করে রাখি নিমন্ত্রণ
একই কথা কহি জনে জনে॥

(বহরমপুর ১৯৩০)

আমরা

মোদের সাধন মুক্তি বাঁধন
সমান মোদের কাঁদন হাসি
কখন কূলায় গগন ভুলায়
কখন গগন কূলায় নাশী।
মহান জীবন মহান মরণ
মোদের প্রেমের তুল্যাভরণ
আমরা দু'জন রসিক সুজন
সকল রসই ভালোবাসি।

এতই বৃহৎ নয় গো জগৎ
গড়বে আড়াল দোঁহার মাঝে
সুদূর অদূর সমান মধুর
বিয়ের বাঁশি নিত্য বাজে।
চোখের দেখা ভাগ্যে লেখা
নেই বলে কি রইব একা?
আমরা দু'জন রসিক সুজন
লিখব রসের লিপিকা যে।

(১৯৩০)

শূন্য বাসর

তুমি আছ দূরে তবু মম পুরে
মনোমতো রচি শয্যা
অতি সযতন করি প্রসাধন
অভিনবতর সজ্জা।

তুমি যদি আস না বলে
হেরিবে তোমার পরিতোষণার
অযতেলা নেই তা বলে।

হই সুন্দর রহি সুন্দর
করি সুন্দর সৃষ্টি
তব তনুরুচি তনু মোর শুচি
অনুরঞ্জিত দৃষ্টি।
সহসা, সজনি, আসিলে
হেরিবে সে জন তেমনি সুজন
যারে তুমি ভালোবাসিলে।

বিরহের ব্যথা সে যে সর্বথা
মিলনের মতো মালিনী
মিলনেরি মতো সেও অবিরত
মুকুল দলের পালিনী।
তুমি যদি আস আজিকে
কণ্ঠে পরাব বিরহ বিকচ
রক্ত কমলরাজিকে।

(১৯৩০)

সকলের

আমাদের সুন্দর প্রণয়
সেতো শুধু আমাদের নয়
নিখিলের সকলের তরে
তারে মোরা আনিয়াছি ঘরে।
নিখিলের সকলের ধন
আমাদের বিরহ মিলন।
আমাদের পরম বিস্ময়
সে তো শুধু আমাদের নয়।

আমাদের যত শত সাধ
উহাতে সবার আশীর্বাদ।

আমাদের সকল স্বপন
সকলের হিয়াতে গোপন।
নিখিলের মরম বাসনা
মিটাইব আমরা দু'জনা।
আমাদের যৌবনের সাধ
উহাতে সবার আশীর্বাদ।

তাই মোর একাকী দিবস
নয়, প্রিয়ে, বিষাদে বিবশ।
জানি জানি নিখিলের প্রাণে
ব্যথা মোর কী বেদনা হানে।
মমতায় দ্যুলোক ভূলোক
শিরে মোর বুলায় পুলক।
হেতুহীন সহজ রভস
ভরিয়াছে একাকী দিবস।

(১৯৩০)

সৌন্দর্যস্নান

দিবসের শত নিত্য কাজ
ভাবনার মাঝ
কোনো মতে করে নিতে হয়
একটু সময়
ত্রিদিবের রূপ সরোবরে
সিনানের তরে
যাতে তুমি আরো মোরে আরো
প্রণয়িতে পারো।

তিন সন্ধ্যা করিয়াছি সার
লোচনাভিসার।
বালারুণ উদয় মাধুরী
করিতেছি চুরি।

গগনের নীলপদ্ম মধু
পান করি, বধু।
গোধূলির হেমাঞ্জন আঁকি
রঞ্জি মোর আঁখি।
রজনীর রূপ পারাবার
এমনি অপার
নিরাশায় দাঁড়াই নিশ্চল
বিমনা বিহ্বল।
ক্লান্তিতে চরণ পড়ে নুয়ে
শেজ পাতি ভুঁয়ে।
কূল যার নয়নে না পাই
স্বপনে বেয়াই।

(১৯৩১)

আমাদের প্রেম

আমাদের প্রেম পদ্মপাতায় তরল মুক্তাফল
টলমল টলমল।
তাই তারে লয়ে চির শঙ্কিত
মৃণালছত্র রহে কম্পিত
কাঁপায়ে সরসীতল।
চির শঙ্কিত, তবু সে ধন্য
পরম পরশ পুলক জন্য
একাগ্র অবিচল।

আমাদের প্রেম প্রিয়বাহুপাশে ভোরের স্বপনসুখ
পলায়ন উৎসুক।
তাই তারে লয়ে চির শঙ্কিত
নয়নপত্রে রহে কম্পিত
কপট তন্দ্রাটুক্।
চির শঙ্কিত, তবু সে পাগল

আঁখির দুয়ারে দিয়াছে আগল
অতিসুখ উন্মুখ।

আমাদের প্রেম মুক্ত স্বাধীন নন্দনবন মৃগ
মোরা তারে বেঁধেছি গো।
তাই তারে লয়ে চির শঙ্কিত
কুটীরাঙ্গন পরিকম্পিত
সেথা সে বাঁচিবে কি গো!
চির শঙ্কিত, তবু কী আশায়
পরায়ে দিয়াছি সেই বিপাশায়
সোনার বন্ধনী গো।

(১৯৩১)

তুমি আমি আছি

হে আমার প্রেম, দিবসের শত কাজে
বাহিরিতে হয় মহাজনতার মাঝে
যেথা কোটি শশী ভানু
কোটি অণু পরমাণু
"আছি" এই সুখে খেটে খেটে হয় সারা।

তাদের ভুবন আমার হইত কারা
তুমি যদি না থাকিতে
দূরে কোনখানটিতে।
"তুমি আমি আছি" এ মধু রাগিণী বাজে
আমার ভুবনে বিহানে বিকালে সাঁঝে।

হে আমার প্রেম, তুমি যদি মোর রহ
বলো তবে মোর কী মিলন, কি বিরহ!
ভরা যদি থাকে বুক
বেদনায় আছে সুখ
প্রেম-পাওয়া মন বিলসিত বেদনায়।

প্রেমের শিকলি দূরে গেলে বাঁধে পা'য়।
দৃষ্টির পরপারে
বিদায় দিয়াছি যারে
আরো কাছাকাছি আসিছে সে অহরহ।
মিলন কি হতো ইহা হতে সুখাবহ।

(১৯৩১)

দুর্মুখ

পরিপূর্ণ জীবনের স্বাদ যারে কভু করে নি উন্মাদ
সে যদি বা হাসে
তর্ক জাল বিস্তারিতে পটু সে যদি সংশয়ে কহে কটু
লঘু ব্যঙ্গ ভাষে
মনে মোরা মানিব না ক্ষয় জানিব মোদেরি হবে জয়
সত্যের সকাশে।

দৈবক্রমে যে পড়েছে কাছে সে ছাড়া আরো তো লোক আছে
বসুধা বিশাল।
অজানিত সমধর্মা কত দেশে দেশে আমাদেরি মতো
জীবন মাতাল।

উহারাই মোদের সমাজ মান যেন উহাদেরই মাঝ
লভি চিরকাল।
দৈবে আজ জীবিত যেজন সে ছাড়া রয়েছে অগণন
আগন্তুক প্রাণ
যুগে যুগে ওরাই জগৎ ওদের অসীম ভবিষ্যৎ
অভ্রান্ত বিধান।

মিত্র যদি কোথাও না থাকে ভাবীকাল মনে নাহি রাখে
ভাবিব না তবু
মনো মাঝে হয়েছে প্রত্যয় সত্যে যদি নিত্য মতি হয়
ভয় নাই কভু।
কাছে থাকি' যে নয় দরদী তারে মোরা তুচ্ছ করি যদি
ক্ষমিবেন প্রভু।

(১৯৩১)

মরণ

প্রেমের মাঝারে মরণের তরে বিরচিতে আয়োজন
যেন মোরা নাহি ভুলি
মরণ আসিলে বরণ করিতে শান্ত করিব মন
স্মরণ করিব আনন্দ দিনগুলি।
দস্যু হইলে হরণ করিত প্রেমের প্রথম প্রাতে
আমার দুঃসাহস
অথবা মোদের পূর্ণ প্রাণের চরম দানের রাতে
তোমার আমার সচকিত সে রভস।
মোদের প্রেমের সহায় হয়েছে কোন গগনের তারা
কোন প্রান্তর পরে
শয়ন পাতিয়া দিয়াছে প্রান্তে কোন ঝরণার ধারা
ছায়া ছল ছল সজল অন্ধকারে।
মরণ তখন হয়েছে বন্ধু অঙ্গে তোলেনি হাত
চেয়েছে করুণ চোখে
নিষাদ হইলে সেই নির্জনে হানিত অকস্মাৎ
প্রিয়াপরশন অচেতন ক্রৌঞ্চকে।
মরণের পরে রাখি' নির্ভর ভয়েরে করিব জয়
ভাবনারে দিব ছুটি
উহার যেদিন হইবে সময় আমাদেরও যেন হয়
দুয়ার খুলিব পালঙ্ক হতে উঠি।
শ্রাবণ নিশীথ বজ্র গরজে বিজুরি ভ্রূকুটি' করে
বরষা বর্শা হানে
আরাম-শয়ন আশার স্বপন রাখিতে নারিবে ধরে
বাহির হইব উদ্ধত অভিযানে।
যেথা নিয়ে যাবে সেথায় চলিব একেলা অথবা দোঁহে
ফিরিব না পশ্চাৎ
চির পরিচিতা ধরণী রহিবে বিষাদের সমারোহে
হায় কে কাহার হেরিবে অশ্রুপাত।
যত আনন্দে অমর হয়েছি চরিতার্থতা যত
যত শত কৌতুক

মরণের সাথে যেথা যাব সেথা নিয়ে যাব অক্ষত
জীবনের দেওয়া পরিণয় যৌতুক।

(১৯৩১)

আহ্বান

তোমারে ফিরায়ে দিবে আনি'
আমার মুখে না বলা
অনুচ্চার অনুজ্জ্বলা
নীরব নিগূঢ়তম বাণী
যারে তুমি শুনেছিলে বলে
এক দিন এসেছিলে ছলে।

সেই বাণী লঙ্ঘি' পারাবার
উত্তরিবে তব ধাম
অহরহ অবিরাম
সঙ্গী হবে স্বপ্নেও তোমার।
দিবে টান চরণে চরণে
আঁখিজল ঝরাবে স্মরণে।

ভাবনা আমার কী বা, বলো ?
আমি জানি প্রিয়া লাগি
ফল নাই নিশি জাগি
সাধাসাধনিতে নাই ফলও।
হিয়াতলে স্পন্দনের মতো
আহ্বানেরে রেখেছি জাগ্রত

যে আহ্বান নিশা অবসানে
উদয় উদধিপারে
পৃথিবীর পূর্বদ্বারে
সবিতারে ফিরাইয়া আনে
স্থিতধৈর্য সে দৃঢ় আহ্বান
আমারে করিবে ফলদান।

(১৯৩১)

বিরহ

বিরহ মৃত্যুর মতো—এই শুধু ভেদ
মরণ মুহূর্তজীবী, বিরহ অমর।
মিলনের সনে তার অনন্ত সমর
কবিরা রচিছে বসি' উভয়ের বেদ।

বিরহ মৃত্যুর মতো—ভেদ শুধু এই
মরণের চিতানল সহজ নির্বাণ,
নিরাশার শ্বাস লেগে চির কম্পমান
বিরহের দীপশিখা তবু যে কে সেই।

বিরহ মৃত্যুর মতো। বিরহেরে চিনি।
চিনি বলে মনে হয় সে সময় হলে
সুদীর্ঘ সাধনা মোর যাবে না বিফল।
মরণ সহন হবে। শুধু হে সঙ্গিনী,
একটি পুরানো কথা ফুরাবে না বলে
আর বার বলিবার কবে পাব ছল?

(১৯৩১)

মিলিত নেত্রে

মোদের মিলিত নেত্রে বিস্তারিল ভুবনের সীমা
উপেক্ষিত যেবা ছিল সে লভিল অপূর্ব মহিমা।
তোমার চিহ্নিত তারা আমার আকাশে ছিল তবু
তোমারেই না চিনিলে তারে নাহি চিনিতাম কভু।
সে আছে আকাশ তাই নিশি নিশি পরিপ্রেক্ষণীয়
তার উদয়াস্ত লীলা আকাশেরে করেছে আত্মীয়।
আষাঢ়ের নব মেঘ ধার্য দিনে আক্রমিয়া দেশ
দিগন্তে শিবির রচি' করে যবে সেনা সমাবেশ
তুমি দূরপুরাগতা তোমারে টানিয়া লয়ে ছাতে
কিছুই না বলি, শুধু চেয়ে রই তব আঁখিপাতে।

আবিষ্কার পুলকের শিখিনৃত্য ক্ষান্ত হলে তব
উত্তরের পাশি ছিন্দি' দৃষ্টিপথে বন্দি নীল নভ।
অতি পরিচয় ফলে মোর যাহা ছিল অবজ্ঞাত
পুরাতন দৃশ্যধ্বনি পুনঃপুনঃ চিত্ত প্রত্যাখ্যাত
সন্ধানী ইন্দ্রিয় তব কোথা হতে আনিল বাহিরে
প্রশ্নের উত্তর দিতে মোর আর বিশ্রাম নাহিরে।
তব কৌতূহলস্পর্শে উজ্জীবিত মম কৌতূহল
সদ্যোজাত জিজ্ঞাসায় লণ্ডভণ্ড করে জলস্থল।
মোদের মিলিত নেত্রে চির শিশু মেলিল নয়ন
দিকে দিকে প্রসারিল নিখিলের নিঃসীম অয়ন।

(১৯৩১)

ছুটির দিন

১

আজিকে ছুটির দিন। তাই ক্ষণে ক্ষণে
কত ছলে কত নামে ডাকি' অকারণে
বাহুতে সঁপিয়া বাহু, স্কন্ধোপরি শির,
নয়নে নয়নযুগ স্থাপিতেছ স্থির
স্থির বিদ্যুতের মতো নির্বাক কৌতুকে।
শুধু কি কৌতুকে। না, না, তীব্রতর সুখে;
একটি চুম্বন দিলে হাস্য অসংবৃত
শিশুসম বকে যাও কলকল্লোলিত
“উজু গুজু, গুজু”--অতি অর্থহীন ভাষ
যেন সে কায়ার বাণী কায়াতে বিকাশ।
যদি রঙ্গভরে মুখ লই ফিরাইয়া
অমনি চাপড় শুরু রাগিয়া কাঁদিয়া।
কিছুতেই শান্তি নেই। কী করিতে হবে,
বলো। কোথা নিয়ে যাবে, চলো। যাই তবে।
হয়ত ঘাসের পরে স্খলন্ত শালিক
হাঁটে আর মাথা নাড়ে। তাই অনিমিখ
হেরিতে হবে। কিম্বা পীত প্রজাপতি
একটি দিবসে যার জন্ম মৃত্যু রতি
বৃন্তচ্যুত চম্পাসম কভু নিয়ে ধায়
আতসবাজির মতো কভু ঊর্ধ্বে তায়
প্রাণের লহর তুলি' পক্ষের তরীতে
কভু শরলক্ষ্যে চলে, হইবে হেরিতে।

২

মোর গেহে আছ তুমি সেই সুখে, প্রিয়া,
তব উপস্থিতিটুকু থাকি বিস্মরিয়া
আপন অস্তিত্বসম। নিত্যকার কাজে
যে অভিনিবেশ মম হেলাসম বাজে
তব চিত্তদেশে ওগো অভিমানময়ী
তুমি না থাকিলে কাছে সেও থাকে কই।
স্নাত পুষ্পরুচি গন্ধ তব অঙ্গজাত
তব নৈশ আলিঙ্গন সম। তাই মম
দীর্ঘদিনব্যাপী শ্রম লাগে স্বপ্নসম।
তব কণ্ঠ মালা খসা সুরপদ্ম দল
মোর কর্ণশীর্ষে লগ্ন। মোর মর্মতল
তার অভিষেকসিক্ত। সেই স্বরস্বাদ
তিক্ত করিবারে নারে কর্মকলনাদ।
আমি যদি ভুলে থাকি তুমি মনে করে
মনে করাইয়া লও তুমুল আদরে।

৩

এই তুমি আছ মোর কাছে। এ সরল
এ সহজ অনুভব করিছে সজল
আমার নয়নোপ্রান্ত অহেতুক রাগে
যেমন গগনোপান্ত নবমেঘাভাসে।
ছিল যে বড় ভীরু উষার শিশির
নিঃশ্বাস লাগিলে কাঁপে শির শির শির।
দীর্ঘদিন অন্যমনা শত কর্মরত
তোমার সান্নিধ্য সুখে সস্মিত সতত
যখনি বিরাম মানি, ভাবি ক্ষণকাল
জীবন অসমাপ্ত জগৎ বিশাল
দিনে দিনে মিলনের ঘনাইছে শেষ
তব পথ চেয়ে আছে দূরে কোন দেশ।

মোর প্রেমে কেন তবে এতো অপচয় ?
এতো অন্যমনস্কতা ? কেন দিনময়
অন্য কাজে মত্ত থাকি ? কেন তব সনে
নিরন্তর নাহি থাকি সংলগ্ন আসনে
নিশীথেও সুপ্তিহীন ? ভাবি ক্ষণকাল
অমনি বাজিয়া উঠে কর্মকরতাল ।
প্রশ্নের উত্তর নেই । আমি অসহায় ।
প্রেম অসমাপ্ত থাকে । দিন চলি' যায় ।

(১৯৩১)

মৃত্যু

মৃত্যু মোদের সঙ্গ রাখে
জন্মকালের সঙ্গী
যতই মোরা এড়াই তাকে
সাধ্য কী যে লঙ্ঘি ।
তার অভিমান জ্যোৎস্নারাতে
হঠাৎ আনে ঝঞ্ঝা
বাধায় মোদের অসাক্ষাতে
যখন উহার মন যা ।
উপেক্ষিত দস্যি ছেলে
জীবন খেলাক্ষেত্রে
পিছন হতে দু'হাত মেলে
ঝাপ্‌টে ধরে নেত্রে ।
লুকোচুরির খেলায় সে যে
আদ্যকালের সঙ্গী
যতই মোরা বেড়াই ত্যেজে
সাধ্য কী যে লঙ্ঘি ।

(১৯৩১)

শোক

মুখখানি শুকায়েছে তার   নিদারুণ শোকে
তাই তার নাই মরলোকে।
অধরে করুণ হাসিধার   অসিধার সম
নীরবে ছেদিছে হিয়া মম।
গৃহকাজে জোড়া দুই হাত   রাঁধিছে আনিছে
না জানিয়ে হৃদয় হানিছে।
কিছু যেন ঘটে নি তফাৎ   পৃথিবীতে হায়
সে আমারে বুঝাইতে চায়।

মন তার দূরে দূরে দূরে   উড়িতে উড়িতে
নাড়া দেয় কাঁকনে চুড়িতে।
স্মৃতি তার লুকাইয়া ঘুরে   খেলাঘর খুঁজি'
আঁচল খসিছে তাই বুঝি।
আঁখি হতে নামে না প্রপাত   ক্ষীণ বাষ্পরেখা
সিক্তপ্রায় আঁখিপাতে লেখা।
কিছু যেন ঘটেনি তফাৎ   পৃথিবীতে হায়
সে আমারে বুঝাইতে চায়।

আমি তারে পারিব বলিতে   হেন বাণী কই ?
কখনো বা হতবাক রই,
কখনো বা ভুলাইয়া দিতে   পাড়ি অন্য কথা
যদি হয় শোকের অন্যথা।
বিতর্কের করি সূত্রপাত   রাজনীতি তুলি
সংবাদপত্রিকাখানা খুলি।
কিছু যেন ঘটে নি তফাৎ   এই পৃথিবীতে
আমি তারে চাই বুঝাইতে।

বুঝে লয় চকিতে সে ছল,   মহা তর্ক করে
চতুর্গুণ উৎসাহের ভরে।
দু'হাতে সরায় বিশৃঙ্খল   বেশ বা কেশর
তর্ককালে প্রতিবন্ধ ওর।

পাছে কারো লাগিবে আঘাত   কেহ নাহি বলে
যে কথা শ্বসিছে হৃদিতলে।
কিছু যেন ঘটেনি তফাৎ   পৃথিবীতে হায়
দুঁহু দোঁহে বুঝাইতে চায়।

(১৯৩১)

বন্দনা

বন্দনা করি অপ্‌সরাকে
প্রেম করে ভয় লভিতে যাকে।
সহজমুক্তা চঞ্চলা যে
বনবিহঙ্গ অঞ্চলা যে
বাহুবন্ধনে বক্ষ মাঝে
আপন কৃপায় স্থির যে থাকে।

বন্দনা করি রঙ্গিণীরে
অযুত ছলনা ভঙ্গিনীরে।
রম্য গগন রম্য ক্ষিতি
উল্লাস যারে জোগায় নিতি
রূপভোগে যার অপরিমিতি
নৃত্য যাহার চরণে ফিরে।

বন্দি নায়িকা উত্তমারে
তনুসুগন্ধ চিনায় যারে।
স্পর্শ যাহার স্নিগ্ধ কোমল
অঙ্গ যাহার ধৌত অমল
নিঃশ্বাসে যার ধীর পরিমল
আনন্দ যার অভিসারে।

বন্দনা মোর সঙ্গিনীরে
যার সন্তোষ গৃহের নীড়ে।
কাজ অফুরান, হাত দু'খানি
মুখে নাই অভিযোগের বাণী
নিদ্রা পালায় আজ্ঞা মানি'
আলস্য যায় হার মানি' রে।

বন্দি তাহারে যে মোর জায়া
নন্দনে মোর দিয়াছে কায়া।
যত্ননিরতা বিরতিহীনা
না করে নৃত্য, না ধরে বীণা
সেই অপ্‌সরা এ দেবী কিনা
নিত্য আমার লাগায় মায়া।

(১৯৩২)

পুণ্য

পুণ্য ধরাতে যবে আসিল
শ্রাবণ স্বাগত সম্ভাষিল।
ঝম ঝম ঝম ঝম ধারাতে
প্রাণীদের হরষিত সাড়াতে
পুণ্য কাঁদন ভুলে হাসিল।
দিকে দিকে নবজাত ধান্য
পৃথ্বী সে পরম বদান্য
পুণ্য হেরিয়া ভালোবাসিল।

পুণ্য শায়িত থাকে দোলাতে
শরৎ তাহারে আসে ভোলাতে।
সাদা মেঘ পাল তোলে নীলিমায়
পুণ্যর নয়নেতে পড়ে ছায়
কে যায় রে ওই সব ভেলাতে।
সাদা ফুল সাদা জল সাদা কাশ
খেলনা ছড়ায়ে আছে চারি পাশ
পুণ্যর ঘুম-ঘুম খেলাতে।

শীতের বাতাস লাগে অঙ্গে
পুণ্য চলিল তবু রঙ্গে
কখনো বাবার কাঁধে চড়িয়া
কখনো মায়ের গলা ধরিয়া
গ্রামে গ্রামে দু'জনের সঙ্গে।

সর্ষে ফুলের ক্ষেত চারি ধার
সোনা দিয়ে ছাওয়া যেন পথ তার
পুণ্য সকৌতুকে লঙ্ঘে।

এর পরে আসিল বসন্ত
পুণ্যে করিল বলবন্ত।
জানু আর করতলনির্ভর
পুণ্য ছুটিতে চায় ঘর ঘর
ক্ষমতায় পুলক অনন্ত।
বাহিরে ধরণী হলো সুন্দর
সবে বলে, “পুণ্যকে ধর ধর
পালাইবে বাহিরে দুরন্ত।”

নিদাঘের নিগূঢ় নিকুঞ্জে
বিহগেরা কলগীতি গুঞ্জে।
পুণ্য অবাক হয়ে হোথা চায়
কোথা হতে আপনার ভাষা পায়
আপনার স্বরসুধা ভুঞ্জে।
আবার শ্রাবণ যবে আসিল
পুণ্য স্বাগত সম্ভাষিল
নবজাত জলধরপুঞ্জে।

(১৯৩৩)

জন্মদিন

আমি কবিতার প্রথম চরণ
আমারে লিখে
মিল দিতে গিয়ে স্মরিলেন বিধি
কত নারীকে।
ভাবিলাম মোর কপালে রয়েছে
নব পদবী
মুক্তক বলে চালাবেন মোরে
কবির কবি।

অবশেষে যারে হেরিলেম ধ্যানে
উদ্ভাসিতা
তুমি কবিতার দ্বিতীয় চরণ
তুমি গো মিতা।
আমার জন্মদিবস ছিল যে
মিত্রহীন
তাহারে স-মিল করিল তোমার
জন্মদিন।

(১৯৩৩)

মিলনস্মৃতি

প্রিয়ার সাথে প্রিয়ের পরিচয় প্রথম স্বলগন
গগনে কোন বর্ণলীলা, কোন লাবণ্যযোজন ?
অবনী কি নবীন হলো প্রেম যৌটক হলো বলে
ধ্বনিল কি অশ্রুত সঙ্গীত অন্তরীক্ষতলে।
প্রাণলোকের বাড়ল পরিসীমা সম্ভবগৌরবে
নক্ষত্র কি পড়ল খসে ঐ জন্ম নিতে তবে ?

প্রিয়ার সাথে প্রিয়ের পরিচয় প্রথম স্বলগন
বিশ্ব তখন আছে কিম্বা নাই, নাই তৃতীয় জন।
আছে দোঁহার কৌতূহলী আঁখি বিমুগ্ধ বিস্ময়
আছে দোঁহার কম্প্র চপল হিয়া স্তব্ধ আদিম ভয়।
প্রথম নারী প্রথম পুরুষের রক্তস্মৃতি আছে
রক্ত যেন রক্তে চেনে, তাই মিলন লাগি নাচে।

প্রিয়ার সাথে প্রিয়ের পরিচয় প্রথম স্বলগন
আজো তাহার হয়নি ইতি ওগো, হবে না কখন।
আজো মোরা তেমনি চমক মানি, তেমনি কুতূহলী
তেমনি ডেকে প্রেমের দেবতারে "ধন্য তুমি বলি"।
তেমনি তাঁরে চিত্তভরে নমি, বলি, "এ বর দেহ
এখনো যে চেনার আছে বাকি রহুক এ সন্দেহ।"

(১৯৬০)

বিরহস্মৃতি

প্রথম মিলন পরে প্রথম বিরহ যে
সে না যদি হয় অতি দীর্ঘ
তবে তার সন্তাপ সহনীয় সহজে
তার তরে নাই আঁখিনীর গো।
বক্ষের বিস্ময়ে চিত্ত যে তন্ময়
সে চায় আপনা হতে নিরালা
চমকের রভসের শিহরণ ক্ষনময়
নিবিতে নিভৃত চায় সে জ্বালা।

মরণ বেদনাসম সঘন আনন্দ
ও: তার কী যে অনুরণনি !
স্তব্ধ এ প্রাণ যদি ফিরে পায় স্পন্দ
শোণিত বাহিবে তবে ধমনী।
স্মৃতি সে ছিঁড়িয়া গেছে মিলনের দ্বন্দ্বে
কণ্ঠমালিকা সম দশা তার
ডোর দুটি জোড় করি' পড়িয়াছি ধন্দে
অতীতে ও সাম্প্রতে লাগে আর
তবু যদি দিন পাই ভাবি বসে বিজনে
কী ছিল কী হলো তার কাহিনী
মিলাইয়া ধরি মোর দুই ভাগ জীবনে
স্রোত পায় রুদ্ধ প্রবাহিনী।
দোঁহার জীবনে যাহা মধুর মিলন গো
একের জীবনে তাহা ছেদনা
মরণ অধিক সুখে অমর তো অজ্ঞ
চেতনায় হানে ছেদবেদনা।
প্রথম মিলন পরে প্রথম বিরহ যে
সে না যদি হয় অতি দীর্ঘ
ছিন্ন বীণার তার জুড়ে যায় সহজে
ছন্দ মিলায় দুই তীর গো।

(১৯৩৩)

নীড়

আমাদের যুক্ত প্রেমে অবনী কি হয়েছে নবীন
মানবের দেশে দেশে অকল্যাণ কিছু হলো ক্ষীণ ?
বীর সে কি নিঃসহায় নিরাশায় যাপে না দিবস
কলভাষী বিদূষক গূঢ় শোকে হয় না বিবশ ?
মিলনের অন্তরায়ে রাধা নয় শাশ্বত বিধুরা
পরস্পর সুখভাগ হরিছে না অবোধ দস্যুরা।
হেতুহীন আঘাতের হেতুহীন ব্যাঘাতের জ্বালা
করে নি কি ধরণীরে অনির্বাণ অজ্ঞ যজ্ঞশালা ?

আহা প্রেম! কে তোমারে দিল ভার স্বর্গ রচিবার।
তুমি শুধু রচো নীড় মিলিত সৃজন দু'জনার ;
সে যদি নির্দ্বন্দ্ব হয়, নাহি হয় অলঙ্কৃত ভুল
তার বড় কিছু নাই, স্বর্গ তার নয় সমতুল।
জানি শুকাবে না ক্ষত একব্রত নিঃসঙ্গচারীর
হবে না বেদনা অস্ত প্রেমবস্ত অবলা নারীর।
প্রাচীনা এ পৃথিবীর নাই হলো কেশের কলাপ
ওগো প্রেম, পারাবত, তুমি শুধু বকিও প্রলাপ।

(১৯৩৩)

জার্নাল

সুন্দরের জাতি নাই, যাহাদের আছে
তাহারা নমিতশির সুন্দরের কাছে।
তাহাদের মুগ্ধ নেত্রে পড়ে না পলক
অন্তরে উদ্বেলি' উঠে অব্যক্ত পুলক।
দাক্ষিণ্যের ভারে চিত্ত পরিত্রাণ যাচে
সুন্দরের কাছে।

১১ই জানুয়ারী ১৯৩৩ চৌরা রাজশাহী (ভগ্ন মসজিদ)

সে ছিল পাষাণ
শিল্পী তারে করে গেল কী সুষমাদান !
মূর্খ তারে দেবীভ্রমে অর্ঘ্য যায় দিয়া
সুবিচিত্র মনস্কাম যত্নে নিবেদিয়া।
প্রত্নতত্ত্ববিশারদ তারে মাপে জোপে
লক্ষণ মিলায়ে রাখে জাদুঘর খোপে।

১২ই জানুয়ারী মহাকৈল (প্রাচীন মূর্তি)

পার্শ্বে প্রিয়া, তাহার পানে
তাকাই নাকো ফিরে
কোন অতীতের যুদ্ধকথা
মন ফেলেছে ঘিরে।
সত্য কি না তাও জানিনে
সত্যসম লাগে।
রাত্রি হল গভীর, তবু
চিত্ত আমার জাগে।

১৩ই জানুয়ারী নিয়ামতপুর টমকীর মাঠ

স্রষ্টা যিনি মানবের মাঝে
মৃত্যু তাঁর কী করিতে পারে।
দেশে দেশে তাঁর আমন্ত্রণ
ভাষা নারে রোধ করিবারে।
কে জানে আমার সৃজনের
কোন দূরে কত যুগ পরে
কে লভিবে পূর্ণতম স্বাদ
আবিষ্কারমোদিত আদরে।
দান মম সত্য হোক শুধু
প্রাণ মোর রহুক উহাতে
এক দিন কোথাও কেমনে
কেহ তুলে লবে যোড় হাতে।

১৪ই জানুয়ারি সাইবেল টলস্টয় পাঠ

হারায়েছি কত সূর্যোদয়
পালঙ্কে করেছি কালক্ষয়
অবহেলাভরে।
কত পুষ্প দ্বারে কর হানি'
দিনান্তে ঝরিয়া গেছে জানি
মূক অনাদরে।
কতদিন অমূল্য সে আয়ু
বৃথা গেছে, ক্ষীয়মাণ স্নায়ু
বিতর্ক বিলাসে।
হারায়েছে থান দুই সোনা
দাম যার হাতে যায় গোনা
খেদ কেন আসে।

১৬ই জানুয়ারি নওগাঁ

আদরিণী বধূ স্নেহের দুলাল
ছোট একখানি গেহ
দু'চারিটি প্রিয় আত্মীয় জন
বয়স্তজন কেহ

পুরানো ভৃত্য একটি কি দুটি—
স্বর্গ ইহারে কয়
সুলভের মতো শুনিতে, কিন্তু
দুর্লভ অতিশয়।

২৭শে জানুয়ারি

শীতের রাতে আগুন জেলে
চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে
বন্ধুজন সঙ্গে লয়ে
গল্প করি ধীরে।
গল্প নহে, সঙ্গ তাদের
জাগিয়ে রাখে সুখ
ঘুমের তরে যত্ন নাই
উৎকর্ণ উন্মুখ।

২৮শে জানুয়ারি

ছপ্ ছপ্ পড়ে দাঁড় নৌকা চলে
পাতিহাঁস সন্তরে নদীর জলে
কাদাখোঁচা উড়ে যায়, অদূরে বসে
দুই পাশে শূন্যতা, রৌদ্র খসে।

২৯শে জানুয়ারি

দু'দিনের শেষে বন্ধুরা গেছে
যে যার আলয়ে ফিরে
উহাদের সাথে সুখগুঞ্জন
বিস্মৃত হই ধীরে।
আসে কর্মের চক্র মুখর
কটু কর্কশ দিন
দু'দিনের স্মৃতি স্বপ্নের মতো
সত্বর হবে লীন।

৩১শে জানুয়ারি

মন উড়ে গেছে দূরে হিমাদ্রিচূড়ে
অরণ্যনীল তুষারশুভ্র পুরে
দেবতা যেথায় একা
দুর্গমপথ লঙ্ঘনকারী
যাত্রীরে দেন দেখা।

১লা ফেব্রুয়ারী

তুচ্ছ দিনেও ক্ষান্ত রহে না
জীবনের সঞ্চয়
একদিন মোরে পূর্ণ করিবে
আজিকার অপচয়।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি

শিলা ইষ্টকে পরিচয় লিখে
নামহীন কবি যত
মর্তের দান মর্তে সঁপিয়া
কোন্ দূরে হলো গত।
বৃথা মোরা আছি পুরাণেতিহাস
বাক্য রচনারত।

৭ই ফেব্রুয়ারি

পূর্ণিমা নিশি জ্যোৎস্নাধবল ধরা
দূরে চোখ গেল অপরিশ্রান্ত ডাকে
অকারণে হাঁকে জাগরূক সারমেয়
সকলে ঘুমায়ে স্বপ্নে হেরিছে কাঁকে।

৯ই ফেব্রুয়ারি

এই দিনটিরে ভুলে যাব একদিন
ভুলিব ইহার অফুরান্ ব্যস্ততা
এই সব জন কেহই রবে না মনে
মনে রহিবে না ইহাদের কারো কথা।
এসব দৃশ্য যেই অদৃশ্য হবে
স্মৃতি হতে হবে অমনি নির্বাপিত

অন্তঃপরের প্রবল বিসংবাতে
অধুনা সে হবে চ্যুত বিস্মৃত মৃত।

২৩শে ফেব্রুয়ারি

সারাদিনভর পদে পদে ব্যর্থতা
তিক্ত মনের বিরস রুক্ষ কথা
আনন্দ আশা তিলে তিলে লাঞ্ছিত
এই কি মোদের বহুদিবাবাঞ্ছিত
পদ্মার চরে বাস।
নির্জন দ্বীপ, ভেক মক মক করে
আকাশ জ্বলিছে তারার সলিতা ধরে
জলের সঙ্গ জাগায় কী অনুভব
মৃদু তালে বাজে কল্লোল কলরব
বায়ু বহে উচ্ছ্বাস।

২৪শে ফেব্রুয়ারি রাজশাহী চর

ফাল্‌গুননিশি চন্দ্রের চোখে তন্দ্রা
স্তব্ধতা ভেদি' ঝিল্লীর স্বর তীব্র
তারা ও জোনাকি দেয়ালি স্বর্গে মর্তে
চিত্তে আমার অম্লান তপোবহ্নি।

১লা মার্চ নওগাঁ

মর্মের অবকাশ নাই রে
মগ্ন রয়েছি সদা কর্মে
চিন্তায় ভুলে থাকি তাই রে
লগ্ন রয়েছে যাহা মর্মে।
যাহা মোর জীবনের বিত্ত
জীবনের অন্তে যা নিত্য
আভাস তাহার যেন পাই রে
বিস্মৃতি বিরচিত হর্ম্যে।

২রা মার্চ

ছোট ছোট কাজ বড় ভালো করে করি
বড় কাজ যত পিছনে রয়েছে পুড়ি'।

তবু মনে মোর আছে এই সান্ত্বনা
করণীয় এরে করি নাই বঞ্চনা।
বড় আর ছোট কে রেখেছে ভাগ করে
কোনো দিন কেহ উল্টা বুঝিবে ওরে।

৮ই মার্চ

      বিগতের শোচনায় মগ্ন
চেয়ে দেখি না যে ধরা চন্দ্রিকালগ্ন।
      আকাশেতে উৎসব
      মর্তে গীতরব
মৃদুল সমীরে ঝরে মদিরা
চিত্তবধূ কেন বধিরা।

৯ই মার্চ

জীবন কী বিমোহন রে
      জ্যোৎস্নাবিকীরিত রাত্রে
সমীর শীকর যায় বরষি'
      তরণী দুলিছে জলগাত্রে।
ভুবনে তাহার কিবা ভাবনা
      প্রণয়প্রতিমা যার অঙ্কে
কণ্ঠে যাহার সুরমদিরা
      তাহারে কাঁপাবে কী আতঙ্কে।

১২ই মার্চ পতিসর

মহা পথিকের সাধনা মহান
      বিপুল তাঁহার বেদনা
ক্লান্তির ভারে কেঁদ না রে মন কেঁদ না।
কারো 'পরে তোর বিরক্তি নাই
      কিছুতে নাইকো ক্ষোভ
পৃথিবীর পথে লোষ্ট্রে নাইকো লোভ।
স্মরণ রাখিস্ সমুখ ছাড়ায়ে
      আপনার দূর লক্ষ্য
ইহারা তোমার কেহ নয় সমকক্ষ।

ইহাদের 'পরে বৃথা অবজ্ঞা
রোষ অভিমান মিছে
ইহাদের সাথে জড়ায়ে রোস্ নে পিছে।

১৭ই মার্চ নওগাঁ

কঠিন কর্মযজ্ঞে শরীর যে অবসন্ন
যৌবন দিনরাত্রি পায় না ভোগের অন্ন।
সুন্দর যায় অস্তে হেরিবার অবকাশ নাই
অন্তরতলে রুদ্ধ নিষ্ফল সব বাসনাই।

১৮ই মার্চ

আকাশে আষাঢ় ধেনু চরাইতে চলে
ধবলী শ্যামলী পাটলীরা দলে দলে
ককুদ দুলায়ে ধীর মন্থর গতি
যেতে যেতে ডাকে হাম্বা হাম্বা বলে।
আষাঢ়ের গোঠে কত যে বাছুর গাই
এক এক করে গুনিতেছি বসে তাই।
দিগন্ত হতে দিগন্ত সীমাবধি
গমনের স্রোতে আদি ও অন্ত নাই।

১২ই জুন চট্টগ্রাম

মোর কক্ষের বাতায়ন দিয়া
চৌকোণ ঐ খণ্ড গগনে
দূরতর মেঘ তায়
নীলমর্মর শিলার গাত্রে
শঙ্খধবল তির্যক শত
সূক্ষ্ম বলীর ন্যায়।

১৩ই জুন

বন্ধুর মাঠ কোমল হয়েছে হরিৎ দূর্বাদলে
কঠিন আসন মুড়িয়া দিল কে মরকত মখমলে।

১৩ই জুন

কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে শোয়
মেঘলা নিশিতে অবনী
ঝিল্লীর স্বর স্তব্ধ আজিকে
নিশ্চল যেন পবন-ই।

১০ই জুন

গুরু মন্থর মেঘের সঙ্গে লঘু চঞ্চল মেঘের
নভ প্রাঙ্গণে বায়ুরথে আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেগের।
ঘর্ষণে ওঠে ঘর্ঘর রব তাহারি সঙ্গে মেশা
রথ তুরঙ্গ ধাবন রভসে সঘনে ছাড়ে যে হ্রেষা।
খুরেতে চাকায় চকমকি ঠোকে ফুল্‌কি ছোটায় ছড়ায়
ব্যোম মার্গের দীপ্তি সে আসি' দিক বলে দেয় ধরায়।

১৬ই জুন

এক মনে ঝরে ঝর্ঝর স্বরে মেঘলোক নির্ঝর
বায়ুভরে কাঁপে দুড়দাড় দাপে বহুশাখ তরুবর।

২৪শে জুন

বর্ষণবিরত মেঘ স্তব্ধ গতি মৃদু মন্দ বায়ে
বাণপূর্ণ তূণ লয়ে ইন্দ্র যেন আছেন ঘুমায়ে।

২৯শে জুন

সেগুন বীথির ওপার হতে উদয় রবির আলো
বিরল পাতার ফাঁকে ফাঁকে এ পারে ছড়ালো।
এ পারেতে ঘন ঘাসের সবুজ শালু পাতা
তার উপরে দীঘল ছায়ার সভামঞ্চ গাঁথা।
ছায়ার কোলে সোনার আলো শ্যামল ভূমিকা
মায়াসভার তোরণে কোন প্রবেশমন্ত্র লিখা।

৩০শে জুন চট্টগ্রাম

প্রভাতে উঠি হেরিনু নীল মেঘ
গগন জুড়ে রয়েছে পড়ে নাইকো তার বেগ।
জমাট সেই নীলের কোনোখানে
নাইকো ফিকা নাইকো ফাঁক হেরিনু সবখানে।

ক্রমে সে নীল হলো ফেনিল কালো
ধোঁয়ার শত রোঁয়ার মতো সংহতি হারালো।
ফাঁকে ফাঁকে উঠল জেগে চর
হেথা হোথা নারঙ্গী রং পাত্‌লা মেঘের সর।
ক্ষণেক আমি ছিলেম অন্যমনা
হেরিনু মোর নীল মেঘের সলিল কালো কণা।
কতক বা তার ছড়িয়ে গেছে দূরে
মিলিয়ে গেছে কতক যে তার অসীম সমুদ্দুরে।
কোথাও তবু নাইকো তিল বেগ
স্তব্ধ হয়ে রয়েছে নত নাই সে নীল মেঘ।

১০ই অক্‌টোবর ঢাকা

হিরণ কিরণ হরিদ্বরণ তৃণে
কোথা হতে আসি' হাসিয়া লইল চিনে।
পরদেশী শিশু ঘরের শিশুর সাথে
খোলা আঙিনায় খেলায় ধুলায় মাতে।
ধরণী আপন স্নেহ সুকোমল কোলে
দু'হাত বাড়ালো দোঁহারে জড়াবে বলে।
আকাশের দেয়া অমনি হিংসা ভরে
পরদিয়ারে দাঁড়ালো আড়াল করে।

১২ই অক্‌টোবর

রূপালি মেঘ দীপালি জালে সুনীল তমসায়
ফুলঝুরিতে সোনালি আলো শ্যামলে ঝলসায়।
স্বর্গে রূপা মর্তে সোনা এ কী রে হেঁয়ালি
শরৎ বলে, এই তো আমার দিবসে দেয়ালি।

১৩ই অক্‌টোবর

এ দিন রবে না, রবে না ইহার স্মৃতি
রবে প্রাণ, রবে প্রীতি।
এই ঝঞ্ঝাট, এই পিপীলিকা দংশ
এরা দিনজীবী দিনশেষে হবে ধ্বংস।
রবে না মোদের দৈন্য ভাবনা ভীতি
রবে গান, রবে গীতি।

কোনো দুর্যোগ আসে না দ্বিতীয় বার
আনে না অধিক ভার।
ইহার সুযোগ লইল না বান্ধব
রইল উদাস, হারাইল বৈভব।
আর তো আমরা যাব না উহার দ্বার
রবে এই স্মৃতি সার।

১৯শে অক্‌টোবর

দুর্দিনে হয়ে ঘরের বাহির বন্ধু লভিনু কারে
অপরিচিত সে পরিচয় দিল সজল অন্ধকারে।
আকস্মিকের ভরসা রাখিলে দুর্দিনে নাহি ভয়
জীবন থাকিলে জীবনের পথে বন্ধুর দেখা হয়।

২৬শে অক্‌টোবর

কৌমুদী কুমুদ বরণা
অশীতল তুষার ঝরণা
নেমে আসে মেঘাবলী লঙ্ঘি'
বহে যায়, নাই তবু কল্লোল
বহে যায়, স্থির যেন পল্বল
বিরহিত তরঙ্গভঙ্গী।

২৭শে অক্‌টোবর

নিশীথ ছায়ে শিশির ছিল তৃণের মাঝে লীন
"শিশির।" সবে কহিত হেসে "শিশির অতি দীন।"
প্রভাত হলো, শিশির দিল আত্মপরিচয়
ফণার 'পরে মণির মতো দূর্বা তারে বয়।
সূর্য তারে পাঠায় ভেট কিরণ কণা কণা
"আগেই মোরা চিনেছি তারে," ঘোষিল সব জনা।

১লা নভেম্বর

ছিন্ন কেশর কীর্ণ হয়ে ছেয়েছে নীল ধূলি
উদয় রবি ঊর্ধ্বে চলে ছুঁইয়ে চলে তুলি।
চকিতে তারা পদ্মরাঙা চকিতে বকফুলী।

২রা নভেম্বর

তুহিন চন্দ্রিকা শ্রীহীন শশী
　　মন্ত্রমর্মর ছন্দ
সুদূর হতে আসে শিশিরে রসি'
　　ব্যাকুল হেনাফুল গন্ধ।

৪ঠা নভেম্বর

ধবল মেঘমালা উরসে ঝলে
　　নিবিড় নীলমণি কিরীটে তার
কপালে ভানুটীকা স্তিমিত জলে
　　চরণে ধরণীর প্রণত কায়।

৯ই নভেম্বর

শিশিরধৌত তরুপল্লব পুষ্প শিশিরস্নাত
শান্ত সমীর, কোমল রৌদ্র বিরলধ্বনি প্রাত।

১০ই নভেম্বর

যে আনন্দ দিবানিশি দিশি দিশি চলেছে বহিয়া
আদিহীন অন্তহীন ত্বরাহীন রহিয়া রহিয়া
সৌর কবে চান্দ্র নভে উদয়াস্ত সন্ধিতে সন্ধিতে
প্রাণধারণের ছন্দে প্রাণী যারে বিকশে সঙ্গীতে
সে যেন আমার কাব্যে ধরা দেয় আপন গৌরবে
মানসপ্রসূন মম ভরি' দেয় নিসর্গ সৌরভে।

২৯শে নভেম্বর

নিশীথ গগন নুঁয়ে পড়ে যেন পুষ্পাবনত শাখা
তারাগুলি যেন রজনীগন্ধা রজতবর্ণে আঁকা।
পৃথ্বী ঘুমায় ধ্বনিহীন, শুধু শ্বাসপতনের সাড়া
ঝিল্লীর রবে মুহূর্তকাল নয় সে বিরতিহারা।

১৫ই ডিসেম্বর

ময়লা কাপড় পরে থাকা গয়লাবাড়ীর মেয়ে
ওর কোলে ওর ছোট্ট ছেলে সামনে আছে চেয়ে।
সম্মুখে ওর ভায়ের কোলে আমার খোকন স্থির
কুকুর এসে গা চেটে দেয় কুকুরছানাটির।

প্রাচীন আমার ভৃত্য গেছে ওদের দলে ভিড়ে
সবাই মিলে পোহায় রোদ চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে।
হাতে হাতে ঘুরছে হুঁকো জুটছে এসে সাথী
কেউ বা ওরা ঠাকুরদাদা কেউ বা ওরা নাতি।

১৬ই ডিসেম্বর

প্রাচী দিগন্ত রঞ্জিত করি' উদয়ের ইঙ্গিত
চঞ্চল শত বিহগ কণ্ঠে বিমিশ্র সঙ্গীত।
অন্তরীক্ষে পরিলম্বিত ধবল কুহেলী ডোর
মৃত্তিকা 'পরে সঘন সফেন ধূম্র কুয়াশা ঘোর।

১৭ই ডিসেম্বর

পূর্ণা তিথির চাঁদ ধীরে ধীরে ফোটে তার কান্তি
সন্ধ্যা ঘনাতে থাকে তরুমূল লম্বিত ছায়াতে
বিহগেরা গেছে ফিরি' দ্রুত কলরবে হরে ক্লান্তি
উহারা নীরব হলে ঝিল্লী বিনায় স্বর মায়াতে।

৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৩

রহুক আমার কাব্যে বালার্কময়ূখচ্ছটা শতবর্ণ মেঘ
বিহঙ্গের গীতিমুক্তি বনস্পতি পরমায়ু মৃত্তিকার রস
শিশিরের স্বচ্ছন্দতা শিশুর শুচিতা পশুদের নিরুদ্বেগ
সর্বশেষে শর্বরীর প্রশান্ত অম্বরতলে নারীর পরশ।

২রা জানুয়ারি ১৯৩৪

সহজ সরল হোক বাণী মোর সূর্যালোকসম
কেহ না জানুক তার কত জ্বালা আদিতে অন্তরে।
অদৃশ্য ছায়ার মতো সাথে থাক কলাবিদ্যা মম
সকলের চিত্ত আমি আকর্ষিব যে জাদু মন্তরে।
সরস সবুজ হোক বাণী মোর দূর্বাদলসম
কেহ না জানুক তার কী আবেগ অঙ্কুরে শিখরে
অদৃশ্য বীজের মতো কোষে থাক অমরত্ব মম
ভবিষ্যের চিত্তে আমি প্রস্ফুটিব যে কুহক ভরে।

২৮শে জানুয়ারি ১৯৩৪

—

পরিশিষ্ট

সত্যাসত্য / প্রথম খণ্ড / যার যেথা দেশ

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়েব আঁকা।

মূল্য পাঁচ টাকা

গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৩০-৩২। উপন্যাসের কথারম্ভে লেখক বলছেন, 'এই খণ্ডের রচনাকাল ১৯৩০-৩২। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে এর কতক অংশ পরিত্যক্ত বা পরিবর্তিত হয়েছিল। চতুর্থ সংস্করণে প্রথম সংস্করণের পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে। অল্পস্বল্প সংশোধন করা গেছে। ভূমিকাটি প্রত্যাহৃত হয়েছিল। প্রকাশকের অনুরোধে পুনর্মুদ্রিত হল। "সত্যাসত্য" এপিক নয়। বৃহৎ উপন্যাস।'

উৎসর্গ—শ্রীভবানী ভট্টাচার্য
স্বহৃদরেষু

প্রথম সংস্করণ ১৩৩৯
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪৭
তৃতীয় সংস্করণ ১৩৫৩
চতুর্থ সংস্করণ ১৩৬২

রচনাবলীতে বইয়ের চতুর্থ সংস্করণ ছাপা হয়েছে।
সেই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত লেখকের ভূমিকা ছাপা হয়েছে মূল গ্রন্থের সঙ্গে।

সত্যাসত্য / দ্বিতীয় খণ্ড / অজ্ঞাতবাস

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

ছয় টাকা

গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৩২-৩৩। উপন্যাসের কথারম্ভে লেখক বলছেন, 'এই খণ্ডের রচনাকাল ১৯৩২-৩৩। দ্বিতীয় সংস্করণে এর কতক অংশ পরিত্যক্ত বা পরিবর্তিত হয়েছিল। তৃতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে। অল্প অল্প সংশোধন করা গেছে।'

উৎসর্গ—শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে

প্রথম স্বাক্ষর

অন্নদাশঙ্কর রায়

গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্ত প্রস্তুত কিন্তু শেষ পর্যন্ত অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি (অংশবিশেষ নূতনা রাধা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত)। রচনাবলীতে মূলত অগ্রন্থিত রচনা হিসেবে ছাপা হল। রচনাকাল ১৯২১-২২ থেকে ১৯২৭।

প্রস্তাবিত উৎসর্গপত্র—শ্রীকৃপানাথ মিশ্র
মিত্রবরেষু

সূচিপত্র—সনেট ১ / সনেট ২ / এলেন কেই / কৃষ্ণ / রাধা / কৈফিয়ৎ / পুনর্জন্ম / পাওয়া / বিরহী / অন্-একনিষ্ঠ / বিপরীত / একনিষ্ঠ

মূল পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া কবিতার তৃতীয় স্তবকের শেষ পংক্তির স্থলে এই দুটি পংক্তি ছিল :

অধর পেলাম সেই অধরার যারে ধেয়েছি
হার গাঁথিয়া কণ্ঠে পরি মাণিক পেয়েছি।

রাখী

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

প্রকাশক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রচ্ছদে কোন চিত্র নেই, শুধু নামাঙ্কন।

মূল্য অনুল্লিখিত

গ্রন্থের রচনাকাল ১৯২৭-২৯। রচনাস্থল ইউরোপ।

উৎসর্গ—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দক্ষিণ করে—

আমরা দু'জনা দুই কাননের পাখী
একটি রজনী একটি শাখার শাখী
তোমার আমার মিল নাই মিল নাই
তাই বাঁধিলাম রাখী।

প্রথম প্রকাশ ১৯২৯
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩০

সূচিপত্র—মাথুর / মিলনের গান / পথের সাথী / বিমুগ্ধ / অনাগতার তরে / অন্বেষণ /
পাশাপাশি / বিলম্বিতা / মনের মানুষ / প্রাতে ও রাতে / চকোর ও চাঁদ /
বিস্মরণ / এখন আর তখন / বিদায় / চলা ও থামা / স্রষ্টা / সৃষ্টি / স্বীকৃতি /
প্রণিপাত

দ্বিতীয় সংস্করণে এই কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের সংকেত অনুসারে স্থলে স্থলে পরিমার্জিত।

একটি বসন্ত

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

প্রকাশক—শ্রী সুধীরচন্দ্র সরকার
এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স
১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা

প্রচ্ছদে ফুলপাতার ক্ষুদ্রাকার ছবি ও নামাঙ্কন, প্রচ্ছদশিল্পীর নাম নেই।

দাম—৮০

গ্রন্থের রচনাকাল ১৯২৯।
উৎসর্গ—জয়্ স্-কে

প্রথম প্রকাশ ১৩৩৯—বৈশাখ

সূচিপত্র—একদিন / মাঝে মাঝে / দোলা / স্মৃতি / ছবি / আন্‌মনা / অভাজন /
অকৃতী / পূর্ণিমা / মৌন / অসপত্ন / সমাপন

কালের শাসন

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

প্রকাশক—শ্রী সুধীরচন্দ্র সরকার
এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ
১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

প্রচ্ছদে কোন চিত্র নেই, শুধু নামাঙ্কন।

দাম—৸০

গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাবলীর রচনাস্থল ইউরোপ, জাহাজ ও ভারতবর্ষ।
রচনাকাল ১৯২৯-৩০।

উৎসর্গ—অম্লস

প্রথম প্রকাশ ১৩৪০

সূচিপত্র—মানবের দেশে শুধু / ঋষি, তব স্থির দৃষ্টি / মহাশিল্পী, আমি কথা দিনু / নিখিল শিল্পীর সৃষ্টি / দিনগুলি যার তার হোক / এবার চলেছি নিজ দেশে / ক্রোধে ক্ষোভে দুশ্চিন্তায় / তোমারে স্মরিব আজ / গোটা দুই গাধা / কাছে যারা আছে / না হয় আমার বসন্ত নাই / আমি হবো আকাশের কবি / আপনা মাঝারে চাহি' / উহাদের নাই কোনো কাজ / অন্তমনে থাকি / ঝরা পাতাদের ঝড় / তোমার প্রবল প্রেম / সকলের শ্রেষ্ঠ প্রেম

লিপি

অন্নদাশঙ্কর রায়

গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য প্রস্তুত পাণ্ডুলিপি কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র গ্রন্থ রূপে অপ্রকাশিত। অংশবিশেষ নূতনা রাধা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত, সেই অংশই রচনাবলীতে ছাপা হল।
রচনাকাল ১৯৩০-৩১।

প্রস্তাবিত উৎসর্গপত্র—লীলাকে

সূচিপত্র—আমরা / শূন্য বাসর / সকলের / সৌন্দর্যস্নান / আমাদের প্রেম / তুমি আমি আছি / দুর্মুখ / মরণ / আহ্বান / বিরহ / মিলিত নেত্র

নীড়

অন্নদাশঙ্কর রায়

গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য প্রস্তুত পাণ্ডুলিপি কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র গ্রন্থ রূপে অপ্রকাশিত। অংশবিশেষ নূতনা রাধা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত, সেই অংশই রচনাবলীতে ছাপা হল।
রচনাকাল ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩-৩৪।

প্রস্তাবিত উৎসর্গপত্র—লীলাকে

সূচিপত্র—ছুটির দিন / মৃত্যু / শোক / বন্দনা / পুণ্য / জন্মদিন / মিলনস্মৃতি / বিরহস্মৃতি / নীড়

জার্নাল

অন্নদাশঙ্কর রায়

গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য প্রস্তুত পাণ্ডুলিপি কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র গ্রন্থ রূপে অপ্রকাশিত। অংশবিশেষ নূতনা রাধা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত, রচনাবলীতে সেই অংশের সঙ্গে অগ্রন্থিত অংশও, অর্থাৎ সমগ্র পাণ্ডুলিপিই ছাপা হল।

রচনাকাল ১১ই জানুয়ারি ১৯৩৩ থেকে ২৮শে জানুয়ারি ১৯৩৪।

প্রস্তাবিত উৎসর্গপত্র—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক
কবিকরকমলেষু

নূতনা রাধা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত জার্নাল পর্যায়ের কবিতাগুলির স্বতন্ত্র নামকরণ করা হয়েছিল—যথা: ভগ্ন মসজিদ / প্রাচীন মূর্তি / সোনা হারানো / স্বর্গ / অপচয় / পদ্মার চর / নদীবক্ষে / আষাঢ় / নব দূর্বা / বর্ষামেঘ / বর্ষণ বিরতি / ইন্দ্রজাল / আলোছায়া / শরৎমেঘ / কৌমুদী / শিশির / হেমন্ত মেঘ / হেনা / নিশীথে / রোদ পোহানো / কুয়াশা / শীতের সন্ধ্যা। —কিন্তু রচনাবলীতে লেখকের নির্দেশে স্বতন্ত্র নাম বাতিল করা হল।